এক এক করে সবগুলো মেল্ ট্রেনই হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল। রোজই যায়। ভজহরি রোজই এসে বসে থাকে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিটাতে। বিশ্রামের জন্যে নয়, সে বসে ভেবে দেখবার জন্যে বিচিত্র এই হাওড়া স্টেশনের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো। এই তো সাত দিন আগে মাদ্রাজ মেলে চাপতে গিয়ে একজন যুবক হঠাৎ বমি করতে আরম্ভ করল। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে তাতে বেশ খানিকটা কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। লোকটা বোধ হয় কলকাতার বিষ সঙ্গে নিয়ে এসেছে—কলেরার বিষ। তৃতীয় শ্রেণীর পরেই গোটা দশ বারো প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রয়েছে। সে-সব কামরার দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যেন বর্গীর দল ঘোড়া চালিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল ওপারে—আর মারাঠা ডিচের এপারের নাগরিকরা দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করতে লাগল কবিতা-লেখা কাগজ হাতে নিয়ে। বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের হাতে খবরের কাগজ ছিল। আজই করপোরেশনের বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে যে, কলকাতায় কলেরা এপিডেমিক ভাবে দেখা দিয়েছে। লোকটা যখন বমি করতে আরম্ভ করল তখন এপিডেমিক-বীজাণু বাতাসের সঙ্গে উড়ে আসতে কতক্ষণ আর ...য় নেবে? বর্গীর ভয়ের চেয়েও কলেরার ভয় অনেক বেশি। খাল কেটে ...র ঘোড়াকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু কলেরার বীজাণুকে যায় না।

ভজহরি বড্ড মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল। যুবকটির সঙ্গে একটা টিনের বাক্স ...। বাক্সের মধ্যে যে বিশেষ কিছু ছিল না তা সে টের পেয়েছিল প্রথমেই। ভজহরি যখন মোট একবার মাথায় তুলেছে তখনই তার পাওনা

অন্নদা মচি

হয়েছে মজুর। ভজহরি দাস হাওড়া স্টেশনের [illegible]
বাঙালী কুলী।

বমি-করার শব্দ শুনে মেল্ ট্রেনটাও যেন সরে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। যত বড় মেল্ ট্রেনই হোক না কেন, ভজহরি দেখেছে প্রতিদিনই গাড়ি ছাড়তে দু-পাঁচ মিনিট দেরি হয়। আজ মাদ্রাজ মেল্ বোধ হয় এক মিনিট আগেই ছেড়ে গেল। যুবকটি প্ল্যাটফর্মের ওপরই শুয়ে পড়েছে। খুবই দুর্বল। পাশে বসে ভজহরি ছেলেটির মাথায় হাত বুলতে লাগল। দূরে দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের সেপাই বললে, "এরে ভজুয়া, বেমারী বড্ড খারাপ রোকমের আছে, পালিয়ে আয়।"

মাথা তুলে ভজহরি চেয়ে রইল সেপাইটার দিকে। কোন কথা বললে না সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ভজহরি ভাবছিল তার পশ্চাৎ-ইতিহাস। 'পালিয়ে আয়' কথাটার প্রতি আছে ওর অপরিসীম অবজ্ঞা। ছেলেবেলা থেকেই যেন ভজহরি পালিয়ে পালিয়ে ঘুরেছে জীবনের বিশটা বছর। পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে ওর সমাজ ও সংসার। পালিয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি ওকে এমন করে পেয়ে বসেছিল যে, বাতাসের মধ্যে হিল্লোল উঠলেই ও ভাবত কালবৈশেখী আসছে। পালিয়ে এসেছে খোলা-ময়দান থেকে, পালিয়ে এসেছে জীবন থেকে। তারপর যেদিন সত্যিকারের ঝড় উঠল, তছনছ হয়ে গেল জীবনের সব পুরনো ব্যবস্থা, সেদিন থেকে ভজহরি আর কখন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে নি। জীবনের নিষ্ঠুরতম বাস্তবকে সে শাস্তি দিয়েছে কঠিনতম হাতে। অনাহার আর আশ্রয়হীনতার ভূত দুটো এখন ওর পায়ের কাছে পড়ে থাকে পোষা কুকুরের মত। চাবুক তুললেই ল্যাজ নামিয়ে ওরা চায় মার্জনা, ভজহরি বসে বসে হাসে। হাসে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসেই। মেল্ ট্রেনগুলো সব চলে যাওয়ার পর বেঞ্চিটার চারপাশে ইলেক্‌ট্রিকের আলো ক্রমশ কমে আসতে থাকে। থাকে না জনতা। তারপর সেই স্বল্প-অন্ধকার অপসারিত হয়। ভেসে ওঠে ভজহরির নতুন সাম্রাজ্য। সিজার কিংবা আলেক্‌জাণ্ডারের সাধ্যই ছিল না এমন সাম্রাজ্যের কল্পনা করা।

খানিকটা পরেই এ্যাম্বুলেন্স এল। লোকটাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল গাড়িতে। সেপাইটা তখন অনেকটা দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। মারাঠা ডিচের ওপারের লোক, তাই চোখ বুজে আর নাক বন্ধ করে শত্রু ঠেকাচ্ছে! ভজহরি টিনের বাক্সটা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল এ্যাম্বুলেন্স গাড়িটার পেছন দিকে। লোকটাকে যখন গাড়ির মধ্যে শুইয়ে দিল লম্বাভাবে, ভজহরি তখন হাসপাতালের লোকের কাছে বলল, "এই বাক্সটাও নিতে হবে।"

বাক্সটা হাতে নিয়ে হাসপাতালের লোক জিজ্ঞাসা করল, "আর সব মোট কোথায়?"

"মোট তো একটাই ছিল।" জবাব দিল ভজহরি।

ধমকে উঠল হাসপাতালের লোক, "একটা? দেখি তোর নম্বর—"

ভজহরি বুকটা তার ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ওপর দিকে তুলে ধরে বলল, "এই তো উন-পঞ্চাশ নম্বর।"

হাসপাতালেব দ্বিতীয় লোকটি বাক্সটাকে দু-চারবার নেড়েচেড়ে দেখে হতাশ সুরেই যেন ঘোষণা করল, "একেবারে ফাঁকা ময়দান! এক মুঠো ঘাস পর্যন্ত জন্মায় নি।" এই বলে গাড়ির পেছন দিকের দরজাটায় মারল একটা ধাক্কা। ভজহরির মনে হল বাক্সটায় তেমন দামী জিনিস-পত্তর নেই বলে হাসপাতালের লোকটা যেন যুবকটির গালে একটা ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল। এ্যাম্বুলেন্সটা চলে যাওয়ার পর ভজহরি তার নিজের গালে হাত বুলতে বুলতে এসে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মের ওপরেই। লক্ষ্য করে দেখল, সেই জায়গাটায় এখন পর্যন্ত একটাও মাছি এসে উড়ে বসে নি। হাত পাঁচেক দূরেই তো সে দেখতে পাচ্ছে অনেকগুলো মাছি খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা হলে বোধ হয় লোকটার বমির মধ্যে খাদ্যের কোন অংশটুকু পর্যন্ত নেই কিংবা লোকটা এমন কিছু খেয়েছিল যা বোধ হয় মাছিরাও খায় না।

ভজহরি এবার আরও একটু ভাল করে নজর দিয়ে দেখতে গিয়ে বুঝতে পারল যে, এ কলেরার বমি নয়। ক্রমাগত উপোসের ফলে লোকটার মুখ দিয়ে উঠে এসেছিল পিত্ত। হড়হুড় করে এক ঘটি জল পড়েছে মুখ দিয়ে।

কলকাতা করপোরেশনের বিশুদ্ধ জলও লোকটা তার সঙ্কুচিত অন্ত্রের মধ্যে ধরে রাখতে পারেনি। জলের মধ্যে এক চিমটি প্রোটিন থাকলে লোকটা আজ কিছুতেই বমি করত না। ফেল্ করত না মাদ্রাজ মেল্।

ভজহরির মনটা একটু ভিজে এল। এতক্ষণে বোধ হয় লোকটাকে কলেরা ওয়ার্ডে ভর্তি করে দিয়েছে। হয়তো এবার ওর সত্যিই কলেরা হবে। গাদা গাদা কলেরা-রোগীর ভেদ বমি দেখলে বড় গামাও ব্যাধির আক্রমণকে রুখে রাখতে পারত না। স্টেশনের হেড জমাদার এসে পড়েছে এরই মধ্যে। সঙ্গে এনেছে রঘুয়া জমাদারের যুবতী বৌটাকে। প্ল্যাটফর্মটাকে বীজাণু-মুক্ত করবার জন্যে ওষুধ মেশানো জল ঢালতে লাগল হেড-জমাদার। আর রঘুয়ার বৌটা ঝাঁটা মেরে মেরে সাফ করতে লাগল সিমেণ্টের বুক। ভজহরি ভাবল, দুনিয়ার কোন ওষুধই পারবে না প্ল্যাটফর্মের বুকটাকে ব্যাধি-মুক্ত করতে। এখানে আজ অনেক বীজাণু—এ-শতাব্দীর বুভুক্ষা-বীজাণু ঘর বেঁধেছে সিমেণ্টের প্রতি রোমকূপে।

কিন্তু সে-ঘটনাও আজ সাত দিন পরে পুরনো হয়ে গেছে। আজকের সেই পরিবারটির কথাই ভজহরির বার বার করে মনে পড়ছিল। দিল্লী মেলে চেপে এক বাঙালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক দিল্লী যাচ্ছিলেন। সঙ্গে একটি পাঁচ ছ-বছরের মেয়েও ছিল। মালপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। একটা বড় স্যুটকেস আর একটা হোল্ডঅল্। ট্যাক্সি চেপেই ওঁরা এসেছিলেন। ভজহরি সামনেই দাঁড়ানো ছিল, যেন ভদ্রলোকটির জন্যে সে অপেক্ষা করছিল।

"এই কুলী—" ট্যাক্সিতে বসেই ভদ্রলোকটি ডাকলেন।

ভজহরির মাথায় তার গামছাটা বাঁধাই ছিল। ট্যাক্সির পেছন থেকে সে স্যুটকেস আর হোল্ডঅল্টা নামিয়ে নিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল গয়া জেলার খোদা বক্স। বাঙালী কুলীর তাকত সম্বন্ধে কেবল খোদা বক্স নয়, হাওড়া স্টেশনের সব কুলীরাই সবটুকু খবরই রাখে। করুণার হাসি হেসে মিঞা খোদা বক্স বাঁ হাত দিয়ে স্যুটকেসের একটা দিক তুলে ধরল। উল্টো দিকটাতে ধরল ভজহরি নিজেই। তারপর সে বোঝাটা মাথায় চাপিয়ে হাঁটতে লাগল বাঙালী বাবুর পিছু পিছু।

প্ল্যাটফর্মে দিল্লী মেল্ দাঁড়ানোই ছিল। প্রথম শ্রেণীর কামরার সামনে নাম-লেখা কাগজগুলো পড়তে পড়তে ভদ্রলোকটি এগিয়ে গেলেন দক্ষিণ দিকে। বেশ কিছুটা দূরেই তিনি চলে গেলেন। স্যুটকেস আর হোল্ডঅল্ মাথায় নিয়ে ভজহরি তার বাঁ দিকের কামরার সামনের কাগজটাতে একবার চকিতের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নিল। স্যুটকেসের ওপরে ভজহরি দেখেছে যে, ভদ্রলোকটির নাম লেখা রয়েছে অজয়কুমার বসু। বাংলায় লেখা। অক্ষরগুলো যেন রাবীন্দ্রিক-নিয়মে পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে দিয়ে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় পড়ে আছে স্যুটকেসের ওপর। আরাম-কেদারায় শোয়া অক্ষরগুলো দেখতে ভজহরির বেশ ভাল লাগে। দু-একমিনিট চেয়ে থাকলে মনে হয়, অক্ষরগুলোর হাত পা গজাচ্ছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে রবীন্দ্রনাথের আরাম-কেদারায় শোয়া ছবিখানা। অক্ষর-অবয়বের মধ্যে ভজহরি দেখতে পায়, বিলুপ্তপ্রায় বিশ্বকৃষ্টির নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন। মুহূর্ত কয়েকের সজ্ঞান সৌন্দর্যানুভূতির দাম ওর দিতে পারে না হাওড়া স্টেশনের কোন প্যাসেঞ্জারই।

মেয়েটির দিকে চেয়ে ভজহরি বলল, "এই খোকী—মালুম হোতা, এহি কামরাই হোগী—"

মহিলাটি এগিয়ে এসে দেখলেন দরজার সামনে সত্যি সত্যি লেখা রয়েছে মিঃ এ. কে. বসু। তিনি ভাবলেন, পাঁচসালা ব্যবস্থায় হাওড়া স্টেশনের হিন্দুস্থানী কুলীরা বোধ হয় তাঁর স্বামীর নাম পড়তে শিখেছে। মিসেস বসু খুকীকে নিয়ে প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠলেন।

কোন যাত্রীর কাছেই ভজহরি নিজেকে বাঙালী বলে ধরা দেয় না। ধরা না দেওয়ার কারণ অবশ্য তার বাঙালীত্ব বাঁচিয়ে রাখা নয়। কিংবা তার আভিজাত্য নষ্ট হবে বলেই যে, সে বাঙালী-বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রাখে তাও নয়। বছর খানেক আগে যখন সে প্রথম লম্বা খাকী প্যান্ট পরে কুলীর কাজ আরম্ভ করে, তখন, সে বাংলা ভাষায়ই বাঙালী যাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা কইত। তাতে অনেকেই তার বাঁধা রেটের ওপরে এক টাকা দু-টাকা বেশি দিয়ে যেত। ভজহরি যেন ক্রমশই কামরার ভেতরে ও বাইরে একটা রোমান্টিক চরিত্রে

রূপান্তরিত হয়ে পড়ল অল্পদিনের মধ্যে। ভজহরি তা হতে চায় নি, চায় নি বাঁধা রেটের ওপরে বেশি মজুরি। শত শত কুলীর মত সে-ও একজন সাধারণ কুলী হয়েই থাকতে চায়।

স্যুটকেস আর হোল্ডঅলের ওজন তেমন বেশি ছিল না। কামরায় উঠে সে নিজেই নামিয়ে নিল মোট। হোল্ডঅল্‌টা রাখল সিটের ওপর। স্যুটকেসটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রাখল সিটের তলায়।

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার আগে সে 'অজয়কুমার বসু' নামটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কোন বড়লোক যাত্রীর স্যুটকেস কিংবা বাক্সের ওপর ভজহরি আজ পর্যন্ত বাংলায় লেখা নাম দেখতে পায় নি। দেখতে পায় না বাংলা দেশকে প্রতিদিনকার মেল্‌ ট্রেনগুলোতে। মেল্‌ ট্রেনের যাত্রী ছাড়া ভজহরি অন্য কোন ট্রেনের যাত্রীর মাল মাথায় তোলে না। তোলে না হাতেও। দৈনিক দুটো টাকা রোজগার তার অনায়াসেই হয়। বত্রিশ আনা সে খরচ করতে পারে না চব্বিশ ঘণ্টায়। বারো আনা এক টাকা তার উদ্বৃত্ত থাকে প্রতিদিন।

অজয়কুমার বসু একটু পরেই এসে কামরায় উঠিলেন। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, "এই যে প্রতিমা, কামরাটা খুঁজে পেয়েছ দেখছি! আমি তো এদিক থেকে সেদিক পর্যন্ত ঘুরে মরলুম। এই কুলী—"

ভজহরি দরজার দিকে চলে যাচ্ছিল দেখে অজয়বাবু ডাকলেন, "এই কুলী—"

ভজহরি ঘুরে দাঁড়াল। এবং হাত বাড়াল মজুরির জন্যে।

"দেগা, জরুর দেগা। প্রতিমা, তুমি একটু সরে বসো তো। এই কুলী, হোল্ডঅল্‌ খোলো।" আদেশ দিলেন অজয় বসু।

ভজহরি বুঝল, সিটের ওপর বিছানাটা পেতে দিতে হবে। হোল্ডঅল্‌ খুলে সে ভেতর থেকে টেনে একটা তোশক বার করল। তারপর চাদর ও বালিশও বার করল ভজহরি; হোল্ডঅল্‌টা ফেলে রাখল সিটের নিচে। তোশকটাকে লম্বা করে পেতে তার ওপরে চাদরটাকে দিল বিছিয়ে। হাতের তালু দিয়ে টিপে টিপে তোশক ও চাদরের ভাঁজগুলোকে সমান করতে লাগল ভজহরি।

অজয়বাবু চান-ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। রাত্রের পোশাক পরে খানিকটা বাদেই তিনি চান-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে দেখলেন, কুলীটা তার সমস্তটুকু মনোযোগ দিয়ে প্রস্তুত করছে শয্যা। দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা। মনে মনে ঠিক করে ফেললেন বাঁধা রেটের ওপর আট আনা পয়সা তিনি আজ বেশি-ই মজুরি দেবেন কুলীটাকে। হি ডিসার্ভস ইট।

ভজহরি রেটের কথা ভাবছিল না। এমন নরম তুলোর তোশকের ওপর হাত রেখে সে একটু বোধ হয় শৌখিনতা করছিল। প্রায় এক বছরই হল সে এমন নরম তোশকের ওপর পারেনি গা ঢেলে দিতে। রমণী-দেহের উত্তাপের চেয়েও তোশকের তুলোর উত্তাপ আজ ওকে প্রলুব্ধ করছে অনেক বেশি। রমণী-দেহ কিংবা তোশকের তুলো কোনটাই কলকাতার শহরে দুর্লভ নয়। কিন্তু বহু দিনের বঞ্চিত মানুষ কোন কোন সময়ে অতি সুলভের মধ্যেও সন্ধান পায় নবম আশ্চর্যের আকর্ষণ। ভজহরিও বোধহয় আজ সে-রকম কিছু একটা পেয়েছে। উপরি পাওনার মত সে পেয়েছে একটা ফোটো।

অজয়বাবুর বর্ষাতিটা ছিল তোশক ও বালিশের ফাঁকে ভাঁজ করা। সেটা আলগা ভাবে টেনে সরিয়ে রাখতে গিয়েই বর্ষাতির পকেট থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা ছোট্ট ফোটো। ভজহরি ফোটোখানা নিজের পকেটে রাখতে গিয়ে অনুভব করল, অজয়বাবু তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। নিঃশব্দে তিনি ভজহরির হাত থেকে ফোটোখানা নিয়ে পুনরায় ঢুকিয়ে রাখলেন বর্ষাতির পকেটে। মিসেস বসু কামরায় ছিলেন না, ছিলেন চান-ঘরে। একটু নিশ্চিন্ত বোধ করেই তিনি যেন ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, "ফোটোটা চুরি করছিলে কেন?"

"ভেবেছিলুম, আমারি পকেট থেকেই বুঝি ফোটোটা পড়ে গেছে। তা ছাড়া এমন সুন্দর ফোটো সবারই চুরি করতে ইচ্ছে করে। সেলাম হুজুর—" মিস বসুকে চান-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই যেন ভজহরি শেষের কথা দু-টো উচ্চারণ করল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে।

পার্স থেকে একটা আধুলি বার করে অজয়বাবু তুলে দিলেন ভজহরির

হাতে। দিয়ে বললেন, "চার আনা বখশিস।" বুক-পকেটে আধুলিটা রেখে দিয়ে ভজহরি একটা সিকি বার করে বলল, "মেরি মেহ্‌নতকি লিয়ে চার আনা হি কাফি। চেঞ্জ লিজিয়ে বাবু—"

বিছানার ওপর সিকিটা ফেলে রেখে ভজহরি নেমে এল কামরা থেকে। মিসেস বসু বললেন, "কুলী ব্যাটার আস্পর্ধা তো কম নয়! তোমার মুখের ওপর সিকিটা ছুঁড়ে মারলে?"

"না প্রতিমা, ওটা সিকি নয়—"

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিসেস বসু প্রশ্ন করলেন, "সিকি নয়? ওটা তবে কি?"

"ভোট।"

"ভোট?"

"হ্যাঁ প্রতিমা। যাঁরা রাষ্ট্র চালাচ্ছেন তাঁদের কাছে আমার এবং ওর ভোটের দাম একই।"

"ওরা আজকাল ভোট দেয় বুঝি?"

"না দিলে কংগ্রেস হেরে যেত। আমার মত শিক্ষিত লোকেরা কংগ্রেসকে ভোট দেয় নি।" বললেন অজয়বাবু।

দিল্লী মেল্ ছেড়ে যাওয়ার পরে ভজহরি ভেবেছিল, আজ আর সে মাথায় মোট তুলবে না। মাথাটা কেমন একটু ঝিমঝিম করছিল। বর্ষাতির পকেট থেকে ফোটোটা না পড়লেই ভাল হতো। অত্যন্ত চেনা ফোটো। চেনা মুখ মেয়েটির। কেবল সাধারণ চেনা নয়, হাতের কত কাছেই না ছিল মিনতি! মৃদু হাসি ভেসে উঠল ভজহরির ঠোঁটে। বছর খানেক আগে এই মিনতির সঙ্গেই ওর দেখা হয়েছিল একটা রিফিউজী ক্যাম্পে। ভাঙ্গা ডিমের মত বুর্জোয়া আভিজাত্য সেদিন ধুলোর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ক্যাম্পের মাটিতে। সতর্ক না থাকলে ভজহরির জুতোর সঙ্গে লেপ্টে থাকত ভাঙ্গা ডিমের ছিঁটেফোঁটা। বিপদ-লগ্নে যে মাথা নিচু করে একদিন ক্যাম্পের ফটক দিয়ে প্রবেশ করেছিল আশ্রয়ের জন্যে, সেই মেয়েটিই আজ বিপদ-

উত্তীর্ণ বর্ষাতির পকেটে এসে ঢুকেছে অতি নিঃশব্দে। বুর্জোয়া চামড়ায় যত আভিজাত্যই থাক, মিনতিকে চিরদিন লুকিয়েই থাকতে হবে। এবার ভজহরি একটু করুণার হাসি হাসল। হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে এল ছ-নম্বর প্ল্যাটফর্মের ফটক দিয়ে। তারপর সে হুইলার কোম্পানীর স্টলের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াল বাইরে, গাড়িবারান্দার সামনে।

"কা ভইলবারে ভজুয়া? হাসতে কিউ?" জিজ্ঞাসা করল কুলীর সর্দার চন্দ্রনাথ দুবে। সহকর্মীরা সবাই ভজহরিকে ভজুয়া বলেই ডাকে।

সর্দারের কথা শুনে ভজহরি একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। হাওড়া স্টেশনের এলাকার মধ্যে সে কখনও হাসে না। হাওড়া স্টেশন তার কর্মস্থল— রুজি রোজগারের পবিত্রতম মন্দির। এখানে সে হাসতে আসে না, আসে না ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে। যে-প্রাণটা অপেক্ষমান মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের মত ধুক্ ধুক্ করছে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ভজহরি আসে এই হাওড়া স্টেশনে প্রতিদিন। বেচতে হয় তাকে মেহ্নত। জড়দেহের বৃহত্তম স্পন্দন বিস্ময়টিকে সে বাঁচিয়ে রাখে মেহ্নত বেচা পয়সায়। ভজহরি জানে, জগতের সব কিছু জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রযুক্তি ও প্রচেষ্টা চলেছে কেবল সেই ইঞ্জিনটাকে সচল রাখবার জন্যেই। জীবন ধারণের মেহ্নত-মর্যাদা তাই সে জগতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা বলেই মনে করে। যে-সম্রাট তার দিনের রুটি রোজগার করবার জন্যে মেহ্নত করে না, তার মর্যাদার দাম ভজহরির কাছে কানাকড়িও নয়।

সর্দারের কথা শুনে সে তাই মুহূর্তের মধ্যেই গম্ভীর হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞাসা করল, "আমি হাসছিলুম না কি সর্দার?"

"হাঁ, হাঁ ভজুয়া। মালুম হোতা হায়, তুম্ সে কোই রাজকন্যাকা ভেট হুয়া। ভজুয়া, কিতনি পয়সা কামায়া?"

"দেড় রূপিয়া।"

"আউর থোড়া কামা লে।" এই বলে সর্দার ভজহরিকে দাঁড় করিয়ে দিল সামনের দিকে। মোটর গাড়ি থেকে প্যাসেঞ্জার নামলেই ভজহরি গিয়ে মাথায় মোট তুলবে। শেষ মেল্ ট্রেন হাওড়া স্টেশন ছেড়ে যাবে আর

আধঘণ্টা পরেই। ভজহরিকে সর্দার খুবই ভালবাসে। তা ছাড়া, সর্দার নিশ্চয়ই জানে যে, নম্বর-লাগানো বুকপকেটের মধ্যে মাত্র এক টাকা আট আনার সঞ্চয় নিয়ে দুনিয়ার কেউ পারবে না গিয়ে কোন রাজকন্যার সামনে দাড়াতে। কিন্তু আর আট আনা বেশী রোজগার করলেই কি ভজহরির বুকের আকর্ষণ বাড়বে? বোধহয় না। কেবল যদি নম্বরের গৌরব নিয়ে ভজহরি তার বুকের ভেতরটা খুলে দিতে পারত, তবে নিশ্চয়ই জগতের কোন রাজকুমারী-ই পারত না ভজহরিকে ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু এ-সব কথা ভেবে ওর লাভ কি? সে হাওড়া স্টেশনে আসেনি রাজকুমারীর অনুসন্ধানে। দিনের রুটি রোজগার করে সে ফিরে যায় বস্তিতে। বস্তিতে বসে সে রোজগার করে মনের রুটি। কর্ম ও চিন্তার দ্বি-রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট এই বাস্তুহারা ভজহরি রায়।

পা চালিয়ে ভজহরি হাঁটতে লাগল ডব্‌সন রোডের দিকে। সেখানে ওর একটা ঠিকানা আছে। পৃথিবীর যে-কোন জায়গা থেকে চিঠি লিখলে এই ঠিকানায় এসে পৌছয়। বোধহয় পৌছয়। পৃথিবীর কোন জায়গা থেকেই ওর কাছে আজো কোন চিঠি এসে পৌছয়নি বটে, কিন্তু কেউ যদি লেখে তবে নিশ্চয়ই পৌছুবে। কলকাতার লাট সাহেবের এবং ডব্‌সন রোডের বস্তি-বাসীদের ঠিকানার মধ্যে তিলেক মাত্র উঁচু-নিচু নেই। ডাক-বিভাগের খাতায় বিরাজ করছে ঠিকানার সাম্যবাদ! সরকারি পিওনগুলো প্রতিদিনই আসে ডব্‌সন রোডের গর্তগুলোর সামনে। এসে বলে: চিঠি, চিঠি হায়।

না বললেও, কেউ ওদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত না। বড় রাস্তার ডাস্টবিনে যদি পিওনরা দু-একখানা পোস্টকার্ড ফেলে দিয়ে চলে যেত ঘরে, তবেই বা কি হতো? ডব্‌সন রোডের গর্তগুলোর মধ্যে যারা রাত কাটাতে আসে তারা দুনিয়ার কারো কাছ থেকেই চিঠি পেতে চায় না।

চায় না বটে, তবুও তাদের ঠিকানা আছে। ভজহরির কাছে এইটেই আজ সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের মত মনে হয়। মনে হয়, সে হারিয়ে যায় নি। অসভ্য শহরের লক্ষাধিক বর্বর ব্যবস্থার মধ্যে এইটেই একমাত্র সভ্য-ব্যবস্থা।

ডাক-বিভাগের খাতায় তার ঠিকানা লেখা আছে। কিন্তু কোন কাজে লাগল না ঠিকানাটা! মিনতি কিংবা বিশুর কাছ থেকে আজো এল না কোন চিঠি।

রাত দশটা বেজে গেছে। বস্তিতে সবে সন্ধ্যের সুরু। এক এক করে বস্তিবাসীরা সব ঘরে ফিরে আসছে। কলকারখানার বাঁধা মাইনের মেহ্‌নতকারী এখানে কেউ থাকে না কেবল ছ-নম্বরের সনাতন ছাড়া। এখানকার অধিকাংশ লোকই ফেরিওয়ালা। একদল দিনের বেলা যায় ফেরি করতে, অন্যদল সন্ধ্যের সময় যায় কুলপী বরফের হাঁড়ি মাথায় নিয়ে। তা ছাড়া চানাচুর, মুড়ি ভাজা ইত্যাদির কারবারও এদের ভাল চলে। দু-দশজন সরকারি অফিস ও আদালতের পিওনের কাজও করে। এরাই এ-সমাজের শিরোমণি। এরাও লালদিঘীর সরকারি অফিস থেকে সন্ধ্যের সময় প্রায়ই ফিরতে পারে না। পাঁচটার পর বড়সাহেবের সঙ্গে যেতে হয় জগুবাবুর কিংবা গড়িয়াহাটার বাজারে। বালিগঞ্জে ফিরবার মুখে সাহেব বাজার করেন প্রায়ই। যেদিন বাজার করেন না সেদিন বড়সাহেব বলেন, "মাধব.—"

"আজ্ঞে—" মাধব ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে পাঁচটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।

"একবার তোমায় মুলেন স্ট্রীটে দত্ত সাহেবের বাড়ি যেতে হবে।"

"যাব।"

"বিশ-তিরিশ মিনিট তোমায় সেখানে বসতে হবে, মাধব।"

"বসব।"

"হ্যাঁ। লুকু দিদিমণি সেখানে বেড়াতে গেছে। ওকে তুমি বাড়ি পৌঁছে দেবে।" মাধব হুকুম তামিল করে। সাহেবের হুকুমই সরকারি আইন বলে মাধব চিরদিন জেনে এসেছে। আজো জানে। মুলেন স্ট্রীট থেকে লুকু দিদিমণিকে বিপিন পাল রোডে পৌঁছে দিয়ে মাধবের ডব্‌সন রোডে ফিরতে রাত ন-টা বেজে যায়। প্রায় বারো ঘণ্টা পরে মাধব ঘরে ফিরে এসে খোঁজ করে নিজের মেয়েটিকে—ষোল বছর বয়েস সরোজিনীর। সে কলতলায়

বসে ভেজা-সিমেন্টের ঠাণ্ডা লাগায় গায়ে। বসে বসে গল্প শোনে ওর ডবল বয়সের মেয়েদের কাছে। মাধবের হাঁক শুনে সরোজিনী ছুটে যায় চোদ্দ নম্বর গর্তের দিকে। মাধবের ঘরের নম্বর চোদ্দ। বারো ঘণ্টার ব্যবধানে মাধবের প্রায়ই মনে হয়, সে যেন রোজই সরোজিনীকে নতুন করে দেখছে! এ-নতুনত্ব কেবল বারো ঘণ্টার ব্যবধানের ফল নয়—এই নতুন-দেখার মূলে আছে বিরুদ্ধ পরিবেশের প্রতিক্রিয়া। সরকারি অফিসের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মাধব গিয়ে গা ভাসিয়ে দেয় সকাল ন-টায়। পাঁচটা পর্যন্ত সে সঙ্গ পায় সুস্থ ও সুখী মানুষদের। তারপর সে বহন করে জগুবাবুর বাজারের টাটকা তরকারী ও পুকুরের কাটা পোনা। বিপিন পাল রোডে এসে দেখে বড়সাহেবের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সংসার। মুলেন স্ট্রীট কিংবা অন্য কোন স্ট্রীট থেকে দিদিমণিকে নিয়ে আসতে হয় বলে মাধবের চোখে কখনও নষ্টস্বাস্থ্যের পীড়া জন্মায় না। যেদিন দিদিমণিকে আনবার দরকার হয় না, সেদিন তাকে স্টিম লণ্ড্রি থেকে আনতে হয় আর্জেণ্ট কাপড়। নতুন বার্নিশ-করা কাউণ্টারের ওপর হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে মাধব সেগুন কাঠের মোলায়েম বুকের আনন্দ উপভোগ করে, আর চেয়ে থাকে বড়সাহেবের আর্জেণ্ট কাপড়গুলোর দিকে। স্টিম লণ্ড্রির সেলস্‌ম্যান অতি মনোযোগ দিয়ে কাপড়গুলোকে ভাঁজ করে প্যাকেট করছে। ফিরবার মুখে প্যাকেট-টা মাধব বুকের ওপর চেপে ধরে হাঁটতে থাকে বিপিন পাল রোডের দিকে। ওর সমস্ত অনুভূতির মধ্যে ভাসতে থাকে সূক্ষ্ম সুতোর আরাম। বারো ঘণ্টার মোলায়েম ও আরামপ্রিয় পরিবেশ থেকে ফিরে এসে মাধব সহসা যেন প্রথম হোঁচট খেয়ে পড়ে সরোজিনীর সামনে। হোঁচট খায় সরোজিনীর গায়ের ওপরেই। রোগা রোগা, হাত-পাগুলো দেখে মাধব যেন অন্ধ হওয়ার জন্যে আগ্রহশীল হয়ে ওঠে। এমন দৃশ্য দেখবার জন্যে চোখের মণিদুটোকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? মেয়েটার সারা গায়ে ষোল বছর থেকেই তো মেদমজ্জা বাড়ছে বলে ওর ধারণা! বৃদ্ধির প্রেরণা রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে, রয়েছে স্বভাবের মধ্যে। প্রতি বস্তুরই স্বভাবধর্ম বৃদ্ধি। কিন্তু সরোজিনী বাড়ল কই? বিপিন পাল রোডে যা স্বাভাবিক, ডব্‌সন রোডে

তা স্বাভাবিক নয় কেন? মাধব যেন প্রতি রাত্রেই সরোজিনীকে দেখে নিজের মনে এই রকমের দু-চারটে প্রশ্ন করতে থাকে। মা-মরা মেয়েটার জন্যে মাধব প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়। কোন তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে মেয়েটার গায়ে বোধহয় এক ছটাক বস্তুও আর বাড়বে না। একেবারে পুরোপুরি বস্তুতন্ত্রের সাহায্যেই বস্তুকে বাড়াতে হবে বলে মনে করে মাধব।

ভজহরির ঘরের নম্বর পাঁচ। ভজহরির চেয়ে নম্বরের দাম এখানে অনেক বেশি। বস্তির প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই ভজহরির নাম জানে না। কিন্তু নম্বরটা জানে। কেউ এখানে, "আপনি কে?" প্রশ্ন করে না।

প্রশ্ন করে, "কত নম্বরে থাকেন?"

"থাকি পাঁচ নম্বরে।" এরপর আর কোন কথাই কেউ জানতে চায় না; যেন পাঁচ নম্বরটা ইতিহাসের গা বেয়ে এসে গড়িয়ে পড়েছে ডব্‌সন রোডের বস্তিতে। পরিচয় স্থায়ী। লক্ষ লক্ষ ছোট বড় বুর্জোয়া ঐতিহাসিকের পায়ের ঠোক্করে এ-পরিচয় কোনদিনও মুছে যাবে না। মুছে দিতে পারবে না বিজ্ঞান শয়তানের সাধন-লব্ধ আনবিক বোমাও।

ভজহরির ঘরের নম্বর পাঁচ। ঠিকানা স্থায়ী। ভজহরি ভালবাসে এই ঠিকানাকে। সে এখানে গা ঢাকা দিয়ে রাত কাটাতে আসে না। সে বাস করে এই বস্তিতে। বিশ বছরের অটুট স্বাস্থ্য আর মনের সঞ্চয় সবই সে মিশিয়ে দিয়েছে বিচিত্র এই পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে। ভজহরি বিশ্বাস করে, প্রতিটি ধূলিকণা পরমাণুর চেয়েও বড়।

পাঁচ নম্বর ঘরের দরজা আছে। ইচ্ছে করলে ভজহরি আলিগড়ের একটা বলিষ্ঠতম তালা সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে কিনতে পারত। কিন্তু তেমন অপব্যয় সে করে নি। প্রতিবেশীর নাগালের বাইরে সে কোন ঐশ্বর্য-ই গোপন করে রাখতে চায় নি। তাই সে প্রতিদিনই বেরুবার সময় এক হাত লম্বা একটা নারকোলের দড়ি দিয়ে দরজাটা বেঁধে রেখে যায়। ঝড়-বৃষ্টির আঘাতে ঘরের পুঁজি নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না।

এক পশলা বৃষ্টি এরই মধ্যে হয়ে গেছে। রাত্রে সম্ভবত আরও বৃষ্টি হবে। ভজহরি একটু পা চালিয়ে রাস্তা হাঁটতে লাগল। মাথার ওপরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গলির মধ্যে ঢুকে পড়লে বিদ্যুৎ আর দেখা যাবে না। দেখা যাবে না আকাশের এই বিরাট্ বিস্তৃতি। বস্তির জগতে দু-সারি ঘরের মাঝ-খানের স্বল্পপরিসর রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভজহরি অনেক দিনই আকাশ দেখবার চেষ্টা করেছে। রাত্রির আকাশ দেখতে ভজহরি ভালবাসে। মেঘ এবং তারা দুটোই ওকে টানে। কিন্তু এখানকার গলির মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে আকাশ আসে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় সে আর মাথা তুলতে পারে না। ভজহরি নিজের ঘরের দরজা খুললো।

এঁটো পাতার মত ওকে পড়ে থাকতে হয় এই ঘরখানাতে। পড়ে রইল প্রায় একটা বছরই। কুড়ি থেকে ওর বয়স বাড়ল একুশ। খুবই বিস্মিত বোধ করল ভজহরি। কেমন করে সে একটা বছর কাটিয়ে দিল এখানে? এতটকু অস্বস্থ বোধ করে নি সে, গন্ধ পায় নি এঁটো পাতার!

সামনের দিক থেকে এল জয়গোবিন্দ। চার নম্বরে থাকে সে। ভজহরির ঠিক পাশের ঘর। জয়গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, "কি দাদা দাঁড়িয়ে যে? ঘুম আসছে না বুঝি?"

"ঘুমোবার সময় হয় নি এখনো।" বলল ভজহরি।

"বেলফুলের মালাগুলো সব বিক্রি হয় নি আজ—" এই বলে জয়গোবিন্দ তার হাতে ঝোলানো পুঁটলি থেকে গোটা পাঁচেক বেলফুলের মালা নিয়ে ভজহরির গলায় পরিয়ে দিল। তারপর বলল, "এবাব ঘুম আসবে। টাটকা ফুলের গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমার তো দাদা ক্ষুৎপিপাসা সব উবে যায়—" হোমিও-প্যাথির শিশি থেকে একটু নস্যি নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে জয়গোবিন্দ বলল, "উবে যায় দাদা নস্যির মত।"

"আজ কতদূর গিয়েছিলে জয়গোবিন্দ?" নারকোলের দড়িটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল ভজহরি।

"মোল্লার দৌড় আর কতদূর হবে, সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত।

মাছির মত দু-দিকে সারি সারি সব গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। মাঠ ভর্তি লোক। ফুটপাতের পাশে পানের আর সোডালেমনেডের দোকান। সে কী ভিড় দাদা!"

"মালাগুলো সব বিক্রি হয় না কেন তবে?" জিজ্ঞাসা করল ভজহরি।

"সব বুড়ো বুড়ো মারওয়াড়ী। পান খায় আর বেঞ্চিতে বসে টাকাপয়সার হিসেব করে।"

"কেন জোয়ান মারওয়াড়ী কি জন্মায় না?"

"কই, ময়দানের দিকে তো দেখি না তাদের?" এই বলে জয়গোবিন্দ তার ঘরের তালা খুলতে লাগল। মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। হয়তো এক্ষুনি আবার জোর বৃষ্টি নাববে।

ঘরে ঢুকল ভজহরি। পকেট থেকে দেশলাই বার করে মোমবাতি জ্বালালো। সঙ্গে করে সে একটা মোমবাতি কিনে নিয়ে এসেছে আজ। গতরাত্রে যেটা জ্বালিয়েছিল সেটা দু-চার মিনিট জলবার পর চলে গেছে মাধবের ঘরে গতরাত্রেই। সরোজিনী এসেছিল ভজহরির কাছে। এসে বলেছিল, "হরিদা, বাবা অন্ধকারে বসে ভাত খাচ্ছে। লণ্ঠনটা নিভে গেছে। তেল নেই।"

ফুঁ দিয়ে তৎক্ষণাৎ মোমবাতিটা নিভিয়ে দিযে ভজহরি বলেছিল, "এটা নিয়ে যাও।" অন্ধকারেই সে মোমবাতিটা সরোজিনীর হাতের মুঠোর মধ্যে ভরে দিয়ে পুনরায় বলেছিল, "গরম মোম গলে পডবার আর ভয় নেই।"

"কিন্তু তোমার ঘর তো অন্ধকার হয়ে গেল, হরিদা?"

"আলোর দরকার নেই আমার। তা ছাড়া আমি তো হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি, আলো দিয়ে কি হবে?"

মোমবাতি নিয়ে সরোজিনী বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর সেখানে দাঁড়িয়েই সে বলল, "দোষ আমারই হয়েছে। ঘুঁটেগুলো সব বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। তাই উনোন ধরাবার সময় লণ্ঠনের কেরাসিন ঢেলে দিয়েছিলুম অনেকটা। দোষ আমারই হরিদা। তোমায় অন্ধকারে ফেলে গেলুম।"

আজ আর ঘরে অন্ধকার নেই। খাটিয়ার কোণায় বাঁশের মাথাটা উঁচু হয়ে আছে। মোমবাতিটা সেই উঁচু যায়গার ওপরে বসিয়ে দিয়ে ভজহরি

কাপড় ছাড়তে লাগল। যে পোশাক পরে সে তার কর্মস্থলে যায় সেটা পাঁচ নম্বরে ফিরে এসে খুলে ফেলে ভজহরি। আজও খুলল। খুলে সে পরনের পোশাকটা তুলে ধরল ওপর দিকে। নতুন মোমের আলোয় ভজহরি দেখল, বছর খানেক ব্যবহারের পর লম্বা প্যাণ্ট-টা হাফ প্যাণ্টের চেয়েও ছোট হয়ে গেছে। এক বছর আগে যখন সে রিফিউজী হয়ে চলে এসেছিল এই নতুন জগতে, তখন এই প্যাণ্ট-টা ছিল ওর বুর্জোয়া-কৃষ্টির পরিচয়-পতকা। আজ সেটা তলার দিক থেকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে উঠে পড়েছে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত। পোশাকের ক্রম অধঃপতনে ভজহরি মনে মনে খুশী হয়েছে খুব। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে লম্বা প্যাণ্টের অহংকার নিয়ে বসে থাকলে হয়তো মোট বইবার মজুরি ওর অনেক বেশি মিলত, কিন্তু অন্যান্য কুলীদের তাতে ইজ্জত যেত নষ্ট হয়ে। কুলী সমাজের মধ্যে ভজহরি চায় নি শ্রেণী-বিভাগ। চায় নি কোন উঁচু-নিচুর বিভেদ সৃষ্টি করতে। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম যেন চির-দিনই সমতল থাকে, তেমন একটা সুন্দর প্রার্থনা ওর মনের বাঁধনকে দিন দিনই দৃঢ়তর করে তুলছে।

বেড়ার গায়ে ভজহরি একটা দু-ইঞ্চি লম্বা পেরেক লাগিয়ে রেখেছিল। প্যাণ্ট-টা সে পেরেকের মাথায় টাঙিয়ে রাখে। আজো রাখল। চেয়ে রইল প্যাণ্টের দিকে। বৃষ্টি আর ঘাম লেগে লেগে খাকী সুতো সব পচে উঠেছে। মাকু আর টেকোঁর শক্তি আলগা হয়ে গেছে বুনুনির গা থেকে। সুতোগুলো তাই ঝুলছে প্যাণ্টের তলার দিকে চিরুনির দাঁতের মত। দাঁতের মত শক্ত নয়, কিন্তু সমান্তরাল। এ দৃশ্য দেখতে ভজহরির ভাল লাগে। মনে হয়, খাকী প্যাণ্ট-টা যেন রামেশ্বর সেতুবন্ধের মত ওর দুটো জগৎকেই ছুয়ে রয়েছে। বেঁধে রেখেছে মধ্যবিত্তের জগৎকে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে।

মেঝেতে মাদুর পাতল ভজহরি। খাটিয়ার শয্যার সঙ্গে এ-মাদুরটার কোন সম্পর্ক নেই। খাটিয়ার ওপর ভজহরি ঘুমোয়। মাদুরের ওপর বসে ভজহরি করে সাধনা। সঙ্গীত সাধনা। ছোট্ট মাদুরটা ঘর থেকে একেবারে

আলাদা—ঘরটা আলাদা হাওড়া স্টেশনের জগৎ থেকে। ভজহরি কেবল একটা জগতেই বাস করে না, সে বাস করে আপাতত তিনটেতে। তিনটের মধ্যে মাদুর-সাম্রাজ্যই ওর সব চেয়ে হোলি, সবচেয়ে বেশি পবিত্র। ভজহরি বুঝতে পেরেছে, কোন-একটা-কিছুর প্রতি যদি পবিত্রতাবোধ না থাকে, তবে মানুষ আর পশুর মধ্যে বোধহয় পার্থক্য থাকে না। সৌন্দর্যানুভূতি মানব মনকে কৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলে। কিন্তু মানব মনের পবিত্রতাবোধ গড়ে তোলে কৃষ্টি-কৌলিন্য। প্রতিটি মানুষের মনের প্ল্যাটফর্ম আলাদা, হাওড়া স্টেশনের মত সমতল নয়। কিন্তু রুটি রোজগারের জন্যে ক্লাইভ স্ট্রীট আর হাওড়া স্টেশনের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখতে পায় না ভজহরি। শ্রমের প্রতি যার পবিত্রতা বোধ জন্মেছে তার কৃষ্টি-কৌলিন্য কেড়ে নিতে পারে তেমন সওদাগর ক্লাইভ স্ট্রীটের কোন্ কামরায় বসে? খাটিয়ার ওপর শোয়ানো তানপুরাটা তুলে নিল ভজহরি। নিয়ে বসল এসে মাদুরের ওপর। ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা দিল নিভিয়ে। ঘরটা অন্ধকার হল বটে, কিন্তু মাদুর-সাম্রাজ্যে আলো জ্বলল। ভজহরির কণ্ঠ মিলে গেল তানপুরার সঙ্গে—চাপা কণ্ঠে সে বিস্তার করে চলল মেঘমল্লারের আলাপ। বাঙালী কুলী তার মাথার মোট নামিয়ে দিয়ে এসেছে রাত দশটার আগেই।

মুহূর্তের মধ্যেই তন্ময় হয়ে গেল ভজহরি রায়। দেশকাল সন্ততি সরমে সরে গেল দূরে। অতিক্রম করল সব কিছু সীমাবদ্ধতা। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে বেড়াতে লাগল সুরের সত্তা। এ-সুরের বয়স বাড়েনি। জন্মতেই জোয়ান। এর ক্ষয়ও নেই বৃদ্ধিও নেই। শিল্প, জন্ম থেকেই শিল্প। কোটি শতাব্দীর ব্যবধানেও শিষ্য তুম্বুরু যেন বসেই আছে সঙ্গীতগুরু ব্রহ্মার সামনে। ক্রমবিবর্তনের বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়েছে সুরের বিস্তারে।

ভজহরির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তার আগেই বৃষ্টি নেমেছে খুব জোরে। ডবসন রোডের আকাশে মেঘের গর্জন। ভজহরি হঠাৎ গান থামিয়ে দিল, ও শুনতে পেল, কোথা থেকে যেন বিশু চিৎকার করে উঠল, "হরিদা, দিদি নেই!" নেই?

ভজহরি তানপুরাটা মাদুরের ওপর রেখে উঠে এল দরজার কাছে। দরজার ও-পাশে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে গান শুনছিল সরোজিনী। ভজহরিকে দেখতে পেয়েই সরোজিনী ছুটে চলে গেল চোদ্দ নম্বরের দিকে, পালিয়ে গেল সরু রাস্তার অন্ধকারে। পায়ের দিকে নজর পড়তেই ভজহরি দেখল, দরজার গোড়ায় কতকগুলো ফুল পড়ে রয়েছে। বেল ফুল। এলোমেলো ভাবে ছড়ানো নেই। সযত্নে গুছিয়ে রেখেছে সরোজিনী—নৈবেদ্য সাজাবার পবিত্রতা ফুলের চেয়েও সুন্দর করে তুলেছে মাধবদার মেয়েটিকে। ভজহরি একটা ফুল তুলে নিল হাতে। চেয়ে রইল কালো আকাশের দিকে। কান পেতে রইল, আবার যদি বিশু চেঁচিয়ে ওঠে, "হরিদা, দিদি নেই!"

কোন চিৎকারই স্থায়ী নয়। বিশুর চিৎকারও স্থায়ী হয়নি। হঠাৎ-আঘাতে মানুষ চেঁচায়। জীবন-সমুদ্রের ভেসে বেড়ানো ঢেউগুলোর মধ্যে আছে চিৎকার, জমাটবাঁধা ব্যথার আলোড়ন নেই। ত্বকের মত ঢেউগুলো সব ওপরের অস্তিত্ব—অল্প আঘাতেই জ্বালা করে। কিন্তু ব্যথার মূলে থাকে বিরাট্ আলোড়ন, বাইরে তার প্রকাশ নেই। সময়ের স্রোতে আলোড়নটা হয়ে ওঠে পাথরের মত শক্ত, ব্যথা অন্তরমুখী, তাই চাপা আর্তনাদ মাঝে মাঝে জীবন-পাহাড়টাকে কাঁপিয়ে তোলে, ঘটায় ভূমিকম্প। নৈসর্গিক উৎপাত মেনে নিয়েই প্রকৃতিকে এগিয়ে যেতে হয়। এগিয়ে যেতে হচ্ছে ভজহরিকেও। বিশুর চিৎকার কানের পর্দায় প্রতিধ্বনি তোলে মাত্র, ভূমিকম্প ঘটাবার শক্তি নেই তাতে।

কিন্তু মিনতি বোধহয় চিৎকারের স্বাভাবিকতাও হারিয়েছে। বিশুর বদলে মিনতি যদি চিৎকার করত? চকিতের মধ্যে প্রশ্নটা খেলে গেল ভজহরির মনে। চিৎকার না করুক, মিনতি হয়তো বালিগঞ্জের কোন এক বড় বাড়িতে, বসে আমোদ-আহ্লাদ করছে। হেসে উঠছে খিলখিল করে। ভজহরি বাইরে এসে দাঁড়াল। মাথার ওপর দিয়ে বয়ে চলল বৃষ্টির ধারা। গড়িয়ে পড়তে লাগল জলের স্রোত দু-কান ছাপিয়ে। ভজহরির যেন বিন্দুমাত্র বাহ্যজ্ঞান রইল না। কেবল কান পেতে শোনবার চেষ্টা করতে লাগল বৃষ্টির

বুকে হাসির হিল্লোল কোন স্পন্দন তুলেছে কি না। ডব্‌সন রোডে দাঁড়িয়ে সে বালিগঞ্জের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতে চায়! কিন্তু মিনতি হয়তো বালিগঞ্জে নেই, নেই বাংলা দেশেই। এমন একটা সোজা সম্ভাবনাও ভজহরিকে নিরুৎসাহ করতে পারল না। দক্ষিণ কিংবা উত্তর মেরুতে বসেও মিনতি যদি হাসে, তারও স্পন্দন ধরা পড়বে ওর বিজ্ঞান বিবর্জিত কানের পর্দায়।

ভজহরি বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। চেতনার সবটুকুই সে ভাসিয়ে দিল জলের স্রোতে। কিন্তু কোন স্পন্দন এসে পৌঁছল না বায়ুস্তর থেকে। উপরন্তু, ওর বেশ শীত করতে লাগল। সে চলে এল ঘরের মধ্যে। গামছা দিয়ে গা মুছতে গিয়ে ভজহরির মনে পড়ল, সরোজিনী এসেছিল ওর গান শুনতে। হয়তো অনেকক্ষণ পযন্ত সে ঐ সরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজেছে। বেলফুলের নৈবেদ্য সাজাবার জন্যে সরোজিনী গ্রাহ্য করে নি শ্রাবণের বারিপাত। মেয়েটা পালিয়ে গেছে লজ্জা পেয়ে, শীতের ভয়ে নয়।

একটু পরে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ল ভজহরি। বৃষ্টির জলে আপাতত ওর মাদুরের সাম্রাজ্য গেল ধুয়ে মুছে। গর্তের মত ঘরটায় বর্ষার জল থৈ থৈ করছে। আরো জল হবে, ব্যাঙ ডাকছে। ডাকছে বোধহয় ওর খাটিয়ার তলা থেকেই। ঘুম আসছে না ভজহরির। ব্যাঙের ডাক ওর ঘুম কেড়ে নিতে পারেনি। ঘুম কেড়ে নিয়েছে বিশুর সেই চিৎকারটা। ইচ্ছে করলে ঘড়ির কাঁটাকে উল্টো দিকে ঘোরান যায়, ইচ্ছে করলে মনটাকেও ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায় পেছন দিকে। চিৎ হয়ে শুয়ে ভজহরি এবার ফিরে গেল দ্বিখণ্ডিত বাংলার পূর্ব অংশে।

দ্বিতীয় খণ্ড

বর্ষাকাল। জগবন্ধু রায় একটা চিঠি পেলেন ঢাকা থেকে। চিঠি লিখেছেন তাঁরই বাল্যবন্ধু যদুনাথ সরকার।

চিঠি : বিক্রমপুরের পাড়াগাঁয়ে গান তোমার জমবে না। এখানে চলে এস। বারোদির বড় জমিদার জগদীশ নাগ মহাশয় ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে দু-হাতে টাকা ছড়াচ্ছেন। আমি জানি তোমার কণ্ঠে সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ বাঁধা রয়েছে। তা ছাড়া নাগ মহাশয় এই সঙ্গে নিজেই তোমায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

চিঠি পাওয়ার পরে জগবন্ধুবাবু স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা যাওয়াই স্থির করলেন। ভাল দিন দেখেই তিনি রওনা হবেন। দিন দেখাতে চল্লেন ভটচাজ পাড়ায় হরপ্রসাদ পণ্ডিতের কাছে। বর্ষাকাল। রাস্তাঘাট সব ডুবে গেছে। পাশের বাড়িতে যেতে হলেও নৌকো করে যেতে হয়। কলকাতায় যেমন বড়লোকদের গাড়ি থাকে, বিক্রমপুরে থাকে নৌকো। কেবল বড়লোক নয়, গরীব লোকদেরও থাকে।

হাতে বইঠা নিয়ে জগবন্ধুবাবু দাঁড়ালেন এসে ঘাটে। শিস দিয়ে সুর তুল্লেন : সাধের তরণী আমার···ইত্যাদি। নৌকোটা হিজল গাছের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল। তালা লাগানো ছিল শেকলে। নৌকোর জন্যে আলাদা কোন গ্যারেজের ব্যবস্থা নেই। শেকল দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা প্রায় সব বাড়িতেই আছে।

তালা খুললেন জগবন্ধুবাবু। তরণী তাঁর ভেসে চললো ভটচাজ পাড়ার,

দিকে। ভেসে চললো বিক্রমপুরের চেয়েও বড় পৃথিবীর নয়া বন্দরের দিকে। বিক্রমপুর পিছিয়ে পড়ছে, পিছিয়ে পড়ছে এখানকার তরঙ্গহীন জল। বইঠা দিয়ে জল কেটে কেটে তিনি চলেছেন হরপ্রসাদ পণ্ডিতের কাছে। ইচ্ছে করেই তিনি নেতিয়ে-পড়া জলের বুকে বইঠা দিয়ে দু-চারবার আঘাত করলেন। স্বল্প-স্রোতের আলস্য তাঁকে যেন হঠাৎ আজ পীড়িত করে তুলেছে। ফণা-তোলা সাপের মত লক্ষাধিক ঢেউ যদি আজ মাথা তুলে দাঁড়ত, তা হলে তিনি মনে মনে খুশীই হতেন। বইঠা দিয়ে ভেঙ্গে দিতেন প্রতি ঢেউ-এর মাথা।

হরপ্রসাদ পণ্ডিত দিন ঠিক করে দিলেন। শুভদিন। মঘা আর ত্র্যহস্পর্শের সঙ্গে টক্কর লড়লেন পণ্ডিত মশাই নিজেই। বিচার করে বলে দিলেন, "যাত্রা তোর শুভই হবে জগবন্ধু।"

"শুভ হওয়াই দরকার। সঙ্গে আমার বৌ-ও যাচ্ছে।" বললেন জগবন্ধু রায়।

"বৌ?" চমকে উঠে পণ্ডিত মশাই পঞ্জিকাটা সরিয়ে রাখলেন ফরাসের এক কোণায়। "বৌ? শ্রাবণ ফুরলেই তো তার দশ মাস হবে রে জগবন্ধু?" পাড়াগাঁর পণ্ডিত বলেই বোধহয় হিসেবে তিনি ভুল করলেন না।

"তা হবে পণ্ডিত মশাই। কিন্তু আর তো থাকতে পারছিনে, বড্ড জরুরী চিঠি এসেছে। বারোদির বড় জমিদার জগদীশ নাগ মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন। যেতে হবে।"

"জগদীশ নাগ? ওরে বাপ্‌রে! সে যে মস্ত বড় ধনী। তার সেরেস্তায় চাকরি পাওয়া ভাগ্যের কথাই বটে। দেখি, হাতটা চিৎ কর্ তো জগবন্ধু।"

জগবন্ধুবাবু ডান হাতের তালুটা চিৎ করে ধরলেন পণ্ডিত মশায়ের চোখের সামনে।

"হুঁঃ! বড় চাকরি সন্দেহ নেই।" মন্তব্য করলেন হরপ্রসাদ ভটচাজ।

"কিন্তু কাজটা তো আমার সেরেস্তায় নয়—"

"ভাগ্যের দড়ি তোকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে সেরেস্তায়। তুই যেতে না চাইলেও তোকে যেতে হবে।"

একটু ইতস্তত করবার পর, জগবন্ধুবাবু বললেন, "চাকরি আমি কোন দিনই করব না পণ্ডিত মশাই। গোলামি করা আমার রক্তে নেই।"

"তবে ঢাকা যাচ্ছিস কেন ?"

"যাচ্ছি বড় বড় আসরে গান করব। সমঝদাররা বসবে সব আমার চারদিকে। পণ্ডিত মশাই, গান আমার ধর্ম, গান আমার ভগবান। গানের জগতে গোলামি নেই।"

"শেষ পর্যন্ত বড় লোকের মজলিসে গিয়ে বাইজীর কাজ নিলি জগবন্ধু ?"

"আশীর্বাদ করুন, গানের মর্যাদা যেন কোনদিনও নষ্ট না হয়।"

"আশীর্বাদ করছি যাত্রা তোর শুভ হোক।"

ফিরবার মুখে কি মনে করে জগবন্ধুবাবু হাটের দিকে চললেন নৌকো বেয়ে। গ্রামের পূব সীমানায় হাট। হাটের পূব দিকে মাইল খানেক জমিতে কোন ঘরবাড়ি নেই—মাঠ। সমস্ত মাঠটাই জলে ডুবে রয়েছে। জলের ওপরে ভেসে রয়েছে পাটগাছের মাথাগুলো। এক মাইল পর্যন্ত কেবল সবুজ রং-এর ঢেউ।

জগবন্ধুবাবু পাটক্ষেতের মধ্যে দিয়েই রাস্তা ধরে চললেন হাটের দিকে। নৌকোর ধাক্কা খেয়ে পাটগাছের মাথাগুলো এদিক-ওদিকে নুইয়ে পড়ছে। নৌকো থামিয়ে দু-একটা গাছের মাথা তিনি টেনে নিয়ে এলেন নিজের মুখ পর্যন্ত। ডগার দিকের সবচেয়ে বড় পাতাটায় চুমু খেলেন একবার। বাঁ পাশের এক ফালি জমিতে ধান লাগানো ছিল। ধানগাছের গলা পর্যন্ত জল। পাটপাতায় চুমু খাওয়ার সময় জগবন্ধুবাবু যেন দেখলেন, ধান গাছগুলো কেমন একটু নড়েচড়ে উঠল। দু-চারটে গাছের মাথা হেলে পড়ল তাঁরই দিকে। ঈর্ষা ? বোধহয় ঈর্ষাই হবে। তিনি নৌকো চালিয়ে চলে এলেন ধানক্ষেতের দিকে। এক গোছা ধানগাছের মাথা মুঠো করে ধরে নিজের ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিলেন বার দুয়েক। পেছন দিক থেকে একটা নৌকোর মুখ বেরিয়ে এল জগবন্ধুবাবুর সামনে। ধানগাছগুলো ছেড়ে দিয়ে তিনি পেছন ফিরে দেখলেন, পোস্টম্যান জামাল মিঞা ডাক বিলি করে ফিরে যাচ্ছে পোস্ট অফিসে।

জগবন্ধুবাবুর পাশে নৌকোটা ভিড়িয়ে দিয়ে জামাল মিঞা জিজ্ঞাসা করল, "এখানে কি করছ জগবন্ধু ?"

"গান শুনছিলাম।"

"গান শুনছিলে ? এখানে গান গাইবে কে ?"

একটু হেসে জগবন্ধুবাবু বললেন, "গান তো কেবল মানুষই গায় না জামাল মিঞা, গাছপালাও গান করে।"

জগবন্ধুবাবুর চোখ দুটো যেন সুস্থ এবং স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না বলে মনে হল জামাল মিঞার। এমন ওস্তাদ গাইয়ে গান শুনতে এসেছে ধানগাছের কাছে ? দিনরাত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লোকটা বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে। সরে পড়বার জন্যে জামাল মিঞা নৌকোটাকে ঠেলে দিল সামনের দিকে।

"একটু দাঁড়াও মিঞা সাহেব। এত তাড়া কিসের ?" জিজ্ঞাসা করলেন জগবন্ধুবাবু।

নৌকো থামিয়ে জামাল মিঞা বলল, "ওদিকে যে পোস্টমাস্টারবাবু ভিজে মাটিতে বসে বুকে সর্দি বসিয়ে ফেলল।"

"কেন, পোস্ট.অফিসের চেয়ারখানা গেল কোথায় ?"

"চালের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে পড়ে কাঁচা মাটি সব গলে গলে পড়ছে। অত বড় গতর নিয়ে চেয়ারে বসতে যাবে কোন্ ভরসায় ? চেয়ারটা যে মেঝের মধ্যে তলিয়ে যেতে চায় ! চলি, বড্ড দেরি হয়ে গেল। হাটের মহাজনদের চিঠি এখনও বিলি করা বাকী।"

"কাল থেকে আমার ঠিকানায় আর কোন চিঠি আসবে না। এলেও পোস্টমাস্টারের কাছে জমা রেখে দিও। তোমার মেহ্নত একটু কমে গেল মিঞা সাহেব।"

"সরকারি পয়সা খাচ্ছি, মেহ্নত আমায় করতেই হবে। কিন্তু তোমার চিঠি সব জমা থাকবে কেন ?"

"আমি শহরে যাচ্ছি।"

"চাকরি পেয়েছ বুঝি ?"

"চাকরি করবার মত বিদ্যে আমার নেই জামাল মিঞা। যাচ্ছি বড় বড় সমঝদারদের গান শোনাতে। যাচ্ছি জয় করতে তামাম দুনিয়া।"

"কিন্তু—" হঠাৎ থেমে গেল জামাল মিঞা।

"কিন্তু কি? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

"আমি যে পোস্টমাস্টারবাবুকে কথা দিয়েছিলুম, তোমায় সেখানে নিয়ে যাব।"

"কেন মিঞা সাহেব?"

"তার বড় মেয়ে পুঁটিকে গান শোনাব বলে ওয়াদা করে এসেছিলুম। নিজের বিবি তো গলায় সুর তুললে বল্লম নিয়ে তেড়ে আসে।"

"কেন, মাথা খারাপ বুঝি?"

"জী না, কান খারাপ। সে কখনও গান শোনে নি। নিজের হেড়ে গলায় আওয়াজ তুলেছি কতদিন, কিন্তু সে যে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে—থাকগে, বিসমিল্লা বলে এবার কেটে পড়ি। কবে যাচ্ছ?"

"কালই।"

"তা—একটা গানের কলি আমায় শিখিয়ে দিয়ে যাও না ভাই জগবন্ধু? সারা জীবন ধরে চিঠি বিলি করলে কি আর মন মেজাজ কিছু ভাল থাকে! বৌকে সঙ্গে নিচ্ছ না কি?"

"হ্যাঁ।"

"প্রথম সন্তান—প্রায় মাস দশেক তো হলো—"

আলোচনাটা থামিয়ে দিয়ে জগবন্ধুবাবু বললেন, "সন্ধ্যে নাগাত শহরে পৌঁছে যাব।—এখানে তোমরা সবাই ছিলে ভাই-বন্ধুর মত। শহরে গিয়ে হয়তো অনেক লোকের সঙ্গেই চেনা-পরিচয় হবে, কিন্তু জামাল মিঞার মত পোস্টম্যানের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত হবে না। তোমার মত সৌভাগ্যের চিঠি আর কে বিলি করবে জামাল?"

নিজের নৌকোয় বসেই জগবন্ধুবাবু একটু হেলে পড়ে জামাল মিঞার হাত চেপে ধরলেন।

সূর্য অস্তগামী।

জগবন্ধুবাবু চলে এলেন হাটের পশ্চিম ধারে। ছোট বড় অনেক রকমের নৌকো সব ওদিকটায় বাঁধা রয়েছে। তিনি তার নিজের নৌকো বাঁধবার জায়গা পেলেন না। হাটে উঠবার প্রয়োজন ছিল তাঁর। একটা বড় নৌকো ভাড়া করতে হবে। শহরে গিয়ে হঠাৎ যেন বিপদে না পড়েন সেই জন্যে সঙ্গে তিনি ঘর-সংসারের কিছু দরকারী জিনিস নিয়ে যাবেন। নিয়ে যাবেন বাবার কাছে পাওয়া তানপুরাটাও। তবলা জোড়াটা অনেক দিনের পুরনো। তা হোক, শহরের নতুন তবলার প্রতি তাঁর তেমন বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া নতুন তবলায় চাটি মারতে গিয়ে সুরমার হাতে হয়তো ব্যথা লাগতে পারে—তাল কাটতে পারে যখন তখন। আঠারো বছর বয়সে সুরমা তবলা বাজায় ভাল। কোমরে আঁচল বেঁধে সুরমা সঙ্গৎ করে এক টানা তিন ঘণ্টা। এখন আর কোমরে আঁচল বাঁধা চলে না। পেটে ওর সন্তান এসেছে। শ্রাবণ পেরুলেই বয়েস হবে তার দশ মাস।

ও পাশের একটা নৌকোর গলুই চেপে বসে ছিল মদন। জগবন্ধুবাবু মদনের কাছে গিয়ে বললেন, "তোকেই খুঁজছিলাম মদন।"

মদনের বড় ছেলে দয়াল বাপের সঙ্গে কাজে বেরুচ্ছে আজকাল। হাত দুটোতে খুবই শক্তি এসেছে দয়ালের। লগি মেরে মেরে আর দাঁড় টেনে টেনে চোদ্দ বছর বয়সেই সে চব্বিশ বছরের মত শক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সাবালক হয়নি। মনে হয়, হাড় মাংস সব মিলিয়ে কেমন একটা কচ্ছপ সদৃশ গোলাকার লৌহপিণ্ড। দয়াল বাড়তে পারে নি। জীবিকার প্রয়োজনে মদন ওকে বাড়তে দেয় নি। উপস্থিত সে বাপের জন্যে তামাক সাজছিল। ঘণ্টাখানেক আগে ওরা ফিরেছে যাত্রী নিয়ে তারপাশা স্টীমার স্টেশন থেকে।

হুঁকোটা হাতে নিয়ে মদন জিজ্ঞাসা করল, "কি দরকার বলো?"

জগবন্ধুবাবু বললেন, "কাল এখান থেকে সোজা নারায়ণগঞ্জ যাব। তারপর সেখান থেকে ধরব ডাঙার পথ। যেতে পারবি?"

"বল কি, এত লম্বা পাড়ি তো কোনদিনও দিই নি ভাই জগবন্ধু! ধলেশ্বরীর গর্জন আমি এখান থেকেই শুনতে পাই।"

"ভয় খাচ্ছিস নাকি?"

"তা একটু খাচ্ছি বৈ কি। ধলেশ্বরীর বুকে ভাসবার মত নৌকো আমার শক্ত নয়। তবে হ্যাঁ, উচিত ভাড়া পেলে মা কালী নিশ্চয়ই রক্ষে করবেন।"

"উচিত ভাড়াই পাবি। তা ছাড়া পণ্ডিত মশাই দিন দেখে দিয়েছেন। কাল দিনটা নাকি যাত্রার পক্ষে খুবই শুভ। তার ওপর মা কালী তো রইলেনই।"

"মা কালী না থাকলে দিনটা তো শুভ হতো না জগবন্ধু?"

"তা হতো না। কিন্তু, পঞ্জিকা লেখবার সময় পণ্ডিতেরা তো আর মা কালীর সঙ্গে পরামর্শ করে লেখেন নি।"

"পঞ্জিকার চেয়ে মা কালী অনেক বড়। যাক সে সব কথা। এখন পাঁচটা টাকা আগাম দিয়ে যাও। গরম ভাত খেয়ে বাপ-ব্যাটাতে মিলে সূয্যি উঠবার আগেই গিয়ে তোমার ঘাটে নৌকো বাঁধব কাল। তোমরা সব তৈরি হয়ে থেকো।"

জগবন্ধুবাবু ট্যাঁক থেকে পাঁচটা টাকা বার করে মদনের হাতে দিলেন। টাকা কটা হাতে নিয়ে মদন বলল, "নিলুম তো টাকা। কিন্তু ধলেশ্বরী পার হতে হবে—বর্ষাকালে তার মূর্তি কালী মূর্তির চেয়েও ভয়ংকর। জগবন্ধু, হালের কাঠ খুব মজবুত আছে বটে, কিন্তু আমার মুঠো যদি আলগা হয়ে যায়?"

"মা কালীর মুঠো আলগা হবে না মদন। তাঁর মুঠো যদি আলগা হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে পঞ্জিকায় লেখা থাকতঃ যাত্রা নাস্তি।"

"বেশ তাই হবে জগবন্ধু। কিন্তু ধলেশ্বরীর কালো বুক—"

জগবন্ধুবাবু সবটা শোনবার জন্যে আর অপেক্ষা করলেন না।

দিন দেখানো আর নৌকো ভাড়া করাই ছিল জগবন্ধুবাবুর সবচেয়ে দরকারী কাজ। কেবল দরকারী নয়, শেষ কাজও বটে। কাজ দুটো হয়ে যাওয়ায়

পর তাঁর দেহ এবং মনটা পেঁজা তুলোর মত যেন হাল্কা হয়ে গেল। তিনি আলগা হয়ে গেলেন মধ্যপাড়ার ভূগোল এবং ইতিহাস থেকে। তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন মধ্যপাড়ার জৈব-কোষ থেকেও। তাঁর যেন আশঙ্কা হল, অল্প *হাওয়ায় এবার তিনি উড়ে যাচ্ছেন, বিক্রমপুরের বায়ু স্তরেই তাঁর স্থিতি নেই।* স্থিতি নেই বায়ুস্তরের শেষ সীমায়ও।

একটু দ্রুতগতিতে নৌকো চালাতে লাগলেন জগবন্ধুবাবু। তিনি ভাবলেন, পেছনের টানে কেবল মায়া-মমতাই থাকে না, থাকে মিথ্যে বন্ধনও। মধ্যপাড়ার সবটুকুই সত্য নয়, কল্পনাও আছে। তাঁকে যেতে হবে এগিয়ে। সামনের সবটাই দেখা যায় না ; দেখা যায় না বলে এগিয়ে চলার গতি তাঁর মিথ্যে হতে পারে না।

তিনি এগিয়ে চললেন বাড়ির দিকে।

বাঁড়ুজ্যেদের দালানবাড়িটাকে ডান দিকে রেখে তিনি একটা মোড ঘুরলেন। পোস্ট অফিসের পেছন দিয়ে এবার তাঁকে শর্ট-কাট ধরতে হবে। হঠাৎ তাঁর মনে হল, একটা কাজ বাকী রয়ে গেছে। শেষ কাজ। মধ্যপাড়ার সবার কাছ থেকেই তিনি বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। জগবন্ধুবাবু গান ধরলেন।

পোস্ট অফিসের মাটি থেকে একটা চালতে গাছ হেলে পড়েছে জলের দিকে। দু-চারটে ডাল লেগে রয়েছে জলের সঙ্গে। নৌকো তাঁর আটকে গেল। কিন্তু গান তাঁর থামল না। গানের শেষ কলিটা সুরের ঢেউ-এ ভাসিয়ে দিয়ে জগবন্ধুবাবু পার হয়ে গেলেন পোস্ট অফিসের সীমা। হেলে-পড়া চালতে গাছের গুঁড়ির ওপর বসে গান শুনছিল পোস্ট মাস্টারের বড় মেয়ে পুঁটি।

সুরমা ঘাটের কিনারেই অপেক্ষা করছিল। জগবন্ধুবাবু নৌকোটাকে হিজল গাছের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে উঠে এলেন ওপরে। অন্ধকারে সুরমাকে দেখে তিনি সহসা আঁৎকে উঠলেন। কাছে এসেও তিনি যেন নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারেন নি। সুরমাকে হঠাৎ যেন আজ একটু বেশি মোটা বলে মনে হল জগবন্ধুবাবুর। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সুরমা, তুমি এখানে ?"

"তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি কাছে না থাকলে এই খালি বাড়িতে বড্ড ভয় করে।"

"এই সময় তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয়।"

"কেন গো?" সুরমা হাত চেপে ধরল জগবন্ধুবাবুর।

"বাচ্চাটা তা হলে ভয় নিয়েই জন্মাবে। আমাদের সন্তান যদি নির্ভিক না হয়, তা হলে সে সংসারে সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবে না। তাকে পোকার মত পা দিয়ে মাড়িয়ে দেবে রাম-শ্যাম-যদুর দল। সুরমা, আমাদের সন্তান যেন কারু ওপর নির্ভর না করে।"

"কারুর ওপর তো নির্ভর করতেই হবে, নইলে একা একা তার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তবলায় তাল তুলতে না পারলে তোমার নিজের গানেও তো জোর আসে না?"

"একটা কোন-কিছুর ওপর যদি ওর পবিত্রতাবোধ জন্মায় তা হলে ওর ব্যক্তিমনের জোর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সুরমা, যে-তাঁতি তার নিজের তাঁতকে ভগবান বলে বিশ্বাস করে না, তার ধর্মতে আমার আস্থা নেই।"

জগবন্ধুবাবু স্ত্রীর ঘাড়ের ওপর হাত রেখে হাঁটতে লাগলেন ঘরের দিকে।

সুরমা বলল, "কাল না গেলেই কি নয়?"

"কেন?"

"পেটের মধ্যে মাঝে মাঝে মোচড় দিয়ে উঠছে। শরীরটাও ভাল লাগছে না। তার ওপর ধলেশ্বরী পার হতে হবে।"

"কোন ভয় নেই, ধলেশ্বরী তো প্রশান্ত মহাসাগর নয়। তা ছাড়া পণ্ডিত মশাই বলে দিয়েছেন যাত্রার পক্ষে কালকের দিনটা খুবই শুভ। এর পর সাত দিন পর্যন্ত যাত্রা নাস্তি।"

পরের দিন ভোরবেলা দয়াল নিজেই লগি মেরে মেরে নৌকো নিয়ে এল ঘাটে। উল্টো দিকের গলুইতে বসে মদন পান চিবুচ্ছিলো আর তামাক

টানছিল। মদন কোন দিনও ধলেশ্বরী পাড়ি দেয় নি। এটাই তার আজ জীবনের সবচেয়ে লম্বা পাড়ি হতে চলেছে। হুঁকোর মুখে মুখ ঠেকিয়ে মদন শক্ত হবার চেষ্টা করছিল। কেবল শক্ত নয়, সে ভাবছিল নিজের স্ত্রীর কথা, ভাবছিল দয়ালের কথাও। সে কোন দিনও বিক্রমপুর পরগনার সীমানার বাইরে যায় নি। বেশি মজুরীর লোভে আজ সে যা করতে যাচ্ছে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারও তা করতে ভয় পেত। কিন্তু মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন বোধহয় বেশি মজুরীর জন্যে তারা ধলেশ্বরী পাড়ি দেবেই।

জিনিসপত্র সব তোলা হল। তুললেন জগবন্ধুবাবু নিজেই। নতুন সংসার পাতবার মত জিনিস কিছুই ছিল না, তবে কোন রকমে চালিয়ে নেবার মত একটা বিছানা আর দু-চারটে বাসনপত্র ছিল। তবলা জোড়া তোলা হয়েছে, চামড়ার ওপরটা চট দিয়ে মোড়ানো। কেমন করে যে এক টুকরো চট সুরমা জোগাড় করেছে জগবন্ধুবাবু আজো তা জানেন না। তিনি কেবল জানেন, সুরমা তার নিজের শাড়ী কেটে আলখাল্লার মত একটা আবরণ দিয়ে তানপুরাটা ঢেকে নিয়েছে। এ যাবৎকাল সংসারের কোন দুঃখ কিংবা অভাব যন্ত্রটাকে স্পর্শ করে নি। স্পর্শ করতে দেয় নি স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। জগবন্ধুবাবু দেখলেন, দু-হাত দিয়ে তানপুরাটা বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে সুরমা নেমে গেল নৌকোর দিকে। কোলে সন্তান এলে, এ শ্রদ্ধা এবং পবিত্রতাবোধ ওর থাকবে কি না, জগবন্ধুবাবু তা জানেন না। স্বার্থের সঙ্গে বড় স্বার্থের সংঘাত না হলে ফলাফল কিছুই বোঝা যায় না। তা ছাড়া পাটির মত সরল নদীর বুকে সুরমা পাড়ি দিতে ভয় পায় না। ভয় পাচ্ছে কেবল রুক্ষ নদীর ঢেউগুলোকে। জীবনের নদীতে যেদিন ধলেশ্বরীর চেয়েও বড় ঢেউ উঠবে, সেদিন যদি তানপুরাটা সুরমা ছেড়ে না দেয়, তবেই ওর পরীক্ষা-পাশের ফলাফলটা সঠিকভাবে জানা যাবে।

খুড়তুতো ভাই অবিনাশ দাঁড়িয়েছিল ডাঙায়। জগবন্ধুবাবু বললেন তাকে, "আমার ভাগের জমি সব তোমার। আমি আর কোন অংশ চাই নে।"

"বাপঠাকুরদার আমলের সব জমি, ভাগ হতে হতে এখন সব ছিটেফোঁটার মত ছড়িয়ে আছে সারা পরগনা জুড়ে। আমিই বা পাড়াগাঁ-এ কতদিন টিকে থাকতে পারব জানি না।"

"জমির ওপর যদি তোমার ভালবাসা থাকে আর সেই সঙ্গে থাকে পবিত্রতাবোধ, তা হ'লে ছিটেফোঁটাই একদিন তোমার সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। মানুষ জন্মায় একটা কোন-না-কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে। কাজের মধ্যে উঁচু-নিচুর তফাৎ নেই। যে যে-কাজ বেছে নেয়, সেটাই তার কাছে ভগবান। অবিনাশ, বিক্রমপুরে বাঘ নেই। অতএব বাঘের বদলে তোমায় লড়াই করতে হবে কুমীরের সঙ্গে।"

"পদ্মার ভাঙন আমিই বা রুখব কি করে দাদা? গ্রামের পর গ্রাম ধ্বসে পড়ছে পদ্মার জলে।"

"প্রকৃতির খেলা। কিন্তু পদ্মার মধ্যে কেবল ক্ষয় দেখলেই চলবে না, সৃষ্টিও দেখতে হবে। একদিকে ভাঙন, অন্যদিকে গড়ন। বিশ্বের গতি যদি বন্ধ না হয়ে যায়, তবে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই অবিনাশ। ভাঙনের স্রোত আমরা রুখব—এগুতে আমবা বাধ্য। বিশ্বের প্রতি রোমকূপে প্রগতির বীজ রয়েছে। প্রগতি আমাদের পরমায়ু।"

অবিনাশ এ-সব কথা বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না। সে ভদ্রলোক বাঙালী, পাড়াগাঁয়ে তাই সে কেবল ভাঙনই দেখতে পায়। শহরে না গেলে যেন সে কোন কিছুই গড়তে পারে না। দাদার সঙ্গে এক নৌকোতে সরে পড়তে পারলে পেছন দিকে এক মুহূর্তের জন্যে অবিনাশ দৃষ্টিপাত করত না। দৃষ্টিপাত করত না এই জন্যে যে, প্রগতি পেছন দিকে নেই, আছে সামনে—আপাতত মদনের নৌকোয়।

নৌকোয় উঠে জগবন্ধুবাবু বললেন, "জমিদার পিতার সন্তান হতে পারনি বলে তুমি গরীব নও অবিনাশ। তুমি জমির সন্তান, তোমার ঐশ্বর্য কোন দিনও নষ্ট হবে না।"

ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল অবিনাশ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল,

মদনের নৌকো মোড় ঘুরল বাঁ দিকে। তারপর নৌকোটা অদৃশ্য হয়ে গেল শশী মিত্রের ধানের গোলার পেছন দিকে।

এ-বাড়ি, ও-বাড়ির সামনে-পিছু দিয়ে মদন নৌকো বেয়ে চলল। পলাশপুরের শেষ প্রান্তে মজিদ মুন্সির বাড়িটা গত দু-দিনের বৃষ্টিতে প্রায় ভেসে যাওয়ার উপক্রম। সামনের উঠোনটা গত কালই ডুবে গেছে। জল দাঁড়িয়েছে চার ফুটের মত। তারপাশা থেকে ফিরবার মুখে মদন কাল মজিদ মুন্সির উঠোনের ওপর দিয়ে নৌকো বেয়ে এসেছে। শর্ট-কাটের রাস্তা, নইলে ওকে সিকি মাইল রাস্তা ঘুরে আসতে হতো। আজও মদন নৌকোর সামনের গলুইটা ঘুরিয়ে দিল সেই ডুবে-যাওয়া উঠোনটার দিকে। দয়াল লগি দিয়ে মারল খুব জোরে এক ধাক্কা।

জগবন্ধুবাবু ছইয়ের মধ্যে থেকে মুখ বার করে বললেন, "মদন, নৌকো থামা।"

"কেন জগবন্ধু, এমন শীতল জলে ভয় কিসের?" জানতে চাইল মদন, "এই দেখো, মজিদ মুন্সির উঠোনের মাটি দেখা যাচ্ছে।"

জগবন্ধুবাবু বললেন, "জলের টানে মাটি অনেক ক্ষয়ে গেছে। এখন লগি মেরে আরও মাটি তার নষ্ট করবি না কি? তোর নিজের গা থেকে মাংস কেটে নিলে ব্যথা লাগবে না? তা ছাড়া জলে ডুবে গেছে বলে সম্পত্তির সীমানা তো কমে যায় নি মদন? ঘুরিয়ে নে নৌকো।"

"সিকি মাইল রাস্তা কমে যেত জগবন্ধু!"

"সিকি মণ মাটিও ক্ষয়ে যেত মদন। নিজের কাজে ফাঁকি দিয়ে লাভ হবে কি? ভাড়া তো আমি তোকে পুরোই দেব।"

মদন কিছু জবাব দেওয়ার আগেই দয়াল উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে লগি দিয়ে মারল এক ঠেলা। নৌকোর মুখ গেল ঘুরে। দয়াল বলল, "হালটা সিধে করে ধরো বাবা। দেরি হয়ে যাচ্ছে।" মদন নিজেই আর দেরি করতে চায় না। এরপর ধলেশ্বরী পার হতে হবে। ডুব-সাঁতার দিয়েও সেখানকার মাটির নাগাল পাওয়া যাবে না। অতএব, দু-এক মিনিটের জন্যে মজিদ

মুন্সির উঠোনের মাটি ধরে রেখে লাভ কি? দিনরাত যারা জলের ওপর ভাসে, তারা বোধ হয় মাটির স্পর্শ সহজে ছাড়তে চায় না। সিকি মাইলের শর্ট-কাটটা সম্ভবত বড় কথা নয়, নৌকোয় বসে উঠোনের মাটি দেখাটাই বড় কথা।

মদনের নৌকো ভেসে চলল ধলেশ্বরীর দিকে।

বেলা বারোটা নাগাদ ওরা পৌছল এসে তালতলার ঘাটে। বিক্রমপুরের স্থলের সীমানা এইখানেই শেষ। এখান থেকে স্থরু হয়েছে ধলেশ্বরী নদী। নদীর দিকে চেয়ে স্থরমার বেশ একটু ভয় করতে লাগল। স্বামীকে সে বললে, "শরীরটা আমার ক্রমশই খারাপ হয়ে পড়ছে।"

"ভয়ে নাকি?" জিজ্ঞাসা করলেন জগবন্ধুবাবু।

"একা থাকলে অতটা ভয় করতুম না। ভয় পাচ্ছি তোমার জন্যে আর—"

তালতলার ঘাটে নৌকো বেঁধে মদন নিঃশব্দে তামাক টানছিল। চোখ দুটো নিচের দিকে নামিয়ে রেখেছিল সে। সামনের দিকের দৃশ্যটা চোখে খুব ভাল ঠেকছিল না। দক্ষিণ আর পূব আকাশে মেঘ জমছে অতি দ্রুত গতিতে। মদন চোরের মত এরই মধ্যে দক্ষিণ আর পূব আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেলেছে দু-এক বার। একটু আগের পাতলা ছাই রং-এর শাড়ীর মত মেঘের বুনুনিটা যেন ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। জমাট বাঁধছে মেঘ। ছাই রং-টা ক্রমে ক্রমে কালো হয়ে আসছে। বাতাসের গতিটাও বুঝি বাড়তে আরম্ভ করেছে। কল্কের টিকে কটা যেন দু-দশটা টান দেবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা ভাববার সময় ছিল না দয়ালের। এক নাগাড়ে মধ্যপাড়া থেকে লগি ঠেলতে ঠেলতে সে এসে পৌঁছেচে তালতলার ঘাটে। সকালের খাওয়া গরম ভাত হজম হতে ওর দু-ঘণ্টাও লাগেনি। ধলেশ্বরীর জলে একটা ডুব দিয়ে এসে দয়াল উঠে এল নৌকোয়। সামনের গলুই-এর দিকে শেষ পাটাতনের তলায় হাঁড়ির মধ্যে ভাত ছিল। সের খানেক

চালের ভাত দয়ালের মা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া গোটা পাঁচেক সিদ্ধ আলু আর খানিকটা নুনও সঙ্গে ছিল। পাটাতনের তলা থেকে হাঁড়িটা তুলে নিয়ে এসে দয়াল বলল, "বাবা, আদ্দেকটা ভাত তোমার জন্যে রইল, খেয়ে নিও।" হুঁকোর ওপর থেকে মুখ তুলতে ইচ্ছে করছিল না মদনের। মুখ তুলতে গেলেই চোখটা চলে যেত আকাশের দিকে। তাই সে জবাব দিল, "তুই খেয়ে নে দয়াল। আমি একেবারে নারায়ণগঞ্জের ঘাটে গিয়েই ভাত খাব।"

সুরমা বলল, "হাঁড়িতে চিঁড়ে আছে, খাবে? ঠাকুরপো কাল সাতক্ষীরা থেকে কিছু ক্ষীর নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। ওই ছোট কলসিটায় বাতাসা আছে।"

"তুমি কিছু খাবেনা সুরমা?"

"না গো আমায় কিছু খেতে বলো না। খেলেও পেটে তা থাকবে না।"

কেন?"

"শরীরটা আমার ভাল লাগছে না।"

"তা হলে আজ তালতলার ঘাটেই নৌকো বেঁধে রাখি। গোটা পাঁচেক টাকা বেশি দিলেই মদন কাল আমাদের নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে দেবে।"

"না, ওকে নৌকো খুলতে বলো। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাওয়াই ভাল। বিকেলের দিকে ঝড় বাদল উঠতে পারে।"

ছই-এর তলা থেকে জগবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কত দেরি করবি রে মদন?"

"এক দণ্ডও নয়। পাল তুলছি।" জবাব দিল মদন।

পাল তোলবার আগেই জগবন্ধুবাবু দেখলেন, পালের মাঝখানটায় বেশ বড় বড় সব তালি পড়েছে।

তিনি বললেন, "মাঝখানটাতেই সবচেয়ে বেশি বাতাস লাগে। তালিগুলো খুব শক্ত নয়।"

মদন ইঙ্গিতটা বুঝল। সে বলল, "কি করব জগবন্ধু, একটা নতুন পাল

কিনবার মত পয়সা জুটল না। কাপড় তো কম লাগে না। বাবার আমলের পাল, তাই নৌকো এখনও চলছে।” ইত্যবসরে দয়াল খুঁটির মাথায় পালের দড়িটা বেঁধে ফেলেছে। এখন গলুইতে বসে দড়ি ধরে টান মারলেই সাদা বকের মত পালটা উঠে যাবে ওপর দিকে। হঠাৎ মদনের দিকে চেয়ে দয়াল জিজ্ঞাসা করল, “বাবা, তুমি গামছা পরলে কেন?”

“দেহের ওজন কমিয়ে নিলাম দয়াল। মা কালীর মুঠো যদি আলগা হয়ে যায়, তবে—বুঝলি তো ধলেশ্বরীর গর্ভে গিয়ে সাঁতার কাটতে হবে। তুইও গামছা পরে নে দয়াল।”

“কিন্তু”—একটু ভেবে নিয়ে দয়াল জিজ্ঞাসা করল, “কিন্তু মা কালীর মুঠো আলগা হবে কেন বাবা?”

“আলগা হবে, ঝড়ের তেজ যদি বেশি হয়।”

“মা কালী তো স্বগ্‌গের দেব্‌তা, তাঁর হাতের জোর ঝড়ের চেয়ে অনেক বেশি। তুমি নৌকো ছাড়ো বাবা।”

“নে, চল্। নৌকো ছাড়ছি। ঠেলিস তো লগি, অত তক্ক করতে শিখলি কোথায় দয়াল?”

মদন নৌকো ভাসিয়ে দিল। দয়াল সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ধরে মারল এক টান। বাতাসের প্রথম ধাক্কায় নৌকোটা অনেক এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু নৌকোটা একটু অস্বাভাবিক ভাবে হেলেদুলে উঠল। আকাশের দিকে চেয়ে মদন হালটা বেশ শক্ত করে ধরল। তির তির করে দ্রুত গতিতে নৌকো চলল সামনের দিকে। দয়াল মদনের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। একটুপর মদন আকাশের দিকে চেয়েই বলল, “কাছেই থাকিস দয়াল। মা কালীর হাত যত শক্তই হোক, তিনি তো স্বগ্‌গের দেব্‌তা। কিন্তু ঝড়টা তো স্বগ্‌গে উঠবে না, উঠবে ধলেশ্বরীর বুকে। দয়াল, দরকার হলে তোর হাত দুটো একটু ইদিক পানে এগিয়ে দিস।”

“ভয় করো না বাবা, ধলেশ্বরীতে যত বড় ঝড়ই উঠুক, মা কালী আমাদের রক্ষে করবেন।”

দয়ালের একটা কথাও মদনের কানে যায় নি। যাওয়া সম্ভব ছিল না কানের পেছন দিকটা ওর কেমন সুড়সুড় করছিল। বাতাসের স্রোত ওর কানের সঙ্গে লেগে লেগে যাচ্ছে। মদন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, সমুদ্রের দিক থেকে ঝড় রওনা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। ধলেশ্বরীর বুকে এসে লুটিয়ে পড়তে আর বেশি সময় লাগবে না।

জগবন্ধুবাবু বাইরে এসে দাঁড়ালেন, ছই আর মদনের মাঝখানে। পালেব বুকটা ফুলে উঠেছে বাতাসের চাপে। তিনি চেয়েছিলেন সবচেয়ে বড় তালি-দেওয়া অংশটার দিকে। জগবন্ধুবাবুর মনে হল, ঐ জায়গাটায়-ই বাতাসের চাপ লাগছে সবচেয়ে বেশি। পালের মোটা কাপড় থেকে যেন ঐ অংশটা একটু বাইরের দিকে বেরিয়ে রয়েছে। ফুলে উঠেছে গোল হয়ে। তন্বীর ত্বকের মত তালি-দেওয়া অংশটা মাজা এবং মোলায়েম দেখাচ্ছে। তাজা ত্বকের টানে মদনের নৌকোটাও যেন তন্বঙ্গী তয়ফার মত ঢেউ-এর তালে দেহ দোলাতে দোলাতে পার হচ্ছে ধলেশ্বরী নদী।

মদনের মুখে শব্দ নেই। নেই ওর পশ্চাৎ কিংবা ভবিষ্যৎ। ওর সবটুকু অস্তিত্ব এখন বর্তমানের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। স্বর্গের দেবতার কথা ও ভুলে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। ঝড় উঠেছে ধলেশ্বরীর বুকে, সবটুকুই অনুভূতিগ্রাহ্য, এক রত্তি অনুমান এতে নেই। নিজের মুঠো দুটোর বাইরে আর কোন মুঠো সে কল্পনাই করতে পারছে না। সমস্ত দেহমনের সবটুকু শক্তি মদন আজ কুড়িয়ে-কাড়িয়ে জড়ো করেছে এনে নিজের দু-বাহুর মধ্যে। আজ ও বুঝতে পারছে এযাবৎকাল নৌকো বাইতে ওর কোন শক্তির-ই দরকার হয় নি। টক্কর লড়তে হয় নি বিপদ সঙ্কুল বিপরীত পরিস্থিতির সঙ্গে। বিক্রমপুরের শান্ত জলে নৌকো চলেছে নাকের নিশ্বাসে। চালিয়েছে দয়াল আর মা কালীর দয়া। আজ সে সত্যিকারের মাঝি হয়েছে।

জগবন্ধুবাবুও চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। এপার-ওপার কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। এখন আর দক্ষিণ ও পূব আকাশের সমস্যা নয়—উত্তর ও পশ্চিম

দিয়েও মেঘ আসছে উড়ে। সামনের দিকে চেয়ে রইলেন জগবন্ধুবাবু। মনে হল তাঁর, ঢেউগুলো যেন ক্রমশই উঁচু হয়ে উঠছে, সাপের মত এগিয়ে আসছে ফণা তুলে। মাথাগুলোর ওপর কালো মেঘের ছায়া। আর একটু উঁচু হতে পারলেই, ঢেউ-এর সঙ্গে মেঘের হবে ছোঁয়াছুঁয়ি। ফণার ডগায় মণির বাহার নেই, ওরা এগিয়ে আসছে মেঘের বোঝা নিয়ে।

জগবন্ধুবাবু বললেন, "বাতাসের তেজ ক্রমশই বাড়ছে। তালি-দেওয়া কাপড়ের টুকরোটা তোর শক্ত নয় মদন।"

মদন কোন জবাব দিল না। বাক্যব্যয় করতে গেলেই শক্তি ব্যয় হবে অনর্থক। দয়াল বলল, "মা তার শাড়ী ছিঁড়ে তালি দিয়েছে। আপনার ভয় করছে না কি বাবু? কোন ভয় নেই, মা কালী রক্ষা করবেন।"

বড় একটা ঢেউ-এর ধাক্কায় নৌকোটা টলমল করে উঠল। জগবন্ধুবাবু হুমড়ী খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। ধলেশ্বরীর মাঝামাঝি জায়গায় পৌছে গেছে নৌকো। মনে হয় এবার বোধ হয় হাত দিয়ে মেঘ ছোঁয়া যাবে। কিন্তু বাতাস আর ঢেউ-এর যৌথ আক্রমণে হাত তুলবার ইচ্ছে হল না জগবন্ধুবাবুর। দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঠেকিয়ে মদন একেবারে পাথরের মত অনড় হয়ে আছে। একাগ্রতায় তার একবিন্দু অন্যমনস্কতা নেই।

চমকে উঠলেন জগবন্ধুবাবু। সুরমার কান্না শুনতে পেলেন তিনি। সৃষ্টি-ব্যথার কান্না। তরোবারির কোপ বসালেও কান্নায় এত গভীরতা আসে না। ব্যথার গভীরতম স্তরে সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

জগবন্ধুবাবু তাড়াতাড়ি করে ছই-এর ভিতরে ঢুকতে গেলেন। পারলেন না। পড়ে গেলেন পাটাতনের উপর।

ছই-এর বাখারি ধরে দাঁত কামড়ে পড়ে আছে সুরমা। ব্যথার বিক্ষুব্ধ ঢেউ-গুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে ওর দেহের সৈকতে। প্রতিটি গ্রন্থি যেন সব আলগা হয়ে গেল। বোবা কান্নার মত একটা চাপা আওয়াজ কেবল কণ্ঠ-নালীর পথ ধরেই বেরিয়ে আসছে না, বেরুতে চাইছে সুরমার প্রতি অঙ্গ ভেদ করে। রক্তের স্রোতে নৌকোর ওজন বাড়ল।

বিচলিত হওয়ার মত মনের গঠন নয় জগবন্ধুবাবুর। তিনি জানেন, মৃত্যুর চেয়ে বৃহত্তর আশঙ্কা আর কিছু নেই। তিনি জানেন, মানব জীবনের বৃহত্তম সৃষ্টি আসবে সেই আশঙ্কারই অঙ্কুর থেকে। মেঘমল্লারের সূচনা, জগবন্ধুবাবু যেন দেখতে পেলেন গাঢ়তম মেঘের গভীরতম ভ্রূণাচ্ছাদনে।

ছই-এর সামনে কাপড় টাঙিয়ে দিলেন জগবন্ধুবাবু। জন্ম নিচ্ছে জীব। একটা মুহূর্তকে তিনি তাই আলাদা করে দিতে চাইলেন সব রকম আঘাত থেকে। দয়াল এবং মদনের দৃষ্টির আঘাত তিনি লাগতে দেবেন না সেই মুহূর্তটির রক্তমাংসে। জন্ম নিচ্ছে জীব। কেবল জীব নয়, জন্ম নিচ্ছে শিল্প। মানুষ-শিল্প। জগবন্ধুবাবু কোন্ এক অনস্তিত্বের কল্পনার জালে জড়িয়ে গেলেন। তন্ময়তা তাঁর সূচাগ্রের মত তীক্ষ্ণ হল। দেশকালের ব্যবধান সব উহ্য হল সেই নতা মুহূর্তটির জৈব-কোষের মধ্যে।

মদন সবই বুঝতে পারল। দায়িত্ব তার দানা বাঁধছে ছই-এর তলায়। তুফানের বেগ বাড়ছে। বাড়ুক, মদনের আর ভয় নেই। মনে হচ্ছে তার, ধলেশ্বরীর হিংস্র আক্রমণকে সে জয় করতে পারবে অতি অনায়াসেই। হাতে এখনও তার অনেক বাড়তি জোর আছে। অতিরিক্ত শক্তির পুঁজি এখনো সে ব্যয় করে নি। বুকের সঙ্গে হাল ঠেকিয়ে মদন তার ডান হাতটা একটু আলগা করে নিল। তারপর হাতটা সে হালের গায়ে বুলোতে বুলোতে ভাবল, কাঠ-টা যেন নরম হয়ে গেছে। তুলতুল করছে কচি মাংসের মত। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে নৌকোটা উঠে গেল বড় একটা ঢেউ-এর মাথার উপর। নিচের দিকে গড়িয়ে নামতে না নামতে আবার আরও একটা ধাক্কা! ছই-এর নিচে সুরমা চেঁচিয়ে উঠল প্রাণপণে। চেঁচিয়ে উঠল মদনও, "দয়াল, পালের দড়ি কেটে ফেল্, জলদি। এবার সত্যিসত্যি তুফান ছাড়ল!"

দয়াল হাত-দা দিয়ে দড়ির গায়ে দিল বসিয়ে কোপ। মাস্তুলের বাঁশটা নামিয়ে ফেলল চকিতের মধ্যে। আকাশের দিকে চাইল একবার। ছুটে এল

মদনের কাছে। প্রত্যয়ের সুর ভেসে উঠল দয়ালের কণ্ঠে, "কোন ভয় নেই বাবা, মা কালী রক্ষে করবেন।"

মদন এবার দু-হাত আর বুকের শক্তি দিয়ে হালের মাথাটা চেপে ধরেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ঠোটের ওপর থেকে বৃষ্টির ফোঁটা জিব দিয়ে টেনে নিয়ে মদন চেষ্টা করছে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়ার জন্যে। গলার ভেতর দিয়ে যেন মরুভূমির বাতাস যাতায়াত করছে মদনের!

"দয়াল, কাছে থাকিস।" হুঙ্কার দিল মদন। হুঙ্কার দিল সে সামনের দিকে চেয়েই। অন্য কোন দিকে চাইবার সময় নেই। ওকে এগিয়ে যেতে হবে—প্রগতি সামনের দিকেই, পেছনে নয়।

"দয়াল, নৌকোতে জল উঠছে—ভারী হচ্ছে নৌকো। ওজন কমিয়ে ফেল শিগগির।"

"ভাতের হাঁড়িটা ফেলে দেব বাবা?"

"দে। আমাদের বিছানাপত্র যা আছে সব ফেলে দে দয়াল।"

"তারপর কি করব বাবা?"

"জল সেচবি—"

ছই-এর পাশ দিয়ে দয়াল চলে গেল সামনের গলুইতে। পাটাতনের তলা থেকে ভাতের হাঁড়িটা তুলে ফেলে দিল জলে। ফেলে দিল বিছানা, বালিশ সব কিছু। বালিশটা তুলতে গিয়ে দয়ালের নজরে পড়ল ওর ঘুড়ি ওড়াবার লাটাইটা। ডাঙায় উঠে মাঝে মাঝে সে ঘুড়ি উড়িয়ে খেলা করত। আজ আর খেলার কথা মনে হল না দয়ালের। ছুঁড়ে ফেলে দিল লাটাইটা ধলেশ্বরীর কালো জলে। তারপর সে জল সেচতে লাগল। ঝড়ের ঝাপটায় মাঝে মাঝে যেন ওকে উল্টে ফেলে দিতে চায়।

"দয়াল, ইদিক পানে আয়।" ডাকল মদন। চকিতের মধ্যে সে ছুটে এল এ-পাশে। বলল, "বাবা, আমি এসেছি, কোন ভয় নেই—মা কালী আমাদের সঙ্গেই আছেন, বাবা।"

"মোটা দড়িটা সঙ্গে আনিস নি দয়াল?"

"এনেছি।"

"সেটা আন। আমার কোমরের সঙ্গে হালটাকে ভাল করে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে ফেল।"

এ-পাশের পাটাতনের তলা থেকে দড়িটা টেনে বার করল দয়াল। এক নিমেষের মধ্যে দড়িটা সে বেঁধে ফেলল। মদন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "হাত দুটো আমার অবশ হয়ে আসছে দয়াল।"

"কোন ভয় নেই বাবা—" দয়াল গিয়ে মাথা গলিয়ে বসে পড়ল মদনের বুকের তলায়। নিজের ছোট বুক আর হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল হালটা। বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় নৌকোর কাঠ বোধ হয় খুলে আসছে বলে মনে হল মদনের। সে জিজ্ঞাসা করল—"হাতটা নিচুর দিকে নামিয়ে দেখতো মদন, হালের জোড়া-তক্তা ভেঙ্গে গেল না কি ?"

দয়াল উবু হয়ে বসে হাতটা নামিয়ে দিল নিচে। ধলেশ্বরীর ঢেউ থাবড়া মারল দয়ালের চোখে মুখে। তবু সে মুখ তুলল না। ভাল করে পরীক্ষা করে দয়াল বলল, "লোহার পাটি-টা একটু ঢিলে হয়ে গেছে বাবা। হাতুড়ি দিয়ে পিটে দেব ?"

"পারবি ?"

জবাব দিল না দয়াল। লাফিয়ে উঠে সে নিয়ে এল হাতুড়ি। ঝুঁকে পড়ে সে হাতুড়ি দিয়ে পেরেকের মাথায় পিটতে লাগল। হাতুড়ি পেটা শেষ করে দয়াল যেন নতুন উদ্যমে ঘোষণা করল, "কোন ভয় নেই বাবা, হালের তক্তা মা কালী ধরে রাখবেন।"

"ধলেশ্বরীর দম্ভ আমি ভাঙ্গব। ছুঁতে দেব না এক ইঞ্চি কাঠও। দয়াল, এদিকে আয়।"

দয়াল উঠে এসে দাঁড়াল মদনের গা ঘেঁষে। মদন বলল, "মাথার চুলগুলো সব বৃষ্টির ছাটে চোখের ওপর এসে পড়েছে। ধলেশ্বরীকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছি নে। চুলগুলো সব ওপর দিকে তুলে দে।" মদন মাথাটা একটু নিচের দিকে নামিয়ে আনল। দয়াল পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মদনের

চুলগুলো তুলে দিল মাথার ওপর। দিয়ে বলল, "বাবা, চুল তোমার থাকছে না, আবার নেমে আসছে।"

"তা হলে সামনের দিকের চুলগুলো সব কেটে দে।—ধনেশ্বরীকে সায়েস্তা করব আজ। হার মানব না কিছুতেই।"

"কিন্তু কি দিয়ে চুল কাটব?"

"কেন, হাত-দাটাও ফেলে দিয়েছিস না কি? দড়ি কাটতে পারলি, চুল কাটতে পারবি নে?"

"পারব বাবা, কোন ভয় নেই—"

দয়াল এবার ছই-এর ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে চলে গেল ও-ধারে দা আনতে।

ইত্যবসরে ছই-এর তলায় জন্ম নিয়েছে জগবন্ধুবাবুর প্রথম সন্তান ভজহরি।

উনিশ-শো পঁয়ত্রিশ সাল।

ভজহরি এই শ্রাবণে পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল।

দাওয়ায় বসে সুরমা ভজহরিকে চান করাচ্ছিল। চান করাতে সুখ পায় সুরমা। সাবানের ফেনাগুলো ছেলেটার গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে সুরমা কচলাতে থাকে ভজহরির হাত-পাগুলো। বেশ মোটাসোটা হয়েছে ভজহরি। ফাঁপা মাংস নয়, হাড় থেকে চামড়া পর্যন্ত কোথাও এতটুকু অনাবশ্যক মেদ জমতে পারে নি। জন্ম থেকেই ছেলেটা জোয়ান হয়েছে।

হঠাৎ সুরমার হাত ফসকে ভজহরি পড়ে গেল উঠোনের ওপর। সিমেণ্টের বাঁধানো উঠোন। সুরমা চেঁচিয়ে উঠল। জগবন্ধুবাবু ছুটে এলেন। উঠোন থেকে তুলে নিয়ে এলেন ভজহরিকে। কপালের ওপর বেশ খানিকটা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছিল।

"আমার হাতেই ছেলেটার কপালে দাগ পড়ল!" বলল সুরমা।

"ছেলেটা যদি মানুষ হয়ে উঠতে পারে, এ-দাগ ওর মুছে যাবে।" অভয় দিলেন জগবন্ধুবাবু।

"মানুষ না হয়ে যদি বনমানুষ হয় ?"

"কেন ? এমন কথা বললে কেন সুরমা ?"

"ছেলেটা কাঁদে না। ব্যথা-বেদনাবোধ একটুও নেই। পাঁচ বছরের বাঙালীর ছেলে পাঞ্জাবীর মত ঢেঙা হয়ে উঠেছে।"

"সুরমা, তুমি ভুলে যেও না খোকার রক্তে আছে ধলেশ্বরীর ঢেউ।"

"ও মাগো!" ভয়ে সুরমার চোখ বুজে এল।

জগবন্ধুবাবু ঘর থেকে তুলো নিয়ে এলেন। নিয়ে এলেন আইডিনও। সুরমার কোলে খোকাকে বসিয়ে দিয়ে জগবন্ধুবাবু আইডিন লাগাতে লাগলেন। হাত-পাগুলোতে একটু চঞ্চলতা এল বটে, কিন্তু ভজহরি তবু কাঁদল না। ব্যাপার দেখে সুরমা বলে উঠল, "সব কান্নাই বোধহয় ছেলেটা জমিয়ে রাখছে ভবিষ্যতের জন্যে। তুমি কি বলো ?"

"আজকে আর ওকে ছুটাছুটি করতে দিও না।" বললেন জগবন্ধুবাবু!

"আমি রথের মেলা দেখতে যাবো বাবা।" ঘোষণা করল ভজহরি।

"যাবে। আমার সঙ্গেই যাবে খোকা।" জগবন্ধুবাবু চলে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে।

বারোদির জমিদার জগদীশ নাগ ঘুমচ্ছিলেন। বিকেলের চা খাওয়ার এখনো সময় হয় নি। রাত আট-টার সময় তাঁর বিকেল হয়। রাত দুটোর সময় তাঁর ডিনার খাওয়ার সময়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে নাগ বংশের কেউ কখনো বেলা দশটার আগে ব্রেকফাস্ট খান নি। এখানকার ঘড়ির সঙ্গে জগতের কোন ঘড়ির-ই মিল নেই। মিল থাকবার দরকারও ছিল না।

বাংলা-গোলক ঘুরছে জমিদার-অক্ষকে কেন্দ্র করে। এই অক্ষের চর্তুর্দিকে সৃষ্টি হয়েছে কৃষ্টির স্তর, যে-স্তরে জমিদার-কেন্দ্রীক সমাজতত্ত্ব কেল্‌নার কোম্পানীর সুরা-স্রোতের মধ্যে ভাসমান। তাড্যমানের শোকাশ্রু তাতে

মিশতে পারে নি। আদি ও অকৃত্রিম কৃষ্টি-তেল আলাদা হয়ে রইল চিরদিন গণ-জল থেকে।

রাত আট-টা প্রায় বাজে। জেনানামহল থেকে বৌরানী হাঁটতে হাঁটতে পুরুষমহলের দিকে আসছিল। জগদীশবাবু ছাড়া পুরুষমহলে দ্বিতীয় কোন বাসিন্দে নেই। বৌরানীর হেঁটে আসতে প্রায় পাঁচ মিনিট লাগল।

সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। ভেতরে ঢোকবার আগে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে একটু আওয়াজ করতে হয়। সরাসরি ঢুকে পড়বার আদেশ নেই জগদীশবাবুর।

ব্যবস্থাগুলো সব অদ্ভুত ঠেকে বৌরানীর কাছে। তাঁর বাবা হরিলাল বসু ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বড় উকিল। খুবই সংগ্রাম করে তাঁকে বড় হতে হয়েছিল। বিক্রমপুরের মালখানগর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি কলকাতায় আসেন কলেজে পড়তে। বারোদির নাগ বংশের সহায়তায় হরিলালবাবু এম. এ. এবং আইন পাশ করেন।

হাইকোর্টে বসবার পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি হরিশ মুখার্জি রোডে একতলা একখানা বাড়ি কিনলেন। দশ বছর পর একতলা বাড়ি তিনতলা হল। হরিলাল বসু উঠে এলেন সমাজের সবচেয়ে উঁচু স্তরে। সেই সময় তাঁর স্ত্রী গেলেন মারা। সংসারে রইলেন কেবল তিনি আর তাঁর একমাত্র সন্তান বেলারানী।

হরিলাল বসুর আর্থিক উন্নতির মূলেও ছিল নাগ বংশের বহুবিধ সাহায্য। পূর্ব বঙ্গের জেলাকোর্টে হেরে-যাওয়া মামলার নথিপত্র আসত হরিলালবাবুর কাছে আপীল করবার হুকুম নিয়ে। পরাজিত পক্ষের মামলা লড়তে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। যে-মকদ্দমা দু-বছরে নিষ্পত্তি হওয়ার কথা ছিল, তা কখনো দু-বছরে নিষ্পত্তি হতো না। বহু বছর কেটে যেত 'রায়' বেরুতে। জগদীশবাবুর পিতা কালিদাস নাগ মহাশয় তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হতেন না। কোনদিনও তিনি হরিলালবাবুর পারিশ্রমিকের টাকার অংক কমিয়ে দেবার জন্যে দেওয়ানজীর কাছে একটা ইঙ্গিত পর্যন্ত করেন নি। কালিদাসবাবু মারা

গেছেন অনেকদিন হল। কিন্তু বছরের পর বছর কলকাতার হাইকোর্টে মকদ্দমা লড়বার প্রথা বলবৎ রয়েছে জগদীশবাবুর আমলেও। পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করবার জন্যে এক লাখ টাকা ক্ষইয়ে এবং খাইয়ে দেবার পুরনো-পদ্ধতি জগদীশবাবুকে একদিনের জন্যেও বিচলিত করে নি।

তিনি বিচলিত হলেও, আদালত তা শুনতো কি না সন্দেহ ছিল তাতে। কলকাতা একদিনে গড়ে ওঠে নি। সুতানুটি ইত্যাদি কংকালের ওপর মাংস গজাতে সময় নিয়েছে। গজাতে সাহায্য করেছেন জব চার্ণক, সাহায্য করছে জমিদারদের নথিপত্রগুলোও। পূর্ব বঙ্গের টাকায় কেবল আদালতেরই আয় বাড়ল না, বাড়ল কলকাতারও।

স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে, মধ্য বয়সেই হরিলাল বসু ভেঙে পড়লেন। টাকার নেশাকে ছাপিয়ে গেল মদের নেশা। আয় বাড়ল প্রচুর, কিন্তু ব্যয় বাড়ল 'তার চেয়েও বেশি। পূর্ব বঙ্গের মাটির টাকা সোনায় রূপান্তরিত হয়ে জমতে লাগল বিদেশী বণিকের সিন্দুকে। ভারতবর্ষ তার অংশ পেল না, সবটুকু চলে গেল বিলেতে, বিদেশী অংশীদারদের পকেটে। সোনার গর্ব নিয়ে বিলেতী স্টার্লিং মার্চ করে চলল পৃথিবীর বাজারে বাজারে। কালীঘাটের হাফ-গেরস্থ যেন হাই-হিল্ পরে মিশে গেল বিদগ্ধ সমাজে বিনিময়-মূল্য বাড়িয়ে নেবার জন্যে!

হরিলাল বসু এ-সব কথা এক দিনের জন্যেও ভেবে দেখেন নি। ভেবে দেখবার প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি। সমাজ-জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে তিনি উঠেছেন, কৃষ্টির স্তর। জমিদাররা কৃষ্টিকে বেঁধে রেখেছেন খাস সম্পত্তির সহস্র আইন দিয়ে। গাধাবোটের মত কৃষ্টি চলেছে ক্ষমতার পিছু পিছু। ক্ষমতার খুরপি দিয়ে খোঁচা মারতে না পারলে যেন কৃষ্টির বীজ বাংলার মাটিতে ফুটে বেরুতে পারে না!

এ-সব কথা হরিলালবাবু ভাবেন নি। বেলারানী ভাবতে লাগল। কলেজ পর্যন্ত পড়েছিল সে। মধ্যবিত্তের মেয়েদের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হল। তাদের ঘরসংসারের মধ্যে দৃষ্টিপাত করল বেলারানী বসু।

অসুস্থ হরিলালবাবুকে সে নিজেই একদিন বলল, "বাবা, চলো আমরা বছরখানেক দেশে গিয়ে থেকে আসি।"

"দেশ?"

"হ্যাঁ বাবা, বিক্রমপুরের আবহাওয়া তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই হবে।" হরিলালবাবুর মাথায় হাত বুলতে লাগল বেলারানী।

"এই তো পুজোর সময় দেশ থেকে ঘুরে এলুম। তা ছাড়া এক বছর কলকাতার বাইরে গিয়ে কি থাকা যায় মা?"

"কেন বাবা? কি অসুবিধে?"

হরিলালবাবু হাত বাড়িয়ে টিপয়ের ওপর থেকে ডায়েরি বইখানা নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। একটু পরেই তিনি বললেন, "অনেকগুলো সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব করতে হবে মা।"

"কিসের সভাসমিতি?"

"পূজো কমিটি থেকে সুরু করে সাহিত্য সভা পর্যন্ত অনেক রকমের প্রতিষ্ঠান।"

"সে সব তো বিক্রমপুরেও আছে?"

"আছে সত্যি, কিন্তু কলকাতাকে বাদ দিয়ে সে-সব কোনদিনও কৃষ্টি-কৌলিন্য অর্জন করতে পারবে না।"

হরিলালবাবুর মাথার ওপর থেকে হাত নামিয়ে বেলারানী বললে, "তোমরা ভাবছ পারবে না,—"

"আমরা ভাবছি? তুই নিজে কি অন্য রকম ভাবিস না কি? বেলা, বাংলা সমাজের মেরুদণ্ড হচ্ছে কলকাতা। এখানকার ঢেউ অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদীর মত বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়।"

"আমার ধারণা ঠিক সে-রকম নয়। বাবা, তোমরা কৃষ্টির নাম করে যে-একটা বিশেষ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে একটা গোপন-বস্তু তোমরা কোনদিনই দেখতে পাও নি।"

"কি বস্তু সেটা?" জানতে চাইলেন হরিলাল বসু।

"বিষ, সাদা আর্সেনিক, শঙ্খবিষ।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত হরিলালবাবু চুপ করে রইলেন। বোধহয় চোখ বুঁজে অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁর চেতন ও অব-চেতন মনের কোথাও শঙ্খবিষের অস্তিত্ব ধরা যায় কি না। একটুপর, তিনি অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন। জ্বরের তাপ সম্ভবত বাড়ল। বাড়ল, শঙ্খবিষের অনিবার্য-আক্রমণের জন্যে নয়। জ্বর বাড়ল বেলারানীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কৃষ্টির আবহাওয়ার মধ্যেই কেবল সাদা আর্সেনিক ছিল না, তাঁর অর্থনৈতিক দৃঢ়তার মূলেও আর্সেনিক বিষ দাঁত বসিয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। বহু টাকা তিনি ঋণ করেছেন। হরিশ মুখার্জি রোডের বড় বাড়িখানা বেচলেও সে ঋণ তিনি শোধ করতে পারবেন না। হরিলাল বসু গোঁড়া হিন্দু, ঋণ শোধ করে না মরলে, তাঁকে আবার জন্মাতে হবে ঋণ শোধ করবার জন্যে। কেবল তাই নয়, ঋণের চেয়েও বেলারানীর ওজন আজ কম নয়।

চাকর এসে খবর দিল জমিদার জগদীশ নাগ অফিস ঘরে অপেক্ষা করছেন।

"এইখানেই তাঁকে ডেকে পাঠাও বাবা।"

"হ্যাঁ সেই ভাল। মা বেলা, আজ তুই নিজে হাতেই ওঁর খাবারের ব্যবস্থা কর। কালিদাসবাবুর চেয়েও ভাল হয়েছে এই ছেলেটি। শিক্ষিত, সুশ্রী ও সদাশয়। অনেক টাকা নিয়েছি নাগ বংশের কাছ থেকে। যে-মকদ্দমা দু-বছরের মধ্যে জিততে পারতুম, সেটা জিতেছি পাঁচ বছর পর। কলাঁকোপা বাজারটা আজও ওদের দখলে এল না, মকদ্দমা চলছে। কিন্তু কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ জগদীশ এসে উপস্থিত হল কেন?"

কারণটা বুঝে দেখবার সুযোগ দিয়ে বেলারানী বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। সিঁড়ির ওপরেই দেখা হয়ে গেল জগদীশবাবুর সঙ্গে। বেলারানীকে দেখলেন জগদীশ নাগ। মাথা নিচু করে সিঁড়ির এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল বেলারানী। ঘরের মধ্যে থেকে হরিলালবাবুর কণ্ঠ শোনা গেল, "মা বেলা, জগদীশকে এখনো কি খবর দেয়া হয় নি?"

"আপনি অসুস্থ আমি তা জানতুম না।" বললেন জগদীশবাবু। "হ্যাঁ, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। তা পড়ুক, সামনের তারিখে যেমন করে পারি, তোমাদের মকদ্দমা আমি শেষ করে দেব। কলাকোপা বাজার তোমাদের দখলে আসতে আর দু-মাসও লাগবে না জগদীশ।"

"কলাকোপার বাজার উদ্ধার করবার জন্যে আপনার এই ভাঙ্গা-স্বাস্থ্য নিয়ে আদালতে ছুটোছুটির আর দরকার নেই।"

"সে কি কথা, ছুটোছুটি করাই তো আমার প্রফেশন জগদীশ!" "আমি আর আপনাকে ছুটোতে চাই নে হরিলালবাবু। কলাকোপা বাজারের সর্ত নিয়ে আমি আর বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে মামলা লড়তে চাই নে। মিটিয়ে ফেলুন। হাজার হলেও, বিরুদ্ধ পক্ষ তো আমারই জ্ঞাতি-বন্ধু।"

"খুবই ভাল কথা, খুবই—" হরিলালবাবু বিছানার ওপরেই বসতে যাচ্ছিলেন। পারলেন না। শুয়ে পড়লেন আবার। দুর্বলতা তাঁর অনেক বেড়ে গেল। একটু পরেই হরিলালবাবু ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "জগদীশ, আমার আয়ু যে ফুরিয়ে এসেছে আমি তা বেশ বুঝতে পারছি। অবশ্যি সব মানুষেরই একদিন না একদিন আয়ু ফুরিয়ে যায়। কিন্তু আমার ভয় রইল কেবল বেলারানীর জন্যে।"

জগদীশ নাগ কোন মন্তব্য প্রকাশ করলেন না, চুপ করে বসে রইলেন। হরিলালবাবু আশা করেননি যে জগদীশ নাগ চুপ করে বসে থাকবেন। আলোচনাটা তাঁর ইচ্ছে মত পরিচালিত হবে বলেই তিনি ভেবেছিলেন। তা যখন হল না তখন তিনি আবার বললেন, "জগদীশ, তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছি অনেক। সত্যিই অনেক। তোমার বাবা কালিদাসবাবু কোনদিনও এতটুকু কৃপণতা করেন নি। অনেক সময় মনে হতো, আমার পারিশ্রমিক কমে যাবে বলেই যেন তিনি কখনো মকদ্দমার নিষ্পত্তি চাইতেন না।"

"তা হলে কলাকোপার বাজারটা—"

জগদীশবাবুকে থামিয়ে দিয়ে হরিলাল বসু বললেন, "না না, ও-মকদ্দমা আমি মিটিয়ে ফেলব। টাকা তো কম রোজগার করি নি, কিন্তু হাতের ময়লার

মত সবই ধুয়ে মুছে গেল। এখন তো ঋণের সমুদ্রে ভাসছি। জগদীশ, আমার একমাত্র সম্পত্তি ঐ মেয়েটা, বেলারানী। বড় সংসার চালাবার মত বুদ্ধি রাখে। খানিকটা লেখাপড়াও শিখেছে। সারা জীবন তোমাদের কাছ থেকে কেবল নিলুম, মরবার আগে তোমার হাতেই ওকে তুলে দিয়ে যেতে চাই।"

কলাকোপা বাজারের সর্ত জগদীশ নাগ হারিয়েছেন পাঁচ বছর আগেই। সর্ত ছেড়ে দিতেই তিনি এসেছিলেন হরিশ মুখার্জি রোডে, হরিলাল বসুর কাছে। কলাকোপা বাজারের মত বিরাট সম্পত্তিটা তাঁর আর নেই। কিন্তু তার চেয়েও বিরাটতর সম্পত্তি তিনি পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন বেলারানীকে। নাগ পরিবারে পা দিয়েই বেলারানী নতুন টাইটেল পেল বৌরানী। বিয়ের এক বছর পরে হরিলালবাবু মারা গেলেন। তাঁর সব ঋণ শোধ করে দিলেন জগদীশ নাগ। পূর্বজন্মের পাপ থেকে হিন্দু-হরিলাল বসু সম্ভবত মুক্তিও পেয়ে গেছেন।

বৌরানীর বিশ্বাস, মুক্তি তিনি পান নি। বাবা তাঁর ঋণটাকেই কেবল পাপ মনে করতেন বটে, কিন্তু আসলে পাপ-রাজ্যের পরিধি তাঁর অনেক বড় ছিল। তিনি সেই পরিধিটা দেখতে পান নি। সাদা আর্সেনিক বিষ তাঁর চোখে পড়ে নি। শঙ্খবিষের গুঁড়ো সমাজদেহের প্রতি রোমকূপে বাসা বেঁধেছে অনেকদিন আগে থেকেই—একটা গোটা শতাব্দীর পদচারণে তাই আজ এত অস্থিরতা! তাই আজ সভ্যতার ভাঙ্গা-সানকীতে খাদ্যের স্বচ্ছলতা নেই, নেই তাতে স্বাস্থ্যের স্মরণীয় উপকরণ। শঙ্খবিষ খেয়ে ফেলেছে সানকীর কলাই-করা রংটা। ভেতরের কদর্যতা আজ তাই আর কোন রকমেই গোপন করা যাচ্ছে না।

জগদীশবাবুর ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বৌরানী জিজ্ঞাসা করল, "বেলা দশটা বেজেছে, উঠবে না?"

জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে বৌরানী ঢুকে পড়ল ঘরে। জগদীশবাবুর মাথায় হাত বুলতে বুলতে সে পুনরায় বলল, "মাগো, মনে হয় তুমি যেন সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে ঘুমচ্ছ!"

হাই তুলতে তুলতে জগদীশবাবু বললেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বর্গ থেকে আমায় তুমি বিদায় করতে চাও না কি?"

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বর্গই দেখলে, নরক দেখো নি?"

"তুমি দেখেছ বৌরানী?"

"দেখেছি।"

"কি রকম দেখতে? কালো না কি?"

"না, সাদা। সাদা বিষ উপচে পড়ছে।"

"কালো হলে আমার চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়ত বৌরানী।"

জগদীশবাবুর পাশে বিছানার ওপর বসল বৌরানী। জগদীশবাবু হাত-কাটা স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরেই কাল রাত দুটোর সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত বারোটা পর্যন্ত গান-বাজনা ও আলাপ-আলোচনা চলে রোজই। রাত একটা বাজে রাতের আহার শেষ করতে। অনেকদিন রাত্রে তাঁর খাওয়াই হয় না। সঙ্গীত ও সুরার নেশায় যেদিন তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, সেদিন তাঁর প্রিয় ভৃত্য রমাকান্তের ঘাড়ে ভর দিয়ে তিনি চলে আসেন শয়ন কামরায়। গড়িয়ে পড়েন বিছানায়। ঘুম আসতে এক মিনিটও সময় লাগে না।

বিয়ের পর বছর চার পর্যন্ত জেনানামহলে তাঁর যাতায়াত ছিল। কিন্তু গত এক বছর থেকে সেদিকপানে যাওয়ার খুব একটা প্রয়োজন বোধ করেন না জগদীশবাবু। বৌরানী মাঝে মাঝে নিজেই চলে আসে পুরুষমহলের দিকে। আসে দিনের বেলায় রাত্রে নয়। বৌরানী জানে রাত এবং দিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য নেই চন্দ্র এবং সূর্যের মধ্যেও। জ্যোৎস্না কিংবা রোদ তার ভ্রূণাচ্ছাদিত অন্ধকার বিদূরিত করতে পারবে না। সৃষ্টি-আলো বিলুপ্ত হয়েছে তার দেহাভ্যন্তর থেকে। জগদীশবাবুর অক্ষমতা তাঁর সামাজিক সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করে নি, কোনদিন করবেও না। সর্বোচ্চ স্তরে তাঁর কৃষ্টি-স্রোত অব্যাহত রয়েছে। দেশের শিল্প, সঙ্গীত এবং সাহিত্য তাঁকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন বড় হয়ে উঠছে। বড় হচ্ছে না কেবল বৌরানী। তিনি কেবল পৃষ্ঠপোষক নন, তিনি নায়ক, তিনি হিরো। সমাজদেহের মেরুদণ্ড তিনি—স্পাইনাল কর্ড। কলেজ

স্ট্রীটের বই এর গাদায় হাত বুললে, তাঁর অস্তিত্বের ছিটে-ফোঁটা সব উপন্যাসের মধ্যেই অনুভব করা যায়। অনুভব করা যায় পৃথিবীর যে-কোন বই-এর দোকানে। সেখানে তাঁর অন্যরূপ, ভিন্ন প্রকাশ। সেখানে তিনি হাত-কাটা স্যাণ্ডো গেঞ্জিগায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েন নি। ল্যাঙ্কেশায়ারের সূক্ষ্মতম সুতোর মসৃণতম রাতের পোশাক পরেই শুয়েছেন। সেখানে তাঁর বাহু দুটো মুক্ত নয়। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বাহুর চামড়া সেখানে ঝুলে পড়ে নি বিছানার কিনার ঘেঁষে।

জগদীশবাবুর মুক্ত বাহুর উপরে হাত রাখল বৌরানী। মাংসগুলো কেমন নেতিয়ে পড়েছে। দানা বাঁধেনি মাংস। জোর করে চেপে ধরলে বাহুতে তাঁর ব্যথা লাগে না। থলথলে মাংসের মধ্যে ব্যথার-ঢেউ হারিয়ে যায়। একেবারে তলা পর্যন্ত গিয়ে পৌছুতে না পারলে কোন আঘাতই আঘাত বলে মনে হয় না। বৌরানী জানে, জগদীশবাবুকে আঘাত দিতে হলে, তাঁর দেহের নিম্নতম স্তরে পৌছুতে হবে। মজ্জা ভেদ করে চলে যেতে হবে একেবারে হাড় পর্যন্ত। ঢুকিয়ে দিতে হবে সাচ্চা ইস্পাতের বল্লম, পুরোটা নয়, অন্তত ছ-ইঞ্চি পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিতে পারলে ব্যথা তিনি পাবেন। জগদীশবাবুকে ব্যথা দেওয়ার জন্যে বৌরানী যেন সত্যি সত্যি ঘরের চারদিকে চাইতে লাগল, খুঁজতে লাগল বল্লম। একটা ভোঁতা বল্লম হলেও তার কাজ চলে যেত। জগদীশবাবুকে ব্যথা দিতে না পারলে যেন তার ভ্রূণের অন্ধকার দূর হচ্ছে না। দূর হচ্ছে না সমাজ-তন্ত্রের পচা নির্যাস। কোঁচানো ধুতি আর গিলে-করা পাঞ্জাবির কৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর অক্ষমতাকে ঢেকে রেখেছেন। প্রতিবাদের ভাষা পর্যন্ত তিনি কেড়ে নিয়েছেন বৌরানীর কাছ থেকে। চারদিকে তুলে দিয়েছেন নীতি ও সংস্কারের অসত্য প্রাচীর। ক্ষমতার প্রাচুর্য না থাকলে এ প্রাচীর তিনি ধরে রাখতে পারতেন না। মানব সভ্যতার বৃহত্তম সম্পদ, ব্যক্তিমনের স্বাধীনতাকে কারারুদ্ধ করে রাখতে পারতেন না বারোদির বড় জমিদার জগদীশ নাগ।

জগদীশবাবু বললেন, "আজকে আমাদের একটা বিশেষ দিন।"

"জানি, রথ।"

"গানের আসর বসবে রাত নটায়। শহরের যাঁরা গণ্যমান্য সবাই আজ আমন্ত্রিত। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। বৌরানী, আমি আশা করব, তুমিও আজ আমাদের আসরে উপস্থিত থাকবে। জগবন্ধুর গলায় আজ উঠবে সুরের ঢেউ। তুমি তো কোনদিনও তার গান শুনলে না?"

"গান শুনলে আমার কান্না পায়। কান্না ওঠে আমার নিজের দেহ থেকে।"

"সেই জন্যেই শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে সমঝদারদেরও হতে হয় নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হতে না পারলে, শিল্পের রস আস্বাদন করা যায় না বৌরানী। তোমার দুঃখ বন্ধ্যাত্বের দুঃখ। জানি, তোমার বন্ধ্যাত্ব আমারই অক্ষমতার ফল। কিন্তু সমাজ ও সভ্যতা তোমার বন্ধ্যাত্ব কোনদিনই ঘুচিয়ে দিতে পারবে না।"

"কিন্তু আমার সভ্যতা তোমার সমাজকে প্রতিমুহূর্তে অস্বীকার করছে।"

"বৌরানী!" জগদীশবাবুর কণ্ঠে যেন ভেসে উঠল আর্তনাদের সুর। নাগ বংশের এই বিরাট বাড়িখানায় বুঝি এক মুহূর্তের জন্যে একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল! জগদীশবাবু ভাবলেন, মধ্যবিত্তের ঘর থেকে বেলারানীকে বিয়ে করে আনা উচিত হয় নি। একটা প্রাচীন সভ্যতার পরমায়ু যেন হঠাৎ আজ বেলা দশটার সময় নাগ পরিবারের বড় বৌ শেষ করে দিতে চায়। তিনি একটু অনুশোচনার সুরেই বললেন, "হরিশ মুখার্জি রোডের বেলারানী বোধহয় কোনদিনও বৌরানী হতে পারবে না।"

"বৌরানীরা যদি কোনদিন বেলারানীর স্তরে এসে পৌঁছুতে পারে, সেদিন বাংলা-সমাজের কৃষ্টি হবে সত্যিকারের সম্পদ।"

জগদীশবাবু ভাবলেন একটু। তারপর বললেন, "আমরা তো সাধারণ থেকে পৃথক হয়ে নেই? নগদ টাকা দান করা ছাড়াও, বাংলা দেশের বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা থেকে সুরু করে আমরা প্রজার জন্যে পুকুর পর্যন্ত কেটেছি হাজার হাজার। তাদের সুখ-দুঃখের অংশ নিয়েছি আমরাও।"

বৌরানী হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, "বাবার সম্বন্ধে একটা গল্প মনে পড়ল। শুনবে?"

"বলো।" গল্প শোনার জন্যে জগদীশবাবু বিছানায় উঠে বসলেন।

বৌরানী অতীত ঘটনা স্মরণ করে বলতে লাগল, "বছর দশেক এক নাগাড়ে কলকাতায় বসবাস করবার পর, বাবার হঠাৎ মনে পড়ল পাড়া গাঁ-এর কথা। তিনি ফি বছরই পূজোর সময় আমাদের সঙ্গে নিয়ে বিক্রমপুরে আসতে লাগলেন। বাবার তখন অনেক পয়সা হয়েছে। কটা চাকর দরওয়ান, আমার জন্যে একজন মাদ্রাজী আয়া এবং রাঁধুনে বামুন ইত্যাদি নিয়ে বাবা আসতেন দেশে। আমোদ আহ্লাদ করতেন খুবই, পয়সা খরচ করতেন প্রচুর, গর্জন করতেন সবচেয়ে বেশী, যেন বারো ভুঁইয়ার একজন বিংশ শতাব্দীতে ত্রয়োদশ হয়ে বিক্রমপুরের মাটিতে পা ফেলেছেন! ঢাল তলোয়ার তাঁর সঙ্গে থাকত না বটে, কিন্তু বড় বড় দুটো পিপে থাকত।"

তারপাশা স্টেশনে আমরা স্টীমার থেকে নামতুম। আমাদের সব লটবহর নিয়ে নামতে বেশ খানিকটা দেরি হতো—স্টীমারের সারেঙ্ তাতে আপত্তি করত না। স্টীমারের ছাদের ওপর রেলিং ধরে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত আমাদের অবতরণ এবং সেই সঙ্গে অবতরণের জাঁকজমক। দু-তলা, এক-তলার যাত্রীরাও এসে ঝুঁকে দাঁড়াত রেলিং ধরে, বোধহয় ভাবত, 'নাবার সময় এরা জানিয়ে দিয়ে গেল যে কারা যাচ্ছে!'

স্টীমার ঘাটে আমাদের জন্যে আগে থেকেই দশ বারোটা নৌকো বাঁধা থাকত। তারপাশা থেকে আমাদের পাড়া গাঁ প্রায় ছ মাইলের রাস্তা। লিস্ট মিলিয়ে জিনিসপত্র সব নৌকোতে তোলা হলে পর বাবা জিজ্ঞাসা করতেন, 'পিপে দুটো উঠেছে তো?'

'জী হ্যাঁ।' জবাব দিত দরওয়ান চন্দন সিং।

একটু দূরেই লৌহজঙ্গের বাজার। বেশ বড় বাজার। ধনী মহাজনরা এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করেন। পাইকারী ব্যবসার বড় কেন্দ্রস্থল লৌহজঙ্গের বাজার। মুহুরী বাবুকে নিয়ে বাবা চলে যেতেন মহাজনদের গদীতে। ঘণ্টা খানেক পরে তিনি ফিরে আসতেন সওদা কিনে। জীবন্ত সওদা। তিনটে নৌকো ভর্তি হয়ে গোটা পঞ্চাশ পাঁঠাও চলতো আমাদের

পিছু পিছু। বাবা বলতেন, "এমন তাজা পাঁঠা আর এতগুলো তাজা পাঁঠা আমাদের গাঁয়ে পাওয়া যেত না।"

পাঁঠার দিকে মা কোনদিনই দৃষ্টি দিতেন না। তিনি ছেলেবেলা থেকেই মাংস খেতেন না। উপরন্তু, পাঁঠার নৌকো তিনটে একটু বেশি পেছনে না থাকলে তিনি গন্ধ পেতেন। সারা রাস্তাটা মা নাকে কাপড় দিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন—শাক্ত হরিলাল বসুর পাশেই। মাকে দেখে আমার যেন মনে হতো যে, মা বোধহয় বাবার গা থেকেও কাঁচা মাংসের গন্ধ পেতেন। আমার বিশ্বাস, সুযোগ পেলে তিনি পালিয়ে যেতেন বাবার নৌকো থেকে। পালিয়ে যেতেন মাংসাশী মানব সমাজের নিকটতম সান্নিধ্য থেকে। প্রকৃতি-গর্ভের বোবা শক্তির রক্তমাখা জিভ তাঁকে কোনদিনও আকর্ষণ করে নি।

নৌকোতে বসেই বাবা হয়তো কখনো কখনো বলতেন, 'ভারতবর্ষের সভ্যতায় পাঁঠার মাংস অস্পৃশ্য নয়। ছায়া মাড়ানো তো দূরের কথা, খেলেও বামুনদের জাত যায় না।'

মা বলতেন, 'খেতে ভাল লাগলে সব কিছুই খাওয়া যায়। কিন্তু তোমার এই খাওয়ার সমারোহের মধ্যে কেমন একটা বর্বরতার গন্ধ আছে। পাঁঠার গন্ধ হয়তো আমায় এতটা উৎপীড়িত করত না, কিন্তু বর্বরতার গন্ধ কাপড় ভেদ করে নাকে আমার ঢুকে পড়ছে। দেশের লোকেরা সব কি মনে করবে বলো তো?'

'কি আর মনে করবে, পেট ভরে খেতে পেলে ভট্‌চাজ বামুনরাও কিছু মনে করবে না।'

'তবুও করবে। ঐ নৌকো তিনটেকে দেখে গাঁয়ের লোকেরা মনে করবে যে, রাজধানী থেকে তুমি কিছুই আনতে পারো নি, কেবল তিন-নৌকো অসভ্যতা ছাড়া।'

'মহাষ্টমী আর কালীপুজোর দিন অন্তত ওরা তা মনে করবে না।'

অষ্টমী পুজোর দিন মা বাবাকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কত লোক খাবে আজ?'

বাবা জবাব দিতেন, 'প্রসাদ পাবে গাঁয়ের সব হিন্দুরাই।'

'ছুটো পিপেই খুলবে নাকি আজ ?'

'খুললে ক্ষতি কি ? আমি তো ধর্মের বাইরে যাই নি। তা ছাড়া, বছরে একবার দেশে আসি, কেন আসি জানো ?'

'না।'

'আসি, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। দেশের কেউ যেন মনে না করে যে, আমি শহুরে হয়ে গেছি। বছরের এই কটা দিন অন্তত কাটে আমার ওদের সঙ্গে মিলেমিশে।'

"মা কি করলেন জানো ?"

"না।" বললেন জগদীশবাবু।

"তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন, বাবা চলে যাওয়ার পরেও।"

"কেন ?" জিজ্ঞাসা করলেন জগদীশবাবু।

"ছু-পিপে মদ আর গোটা পঞ্চাশ পাঁঠা দিয়ে বাবা গাঁয়ের লোকেদের সুখ-দুঃখের অংশ নিতেন বলে।"

জগদীশবাবু বিছানা ছেড়ে উঠলেন। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। চা খাওয়ার সময় অতিবাহিত হল। বিছানায় শুয়ে প্রথমে তিনি এক গেলাস ছুধ খান। বেশ বড় গেলাস। তারপর চানঘর থেকে ঘুরে এসে চা এবং অন্যান্য খাবার খেতে বসেন। খাবার সময় বৌরানীকে উপস্থিত থাকতে হয় না। উপস্থিত থাকলে, জগদীশবাবুর একটু অসুবিধেই হয়। রমাকান্ত এসে এরই মধ্যে বিছানার পাশে ছোট টেবিলটার ওপর ছুধ রেখে গেছে।

শয্যা ত্যাগ করার পর জগদীশবাবু বললেন, "তা হলে গানের আসরে আজ আসছ তো ? জগবন্ধুকে আমি বলেছি, তুমি এই প্রথম তার গান শুনবে।" তিনি পা বাড়ালেন চানঘরের দিকে। বৌরানী বললে, "ছুধটা খেয়ে যাও।"

"না, থাক।" হাত দিয়ে জগদীশবাবু গেলাসটা একটু সরিয়ে দিতে গেলেন। ধাক্কা লেগে গরম ছুধটা পড়ে গেল মেঝের কার্পেটের ওপর। বৌরানী বুঝল, জগদীশবাবু ইচ্ছে করেই ছুধটা ফেলে দিয়ে গেলেন। সম্ভবত তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কার্পেটের দিকে চেয়ে বসে রইল বৌরানী। বিলেতী কার্পেটের বুকে দুধটা মিলিয়ে যেতে এক মুহূর্তও লাগল না। উপনিবেশের বুকের দুধ নিঙড়ে নিতে বিলেতী হাতের দুটো শতাব্দীও লাগে নি! জগদীশ-বাবুর হাতের সঙ্গে বিলেতী হাতের কত তফাৎ, ভাবল বৌরানী।

সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ফিরে চলল জেননামহলের দিকে। লম্বা বারান্দা। হরিশ মুখার্জি রোডের দুখানা ঘর পাশাপাশি ফেলে রাখা যায় বারান্দাটার প্রস্থের মধ্যে। বৌরানী দাঁড়াল একটু। সামনে বুড়ী গঙ্গা। বর্ষার জলে নদীর বুক ফুলে উঠেছে। বছরের এই সময়টায় একে আর বুড়ী বলা চলে না। এদেশের লোক কেন যে এই নদীটাকে বুড়ী গঙ্গা বলে, বৌরানী তা আজো জানে না। হয়তো, যৌবনের প্রতি কারু শ্রদ্ধা নেই। বাংলার সমাজ-সাম্রাজ্যে যৌবন বুঝি কোনদিনও তার সিংহাসন পেলে না! সাদা চুলের মধ্যে আজ যেন গোটা দেশটার মহিমা জয়পাতাকার মত উড়ছে। বৌরানীর চোখে আজ কোন কিছুরই বয়স বাড়ছে না। বাড়তে দিতে চায় না বৌরানী নিজেই। বার্ধক্যের প্রতি তাঁর চরম ভীতি।

নদীর মাঝখানে চর পড়েছে। বর্ষার জল ডুবিয়ে দিতে পারে নি চরটাকে। নিচে থেকেই মাটির স্তর ক্রমে ক্রমে শক্ত হয়ে উঠেছে। চরের ওপরে ঘাস গজিয়েছে অনেক। চাষীরা তাদের গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে বসে আছে চুপ করে। বৌরানী বারান্দা থেকে সবই দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। নদীর ওপার থেকে অনেকগুলো নৌকো আসছিল এদিকে। রথের মেলা বসবে সদরঘাটে। এখন থেকেই সব ক্রেতা বিক্রেতার ভিড় জমছে।

বৌরানীর মনে পড়ল মালবিকার কথা। কলেজ পর্যন্ত সে মালবিকার সঙ্গে লেখাপড়া করেছিল। দেবেশদার জন্যে বৌরানী পরীক্ষাটা দিয়ে উঠতে পারল না। মালবিকাও পরীক্ষা দিতে পারে নি—বাবা ওর হঠাৎ মারা গেলেন বলে। ওর বাবা কেরানীগিরি করতেন কোথায় কোন্ এক বণিক্ অফিসে। মধ্যবিত্ত পরিবার বলেই মালবিকারা কোথায় যে তলিয়ে গেল বৌরানী তা আজো জানে না। বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করতে বৌরানী নিজেই গিয়েছিল

গড়পারে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল দুতলায়। ঘরটা খালি পড়ে রয়েছে দেখল বৌরানী। তখনকার দিনে এমন ভাঙ্গা বাড়িতে কেউ বোধহয় ভাড়া দিয়ে বাস করত না। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল, কোন আসবাবপত্রও নেই। বোধহয় মালবিকার মা তাঁর তিনটি সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন বস্তি অঞ্চলে। বৌরানী এসে দাঁড়াল বাইরের বারান্দায়। আগেও সে মালবিকার সঙ্গে এই বারান্দায় বসে অনেক গল্প করে গেছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বারান্দার সঙ্গে তার কতই না তফাৎ! সেখানে দাঁড়ালে মনে হতো বারান্দাটা বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। আর এখানে দাঁড়াবার মত একটা কেউ লোকও নেই। মনে পড়ল বৌরানীর, একদিন বিকেলের দিকে সে গিয়েছিল মালবিকাদের বাড়িতে। মালবিকা চান করতে গেছে বলে সে দাঁড়াল এসে বাইরের বারান্দায়। সামনেই গড়পারের বড় রাস্তাটা পড়ে রয়েছে যেন অবসন্নভাবে। সমস্তদিন এর বুকের ওপর দিয়ে চলেছে কর্মব্যস্ত মানুষ, চলেছে গাড়ি, ঘোড়া। সন্ধ্যের দিকে কর্মব্যস্ততা কমে এসেছে বলে রাস্তাটা যেন বিশ্রাম করছিল। বৌরানী দেখল, বিহারী গয়লারা রাস্তার পাশে বসে গাই দোয়াচ্ছে। উল্টো দিকের বাড়ির বৌ জানলা দিয়ে সতর্ক ভাবে চেয়ে রয়েছে গয়লার হাতের দিকে। অসতর্ক হলেই বুঝি গয়লাটা দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে দেবে। দামের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেও এরা একটু জল না মিশিয়ে পারে না। জল মেশাবার কোন সুযোগ না থাকলেও যেন এরা চায় একটু চোখের জল মিশিয়ে দিতে। মালবিকার ছোট বোন সুকুমারী একটা গেলাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গয়লার সামনে। রাত্তিরে ঘুমোতে যাওয়ার আগে কোলের ভাইটাকে একটু দুধ খাওয়াতে হয়। কেরানী পিতা সবাইকে দুধ খাওয়াতে পারেন না।

সুকুমারী গেলাস হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। বৌরানী দেখল, গয়লাটা বালতি থেকে মেপে মেপে সবাইকে দুধ দিচ্ছে, দিচ্ছে না কেবল সুকুমারীকে। বৌরানী ব্যস্ত হয়ে এসে দাঁড়াল বারান্দার কোণায়। গয়লাটা তখন বালতিটা উপুড় করে সবটুকু দুধই ঢেলে দিয়েছে অন্য একজনের পাত্রে। সুকুমারী জিজ্ঞাসা করল, "আমার ভাই খাবে কি? সব ওদের দিয়ে দিলে কেন?"

"পইসা লিয়ে এসো খোকী—গেল মাহিনার সব রূপিয়া তো মিলে নি আমার।"

"কাল পয়সা দেবেন বাবা।" বলল সুকুমারী।

"দুধ তবে কালই মিলবে খোকী।"

হাতের চেটোয় খৈনী টিপতে টিপতে গয়লা তার গরু নিয়ে চলে গেল সার্কুলার রোডের দিকে। খালি গেলাস হাতে নিয়ে হতাশভাবে দাঁড়িয়ে রইল মালবিকার বোন সুকুমারী দত্ত। বৌরানীর যেন মনে হল, সুকুমারীর চোখ থেকে টস্ টস্ করে জলের ফোঁটা পড়ছে খালি গেলাসের মধ্যে। উল্টো-দিকের বাড়ির বৌ ততক্ষণে জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে। হয়তো এরমধ্যেই তার খোকার জন্য দুধটা সে গরমও করে ফেলল!

একটু পরেই গড়পার রোডে অন্ধকার নেমে এল। বৌরানী ভাবল, সুকুমারীর চোখের জল আজ হয়তো অন্ধকারের বুকে কোন দাগই কাটতে পারে নি, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের বুকে এ-জল চিরদিনের জন্যে দাগ রেখে গেল।

বুড়ী গঙ্গার দিকে চেয়ে বৌরানীর মনটা ভিজে এল আজ। জগদীশবাবুর সংসার দুধের প্লাবনে একাকার হয়ে গেছে, বিলেতী কার্পেটের বুকে উঠেছে দুধের ঢেউ—কিন্তু··বৌরানী নিজের বুক চেপে ছুটতে লাগল জেনানামহলের দিকে। ছুটতে লাগল হয়তো বা গড়পারের গাঢ়তম অন্ধকারের দিকেই। ক্ষমতা দিয়ে ঘেরা এই সুন্দর পৃথিবীটার প্রতি লোভ নেই বৌরানীর, ছিন্ন-কন্থা পরিহিতা বেলারানীর লোভ আজ যৌবন-সরসী তীরে ঝরণার মত ঝরে পড়ছে অনিবার্য আকাঙ্ক্ষায়। ঝরে পড়ছে লক্ষ সুকুমারীর শূন্য গেলাস পূর্ণ করে দেবার জন্যে।

বিকেলের দিকেই জল নামল। রথের দিনে প্রতি বছরই নামে। খোকার ঘুম ভেঙ্গে গেছে একটু আগেই। কপালের পটির দিকে চেয়ে সুরমা জিজ্ঞাসা করল, "ব্যথা করছে খোকা?"

মাথা নেড়ে খোকা বললে, "না।" সুরমার বিশ্বাস হল না। কপালের ওপরে প্রায় আধ ইঞ্চির মত কেটে গেছে, বেশ খানিকটা রক্তও পড়েছে,

অথচ খোকার কোন ব্যথা বেদনা নেই! অবাক হয়ে সুরমা চেয়ে রইল খোকার দিকে। একটু পরেই খোকা বলল, "আমি রথের মেলায় যাব মা। সোনার পাখী কিনব।"

"যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। তুমি যদি সোনার পাখী না কেনো, তবে যে খোদা বক্সের ঘরে উনোন জ্বলবে না।"

"কেন মা?"

"সোনার পাখী বেচে খোদা বক্স পয়সা রোজগার করে।"

"খোদা বক্স সোনার পাখী কোথা থেকে ধরে নিয়ে আসে?"

"জাপান থেকে খোকা।"

"আমিও ধরব। আমি জাপান যাব মা।" খোকা উঠে বসল। ভয় পেয়ে সুরমা বলল, "আগে বড় হয়ে নাও, এক্ষুনি কোথায় যাচ্ছ? জাপান যে এখান থেকে অনেক দূর খোকা। তা ছাড়া বাইরে এখন বৃষ্টি হচ্ছে, জল লাগলে তোমার অসুখ করবে যে।"

"অসুখ করুক, আমি তবু মেলায় যাব।"

সুরমা জোর করে খোকাকে শুইয়ে দিল মেঝের ওপর। তারপর গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, "অসুখ করলে তুমি কষ্ট পাবে।"

"কষ্ট পেলেও আমি কাঁদব না মা। তবে কেন আমায় মেলাতে নিয়ে যাবে না?"

জগবন্ধুবাবু এসে দাঁড়ালেন সুরমার সামনে। তিনি বললেন, "তবলচি আজ আর এল না বোধহয়। রাত আট-টায় আমায় যেতে হবে, বৌরানী আজ আমার গান শুনবেন প্রথম।"

সুরমা বলল, "খুবই ভাগ্যের কথা।"

"একটু সঙ্গত করে গেলে ভাল হতো।"

"তানপুরাটা এ-ঘরেই নিয়ে এস। তবলা দুটো কোথায়? খোকার পাশে বসে আমিই ঠেকা দিয়ে যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, তাই ভাল সুরমা।"

ওঘর থেকে জগবন্ধুবাবু তবলা আর তানপুরাটা নিয়ে এলেন। তানপুরায় সুর বাঁধলেন তিনি। হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে সুরমা তানপুরার সঙ্গে তার তবলা নিল মিলিয়ে। জগবন্ধুবাবু সুরু করলেন সুরের বিস্তার। সোনার পাখীর কথা ভুলে গিয়ে খোকা চেয়ে রইল বাবার দিকে! চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল মায়ের আঙ্গুলগুলো। অবাক্ হল খোকা।

রাত আটটায় জগদীশবাবুর মস্তবড় হল্-ঘরটায় গানের আসর বসল। ঘরের একদিকে দুখানা চেয়ার রয়েছে। সাজানো হয়েছে পাশাপাশি। সামনে একটা টিপয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজ সাহেব বসেছেন সেখানে মেমসাহেবকে নিয়ে। টিপয়ের ওপর রয়েছে মদের গেলাস। বাকী মেঝেটা জুড়ে ফরাস পাতা হয়েছে। ঘরের একদিকে চিক্ টাঙানো ছিল। মেয়েরা বসেছে সব চিকের ও-পাশে। বৌরানীও আজ সেখানে উপস্থিত আছে।

তবলায় চাঁটি মারল মুনীর খাঁ। সমবেত সমঝদারদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সমঝদার নন, অতএব তিনি গেলাসে চুমুক মারলেন একটা। মেমসাহেব তাঁর কানের ওপর রুমালটা একবার বুলিয়ে নিলেন। তাঁর কানের পর্দায় তবলার ধ্বনি হয়তো বা আঘাত দিয়ে থাকবে।

বড় আসরে গান করবার সুযোগ জগবন্ধুবাবুর এই প্রথম নয়। গত পাঁচ বছরে তিনি জগদীশবাবুর দয়ায় বহু বড় বড় আসর মাতিয়ে দিয়ে এসেছেন। তিনি জানেন, উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকেই তাঁর গানের শিল্প বুঝতে পারেন না। উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীত বুঝবার জন্যে সবাই এখানে আসেন নি। অনেকে এসেছেন জমিদার জগদীশ নাগের আকর্ষণে। ব্যক্তি জগদীশ নাগের আকর্ষণে নয়—জমিদার কেন্দ্রীক কৃষ্টির এটা নৈর্ব্যক্তিক স্তর। এই স্তরের সঙ্গে বাংলার সমাজ-জীবন বাঁধা রয়েছে। বাঁধা পড়েছে জগবন্ধুবাবুর সঙ্গীত। বাঁধা পড়েছেন তিনি নিজেই। জগদীশবাবুর টাকায় তাঁর সংসার চলে।

জগবন্ধুবাবু আসরের চারদিকটা একবার ভাল করে দেখলেন। চিকের দিকেও তাঁর নজর পড়ল। কিন্তু চিকের ও-দিকটার কোন বন্দোবস্তই তিনি

দেখতে পেলেন না। বৌরানী দেখতে কেমন? চেহারাটা দেখা থাকলে, হয়তো তাঁর প্রেরণার উৎস হতে পারত বৌরানী। জগবন্ধুবাবুর শিল্প ধন্য হতো বৌরানীর কানের পর্দায়।

ম্যাজিস্ট্রেটের পায়ের কাছে ফরাসের ওপর বসে ছিলেন জমিদার জগদীশ নাগ। থলথলে মাংসের ওপর গিলে-করা পাঞ্জাবিটা সেঁটে বসেনি—নৌকোর পালের মত ফুলে রয়েছে। কোঁচানো ধুতির নিচের দিকটা ছড়িয়ে রয়েছে ফরাসের অনেকটা জায়গা জুড়ে। আর একটু বেশি ছড়িয়ে পড়লে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জুতোর সঙ্গে লেগে যেতে পারত। মনে হয়, লাগবার জন্যেই যেন ধুতিটা প্রার্থনা করছে দেড়শ বছর ধরে তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে। জগদীশবাবু হাত তুলে ইশারা করলেন গান সুরু করবার জন্যে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতে সময় অতি কম। হাত-ঘড়িতে তিনি এরই মধ্যে দু-একবার সময় দেখে নিয়েছেন। ইংরেজী-সভ্যতার আধুনিক ঘড়ি কখনো শিল্পের পিছু পিছু চলে না—শিল্প চলে ঘড়ির পিছু পিছু।

জগবন্ধুবাবু তান ছাড়লেন। তান ছড়িয়ে পড়ল সারা হল-ঘরটায়। জগবন্ধুবাবুর মনে হল গলার মধ্যে কোথায় যেন সুরটা তাঁর একটা হোঁচট খেল। তিনি সুরটা তাঁর বিস্তার করতে পারছেন বটে, কিন্তু সুরের মধ্যে গভীরতা আসছে না। পৌঁছতে পারছে না সমঝদারদের গণ্ডী কাটিয়ে সাধারণের মনের রাজ্যে। সুর যেন তাঁর কয়েদীর মত আবদ্ধ হয়ে আছে জগদীশবাবুর ক্ষমতা-কারাগারে। তাঁর শিল্প কিছুতেই যেন শিল্প হতে পারছে না জগদীশবাবুকে বাদ দিয়ে।

চিকের ফাঁক দিয়ে বৌরানী চেয়েছিল মেমসাহেবের দিকে। মিলিয়ে দেখছিল নিজের সঙ্গে। কত বয়স হবে মেমসাহেবের? ত্রিশ? বৌরানী এখনো বাইশ পেরোয় নি! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বৌরানী। লম্বা হাতের ব্লাউজ আর এগারো হাত শাড়ী দিয়ে দেহটাকে ঢেকে রাখতে হয়। মাথার ওপরে তুলে দিতে হয় ঘোমটা। কিন্তু কেন? নাগ বাড়ির অন্তঃপুরে কেউ আসে না, আসতে পারেও না। তবু কেন সে এমন করে নিজেকে ঢেকেঢুকে রাখে?

দেহের লজ্জা সে গোপন করে রাখছে কার কাছ থেকে? বৌরানী ভাবল, মেমসাহেবের মত কাপড়ের গজ কমিয়ে ফেললেও তাকে কেউ দেখতে পেত না। সভ্যতার চোখে বোধহয় ছানি পড়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মত চোখের দৃষ্টি তার বলিষ্ঠ নয়, নয় পরিষ্কারও। চিকের ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে বৌরানী সরিয়ে দিতে চাইল চিকের অন্তরাল। কৃত্রিম কয়েদখানাটা তাকে তিলে তিলে মারছে। মেমসাহেবের মত সে যদি স্বাধীন হতে পারতো? ভারতীয় সঙ্গীত তার কানে ঢুকছে না। স্নায়ুতন্ত্র তার অবসন্ন, বোধ হয় অবশও। হলঘরটার সভ্যতায় আজ অনেক বিষ, সাদা আর্সেনিক। পাঁচ কিংবা পাঁচ হাজার বছরের ক্রম সঞ্চয়। জগদীশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল বৌরানী। নেত্র গোলকটা যেন তার বেশ একটু লাল হয়ে উঠেছে। আর কদিন পরে, হাঁটুর গ্রন্থিগুলো উঠবে ফুলে, বাত ব্যাধির আক্রমণে তিনিও যাবেন অবশ হয়ে। শঙ্খবিষের মধ্যে মৃত্যুর অনিবার্যতা স্বাভাবিক নয়, সাদা চোখে ধরা যায় না। এ মৃত্যুর মেয়াদ বিলম্বিত, সময় সাপেক্ষ। শেষ মুহূর্তটার মধ্যে থাকে আত্মহত্যার প্রতীক্ষা। পাঁচ কিংবা পাঁচ হাজার বছরের সঞ্চিত শঙ্খবিষ আজ যেন গোটা সমাজকে সেই শেষ মুহূর্তের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে। আত্মহত্যার মুহূর্ত!

বৌরানী বেরিয়ে এল আসরের আবদ্ধ-অংশ থেকে। ভাবল, জগবন্ধু-বাবুর সঙ্গীতও আবদ্ধ। সুর তাতে আছে, সঙ্গীত নেই। বুড়ী গঙ্গার দিকে চেয়ে বৌরানী ভাবল, ব্যক্তিমনের পরাধীনতা কচি পৃথিবীটাকে জোয়ান হতে দিল না। স্ফুটন্মুখ সভ্যতার বীজ নষ্ট করে দিল সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষমতার শঙ্খবিষ। কচি পৃথিবীর ওপর পড়ে রইল কেবল কতকগুলো থলথলে মাংস, বারোদুয়ারির জমিদার জগদীশবাবুর মত।

সন্ধ্যের একটু পরেই ভজহরির জ্বর এল। বাইরে বেরুবার আগে জগ-বন্ধুবাবু তা জেনে যেতে পারেন নি। খোকা তখন ঘুমচ্ছিল। ঘুম ভাঙ্গবার পরেই খোকার মনে পড়ল সোনার পাখীর কথা। মনে পড়ল, বাবা ওকে

মেলায় নিয়ে যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কথা দিলে যে তা রাখতে হয় তেমন একটা বিশ্বাস যেন খোকা জন্ম থেকেই নিয়ে এসেছে বলে সুরমার ধারণা।

"মা, বাবা কোথায় ?" জিজ্ঞাসা করল খোকা।

"কাজ করতে গেছেন।"

"কি কাজ ?"

"গান করার কাজ।"

"আমায় তবে রথের মেলায় নিয়ে যাবে কে ?"

"তোমার যে জ্বর এসেছে খোকা। কাল নিজে আমি তোমায় সোলার পাখী কিনে দেব।"

খোকা পাশ ফিরল। সুরমা বুঝল, খোকা তার কথা বিশ্বাস করে নি। আজ যারা কথা রাখেনি, কালও তারা পারবে না কথা রাখতে। একটু পরেই খোকা আবার জিজ্ঞাসা করল, "বাবা কেন গান করে মা ?"

"টাকার জন্যে। টাকা না পেলে আমরা খেতুম কি ? সোলার পাখী কিনব কি দিয়ে ?"

সুরমা দেখল, খোকা তার প্রতিটি কথা যেন চোখ দিয়ে গিলছে। প্রতিটি কথার প্রতি ওর অদ্ভুত মনোযোগ। কেউ কোন কথা বললেই খোকা এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাদের মুখের দিকে। অতি গভীর শ্রদ্ধার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পায় সুরমা তার সন্তানের চোখের মধ্যে। যে কথা সে রাখতে পারবে না তেমন কথা বলতে ভয় পায় সুরমা।

রাতের দিকে খোকার জ্বর বাড়তে লাগল। জ্বর যত বাড়তে লাগল, খোকার প্রশ্নের জোর বাড়তে লাগল তত বেশি। সে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা কেন গান গাইতে গেল ? সোলার পাখী কিনে দেবে কে ?"

রাত তখন বোধহয় নটাই হবে। খোকা কাঁদতে সুরু করল। জগবন্ধুবাবু কথা রাখতে পারেন নি বলে, না জ্বর বেশী হওয়ার জন্যে সে কাঁদছে সুরমা তা সঠিক করে বুঝতে পারল না। বড্ড মুশকিলে পড়ল সুরমা। কোন

ফালতো কথা বলে ওকে আর ঠাণ্ডা করা চলবে না। কথার মধ্যে ছেলেটা যেন ভগবানকে দেখতে পায়। একটু এদিক-সেদিক হওয়ার উপায় নেই। ছেলেটাকে একলা ফেলে রেখে সে-ই বা কেমন করে যায় সোনার পাখী কিনতে?

বাড়ি থেকে একটু দূরে ঘোড়ার গাড়ি থামার শব্দ পেল সুরমা। ঘরখানা প্রায় রাস্তার ওপরেই। কে যেন জিজ্ঞাসাও করল, বাড়িটা পাঁচ নম্বর কি না। পাঁচ নম্বর বলেই তো সুরমার জানা ছিল। অন্তত পাঁচ বছর আগে যখন সে স্বামীর সঙ্গে এই বাড়িতে এসে উঠেছিল, তখন পাঁচ নম্বরই ছিল। পাঁচ বছরের মধ্যে নম্বরটা নিশ্চয়ই বদলে যায় নি।

সুরমা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সামনের দিকের ঘরটায়। দু-খানাই ঘর। বাইরের ঘরে লোকজন এসে বসে। সেই জন্যে সেখানে একখানা তক্তাপোশ পাতা আছে। জগবন্ধুবাবু দ্বিতীয় তক্তাপোশ আর কিনতে পারেন নি। তাই এরা স্বামী-স্ত্রী খোকাকে নিয়ে শোবার ঘরের মেঝেতেই শোয়।

নিজের পরিচয়টুকু সুরমার শ্রবণযোগ্য করে বৌরানী সোজা চলে এল জগবন্ধুবাবুর শোবার ঘরে। খোকা তখনও কাঁদছিল। খোকার হাতে এক গাদা খেলনা দিয়ে বৌরানী বললে, "এটা বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এটা সিংহ। দেখেছ কোমরটা কেমন সরু?"

বৌরানী নিজের হাত দিয়ে সিংহের কোমরটা পেঁচিয়ে ধরল। ধরে রাখল দু-এক মিনিট। সময়টা একটু অতিরিক্তভাবে বিলম্বিত হচ্ছে মনে করেই বৌরানী খোকার দিকে চেয়ে পুনরায় বললে, "এটা পাখী। কী সুন্দর দেখেছ? কোকিলের মত গান করতে পারে, আবার সিংহের মত লড়তেও পারে! বাংলা দেশের পাখী নয় এটা খোকনবাবু—এটা এসেছে জাপান থেকে।"

বৌরানী যতক্ষণ কথা বলছিল খোকা চেয়েছিল বৌরানীর দিকেই, খেলনার দিকে নয়। কথা শেষ হবার পর মার দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "খেলনাগুলো নেব মা?"

"নাও, উনি তোমার জন্যেই এনেছেন।"

খেলনা পাওয়ার পরে খোকার কান্না গেল থেমে। ইতিমধ্যে বৌরানী ঘরখানা ভাল করে দেখে নিয়েছে।

সুরমা বলল, "উনি তো আপনাদের ওখানেই গেছেন গান করতে। এদিকে সন্ধ্যের পরেই খোকার জ্বর এসেছে।"

"জ্বর? জ্বর কেন? জলে ভিজেছে বুঝি খুব?"

"চান করাবার সময় আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। কপালটায় ব্যথা পেয়েছে খুব।"

খোকার পাশে বসে পড়ল বৌরানী। হাত রাখল খোকার কপালের ওপর। তারপর বলল, "তাই তো, গা-টা যে খুবই গরম! ওঁকে আজ বেরুতে দিলেন কেন?"

চট করে জবাব দিল না সুরমা। একটু ভেবে নিয়ে বলল, "রথের দিন, বড় আসর—তা ছাড়া, জগদীশবাবুর দয়ায় আমাদের সংসার এক রকম ভালই চলে যাচ্ছে।"

"জমিদারদের দয়ায় গোটা বাংলা দেশটাই চলছে। কিন্তু আপনাদের বেশ ভাল চলে যাচ্ছে বলে মনে হয় না।"

সুরমা চুপ করে রইল। সে ভাবছিল, বৌরানীর কথাবার্তাগুলো ঠিক জমিদারবাড়ির বড় রানীর মত নয়। অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের সাধারণ বাঙালী পরিবারের যে-কেউ একজনের মত এই বৌ-টি। সুরমার খুব ভাল লাগল একে।

বৌরানী খোকার পাশে বসে ওর মাথা টিপে দিচ্ছিল। ভাল লাগছিল কোন একটা কিছু করতে। ভাল লাগছিল ছোট্ট এই ঘরখানার সব কিছু। টিপ টিপ করে এখনো বৃষ্টি পড়ছে, রথের বৃষ্টি। রাত বোধহয় দশটা বাজে। রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। জমিদার বাড়ির বড় কোচোয়ান ফজ্‌লু শেখ-কে নিয়ে এসেছে বৌরানী। আস্তাবলের সবচেয়ে জোয়ান ঘোড়াটা টেনে এনেছে গাড়িটাকে। অন্ধকার রাস্তায় ঘোড়াটা মাঝে মাঝে পা নাড়ছে। ক্ষুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ঘর থেকে। ফজ্‌লু শেখ কোচবাক্সের ওপর বসে বিড়ি টানছিল। বিড়ি টানার শব্দ এসে পৌঁছচ্ছিল বৌরানীর কান পর্যন্ত।

ফজ্‌লুর আজ বিস্ময়ের সীমা নেই! এত রাত্রে একলা বৌরানীকে নিয়ে তাকে রাস্তায় বেরুতে হবে, সে-কথা কোনদিন সে কল্পনা করে নি। এত বড় অসম্ভব কল্পনা যে সত্য হতে পারে, সে-কথা ভেবে ফজ্‌লুর বিড়ি টানায় জোর বাড়ল। বাড়ল দায়িত্ব। বাড়ল কোচোয়ানবৃত্তির মর্যাদা। সে তাই কোচবাক্সের ওপর বসে কেবল বিড়ি-ই টানছিল না, সতর্ক-নজর রাখছিল রাস্তার ওপর। কোচবাক্স থেকে নেমে ফজ্‌লু এবার রাস্তায় পায়চারি করতে লাগল। সারা জীবন ধরে নাগবাবুদের সে গাড়ি চালাচ্ছে। কোন দিনও সে তার নিজের প্রতি সম্ভ্রমশীল হয় নি। মর্যাদার ছিটেফোঁটা তাকে মহিমান্বিত করে নি এক মুহূর্তের জন্যেও। পায়চারি করতে করতে ফজ্‌লুর মনে হল, দুনিয়ার কোন মানুষই ছোট নয়, ছোট নয় রুজি রোজগারের মেহ্‌নত। এ যাবৎকাল কেউ তাকে মর্যাদা দেয় নি, দেয় নি তার মেহ্‌নত-কেও। কেন দেয় নি? ফজ্‌লু নিজের মনেই প্রশ্নটা তুললো। গাড়ি চালায় বলে তাকে কেউ মানুষ বলেই গণ্য করে নি। এই শহরটার সবাই রাত্তিরে ঘুমোবার আগে দরজা জানালা বন্ধ করবার সময় চোরডাকাতের কথা স্মরণ করে, অথচ ফজ্‌লুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা মানুষও সচেতন নয়। চোরডাকাতের চেয়েও তুচ্ছ এই ফজ্‌লু শেখ! কেন সে এত তুচ্ছ হল? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেও কাজ করতে হয় দিনের রুজি রোজগার করবার জন্যে। তবে কেন দু-জনের মেহ্‌নতের মধ্যে এত ফারাক? ল্যাম্পপোস্টের তলায় একটা রাস্তার কুকুর এসে দাঁড়াল। ফজ্‌লু হাতের চাবুকটা ওপর দিকে তুলে এগিয়ে গেল কুকুরটার দিকে। বৌরানীর এত কাছে সে একটা দুর্বল কুকুরকে পর্যন্ত দাঁড়াতে দিতে চায় না! হঠাৎ-পাওয়া মর্যাদাবোধ আজ ওকে মানুষ করে তুলেছে। জগতের প্রতিটি মানুষের প্রতি অপর মানুষের যদি কেবল এইটুকু সম্ভ্রমই থাকত, তা হলে অভিযোগ করবার মত মানুষের ভাষা যেত হারিয়ে। ফজ্‌লু ভাবল, কোন মেহ্‌নতই মর্যাদাহীন নয়। নয় উঁচু-নিচুর ফারাক ফারাক পৃথিবী। মেহ্‌নতের দুনিয়া সমতল।

মাথার চুলে আরাম পেয়ে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা

এতক্ষণ পর্যন্ত বেশ জোরেই জ্বলছিল। বৌরানী দেখল, আলোর জোর এখন ক্রমশই কমে আসছে। সুরমাও চাইল লণ্ঠনের দিকে। সে বলল, "রান্নাঘরে কেরাসিন তেলের বোতলটা আছে আমি নিয়ে আসছি।"

"না, না, কিচ্ছু দরকার নেই। আপনি বসুন।" বলল বৌরানী।

"অন্ধকার ঘরে আপনি বসবেন কি করে?" জিজ্ঞাসা করল সুরমা।

"লণ্ঠনের আলো আমার ভাল লাগে না। ভাল লাগে না ইলেকট্রিকের আলোও। এ-ঘরের আলো আলাদা।" বৌরানী শুয়ে পড়ল খোকার পাশে, "বড্ড ভাল লাগছে আপনাদের ঘরখানা, ভাল লাগছে মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দিতে।" বৌরানী তাঁর ডান হাতটা ছড়িয়ে দিল বিছানার ওপর। মেঝের খানিকটা জায়গা জুড়ে সুরমা বিছানা পেতেছে। রোজই পাতে। খোকাকে মাঝখানে রেখে স্বামী-স্ত্রী দুজন দুধারে শোয়।

বৌরানী হাত দিয়ে চকিতের মধ্যে বিছানাটা একটু টিপে দেখল। বড্ড শক্ত বলেই মনে হল তাঁর। সুরমা বৌরানীর দিকে চেয়ে বলল, "তোশকের মধ্যে মাত্র দু-সের তুলো আছে।"

"তুলো?" বৌরানী যেন তুলো কথাটা এই প্রথম শুনল, "তুলো দিয়ে কি হয়? কাঁড়ি কাঁড়ি তুলো পড়ে রয়েছে নাগবাড়ির এ-ঘরে সে-ঘরে। তুলো বেশি দিলেই বিছানা ভাল হয় না, হয়তো নরম হয়।"

বৌরানী পাশ ফিরল। সরে গেল খোকার কাছ থেকে। গড়িয়ে এসে পড়ল প্রায় তোশকের কিনারা পর্যন্ত। সুরমা কেবল বিস্মিতই হচ্ছে না, সে বিপর্যয়ের সংকেত দেখতে পেল খাটো তোশকের কিনারায়। সুরমা বলল, "তোশকটা বড্ড ছোট। উনি তো গোটা রাতটা মেঝের ওপরই শুয়ে কাটান।"

"যদি ঠাণ্ডা লাগে?" জিজ্ঞাসা করল বৌরানী।

"উনি বলেন, এক নম্বর সিমেণ্ট দিয়ে মেঝেটা তৈরি হয়েছে।"

"তা হবে, বিলেতী সিমেণ্টের গুণ অনেক। বাংলার আর্দ্রতম বায়ুও পারবে না এ-সিমেণ্টকে স্যাঁতসেঁতে করে দিতে।" বৌরানী হাতটা ফেলে রাখল বিলেতী সিমেণ্টের ওপর। রাত বেড়ে যাচ্ছে। তা বাড়ুক। বাড়ি ফিরবার

তাড়া নেই। দাসদাসীরা সবাই আজ আসরের আশেপাশে বসে গান শুনছে। সারা রাতই হয়তো শুনবে। ওস্তাদী গান ওরা বোঝে না, তবু যে-কোন রকমের একটা শ্রুতিমধুর চিৎকার বাতাসে ভাসলেই ওরা মনে মনে খুশী হয়। খুশী হয় এই জন্যে যে, বাড়িতে বড় জলসা বসলেই ওদের তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যায়। রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত সংসারের কাজ করবার জন্যে বসে-বসে ঝিমুতে হয় না। ওরা এখানে চাকরগিরি করতে আসে নি, এসেছে দাসত্ব করতে। আজ ওদের মুক্তির দিন, নিশ্বাস ফেলবার মুহূর্ত! গান শোনা বা না শোনার স্বাধীনতা আজ ওদের কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বৌরানী সিমেন্টের ঠাণ্ডা লাগাচ্ছিল গায়ে। খানিকটা ঠাণ্ডা বুকের ওপর চেপে বসলেও আজ আর সে আপত্তি করত না। সারা জীবনে তার কোন অসুখ হয় নি বলে বৌরানী সবার কাছে প্রায়ই অভিযোগ করে, মাঝে মাঝে অসুখ-বিসুখ না করলে না কি শরীরের ক্লেদ নষ্ট হয় না!

বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেছে সুরমার। এবার তার ভয় করতে লাগল। সে বুঝতে পারল, বৌরানীর আগমন এখানে খুব স্বাভাবিক সংঘটন নয়। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে। হয়তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধাও বিচিত্র নয়। সাধারণ সাংসারিক ঝগড়াঝাঁটি হলেও, বৌরানী বাড়ি থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারতেন না। খুবই একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে বলে ভাবল সুরমা। হয়তো বড় লোকের ঝগড়া দু-এক ঘণ্টার বেশি আর টিকবে না, মিটে যাবে রাত না শেষ হতেই। কিন্তু সুরমারা যদি কোন রকমে এর মধ্যে জড়িয়ে যায়, তা হলে এই ছোট সংসারটা ভেঙ্গে পড়বে খান খান হয়ে। জগদীশবাবুর পঁচাত্তরটা টাকা তিনটে প্রাণীর পরমায়ুকে ধরে রেখেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে কোন রকমে। জগদীশবাবু যদি আঘাত পান? টাকা কটা বন্ধ করে দেন? ভবিষ্যৎ-চিন্তায় সুরমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

লণ্ঠনের বাতিটা এবার নিবুনিবু করছে। সুরমা বলল, "রাত বোধ হয় এগারোটা বাজল। জগদীশবাবু আপনাকে হয়তো খুঁজবেন।"

"রাত্রিতে তিনি আমায় খোঁজেন না—" থেমে গেল বৌরানী। কথাটা যেন ঠিক মত করে বলা হল না বলে তাঁর কানে লাগল। সে তাই আবার বললে, "তিনি এখন সুরের পেছনে ছুটছেন—" উঠে বসল বৌরানী, "সারা রাত ধরে তিনি খুঁজে বেড়ান খেয়ালের নুপূর-নিক্কন।"

দাঁড়াল বৌরানী।

সুরমা বলল, "আজ তো আপনাকেই গান শোনাবার জন্যে উনি গেছেন সেখানে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে।"

আস্তাবলে ফিরবার আগ্রহ ঘোড়ার পায়ে আওয়াজ তুলল। জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে বৌরানী বলল, "এত রাত্তিরে পথে বেরুবার অভ্যাস নেই ঘোড়াটার। আমি এবার চলি।"

"এমন সময় এলেন যে,—" আরও কি বলতে যাচ্ছিল সুরমা। বাধা দিয়ে বৌরানী বলল, "আদর যত্ন করতে পারলেন না, এই তো?"

"হ্যাঁ বৌরানী।"

"বৌরানী নয়, আমার নাম বেলারানী। বয়সে বোধ হয় আমি আপনার চেয়েও ছোট। জানেন, আমি এখনও বাইশ পেরইনি? জানেন আমি এখনও—" লণ্ঠনের আলোটা গেল নিবে। বৌরানী কথাটা শেষ করতে পারলে না। সুরমা ছুটে চলে গেল রান্নাঘরে কেরাসিন তেলের বোতলটা নিয়ে আসতে।

বসবার ঘর দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন জগবন্ধুবাবু। তিনি ডাকলেন, "সুরমা, সুরমা—"

"লণ্ঠনে তেল নেই, তেল নিয়ে এলুম।" বলতে-বলতে চৌকাঠের এপাশে পা ফেলল সুরমা। সে জিজ্ঞাসা করল, "এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?"

"গান তেমন জমে নি। বৌরানী কি ভাবলেন জানি না।"

"দেশলাইটা ফেল দিকি এখানে।" আদেশ দিল সুরমা। দেশলাইটা ফেলে দিয়ে জগবন্ধুবাবু বললেন, "জহীর খাঁকে আসর ছেড়ে দিয়ে এলুম। আমার সঙ্গীত আজ শিল্পের পর্যায়ে উঠতে পারে নি সুরমা।

সঙ্গীতের মধ্যে পাই নি আমার ভগবানকে। বৌরানী নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করবেন না।"

লণ্ঠনের তলা দিয়ে দেশলাই-এর জ্বালানো কাঠিটা পলতের মুখে তুলে ধরল সুরমা। বৌরানী আধো-অন্ধকারের মধ্যেই জগবন্ধুবাবুর পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে ধাক্কা খেলো জগবন্ধুবাবুর গায়েই।

"কে? কে?" জগবন্ধুবাবু দু-হাত দিয়ে ধরে ফেললেন বৌরানীকে। বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে ধরা পড়ল বাইশ বছরের স্বাস্থ্য। ঘরের আবহাওয়ায় জমে উঠল সনাতন নৈঃশব্দ। কিন্তু এ-নৈঃশব্দের আয়ু বুদ্বুদের মত। যত তাড়াতাড়ি জন্মায়, মরে যায় তত তাড়াতাড়ি। একে ধরে রাখা যায় না, সভ্যমানুষ ধরে রাখতে চায়ও না। বৌরানীকে ধরে রেখেই জগবন্ধুবাবু চাপাকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "সুরমা, এ কে?" বাইশ বছরের স্বাস্থ্য মূক হয়ে রইল। সুরমাই লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঘোষণা করল, "বৌরানী।"

"বেলারানী।—ক্ষমা আমি আপনাকে করেছি।" এই বলে বৌরানী নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জগবন্ধুবাবু চলে যাওয়ার পর জগদীশবাবু আসর থেকে উঠে গেলেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও ওস্তাদমণ্ডলীর কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলেন তিনি। বললেন, "বড্ড অসুস্থ বোধ করছি। এ-বাড়িঘর সবই আপনাদের, যাকিছু দরকার চেয়ে নেবেন।" ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ফেলে-যাওয়া শূন্য গেলাশটার দিকে তিনি চাইলেন একবার, চাইলেন ওস্তাদ জহীর খাঁর দিকে। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি বেরিয়ে গেলেন আসর থেকে।

হল্‌ঘরের দরজা দিয়ে বাইরে আসতেই তিনি দেখলেন, কর্তার আমলের ভৃত্য বুড়ো রমাকান্ত অপেক্ষা করছে তাঁরই জন্যে। রমাকান্ত জগদীশবাবুকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। মানুষ করবার চেষ্টা করছে আজও। জাগ্রত অবস্থায় রমাকান্ত কাছে না থাকলে তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন। রমাকান্ত তা বেশ ভাল করেই জানে। জগদীশবাবু বেরিয়ে আসতেই রমাকান্ত

এসে পাশে দাঁড়াল। তিনি তাঁর হাত রাখলেন রমাকান্তের ঘাড়ে। ঘাড়ে হাত রেখে তিনি ধীরে ধীরে উঠে এলেন দোতলায়। জামা জুতো নিয়েই জগদীশবাবু গড়িয়ে পড়লেন বিছানায়। নরম বিছানা, তোশক-ভর্তি অনেক তুলো!

"রমাকান্ত, ডান-পাএর হাঁটুতে বড্ড ব্যথা, বাতে ধরল না কি?"

পা-থেকে জুতো খুলতে খুলতে রমাকান্ত বললে, "ডাক্তার দেখাও।"

"মনে হচ্ছে গাঁটগুলো সব ফুলে উঠেছে। দুপুর বেলা রোজই তো যাই পল্টনের মাঠে ঘোড়া দৌড়তে। এক ঘণ্টার ব্যায়াম কি যথেষ্ট নয়?" জিজ্ঞাসা করলেন জগদীশবাবু। কোঁচানো ধুতিটা টেনে খুলে ফেলবার জন্যে রমাকান্ত এরই মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে জগদীশবাবুর কোমরের দিকে। তাই জবাব দিতে একটু দেরি করল রমাকান্ত। কাপড়টা খুলে নিয়ে সে পা-জামাটা জগদীশবাবুর হাতের কাছে রেখে বলল, "এটা পরে ফেলো বাবু। দাও দিকি পাঞ্জাবিটা এবার আমার হাতে।"

জগদীশবাবু পাঞ্জাবিটা অতি কষ্টে নিজেই মাথা পর্যন্ত টেনে তুললেন। বাকীটা খুলল রমাকান্ত। তারপর পরা-কাপড়গুলো সব এক সঙ্গে করে সে চলে এল পাশের কামরায়, সাজিয়ে রাখল আলনার ওপর। গত পঁয়ত্রিশ বছর থেকে সে জগদীশবাবুর কাপড় চোপড় সাজিয়ে রাখছে, জন্মের একেবারে পর মুহূর্ত থেকেই। পাশের ঘরে আজ কাপড় রাখতে এসে রমাকান্তের বহু পুরোনো কথা একটা মনে পড়ল। ভাবতে লাগল সে। হঠাৎ সে চলে গেল ত্রিশ বছর পেছনে, জগদীশবাবুর বয়স তখন মাত্র পাঁচ বৎসর। পেছনে গিয়ে সে বেশীক্ষণ থাকতে পারল না, জগদীশবাবু ও-ঘর থেকে ডাকলেন, "এদিকে আয় রমাকান্ত, ও-ঘরে কি করছিস রে?"

রমাকান্ত চলে এল জগদীশবাবুর কাছে। জিজ্ঞাসা করল, "বৌরানীকে ডাকব বাবু?"

"রাত অনেক হলো, তাকে আর বিরক্ত করে লাভ কি? তা ছাড়া বাত যদি ধরেই থাকে আমায়—" কথাটা শেষ না করে জগদীশবাবু সহসা উঠে বসলেন। ঠিক উল্টো দিকে দেয়ালের গায়ে মস্তবড় একটা আয়না লাগানো

রয়েছে। অনেক টাকা দাম দিয়ে তিনি নিজেই এটা বেলজিয়াম থেকে আনিয়েছেন। এ-আয়না কোনদিনও মিথ্যে সাক্ষী দেবে না বলেই তিনি এত বেশি টাকা দাম দিয়েছেন। আজ তিনি দেখতে পেলেন যে, চোখের সাদা অংশটা সাদা বলে আর চেনা যাচ্ছে না। বড্ড বেশী রকম লাল হয়ে উঠেছে। তিনি আয়নার দিকে চেয়েই বললেন, "দু-চার পেগ-হুইস্কিতে তো লাল হওয়ার কথা নয়।"

"মদ খাওয়ার লাল এ নয় বাবু।" বলল রমাকান্ত।

"তবে?"

জবাব দিতে ইতস্তত করছিল রমাকান্ত। অথচ কোন একটা গুরুতর কথা যে সে বলতে চাইছে তা বুঝতে পারলেন জগদীশবাবু। তিনি একটু উত্তেজিত-ভাবেই পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "আমার দেহের মধ্যে কোন রহস্য আছে না কি রমাকান্ত?"

"আমার মনে হয় আছে।"

জগদীশবাবুর ভয় এল মনে। তাঁর দেহের কোন অংশই তিনি রমাকান্তের দৃষ্টি থেকে গোপন করে রাখতে পারেন নি। গোপন করা তো দূরের কথা, তাঁর দেহের খবর তাঁর নিজের চেয়ে রমাকান্তই বেশি রাখে। তাঁর ডান পা-এর বুড়ো আঙ্গুলটা যে অস্বাভাবিকভাবে সরু হয়েই জন্মেছে তা তিনি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত জানতে পারেন নি। জানিয়েছে রমাকান্তই। আজ আবার তিনি রমাকান্তের কথায় নতুন সংবাদের আভাস পেলেন। তাই আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "রহস্যটা কি রে?"

হাঁটুর ওপর ধীরে ধীরে হাত বুলতে বুলতে রমাকান্ত বলতে লাগল, "তোমার তখন বয়স মাত্র পাঁচ। গায়ের রং অনেকটা কালোর দিকেই ছিল।"

"বলিস কি, আমি কালো ছিলুম?" বেলজিয়ামে তৈরি বড় আয়নায় জগদীশবাবু নিজের চেহারাটি ভাল করে দেখলেন আবার। চামড়াটা তাঁর সাদা। ঈষৎ লালের চিহ্ন তাঁর সারা মুখে, কালোর আভাস কোথাও নেই। রমাকান্তের কথা শুনে তিনি খুবই অবাক হলেন।

"পাঁচ বছর বয়সে তোমার একবার অসুখ হয়েছিল বাবু। খুবই সামান্য অসুখ।" বলতে সুরু করল রমাকান্ত, "বড়বাবু তখন কলকাতার বাড়িতে। মা ছিলেন এখানে। ডাক্তারবাবু এলেন। দেখেশুনে ওষুধ দিয়ে গেলেন। ওষুধ কিনে নিয়ে এলুম আমি-ই। সাদা রং-এর পাউডার, কাগজে মোড়ানো ছোট ছোট পুরিয়া করা ছিল। তোমায় ওষুধ খাওয়াতেন মা নিজেই। ছ-দিনের ওষুধ ওতে ছিল। আমি লক্ষ্য করতুম, মা কখনো তোমায় আমার সামনে ওষুধ খাওয়াতেন না।"

এই পর্যন্ত বলে রমাকান্ত থামল একটু। ত্রিশ বছর আগের ঘটনা, তাই সে সঠিকভাবে স্মরণ করবার জন্যে চোখ বুঁজে ভাবতে লাগল। জগদীশবাবু ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না। রমাকান্তের হাতে একটু চাপ দিয়ে তিনি অনুরোধের স্বরে বললেন, "তারপর কি হল বল্‌না রে?"

"বলছি, দাঁড়াও বাবু। একটা কথাও বাড়িয়ে বলা চলবে না। মা বেঁচে নেই, তাই বাড়িয়ে বললে তিনি স্বর্গে বসে আমার মাথায় অভিসম্পাত ফেলবেন যে। ছ-দিন ওষুধ খাওয়ার পরে, তোমার অসুখ বোধহয় সেরেই গেল।"

"বোধহয় কেন? মনে নেই তোর?"

"মনে আমার ঠিকই আছে। কিন্তু তোমার অসুখ হয়েছিল বলে আমার গোড়া থেকেই বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস হয়নি এই জন্য যে, বড়বাবু যখন কলকাতায় থাকতেন, ঐ ডাক্তার সেন আসতেন মার কাছে। অন্দরমহলে তাঁর ছিল স্বাধীন যাওয়া-আসা। কথাবার্তা আমার সামনে কিছু হতো না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডাক্তার সেন আমায় বলতেন, খোকার জন্যে এই ওষুধটা আমার ডিসপেনসারী থেকে নিয়ে এস। ওষুধ আমি নিয়ে আসতুম। ডাক্তারবাবুকে একদিন বললুম, খোকা তো সর্বক্ষণ আমার কাছেই থাকে, কিন্তু কোন অসুখ তো তার আমি লক্ষ্য করিনি। তাছাড়া, বড়-বাবু কলকাতায় গেলেই ওর অসুখ হয়, এ-কেমন ব্যারাম ডাক্তারবাবু? আমার কথা শুনে তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি চিন্তিত হলেন

বলেই আমার আশঙ্কা বাড়ল আরও বেশি। ডাক্তারবাবু আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন যে, ব্যারাম খোকার নয়। বড় বৌরানীর। শরীরের নয়, মনের ব্যারাম। স্বর্গবাসিনীর মনের ব্যারাম জানবার জন্যে জগদীশবাবু বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সাদা পাউডারটা কি ছিল তাই বল্ তাড়াতাড়ি।"

"বলছি বাবু। বড় বৌরানীর মনের ব্যারাম সারাবার জন্যেই তো তোমায় ওষুধ খেতে হয়েছে। তুমি একটু কালো হয়ে জন্মেছ বলে তিনি বসে বসে চোখের জল ফেলতেন। কালো রং তিনি সহ্য করতে পারতেন না! তিনি পাঁচ বছর অপেক্ষা করলেন দ্বিতীয় সন্তানের জন্যে। বড় বৌরানী মাঝে মাঝে আমায় বলতেন যে, তাঁর দ্বিতীয় সন্তান হবে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মত ফরসা। একদিন ডাক্তার সেন বললেন যে, তাঁর আর সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দু-জনে মিলে পরামর্শ চলল, তোমায় কি করে ফরসা করা যায়। ফরসা করার ওষুধ দিতে লাগলেন ডাক্তার সেন। তারপর, তুমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মত সাদা হতে পারলে না বটে, কিন্তু কালো আর রইলে না। ডাক্তার সেন মজুরী পেলেন অনেক। পুরোনো পল্টনের বড় বাড়িটা তিনি কিনলেন সেই পয়সায়। অনেকদিন পর্যন্ত আমি ওষুধটার নাম জানতে পারিনি। নাম জানবার ইচ্ছে ছিল গোড়া থেকেই। কারণ—" থামল রমাকান্ত।

"কি কারণ?" জিজ্ঞাসা করলেন জগদীশবাবু।

"আমার মনে হতো জগৎ-সংসারে জোর করে কিছুই করা যায় না। যা স্বাভাবিক তাকে বদলাতে গেলে, লোকসান কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তুমিও পারোনি বাবু। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে। তুমি বিষ খেয়েছো।"

"বিষ?" বলে উঠলেন জগদীশবাবু।

"হ্যাঁ বাবু, বিষ। শঙ্খবিষ।" শেষের কথাটা রমাকান্ত বেশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল। জগদীশবাবুর মনে হল, কথাটা যেন পুরোনো পল্টনের বড় বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে তাঁর কানের পর্দায় প্রতিধ্বনি তুলেছে। ফরসা করবার

জন্যে মা তাঁকে ছেলেবেলা থেকে আর্সেনিক খাইয়েছেন। খাইয়েছেন বহু বছর ধরে। হয়তো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কালো রংটা এমনিতেই মুছে যেত। কিন্তু আজ পা-এর গ্রন্থি দু-টোই কেবল তাঁর ফুলে ওঠে নি, মেরুদণ্ডের সহজাত শক্তিও তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে প্রতি পলে পলে। স্নায়ুতন্ত্র অবশ হয়ে যাওয়ার শেষ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোন কাজই নেই।

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন জগদীশবাবু। দেয়াল ঘড়িতে সময় বয়ে যাওয়ার শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছেন। শুনতে পেয়েছেন তাঁর পূর্ব পুরুষরাও। জগদীশবাবু ভাবতে লাগলেন, আর বোধহয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থায়ী হবে না। মূলে যার বিষ ঢুকেছে, তার ভবিষ্যৎ ধরে রাখবার সাধ্য তাঁর নেই। সাধ্য নেই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরও। তিনি নিজে আজ নিঃশেষিত, তিনি অক্ষম। অক্ষমতার পাপ তিনি আরোপ করেছেন বৌরানীর দেহে। মিথ্যে বন্ধ্যাত্বের নিরর্থক সভ্যতার জলছবি তিনি ভাসিয়ে রেখেছেন বৌরানীর সামনে। জগতের কোন বন্দোবস্তই স্থায়ী হয় নি—স্থায়ী হবে না পাপপুণ্যের পুরাতন প্রথা। ক্ষমতার শেকল দিয়ে তিনি আর বৌরানীকে বেঁধে রাখবেন না। বৌরানী তার নিজের ধর্ম নিজেই সৃষ্টি করে নিক। নীতি দুর্নীতির নতুন আইন সে বেঁধে নিক তার রক্তমাংসের সংগঠন সুচিতা দিয়ে।

বাড়ির পেছন দিকের ফটকে গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল। রাত গভীর হয়েছে বলেই শব্দটা অতি সহজে ভেসে এল ঘর পর্যন্ত। আওয়াজটা শুনে জগদীশবাবু বালিশ থেকে মুখ তুললেন। তুলে দেখলেন, রমাকান্তও কান তার খাড়া করে রেখেছে। আওয়াজ থেকে দু-জনেই যেন বুঝতে পেরেছে যে, গাড়িটা এবাড়িরই আস্তাবলে ঢুকছে।

জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এত রাত্তিরে গাড়ি কোথা থেকে ফিরল ? বৌরানী কোথায় রমাকান্ত ?"

"দেখছি বাবু।" রমাকান্ত চলে গেল ঘর থেকে।

জগদীশবাবু নিজেই উঠতে পারতেন। গিয়ে দেখে আসতে পারতেন বৌরানীর নৈশ-অভিসার। কিন্তু আজ আর তাঁর নীতির নিয়ম শক্ত নয়।

দৃঢ় নয় দেহের একটা অঙ্গও। তিনি ভাবলেন, বন্ধ্যাত্ব বাঁচিয়ে রাখবার মধ্যে কোন নীতি নেই। নীতি থাকতে পারে না ভগ্ন-স্বাস্থ্যের মধ্যেও। নষ্ট-বীজের মধ্যে কোন্ নীতি দানা বাঁধবে? ফুল যখন ক্ষয়প্রাপ্ত, নীতির সার দিয়ে তাকে ধরে রাখা যাবে না। জগদীশবাবু ক্রমে ক্রমে যেন মূলের সত্যে প্রবেশ করছেন।

একটু পরেই ফিরে এল রমাকান্ত। এসে ঘোষণা করল, "বৌরানী বাইরে গিয়েছিলেন।"

"এত রাত্রে?"

"জগবন্ধুবাবুর বাড়ি থেকে ফিরছেন তিনি।"

জগদীশবাবুর জীবন থেকে লুপ্ত হল ধ্রুপদ-খেয়ালের রাগরাগিনী। সুরের বিস্তার সুরুতেই হারিয়ে গেল নষ্ট-বীজের অন্ধকারে।

তৃতীয় খণ্ড

সমস্ত রাত ভজহরির ঘুম এল না। ডব্‌সন রোডের বস্তিতে ওর ঘুমের ব্যাঘাত কোনদিনই হয় নি। মাঝে মাঝে ওর মনে হতো, নিরুদ্বেগে ঘুমোবার মত এমন ভাল জায়গা বাংলা দেশের কোথাও নেই। পাশের ঘরে জয়গোবিন্দ সারারাত ধরে কাশে। দশ নম্বরে নন্দরানী তার হাতকাটা স্বামীকে ভাত খাওয়াতে বসে রাত বারোটা অবধি স্বর চড়িয়ে গালাগালি করে। আট নম্বরের ভুজঙ্গ তার দিনের রোজগার শুঁড়ীর দোকানে রেখে এসে বাড়ি ফেরে অনেক রাত করে। বাড়ি ফিরে হঠাৎ তার মনে হয় পকেটে একটা পয়সাও নেই। বেড়া থেকে বাখারি ভেঙ্গে নিয়ে সে আধমরা বৌ-টার চামড়ার তলায় নতুন রোজগারের সন্ধান করতে থাকে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত। আধমরা বৌ-টা যা চেঁচায় তার চেয়ে বেশি চেঁচায় ভুজঙ্গ নিজেই।

চার নম্বরে থাকে সনাতন। শক্ত ছেলে সে। দাসনগরে কাপড়ের কলে সে চাকরি করে। সুতো বিভাগের ওস্তাদ কারিগর। সে ফেরে রাত আট-টা নটার মধ্যে। বস্তির সরু রাস্তায় বসে সে উনোন ধরায়। তারপর, ঘরের কোনায় উনোনটা রেখে তাতে চাপিয়ে দেয় ভাত। ভাতের মধ্যে ফেলে দেয় নানান রকমের সব্‌জি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে সনাতনের রাত দশটা-এগারোটা বাজে। এরই মধ্যে ভজহরি ফিরে আসে এবং কাপড়চোপড় ছেড়ে সে শুয়ে পড়ে খাটিয়ার ওপর। ভজহরির মনে হয়, সনাতন যেন পাশের ঘরে অপেক্ষা করে বসে থাকে ভজহরি কতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়বার মত যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে, সনাতন এসে দাঁড়ায় বেড়ার কাছে, খুব নিচু স্বরে ডাকে, "হরিভাই, ঘুমিয়ে পড়লে না কি?"

ভজহরি জবাব দেয় না। দেয় না ইচ্ছে করেই। সনাতনের সময় সে নষ্ট করতে চায় না। সে ঘুমিয়ে না পড়লে, সনাতন তার লেখাপড়া স্থুরু করতে পারে না। ভজহরি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দু একদিন লক্ষ্য করে দেখেছে যে, সনাতন বিছানার তলা থেকে কি সব বই খাতা বার করে রাত এগারোটার পরে লেখাপড়া করতে বসে। হ্যারিকেন লণ্ঠনের পলতেটাকে ছোট করে ফেলে, আলোটা যেন বেড়ার ফুটো দিয়ে ভজহরির ঘরে গিয়ে না পড়ে, সেইজন্য সনাতন সতর্ক থাকে খুব। সতর্ক থাকলেও সবটুকু আলো সে রুখতে পারে না। ভজহরির ঘরের মধ্যে এসে আলোর কণা ছড়িয়ে পড়ে। তাতেও ভজহরির ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। ছ-সাত ঘণ্টা সে গভীর ভাবেই ঘুমোয়। ডাউন মেল্‌ট্রেন থেকে মোট নামাবার জন্যে তাকে ছুটতে হয় ভোর বেলায়। ভাল করে ঘুমোবার অভ্যাস না করলে ভাল করে সে মোট বইতে পারত না।

দরজার গোড়ায় ফুল রেখে সরোজিনী চলে গেল বটে, আসলে সে রইল ভজহরির মনের আকাশে। মাধবদার মেয়েটি কি চায় ওর কাছে? বস্তিতে কত উপযুক্ত লোক রয়েছে, ওর চেয়ে অনেক বেশি টাকা উপায় করে তারা। বস্তি-সমাজে তাদের মর্যাদা ভজহরির চেয়ে অনেক বেশি। সরোজিনী কেন তাদের দরজায় গিয়ে ফুল রেখে আসে না? তা ছাড়া সনাতনের মত ভাল পাত্র মধ্যবিত্ত সমাজেও ভাল একটা দর পেতে পারে। সে কেবল স্থতো-শিল্পের বড় কারিগর নয়, লুকিয়ে লুকিয়ে লেখাপড়াও করে। এ সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন সনাতন। নতুন শ্রেণী তৈরি করছে সে। ভবিষ্যৎ সমাজের মাংস গজাবে সনাতন-মেরুদণ্ডের ওপর। ভজহরি তো ভাসমান কুটোর মত ভাসছে, তার ওপর ফুলের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে লাভ কি?

ঘুমোতে না পেরে ভজহরি বিছানা থেকে উঠে এল। দাঁড়াল এসে দরজার কাছে। ঘরের ঠিক নিচুতেই কাঁচা নর্দমাটা জলে ভরে উঠেছে। থৈ-থৈ করছে নর্দমার আর বৃষ্টির জল। ভজহরি অনুমান করে পা ফেলল রাস্তার ওপর। ঈষৎ পশ্চিম দিকে পা ফেললে সে নিশ্চয়ই পড়ে যেত নর্দমার মধ্যে। কিন্তু নর্দমার নোংরা জলও ভজহরির পা-এ আর কোন বাধা সৃষ্টি করতে

পারবে না। মাধবদার সঙ্গে তার এই মাঝরাত্রিতেই একবার দেখা করা দরকার। দরকার তাকে বুঝিয়ে বলা যে সনাতনের মত পাত্র ফসকে গেলে, সরোজিনী তাকে ক্ষমা করলেও ইতিহাস তাকে ক্ষমা করবে না। জল ঠেলে সামনের দিকে হাঁটতে গিয়ে ভজহরি নিজেই পা ফসকে পড়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারের মধ্যেই কোন রকমে ধরে ফেলল ছ-নম্বর ঘরের বেড়াটা—সনাতনের ঘরের বেড়া। ভেতর থেকে সনাতন জিজ্ঞাসা করল, "কে ? কে ?"

"আমি। আমি ভজহরি।"

"বাইরে কি করছ হরিভাই ?"

"বৃষ্টিতে ভিজছি। শরীরের উত্তাপ যেন কিছুতেই কমে না।—তুমি এত রাত অবধি আলো জেলে কি করছ সনাতনদা ?"

সনাতন দরজা খুলল। খুলতে একটু সময় লাগল তার। ভজহরির মত সে ঘরের ঐশ্বর্য খুলে রাখে না। দরজায় সে খিল লাগায়। নিজের পয়সা দিয়ে একটা লোহার ছিটকিনি সে কিনে এনে দরজায় লাগিয়েছে। ডবল সতর্কতা দিয়ে সনাতন তার ঘরখানাকে সুরক্ষিত করেছে।

লালকেল্লার চেয়ে সনাতন-কেল্লা বেশি মজবুত।

"এস, ভেতরে এস হরিভাই।" বলল সনাতন। ভেতরে গিয়ে ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, "তোমার খুব চোর-ডাকাতের ভয়, না সনাতনদা ?"

"চোর-ডাকাত ?" সনাতন মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। গভীর ভাবনা। ভজহরির মনে হল, ভাবনার সাগরে ডুবে গেল সনাতন। সাত-সমুদ্রের তলের চেয়েও এ-সাগরের তল অনেক বেশি গভীর। সনাতন যেন অষ্টম সমুদ্রের তলা থেকে তার মুক্তো খুঁজে নিয়ে আসছে। অসীম আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ভজহরি রায়।

"চোর-ডাকাতের ভয় আমার সত্যিই নেই হরিভাই।" খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছিল বলে সনাতন দরজাটা বন্ধ করে কথাটা পুনরায় উল্লেখ করল, "চোর-ডাকাতের ভয় আমার নেই। ভয় পাই ভদ্রলোক ডাকাতদের।"

"তারা কারা সনাতনদা ?"

"ঐ সব বি এ. এম এ. পাশ করা ভদ্রলোকেরা। বড়লোকদের শোষণ করতে সাহায্য করে তারা, আবার গরীবদের রাজাউজীর করে দেবে বলে ঐ সব ভদ্র-লোকেরাই মাঠ ময়দানে মাইক লাগিয়ে চেঁচায়। হরিভাই, অফিস-আদালতের চেয়ারে বসে দুনিয়া চালাচ্ছে বলে যে সব লোকগুলো গর্ব করে বেড়ায় তারা কারা জানো? ঐ সব ভদ্রলোকের দল। বাঘ-ভাল্লুকের চেয়েও এরা বেশি হিংস্র।"

এইসব বাঘ-ভাল্লুকের চেয়ে বেশি হিংস্র লোকদের মধ্যে দু-এক জনের সঙ্গে ভজহরির সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে। তাই সে সনাতনের কথায় সায় দিয়ে বললে, "তোমার কথা মিথ্যে নয় সনাতনদা। দু-একটা বাঘ-ভাল্লুকের থাবা আমার মনের মধ্যে দাগ দিয়ে দিয়েছে চিরদিনের জন্যে। এ-যুগের অফিসগুলো আফ্রিকার জঙ্গলের চেয়েও বেশি ভয়সংকুল। মাগো! কোট-প্যাণ্টালুন পরা মানুষ নয় তো বাঘ! এর চেয়ে জমিদারদের সেরেস্তাগুলো অনেক ভাল ছিল। —কিন্তু বস্তির এই ভাঙ্গা ঘরখানাতে বসে মাঝরাতে আলো জ্বালিয়ে তুমি কি করো সনাতনদা?"

"বই পড়ি।"

"বই যে পড়ো তা আমি দু-একদিন দেখতেও পেয়েছি।" সত্য গোপন করা উচিত হবে না মনে করেই কথাটা বলল ভজহরি, "কিন্তু কি বই পড়ো তা আমি দেখতে পাই নি।"

"বই দেখলে কি তুমি বুঝতে পারবে হরিভাই?" জিজ্ঞাসা করল সনাতন।

"লেখাপড়া আমি খানিকটা শিখেছিলুম সনাতন দা।—সে অনেক কাহিনী। মস্তবড় ইতিহাস।"

"তবে তুমি হাওড়া স্টেশনে মোট বয়ে বেড়াও কেন?"

"চুরি কিংবা পকেট কাটার চেয়ে কাজটা তো ভাল। অন্তত ভদ্রলোক ডাকাতদের চেয়ে খারাপ নয়। অফিসেও আমায় বসতে হয় না, চেঁচাতে হয় না ময়দানে গিয়েও। সনাতনদা, মেহ্‌নতের মধ্যে কোন ছোটবড় নেই।"

"নেই? তবে সমাজে এত শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে কেন?"

"রয়েছে এই জন্যে যে, মানুষ যখনই তার মেহ্‌নতকে ব্যবসার পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে যায়, তখনই তার লক্ষ্য থাকে সবচেয়ে বেশি মূল্য পাওয়ার। মূল্যের কম বেশির ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন শ্রেণী। কিন্তু সনাতনদা, তুমি একটা কথা ভেবে দেখেছ কি?"

"কি কথা হরিভাই?"

"পুরো মানুষটাকে আমরা যদি কেবল টাকা-পয়সার আইন দিয়ে বেঁধে রাখি তা হলে মানুষের সমস্যা কোনদিনই মিটবে না? মেহ্‌নত আমার কাছে ভগবান। তাকে কেবল পয়সা রোজগারের অস্ত্র হিসেবে আমি ব্যবহার করি না। মানুষরা করে। তাই মেহ্‌নত-বেচা পয়সার মধ্যে হয় তারতম্য। সুযোগ-সুবিধে মত একই পণ্য বিক্রি হয় বিভিন্ন দরে। বেশি পয়সার সঙ্গে সঙ্গে আসে বেশি ক্ষমতা। ক্ষমতাকে যারা সঙ্ঘবদ্ধ করে ফেলতে পারে, তারাই হয় সমাজের শিরোমণি। সনাতনদা, মানুষের সমস্যা এত বেশি জটিল হয়ে উঠেছে যে, কোন বইতেই তার আর সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সেই জন্যে পড়াশুনা এক রকম ছেড়েই দিয়েছি।"

পাঁচ নম্বর ঘরের কুলীর মুখ থেকে এ-সব শুনবে বলে সনাতন কল্পনা করে নি। করা সম্ভবও ছিল না। বিছানার তলা থেকে দুখানা বই সনাতন এরই মধ্যে টেনে বার করে রেখেছিল ভজহরিকে দেবে বলে। এতগুলো কথা শুনবার পরে, সে সহসা হাতের বই দুখানা গুঁজে রাখল বালিশের তলায়। মেহ্‌নতকে যে ভগবান মনে করে, তার চোখে সমাজের শ্রেণী-বিভাগ কোনদিনও ধরা পড়বে না। পড়বে না সত্যি, কিন্তু সনাতনের যেন মনে হল তার নিজের চোখের সামনে পাঁচ নম্বর ঘরে একটা নতুন শ্রেণী তৈরি হয়েছে। সে-শ্রেণীর জনসংখ্যা আপাতত একজন। কুলী বলে তাকে আর দূরে ঠেলে দিলে চলবে না। ভজহরি যেন একাই একটা আলাদা শ্রেণী। একদিকে নদীর আঘাতে মাটির বুক ক্ষয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে আবার জন্ম নিচ্ছে নতুন মাটি। ভজহরি বলল, "কাল আর আমি কাজে যাব না। বই দুখানা দাও, আমি পড়ে দেখব।"

"কাজে যাবে না কেন ?"

"শরীরটা আমার ভাল নেই।"

বই দুখানা হাতে নিয়েই ভজহরি বেরিয়ে এল সনাতনের ঘর থেকে। বেরিয়ে এসে ভাবল, এত রাত্তিরে মাধবদাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। আজ রাতের মত সরোজিনীর ভবিষ্যৎ-ভাবনা মুলতবী থাক। ঘুমিয়ে থাক সরোজিনী।

নর্দমার জল ডব্‌সন রোডের দিকে গড়িয়ে চলেছে হুড়হুড় করে। বৃষ্টির বেগ এসেছে কমে। রাস্তা ও নর্দমার জলের মাথা গেছে উঁচু-নিচু হয়ে। ঢালু রাস্তা পেয়ে এখানকার জল তাই চলেছে গড়িয়ে বড় নর্দমার দিকে। যাওয়া দরকার, ভাবল ভজহরি। ভোর না হতেই সরোজিনীকে উঠতে হয়। মাধবদা নটার মধ্যেই ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে অফিসের দিকে। ঘুমের ঘোর চোখে লেগে থাকে সরোজিনীর। গত রাত্রের সাজানো উনোনটা সে তুলে নিয়ে আসে রাস্তার ওপর। তাতে আগুন দেয় সেখানে বসেই। উনোনটা ধরে উঠবার আগেই চাল ধুয়ে ফেলে সরোজিনী। রাতের মধ্যে রাস্তা ও নর্দমার জল নেমে না গেলে, ভোরের দিকে সরোজিনীর কষ্টের আর সীমা থাকবে না। সরোজিনীর কষ্ট হবে মনে করেই যেন ভজহরি হাঁটতে হাঁটতে এসে উপস্থিত হল চোদ্দ নম্বরের সামনে।

ভজহরি দেখল, রেলগাড়ির মত এখানেও আপ-ডাউন আছে। চোদ্দ নম্বরের কাছে জলের গভীরতা অনেক কম। নম্বর যত বাড়ছে, জল কমে আসছে তত বেশি। সরোজিনীদের ঘরের সামনে জলের লেভেল ভজহরির হাঁটুর ঠিক ছ-ইঞ্চি নিচু পর্যন্ত নেমে গেল। ওখানে দাঁড়িয়েই সে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে জলটাকে জোর করে নামিয়ে দিতে লাগল ডাউনের দিকে। সনাতনের ঘরের সামনে দিয়ে এ-জল বেরিয়ে যাবে বস্তি-সীমানার বাইরে।

সরোজিনী ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে মাধবও। উপস্থিত-মুহূর্তে পৃথিবীর যে-অংশটায় মাঝরাত, সেখানে সম্ভবত কেউ আর জেগে নেই। পা দিয়ে জল

ঠেলতে ঠেলতে ভজহরি ভাবলে, যে-সব কোটি কোটি লোক এখন নিরুদ্বেগে ঘুমোচ্ছে, তাদের নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে একটা আলাদা জগৎ। সে-জগৎ থেকে লুপ্ত হয়েছে শ্রেণী-চেতনা, লুপ্ত হয়েছে তুচ্ছতম অভিযোগও। সমকালীন সাম্য মুছে দিয়েছে ছোটবড়র ব্যবধান-চিহ্ন।

জল ঠেলার শব্দে সরোজিনীর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া খুবই সম্ভব। ভজহরির ধারণা, সরোজিনীরা ঘুমোয় না। বেলুন যেমন হাল্কা হাওয়ায় ভাসে, এরাও তেমনি চোখ বুঁজে পড়ে থাকে আচ্ছন্ন ভাবে। আচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। গভীর ঘুম মানুষকে স্বাস্থ্য দেয়—শূন্য পেটেও স্বস্তি আনে।

ভজহরির পা-এর শব্দে ব্যাঙগুলো এদিক-সেদিকে লাফিয়ে পড়তে লাগল। শব্দ-সংখ্যা বাড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। সে ফিরে চলল নিজের ঘরের দিকে। সরোজিনীর বিয়ের প্রস্তাব সে কাল মাধবদার কাছে দিনের বেলায়ই উত্থাপন করবে। সরোজিনীকে বুঝিয়ে দেবে যে, এখানে সনাতনের চেয়ে বড় পাত্র আর কেউ নেই। বেলফুলের নৈবেদ্য ছ-নম্বরের চৌকাঠ গ্রহণ করবে সর্বান্তকরণে।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল ভজহরি। ঘুম আসছে না। নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে আজ। পৃথিবীর ঘুমোনো অংশটায় সেই কি কেবল একা জেগে আছে? জেগে আছে সনাতনও।

বেড়ার ফুটো দিয়ে কুচি কুচি আলোর অস্তিত্ব দেখতে পেল ভজহরি। সনাতন সরোজিনীর কথা ভাবছিল না, সে ভাবছিল মানব সমাজের ভবিষ্যৎ। কেরাসিন তেল খরচ করে সে জীবন ও জগতের সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছে! ছ-ইঞ্চি লম্বা পলতেটা পুড়ে পুড়ে এক ইঞ্চিতে এসে ঠেকেছে—সনাতনদার তবু প্রতিশোধ স্পৃহা কমল না। বই-এর পাতায় সে সত্য খুঁজছে বলে মনে হয় না ভজহরির। সে তার নিজের তুচ্ছ অবস্থার জন্যে প্রতিশোধের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানব সমাজের সৌভাগ্যবান অংশটাকে আঘাত করবার পরম সাধনায় মত্ত হয়ে আছে সনাতনদা। ঘুমের সঙ্গে তাই তার

ধর্মঘট চলেছে এবং চলবে, যতদিন না ভাগ্যবানের দল তার কাছে এসে মাথা নত করে।

ভোর রাত্রেই ভজহরির শীত করতে লাগল খুব। শীতকে ঠেকিয়ে রাখবার মত ব্যবস্থা ছিল না ওর। খাটিয়ার দড়ির ওপর দেহটাকে ভাসিয়ে দিয়ে তোশকটাকে গায়ে দিলে কেমন হয়? গত এক বছরের মধ্যে সে একটা লেপের যোগাড় করে উঠতে পারে নি। কেবল একটা শীতকালই পার হয়েছে ডব্‌সন রোডের বস্তিতে। ভেবেছিল, এবার শীতকাল আসবার আগে লেপ একটা সে কিনে ফেলবে। কিন্তু বর্ষাকাল শেষ না হতেই শীতের আক্রমণ সুরু হয়ে গেল। ভাগ্যবানদের ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা ওর নেই। ভজহরি তাই, বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল লম্বা লম্বা দড়িগুলোর ওপর। তোশকটা টেনে তুলে নিয়ে ফেলে রাখল নিজের পা থেকে মাথার ওপর পর্যন্ত। পিঠের চামড়ায় দড়িগুলোর ঘষা লাগছে। তা লাগুক, শীতের আক্রমণ সে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না সে জ্বরের আক্রমণ। ভোরবেলায়ই জ্বর এল খুব। বমি আসছে ঠেলে। ভজহরি চৌকাঠের ওপর বসে মুখটা সারসপাখীর ঠোঁটের মত এগিয়ে দিল নর্দমার দিকে। হড়হড় করে বমি করতে লাগল সে।

দুর্বল বোধ করছে ভজহরি। দেহের চেয়ে মনের দুর্বলতাই বেশি। মা কিংবা বাবাকে কাছে পাওয়ার জন্যে ওর একটা আগ্রহ ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। কোন-কিছুরই অভাব নেই নম্বর-লাগানো ঘরে, একটু স্নেহ-ভালবাসার অভাবের জন্যেই যেন পাঁচ নম্বর ঘরখানা আজো গৃহ হয়ে উঠতে পারল না। বাড়িওয়ালার ভাড়ার খাতায় এ কেবল সাত টাকার মুকুট পরে বসে রইল্‌ আয়ব্যয়ের সিংহাসনে। জ্বরের আক্রমণে ভজহরি এপাশে-ওপাশে হাত দুটো ছড়িয়ে দিতে লাগল ঘন ঘন। কারো সঙ্গে হাতের একটু যোগাযোগ হল না। দুনিয়ার সবচেয়ে লম্বা হাতেরও সাধ্য নেই স্নেহের বিন্দু কুড়িয়ে আনবার! জগতের অস্থায়ী তাঁবু ত্যাগ করে ওর মা-বাবা কোথায় যে সরে

পড়েছেন ভজহরি তা জানে না। অভাবের উৎপাত ওকে আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে হল না। ভজহরি ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর ঘুম।

ভোরবেলা ঘুমের চোখে রোজকার মত সরোজিনী উনোনটা রাস্তার ওপর রাখতে গিয়েই দেখতে পেল, জল এখনো শুকোয় নি। শুকোয়নি বটে, কিন্তু উনোনটা রাখতে সেখানে কোন অসুবিধে হল না। জলের লেভেল বিপদ-রেখার নিচেই রয়েছে।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে গিয়েই মুশকিলে পড়ল সরোজিনী। চালের ফুটো দিয়ে জল পড়ে পড়ে দেশলাইটা একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে, দেশলাই-এর কাঠিতে আর আগুন নেই।

ভজহরির কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নেবার উদ্দেশ্যেই সে এগুতে লাগল পাঁচ নম্বরের দিকে। রাত নটা-দশটা পর্যন্ত মোট বয়ে এসে হরিদা ঘুমিয়েছে। তাকে এত ভোরে ঘুম থেকে তোলা উচিত হবে কিনা ভাবতে গিয়ে সরোজিনী দাঁড়িয়ে রইল ভজহরির ঘরের সামনে। হঠাৎ সে দেখতে পেল, কতকগুলো রুটি তরকারির উচ্ছিষ্ট লেগে রয়েছে চৌকাঠের এ-পাশে। হোটেলের রান্না হরিদার হজম হয়নি বলে ভাবল সরোজিনী। সরোজিনীর অনেক দিনের সাধ যে, সে তাকে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়ায়। হরিদা কি মনে করবে ভেবেই সে কোনদিনও কথাটা তার কাছে প্রকাশ করতে পারে নি। তা ছাড়া বাবার মনেও নানান রকমের সন্দেহ আসা অসম্ভব নয়। বাবা কদিন আগেই নাকি সনাতনের কাছে বিয়ের একটা প্রস্তাব করেছিল। রাজী না হলেও সনাতন প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে নি। সরোজিনীর লেখাপড়ার মান কিছুটা না বাড়লে সনাতন তাকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে পারবে না। সেই জন্যে মাধবের মারফত সে সরোজিনীর কাছে ক-খানা বই পাঠিয়ে দিয়েছিল দিন-সাতেক আগে। সে সুবিধেটা সরোজিনীর পাওয়া উচিত ছিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মারফত, সেটা সে পেল সনাতনের কাছ থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং বিনা খরচে।

উপস্থিত কি করে একটা দেশলাই যোগাড় করবে সেই কথাই সে ভাবছিল। হরিদাকে যখন ঘুম থেকে তোলা উচিত হবে না, তখন ছ-নম্বরের দরজায় করাঘাত করলে কেমন হয়? কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবটার কথা স্মরণ করে সরোজিনীর লজ্জা এল মনে। লেখাপড়ার মান বাড়লেই তো সে একদিন সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে এই ছ-নম্বরে এসে উঠবে। ছ-নম্বরের দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল সনাতন। কাজে বেরুচ্ছে সে। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে?" এই বলে সনাতন দৃষ্টি ফেলল পাঁচ নম্বরের দরজার ওপর। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করা ছিল না ভজহরির। কোন দিনই থাকে না।

"উনোন ধরাবার জন্যে একটা দেশলাই খুঁজতে এসেছিলুম। বাবার দেশলাইটা জলে ভিজে গেছে।"

ভজহরির দরজার দিকেই চোখ রেখে সনাতন জিজ্ঞাসা করল, "ভজহরির কাছে পেলে না?"

"তাকে ঘুম থেকে তুললুম না।"

"ভজহরি এখনো ঘুমোচ্ছে বুঝি? তা তো ঘুমোবেই—ওর তো আর টাইম বাঁধা কাজ নয়। যারা মোট বয় তারা সারাদিনই ঘুমোতে পারে। ওদের কাজের কোন দায়িত্ব নেই।" সনাতন নিজের পকেট থেকে দেশলাই বার করে এগিয়ে ধরল সরোজিনীর দিকে। দেশলাইটা নিয়ে সরোজিনী বলল, "হরিদার বোধ হয় অসুখ-টসুখ করে থাকবে, নইলে এতক্ষণে সেও উঠে চলে যেত হাওড়া স্টেশনে। প্রথম মেল্‌ট্রেনটা বেশ সকালের দিকেই আসে।"

"কাল তো মাঝরাত অবধি ভজহরি আমার ঘরেই ছিল, কই অসুখ বলে তো আমি বুঝতে পারি নি?"

"আমি পেরেছি।" সরোজিনী আঙুলটা চৌকাঠের দিকে তুলে ধরল।

এই সময় কোথায় একটা হুইসেল বেজে উঠল। সনাতন বলল, "বড্ড দেরি হয়ে গেল! হ্যাঁ ভাল কথা, বইগুলো সব পড়ছ তো?"

"পড়ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না সব।"

"এ বর্ণ পরিচয় নয়। এর পরিচয় আলাদা। বুঝতে না পারলেও বইগুলো

তোমায় পড়তে হবে। আচ্ছা রবিবার দিন আমি-ই যাব তোমাদের চোদ্দ নম্বরে। দেশলাইটা তোমার কাছেই থাক এখন।"

উনোন ধরিয়ে ভাত চাপিয়ে দিল সরোজিনী। ভাতের মধ্যে ফেলে দিল দুটো আলু আর পটল। দিয়ে সে গেল কলতলায় মুখ ধোবার জন্যে। হাতে করে নিয়ে গেল মসুর ডালের বাটিটা। মুখ ধোয়া শেষ করে সে ডালটাও ধুয়ে ফেলবে। একটু যত্ন নিয়েই ডাল-চালটা ওকে ধুয়ে রাখতে হয়। রেশনের চালে বড্ড বেশি নোংরা থাকে, পাথরের কুচিও থাকে অনেক। আড়াই সের চালে আধপোয়া মিথ্যে ওজন চাপিয়ে দেয় ওরা। বাবার কাছে সরোজিনী শুনেছে যে, মসুর ডাল পাটনা-অঞ্চল থেকে আসে বটে, কিন্তু পাথরের কুচি আসে বড়বাজারের গুদাম থেকে। মাপে ঠকাচ্ছে বলে সরোজিনীর খুব বেশি রাগ হয় না। রাগ হয় দুপুর বেলা বসে ওকে কাঁকর আর নোংরা পরিষ্কার করতে হয় বলে। বিশ-তিরিশ মিনিটের কাজ নয়, ঘণ্টা দু-তিন লাগে ওর ঝেড়ে মুছে সব তুলে রাখতে। রেশনের চাল কিংবা বড় বাজারের ডাল কিনবার জন্যে কেবল পয়সা দিতে হয় না, দু-তিন ঘণ্টার পরিশ্রমও দিতে হয়। আট আনা সের মসুর ডাল কিংবা ছ আনা সের চালের সঙ্গে তিন ঘণ্টার পারিশ্রমিক যোগ দিলে পড়তা অনেক বেড়ে যাবে বলেই সরোজিনীর বিশ্বাস।

কলতলায় বসে সরোজিনী ভাবলে, এই জন্যেই ওর সনাতনদাকে এত ভাল লাগে। কি জন্যে যেন? কথাটা পরিষ্কার ভাবে মনে রাখবার জন্যেই সরোজিনী প্রশ্নটা উত্থাপন করল কলতলায় বসে। সনাতনদা সত্যি কথা বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে। সনাতনদা সত্যি কথা বলতে ভয় পায় না। গত রবিবারে মাধবের কাছে এসেছিল সনাতন। বিশেষ কিছু কাজ ছিল না।

"আপনি যা-ই বলেন মাধববাবু ও-সব মানুষ খেকো রুই কাতলার প্রতি আমার কোন দরদই নেই। বড়সাহেব আপনার যত বড়ই হোন না কেন, আসলে তিনি বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর।" বললে সনাতন।

"ভয়ঙ্কর ?" মাধব যেন তোতলাতে স্থরু করল গোড়া থেকেই।

"হ্যাঁ ভয়ঙ্কর। দশ পাঁচটা জমিদারদের আধিপত্য গেল, কিন্তু এই সব বাবুগুলো চেয়ারে বসে কী কাণ্ডই যে করছে—"

"এঁ্যা, কি কাণ্ড করছে যেন ?" মাধব ক্রমে ক্রমে বুঝি চৈতন্য হারাচ্ছে।

"করছে আর কি, দালালি করছে। বড়লোক আর গরীবদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করছে। ওরা বড়লোকদের হয়েও চেঁচায়, আবার সর্বহারাদের জন্যেও কাঁদে। ওরা কুমীর।"

"কুমীর ? ও, হ্যাঁ কুমীর। কিন্তু কুমীর কেন সনাতন ?" লালদিঘীর পিওন কুমীর দেখেছে বলে বিশ্বাস হল না সনাতনের। কুমীর দেখলেও কুমীরকে কাঁদতে দেখে নি মাধব। সনাতন তাই বললে, "কুমীরকে আপনি কাঁদতে দেখেছেন মাধববাবু ?"

"না, দেখি নি।" জবাব দিল মাধব, "হাসতেও দেখি নি সনাতন।"

"দেখা উচিত ছিল। লালদিঘীতে যারা হাসে, মনুমেণ্টের তলায় এসে তারাই আবার কাঁদে। ওরা ভাবছে, সর্বহারাদের খেলাচ্ছে—আমরা কিন্তু ভাবি অন্য রকম।"

"কি রকম ?" জানতে চাইল মাধব।

"ঝোপ বুঝে আমরাও কোপ মারতে পারি। আপনার বড়সাহেবও বাদ যাবে না।"

কথা শুনে মাধব ভড়কে গেল ! সনাতন যে ছুটির দিনে এমন সব মাথা কাটাকাটির কথা তুলবে তা সে ভাবতে পারে নি। যে-লোক বড়সাহেবের গর্দানে কোপ মারতে পারে, সে তো তার মেয়েকেও কেটে ফেলতে দ্বিধা করবে না। ডব্‌সন রোডের বস্তিতে সনাতনের চেয়ে ভাল পাত্র আর নেই বলেই মাধবের ধারণা ছিল, কিন্তু—। সনাতন চলে যাওয়ার পরে সরোজিনী বললে, "সত্যি কথার মধ্যে কোন কিন্তু নেই বাবা।"

"তা নেই, কিন্তু—"

"আবার কিন্তু তুমি কোথায় পেলে ?"

“পেলুম সরকারি আইন-কানুনের মধ্যে। লালদিঘীর বড় সাহেবদের কুমীর বললে আমাদের সার্ভিস রুলে আটকায়। তা বেশ, তোর নিজের যদি না আটকায়, তবে সনাতনের সঙ্গেই তোর বিয়ে আমি পাকাপাকি করে ফেলব।” সরোজিনী চুপ করে রইল।

কলকাতায় বসে মসুর ডাল ধোবার সময় শেষদিনের কথাগুলো সরোজিনীর আবার নতুন করে মনে পড়ল। সনাতনদা আর যাই হোক, সত্যি কথা বলে। ডালচালের কাঁকরগুলোকে ভগবানের অসীম আর অসংখ্য দয়া বলে মিথ্যে-বিবেচনা সনাতনদার নেই। বাবার আছে। তিনি খেতে বসে কোনদিনও কাঁকর পান না, তাই তাঁর বিবেচনা অন্য রকমের। তা ছাড়া লালদিঘীর অফিস থেকে তিনি মাইনে পান বলে কাঁকরগুলো তাঁর কাছে কোনদিনও কাঁকর বলে ধরা পড়ে না।

বেলা সাড়ে আটটার মধ্যেই মাধব ডালভাত খেয়ে অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেল। আজ একটু আগে আগেই সে রওনা হল। মাসের শেষ সপ্তাহটা মাধব হাতে অনেক সময় নিয়ে বেরোয়। ট্রাম বাসের পয়সা বাঁচাতে হয় ওকে। পায় হেঁটে অফিসে যেতে হয়। মাসের শেষের দিকে মাইনের টাকা আর থাকে না। দু-চার টাকা ধার করতে হয়। ধার পায় সে ভজহরির কাছেই। গত ছ-সাত মাসের মধ্যে ধারের অঙ্ক মাধবের বেশ মোটা হয়ে উঠেছে। শোধ দেবার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে শোধ করতে পারে নি। মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভজহরি পাঁচটা টাকা আলাদা করে রাখে মাধবকে ধার দিতে হবে বলে। মাধবের দরকারের সময় টাকাটা না দিতে পারলে যেন ভজহরির নিজের মাথায়ই আকাশ ভেঙ্গে পড়ে! সেই জন্যে সে আগে থেকেই টাকার সংস্থান পাকা করে রাখে।

মাধব বস্তি থেকে বেরিয়ে যাবার পরে, সরোজিনী কলতলায় বসেই চান করে এল। রোজই করে বলে আশপাশের ঘর থেকে কেউ আর আজকাল উঁকি দিয়ে ওকে দেখে না। তা ছাড়া কুড়ি পঁচিশ নম্বর ঘরের বাসিন্দেরা তো সরোজিনীকে বড় হতে দেখল ঐ কলটার নিচেই। মেয়েটা কি দুষ্টুই না ছিল!

পঁচিশ নম্বরের ছট্টু একটা ল্যাঙট পরে আসত কলতলায়। ধুতিটা সে প্যাকেটের মত গুছিয়ে ফেলে রাখত দাওয়ার ওপর। সরোজিনী দেখত, ঠেলাওয়ালাটা বছর ভরে ঐ একই ধুতিখানা পরছে। ফ্রক পরা সরোজিনী একদিন এসে দাঁড়াল কাপড়টার কাছে। ফ্রকের তলাটা টেনে তুলে ফেলল নাক অবধি। কাপড় থেকে গন্ধ আসছিল! লোকটা কলতলার দিকে একটু সরে যেতেই সরোজিনী কাপড়টা তার ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল জল-ভরা বালতির মধ্যে। দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ছট্টু, "ই তুম কেয়া কিয়া?" একটু দূর থেকে মুখ ভেংচে সরোজিনী জবাব দিল, "হাম্ ঠিক কিয়া। তুম্‌কো কাপ্‌ড়া সে বো আতা হ্যায়।"

রাগের ঠেলায় বুক চিতিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। সরোজিনীর যেন মনে হল বিহারের ভূমিকম্পের চেয়েও বড় কম্পন সে ঘটিয়ে এসেছে পঁচিশ নম্বরের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে।

আজ সরোজিনী বড় হয়েছে। বিপিন পাল রোডের বড়সাহেবের মেয়ের মত স্বাস্থ্য তার অটুট হয় নি বটে, কিন্তু কোন পুরুষ মানুষ অমনি করে বুক চিতিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে লজ্জাই পায় সরোজিনী। পঁচিশ নম্বরের ছট্টু কলতলায় ও:কে বড় হতে দেখল বলেই সে আর বড়-হওয়া সরোজিনীর দিকে দৃষ্টি দেয় না। মনে মনে রাগ করে সরোজিনী।

এখন আর রাগ করার সময় নেই। চান শেষ করে ধোয়া শাড়ীখানা পরে সরোজিনী চটপট চলে এল ভজহরির ঘরের দিকে। নিজের ভাত আর ডালের কড়াইটা ঢেকে রাখতে ভুলে গেল। ভুলে গেল দরজায় শেকল তুলে দিয়ে আসতে।

ভজহরির ঘরের চৌকাঠে রুটি-তরকারীর উচ্ছিষ্টগুলো আর নেই। গোটা বারো কাগ এরই মধ্যে ঠুকরে ঠুকরে সব সাফ করে ফেলেছে। একটু চিহ্ন পর্যন্ত নেই! সরোজিনীর মনে হল, বস্তি-মালিকের চৌকাঠের কুচি কুচি কাঠ পর্যন্ত ঠুকরে ঠুকরে কাগগুলো খেয়ে ফেলেছে!

দরজা খোলাই ছিল ভজহরির। ওর কোন গুপ্তধন নেই। যে-ধন পাঁচ

জনের সঙ্গে মিলেমিশে ভোগ করা যাবে না, তাকে লুকিয়ে রাখবে সে কার জন্যে ?

"হরিদা—" ডাকল সরোজিনী, "হরিদা, বেলা অনেক হয়েছে। বাবা অফিসে চলে গেছেন।"

মাধবের অফিসে-যাওয়াটা সময় নির্ধারণের নির্ভুল সঙ্কেত সরোজিনীর কাছে।

"হরিদা এত বেলা অবধি তুমি তো কোনদিনও শুয়ে থাকো না ?"

"আমার শরীরটা ভাল নেই সরোজিনী।" বলল ভজহরি।

সরোজিনী এবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। "ওমা, এ কি ?" প্রশ্নের ধাক্কায় ভজহরির মুখটা যেন ঘুরে গেল সরোজিনীর দিকে।

"তোশক গায়ে দিয়েছ কেন হরিদা ?"

"লেপ নেই বলে। শীত করছিল খুব। এখন অবশ্য গরমই লাগছে।"

সরোজিনী খাটিয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে টান দিয়ে তোশকটা সরিয়ে ফেলল। গায়ে হাত দিয়ে বললে, "ঘেমে গেছ খুবই।"

অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল ভজহরি। মার হাতের চেয়েও সরোজিনীর হাত অনেক বেশি কাছে এগিয়ে এসেছে। তোশকটা সে টান দিয়ে তুলে ফেলবে জানলে ভজহরি খানিকটা সতর্ক হতে পারত। ভজহরি একটু উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, "কি করছ ? দাঁড়াও—মানে তোশকটা তুলছ কেন, বুকে ঠাণ্ডা লাগে যদি ?" ভজহরি পাশ ফিরল।

"ঠাণ্ডা লাগা অসম্ভব নয়, কিন্তু—" ভজহরির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সরোজিনী বলল, "কিন্তু হরিদা, তোমার পিঠ যে কেটে গেছে ! কুলীদের মত তোমার পিঠের চামড়া তো শক্ত নয়। রাত্তিরে আমায় খবর দাও নি কেন ?"

"দিই নি, তার কারণ, জ্বরটা এসেছিল ভোর রাত্রের দিকেই। ভাবলুম, আর একটু পরে তো তোমায় উঠতেই হবে। তাই বিরক্ত করতে চাই নি।"

"আমি বিরক্ত হতেই চাই হরিদা।" এই বলে সরোজিনী চট করে একবার ছ-নম্বর ঘরের বেড়ার দিকে চেয়ে বলল, "সনাতনদা কাজে বেরিয়ে গেছে

ভোরবেলায়।" শেষের কথাটা ভজহরির কানে অনাবশ্যক ও অসংলগ্ন বলে মনে হল। সে তাই বললে, "সনাতনের কাজে যাওয়ার সঙ্গে আমার জ্বরের কি সম্পর্ক ?"

পিঠের তলা থেকে হাতটা টেনে নিয়ে সরোজিনী বলল, "না, সম্পর্ক কিছু নেই। সকালবেলা এসেছিলুম তোমার কাছে একটা দেশলাই চাইতে—বাবারটা ভিজে গিয়েছিল কি না। সনাতনদা তখন কাজে যাচ্ছিল। তার কাছ থেকেই চেয়ে নিলুম। তোমাকে আর বিরক্ত করি নি। তুমি বোধহয় ঘুমচ্ছিলে ?"

"নিশ্চয়ই, নইলে টের পেতুম।"

মনে মনে সরোজিনী স্বস্তি বোধ করল। আসলে, সকাল বেলার কথাবার্তা-গুলো ভজহরি শুনেছে কি না সেই সম্বন্ধেই সরোজিনী চাইছিল নিশ্চিন্ত হতে। প্রেম-প্রণয়ের কথা সে কয়নি বটে, কিন্তু তবু ……।

"হরিদা, আমি জল নিয়ে আসছি, হাত মুখ ধুয়ে নাও। কি খাবে বলো তো ? রাতের খাবার তো পেটে তোমার একরত্তিও নেই।"

"কি করে বুঝলে ?" জিজ্ঞাসা করল ভজহরি।

"বমি হয়ে সবই যে পড়ে গেছে ! উনোনে আমার অনেক আগুন, এক্ষুনি একটু চা করে নিয়ে আসি। বড়সাহেবের মেয়ে সেদিন ঠোঙায় করে চারখানা বিস্কুট পাঠিয়েছিল আমার জন্য। আমি খাই নি, রেখে দিয়েছি। বিস্কুট খেলে তো তোমার অসুখ বাড়বে না হরিদা ?"

"না, তা বোধ হয় বাড়বে না। বড়সাহেবের মেয়ে নিশ্চয়ই তোমার জন্যে ভাল বিস্কুট-ই পাঠিয়েছে। বেশি ভাল বলেই হয়তো আমার হজম হবে না সরোজিনী।"

"হজম হবে। বস্তির লোকেরা বিষ খেয়ে হজম করে হরিদা !"

"বিষ ?" চমকে উঠল ভজহরি।

"হ্যাঁ, বিষ।"

"কি বিষ সরোজিনী ? মানে, সে-বিষ দেখতে কেমন ?"

"দেখতে কেমন আমি তা কি করে বলব? এ-বিষ আবার চোখে দেখা যায় না কি হরিদা?"

"দেখা গেলেও চেনা যায় না। সাদা কিনা।"

"ওমা, এই দেখো, তুমিও আবার বই থেকে টুকে-টুকে কথা কইতে স্থরু করলে! এই জন্যেই সনাতনদার সঙ্গে দু-মিনিটের বেশি কথা কওয়া যায় না। তার মুখ দিয়ে কেবল বই-এর পাতা গলে গলে পড়ে। নাও, তুমি এবার উঠে পড়ো, হাত মুখটা ধুয়ে নাও।" এই বলে সরোজিনী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বালতি করে জল তুলতে হবে। পৌঁছে দিতে হবে হরিদার ঘরের সামনে। যোলো বছর বয়সের মধ্যে সরোজিনী এই যেন প্রথম কাজ পেল, সত্যিকারের কাজ। এতে কেবল হাত আর পা দিয়ে কাজ করবার শুষ্কতা নেই, এক বালতি জল টেনে আনবার মধ্যে রয়েছে ওর দেহ ও মনের সবটুকু প্রয়াস এবং প্রেরণা।

জলের বালতিটা পৌঁছে দিয়ে সরোজিনী বাইরে থেকেই বলে গেল, "হাত মুখ ধুয়ে নাও হরিদা, চা নিয়ে আসছি।"

ভজহরি খুবই বিস্ময় বোধ করল। কলকাতার মত জায়গায় সবাই কেবল যার যার ধনসম্পদ আগলে বসে আছে, এখানে কেউ কাউকে স্নেহ ভালবাসার অংশ পর্যন্ত দিতে চায় না! অথচ সরোজিনী আজ যা দেখাচ্ছে এবং দিচ্ছে তার ঐতিহাসিক সত্য কলকাতার কৃপণতাকে যেন নিমেষের মধ্যেই সব ধুয়ে মুছে দিল। ভজহরি বালিশের তলা থেকে ভাঁজ করা গেঞ্জিটা নিয়ে পরে ফেলল। তারপর চৌকাঠের ওপাশে গিয়ে জল দিয়ে হাত মুখ ধুতে বসল সে।

শ্রাবণের আকাশ বেলা দশটা না বাজতেই মেঘের ভারে ভারী হয়ে উঠেছে যে-কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। এক ঘণ্টা বৃষ্টি পড়লেই, বস্তিটা যেন কাগজের নৌকোর মত ভাসতে থাকে জলের ওপর। চাল দিয়ে জল পড়ে প্রায় প্রত্যেকটা ঘরেই। খাটিয়াটা এ-কোণা থেকে সে-কোণা পর্যন্ত টানাটানি করে শেষ অবধি কোন লাভই হয় না। জল পড়তে থাকে সব জায়গা দিয়েই। তবুও জল ভজহরিকে টানে। জলের প্রতি ওর অদ্ভুত আকর্ষণ। পৃথিবীটা

যদি কোনদিন জলের তলায় ডুবেও যায়, তাতেও ভজহরি আপত্তি করবে না।

সরোজিনী ঘরের দাওয়ার ওপর উঠে দেখল যে, কতকগুলো কাগ পঁচিশ নম্বরের চালে বসে পা আর ঠোঁট দিয়ে গা চুলকে চুলকে বেশ আরাম করছে! পেটগুলো বেশ ফোলা ফোলা বলে মনে হল সরোজিনীর। ঘরের দরজার দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে গোটা পাঁচেক কাগ এক সঙ্গে উড়ে চলে এল বাইরে। চৌকাঠ লাফিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ছিটকে পড়ল সরোজিনী। ভাতের হাঁড়ি আর ডালের কড়াইটা খোলা রেখে গিয়েছিল সে। দরজাটাও বন্ধ করে যায় নি। ডব্‌সন রোডের বস্তির সবগুলো কাগই আজ ডাল ভাতের মধ্যে ঠোঁট লাগিয়ে গেছে! পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে ওরা। তবুও হাঁড়িতে অনেক ভাতই ছিল। কিন্তু ভজহরির চৌকাঠে এই কাগগুলোই হয়তো একটু আগে ঠুকরে ঠুকরে উচ্ছিষ্ট খেয়ে এসেছে। রাগে সরোজিনীর চোখ মুখ দিয়ে আগুন বেরুবার উপক্রম!

সে ভাতের হাঁড়িটা দু-হাত দিয়ে আলগা করে তুলে নিয়ে এসে ফেলে রাখল কলতলায়। ছট্টুর চালের দিকে চেয়ে বলল, "নে, পেট ভরে খা এবার। তোরা একলা না পারিস, যা হাওড়া স্টেশন থেকে আরও সব কাগের দল ডেকে নিয়ে আয়।"

হাঁড়িটা কলতলায় রেখেই সরোজিনী ছুটে গেল ঘরের মধ্যে দ্বিতীয়বার। ডালের কড়াইটা নিয়ে এসে উপুড় করে ঢেলে দিল নর্দমার পাশে। তারপর পঁচিশ নম্বরের চালের দিকে চেয়ে আবার বলল, "তোদের জন্যে এবেলা আমি উপোস করলুম।"

কলতলার পাশেই ছাই জমানো ছিল। ছাই দিয়ে কড়াইটা মাজতে লাগল সরোজিনী। পরিষ্কার করবার পর সে কড়াইটাতে জল ধরল। চা-এর জন্যে গরম জল চাই। উনোনে তখনও দপদপ করে আগুন জ্বলছিল। কড়াইটা সে চাপিয়ে দিলে উনোনের উপর।

কলতলায় ফিরে এসে সে দেখলে, এবার আর কাগ নয়, কোথা থেকে খবর

পুয়ে গোটা তিন কুকুর এসে হাঁড়িতে মুখ ঢুকিয়ে ভাত গিলছে প্রাণপণে। সরোজিনী রেগে উঠল ফাটা-বোমার মত। আলগা করে হাঁড়িটা শূন্যে তুলে ছুঁড়ে মারল কলতলার সিমেণ্টের ওপর! মাটির হাঁড়ি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ভাতের দানা ছড়িয়ে পড়ল ঘরের দরজা পর্যন্ত। জিবগুলো যথাসাধ্য বিস্তার করে দিয়ে কুকুর তিনটে চেটে চেটে ভাত খেতে লাগল মনোযোগ দিয়ে।

চোখে কাপড় দিয়ে সরোজিনী কাঁদবে ভেবেছিল। কিন্তু কাঁদবারই বা সময় কই? অসুস্থ লোকটা খালিপেটে বসে আছে এক বাটি চা-এর জন্যে। দেরি করলে চলবে না। অসুস্থ লোকের পেটের খিদের চেয়ে তার নিজের খিদে বেশি হতে পারে না। একবেলা ভাত না খেলে সে মরেও যাবে না। ডব্‌সন রোডের বস্তিতে এমন অনেক লোক আছে, যারা মাসের শেষ দু-তিনটে দিন ভাত খেতে পায় না। সরোজিনী তাদের দু-চারজনকে চেনেও। সেই জন্যে সে বাবাকে না জানিয়ে দু-এক মুঠো করে প্রত্যেক দিনই চাল জমিয়ে রাখে। মাসের শেষের দিকে সে নিজেই নিয়ে যায় সেই জমানো চাল। রেখে আসে বত্রিশ নম্বরের দরজায়। বত্রিশ নম্বরে থাকে সতীশবাবু। দালালি করতে যায় ক্লাইভ স্ট্রীটে। ঘরে তার বৌ আর দুটি বাচ্চা আছে। এককালে বোধ হয় এরা ভদ্রলোকই ছিল। সরোজিনী শুনেছে, ছিল এরা বালিগঞ্জের দিকে। সে-সব বিগত দিনের ভদ্রলোকেরা আজ লুকিয়ে আছে ডব্‌সন রোডের বস্তিতে। উপোস করে মরে গেলেও, বৌ-টি কোনদিনও সরোজিনীর কাছে হাত পাতে না। অতএব হাত বাড়িয়ে সরোজিনীকেই রেখে আসতে হয় জমানো চালের ষ্টক। ভোরবেলা দরজা খুলে সতীশবাবু সামনে চাল দেখতে পেয়ে প্রথম প্রথম মা কালীর উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত, "তুমি নিজে হাতে আমাদের চাল পৌঁছে দিয়ে গেছ মা।"

দু-এক মাস পরে বৌ-টি সতীশবাবুকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এ-হাত মা কালীর নয়, সরোজিনীর। চোদ্দ নম্বরের মাধব পিওনের মেয়ে।

চমকে উঠে সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করেছে, "পিওন? পিওনের ঘরে এত চাল এল কি করে? ব্যাটা ঘুষ খায় নিশ্চয়ই।"

"কি খায় জানি না, আমাদের খাওয়াচ্ছে সরোজিনী সে-কথা ঠিক।"

বিগত দিনের ভদ্রলোকের বৌ বালিগঞ্জে বসে এত বড় কথা বলতে সাহস পেত না। ডব্‌সন রোডের বস্তিতে এসে সতীশবাবুর বৌ সরোজিনীর হাতের মর্যাদা বুঝতে পেরেছে।

বাটিতে করে চা নিয়ে এল সরোজিনী। বিপিন পাল রোডের বড়সাহেবের মেয়ের দেওয়া বিস্কুটের ঠোঙাটাও সে সঙ্গে এনেছে। ভজহরি বসেছিল খাটিয়ার ওপর। তোশকটা এরই মধ্যে সে পেতে ফেলেছিল। ভাঁজ-করা গেঞ্জি পরেছে গায়ে। অতএব বুকে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় রইল না আর।

"হরিদা, তোমার বুঝি মা-বাবা নেই?"

জবাব দেবার জন্যে ভজহরি চা-এর বাটিটা মুখ পর্যন্ত তুলে নামিয়ে ফেলল আবার। সে বলল, "না, আমার মা-বাবা কেউ নেই।"

"সংসারে মা-বাবার স্থান কেউ পূরণ করতে পারে না।—বিস্কুট ক-খানা খেয়ে নাও।" ঠোঙা থেকে সরোজিনী নিজেই বিস্কুট ক-খানা বার করল। আঙুল দিয়ে একটু চাপ দিতেই বিস্কুটগুলো কেমন ভিজে নেকড়ার মত মনে হল সরোজিনীর।

"না হরিদা, এ-বিস্কুট খেয়ে তোমার কাজ নেই। বড্ড বেশি নেতিয়ে গেছে।"

"আমার বরাতে ভাল বিস্কুট কোনদিনই জুটবে না সরোজিনী।"

"বরাত?" সরোজিনী যেন চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি বরাত বিশ্বাস করো নাকি?"

"হ্যাঁ, করি।"

"সনাতনদা করে না।" এই বলে আলোচনার ওপর উপসংহার টানল সরোজিনী।

গরম চা পেটে যাওয়ার পর ভজহরি অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল। "এক্ষুনি আসছি" বলে সরোজিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভজহরি শুয়ে পড়ল বিছানায়।

ঘুমিয়ে পড়েছিল ভজহরি। গভীর ঘুম। ঘুম থেকে তুলল এসে চন্দ্রনাথ দুবে।

"কেয়া হুয়ারে ভজুয়া ?"

"সর্দার ? তুমি ?"

বিস্মিত হল ভজহরি। বালিগঞ্জের ভদ্রলোকেরা মৃতপ্রায় প্রতিবেশীর জন্যে দোতলা থেকে এক তলায় নেমে আসবার কষ্ট স্বীকার করে না। আর সর্দার এসেছে হাওড়া স্টেশন থেকে জল কাদা ভেঙ্গে ডব্‌সন রোডের বস্তিতে! গেল বছর মাধবদা টানা পনরোটা দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বিছানায়, কিন্তু বিপিন পাল রোডের বড়সাহেব একটা লোক পাঠিয়ে খবর পর্যন্ত নেন নি। সর্দার লেখাপড়া জানে না, জানে না ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, 'প্রতিবেশীকে ভালবাস।' কিন্তু তবুও, বিংশ শতাব্দীর বড় স্টেশনে সর্দারই হচ্ছে উপযুক্ত মেষপালক, কুলী-মেষগুলোর জন্যে রয়েছে তার সীমাহীন উদ্বেগ, রয়েছে সর্তহীন ভালবাসা। সর্দারের অক্ষর-পরিচয় নেই বলে, মূল্য তার এক কানা কড়িও কমে নি। বিপিন পাল রোডের বড়সাহেবের পাশে দাঁড়ালে সর্দারের মাথা নিচু দেখাবে না। হাজার হাজার বছরের সভ্যতা-সমুদ্রের তরঙ্গবাহিত হয়ে যে-সব ধর্মগ্রন্থ মানবজীবনের তটে এসে পৌঁছল, সেগুলো সব মুখস্থ করে লাভ হল কি? ক্লাইভ স্ট্রীট আর লালদিঘীর সমুদয় জন্তু-রাজ্যে সেগুলো তো ভেসে বেড়াচ্ছে শৌখিন খাদ্যের মত? জগতের কোন গ্রন্থই লেখা হয় নি মুখস্থ করবার জন্যে, লেখা হয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলবার জন্যে। সংগঠন-কীর্তির মধ্যেই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণিত হয়। জীবনের উচ্চতম স্তরে সংগঠন-কীর্তিই হচ্ছে মানুষ ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়পতাকা। ভজহরি যেন বিছানায় শুয়েই দেখতে পেলে, সর্দার চন্দ্রনাথ দুবের হাতে আজ সেই জয়পতাকা উড়ছে!

"সর্দার, কাল রাত থেকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। খুব জ্বর এসেছিল। এখন জ্বর আর নেই।" বলল ভজহরি।

"নেই? জরুর আছে।" এই বলে সর্দার হাত রাখল ভজহরির কপালে।

"হুঁ, থোড়া থোড়া হ্যায়। ভজুয়া, দো রোজ কাম-মে মাত আও। কুছ খায়া ?"

"চা খেয়েছি সর্দার।"

"চা ? বাঙালী লোগ চা কো খানা বোলতা। ভজুয়া, চা তো পাণি হ্যায়। ইস্‌মে কোই তাগত নেই হ্যায়। তুমকো লিয়ে হাম থোড়াসে ফল লে আয়া।"

ভজহরি মেঝের দিকে চেয়ে দেখল সেখানে একটা প্যাকেট পড়ে রয়েছে। বেশ বড় প্যাকেট। সর্দার প্যাকেট-টা খুলে ফেলে বলল, "বানারসকা লেংড়া, নাগপুরকা নেবু, কাশমিরকা আপেল—ভজুয়া, ইস্টিশানমে, তামাম হিন্দুস্থানকা চিজ মিলতা হ্যায়। এই লে আপেল। আরে দেখ্ না, কাশমিরকা ছোকরী সে জেয়াদা খুবসুরত মালুম হোতী হ্যায়। হিন্দুস্থানমে কোই মরদ হ্যায় তো, পণ্ডিতজী হ্যায়।"

চোখের মণি দুটো কপালের দিকে তুলে ভজহরি বললে, "এ কি করেছ সর্দার ? এতগুলো ফল আর এত সব সেরা সেরা ফল !"

"কোই বাত নেহি ভজুয়া—কাশমির হামারা হ্যায়।" আপেলটা ভজহরির হাতে গুঁজে দিয়ে সর্দার তার লাল পাঞ্জাবির ওপরেই কোমরে গামছা বাঁধতে লাগল। গিঁট বাঁধতে বাঁধতে সে পুনরায় বলল, "কাশমির হাম ছোড়েঙ্গে নেহী—হিন্দুস্থানমে কোই মরদ হ্যায় তো মতিলালকা বেটা····· কেয়া খুবসুরত, আপেলকা শেক্‌ল দেখ্ ভজুয়া। লে খা····· "

ভজহরি দাঁত বসিয়ে দিল আপেলের মধ্যে। চিবুকের তলাটা ওর ঠেলে দিল সর্দার নিজের হাত দিয়ে, তারপর খানিকটা নাচের তালে তালে চন্দ্রনাথ দুবে সুর করে বলতে লাগল, "পণ্ডিতজী নে কহা, কাংগ্রেসকো ভোট দো।"

ভজহরির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

"রোতা কিউ ? ভুখ লাগা ? কেয়া খাও গে ? রোটি ?"

ভজহরি সর্দারের হাতটা টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর রেখে বললে,

"রোটি সে মেরা ভুখ নেই জায়েগা সর্দার।"

"তব ?"

"রোটি বানাতা আটা সে, আটা হোতা হ্যায় গম সে, গম আতা হ্যায় জমিন সে—মগর মহব্বত আতা হ্যায় দিল্‌সে। সর্দার, হিন্দুস্থানমে হাম একই মরদ দেখা হ্যায়, মতিলালকা বেটা নেহি, ছাতিলালকা পোতা নেহি, একই মরদ, ব্যস একই মরদ চন্দ্রনাথ দুবে।"

এক বাটি বার্লি নিয়ে ঘরে ঢুকল সরোজিনী।

সর্দার জিজ্ঞাসা করল, "তুম্ কোন্ হ্যায় ?"

সর্দারের মুখের দিকে চেয়ে সরোজিনীও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "তুম্ কোন্ হ্যায় ?"

"হাম হ্যায় সর্দার চন্দ্রনাথ দুবে।"

"হাম হ্যায় মাধব পিওন কা লেড়কী, মেরী নাম সরোজিনী।"

"ই হ্যায় মেরা বেটা।" এই বলে সর্দার তার হাতটা তুলে নিল ভজহরির বুকের ওপর থেকে। তারপর হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুলীর সর্দার চন্দ্রনাথ দুবে।

মাধবের মনের অবস্থা দিন দিনই ভেঙ্গে পড়ছে। লালদিঘীর অফিসে তার আর কাজ করতে ভাল লাগছে না। জীবনের বিশটা বছর কেটে গেল ঐ লাল বাড়িটার এতলা-ওতলায়। বিশ বছরের হাঁটাহাঁটি যোগ দিলে বোধহয় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা অসম্ভব হতো না। কাজের প্রতি দরদ এল না তার একটা দিনের জন্যেও। দিশী-আমলেও তাকে পরের কাজই করতে হচ্ছে। গাদা গাদা সরকারি ফাইল সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে বয়ে নিয়ে যায়, যাচ্ছে বিশ বছর থেকেই। ফাইল-বহনের কাজে মাধব কোন দিনও গৌরব বোধ করে নি। সে ভাবে, এর একটা ফাইলের মধ্যেও তার নিজের কোন উন্নতির কথা লেখা নেই। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পরে, ফাইলগুলো যেন সম্ভ্রম হারিয়েছে, হারিয়েছে সৌন্দর্যও। ইজ্জতের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে ফাইলগুলো থেকে! বড়বাজারের দালালদের মত এরা ফেঁপে উঠেছে হঠাৎ, বড্ড বেশি চিৎকার এতে শুনতে পায় মাধব। সে জানে, খালি-কলসীতে আওয়াজ অনেক বেশিই হয়।

সহসা সে বিরক্তি বোধ করতে লাগল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, চারটে বেজে মাত্র পাঁচ মিনিট। আরও পঞ্চান্ন মিনিট না কাটলে, মাধবের পা-এর শেকল আলগা হবে না। চারটের পর থেকেই প্রতিটি মিনিট মাধবের কাছে বড্ড বেশি একঘেয়ে লাগে, বড্ড বেশি লম্বা মনে হয়। হঠাৎ সে মনে মনে ভজহরির ওপর রেগে উঠল। ছোঁড়াটা খোট্টাগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে প্রতিদিন কুলীগিরি করতে যায়, অথচ সে তাতে অপমান বোধ করে না। ঘাড়ের মাংস শক্ত হলেই বাঙালী কেন মোট বইতে যাবে? বাঙালীদের ইজ্জত মেরেছে পাঁচ নম্বরের ছোঁড়াটা! চারটে বেজে দশ মিনিটের মধ্যে মাধবের বিরক্তি আরও বাড়ল। ভজহরির সেই কথাটা মনে পড়ল ওর। কি যেন কথাটা? এক গাদা ফাইলের ওপর চেপে বসে ভজহরির কথাগুলো ভাবতে লাগল মাধব। প্রতিটি কথা যেন থান ইটের মত এসে উড়ে পড়তে লাগল ওর ঘাড় আর মাথার ওপর। ছোঁড়াটা বলে কি না, মেহ্‌নত হচ্ছে ভগবান, কাজ কখনও ছোট বড় হয় না। কাজের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ নেই!! নেই? ব্যাটা করিস তো মুটেগিরি, কাজের মর্ম তুই কি বুঝবি? পুঁচকে ছোঁড়াটা ভগবানকে নিয়ে তামাসা করতে ভয় পায় না। এই ফাইলগুলো যদি ভগবান হয়, তবে আর সবাই মিলে কালীঘাট আর দক্ষিণেশ্বরে ছোটাছুটি করে কেন? নাঃ, অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। সনাতনের হাতে মেয়েটাকে তুলে দিতে পারলে, বাবা বিশ্বনাথের আশেপাশে কোথাও গিয়ে সে পড়ে থাকবে। কিন্তু সনাতন ছোঁড়াটাও যে গোল বাধিয়েছে। কোত্থেকে সব হাড়গিলের মত চটি চটি বই এনে চোদ্দ নম্বরের গর্তটাকে প্রায় বুজিয়ে ফেলবার উপক্রম করেছে সনাতন। বই পড়ে আর কতদূর এগুবি রে ছোঁড়া? সরোজিনীর গায়ে এক ছটাক মাংস বাড়াতে পারবি? পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে জোড়া লাগালে তো আর সরোজিনীর একখানা শাড়ী বাড়বে না? শাড়ী? ফুঃ! কি একটা দরকারের জন্যে মেয়েটা এক টুকরো সাদা ছিট কাপড় চাইছে, গত তিন মাস থেকে, কিন্তু······।

বড়সাহেব ঘরে বসে বেল টিপছেন। মাধব তাড়াতাড়ি ফাইলগুলো

ঘাড়ের ওপর ফেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে উপস্থিত হল বড়সাহেবের সামনে। ব্যথার ওজুহাত দেখিয়ে আজ সে ছুটি চাইবে।

"কি রে, এই কটা ফাইল আনতে দিন যে কাবার করে দিলি মাধব? রাষ্ট্র চলবে কি করে? ও কি খোঁড়াচ্ছিস কেন? পা-এ কি হল?"

"বোধ হয় বাত স্যার—"

"বাত? বাত হবে কেন? পাঁচটা বাজতে মাত্র পনরো মিনিট বাকী, আর অমনি তোর বাত? মানে, তোকে যে একবার হগ্‌ সাহেবের বাজারে যেতে হবে মাধব। ভাল ভাল ল্যাঙড়া কিনবি, বেনারসের ল্যাঙড়াই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল, কি বলিস্?

ঘাড়ের ওপরে ফাইলের গাদা নিয়েই মাধব জবাব দিল, "বাবা বিশ্বনাথের ভোগে তো কাশীর ল্যাঙড়া ছাড়া অন্য আম চলে না স্যার।"

"তা হলে তিন টাকার কাশীর ল্যাঙড়া, আর আপেল কিছু চাই। সব চেয়ে ভাল আপেল কোথায় হয় রে মাধব?"

বড়সাহেবের পিছন দিকের দেয়ালে স্বাধীন ভারতবর্ষের মস্তবড় একটা মানচিত্র টাঙানো ছিল। মাধব যেন সেই দিকে চেয়েই বললে, "আপেল··· আপেল স্যার কাশ্মীরেরই ভাল।"

"তা হলে কাশ্মিরী আপেল চাই দু-টাকার। লুকু দিদিমণির বিয়ে সব পাকাপাকি হয়ে গেছে মাধব!"

"খুব ভাল হয়েছে স্যার। মুলেন স্ট্রীটে না কি?"

"না, পাটনায়। মুলেন স্ট্রীটের ছোঁড়াটা তো বাপের টাকা ওড়ায়, কোন কাজ কর্ম করে না। কলকাতায় আর ভাল জামাই পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কেন স্যার?"

"অল্‌-ইণ্ডিয়া সার্ভিসে যেতে পারছে না। এখানকার সব চেয়ে ভাল যারা তারা সব যেন একই সাইজের, দু-শ থেকে তিন-শ টাকা মাইনের মধ্যে সবাই যেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাটনার ছেলেটি আই. এ. এস. পাশ করেছে মাধব।"

"লুকু দিদিমণি তা হলে পাটনায়ই থাকবে?"

"না, থাকবে দিল্লীতে।"

মাধব খুব খুশী হল। মুলেন স্ট্রীট থেকে দিদিমণিকে আর বিপিন পাল রোডে ফিরিয়ে আনতে হবে না। পাটনা থেকে দিল্লী আরও দূর। অতএব মাধবের সুবিধে হওয়াই স্বাভাবিক।

দশ টাকার একখানা নোট মাধবের হাতে দিয়ে বড়সাহেব বললেন, "এক পোয়া কিসমিসের দাম কত রে?"

ভারতবর্ষের মানচিত্রে দামটা লেখা নেই বলে মাধব মাথা নিচু করে চেয়ে রইল মেঝের দিকে। ভাবতে লাগল সে। অনুমানের ওপর নির্ভর করাও চলবে না। কিসমিস কেমন তাও মাধব আজ আর সঠিক করে বলতে পারবে না। কিসমিসের সের পাঁচ টাকা না পঞ্চাশ টাকা মাধব কি করে জানবে তা? সে মাথা নিচু করেই বলল, "দরটা ঠিক আমার জানা নেই স্যার।"

"বেশ, ঐ দশ টাকাই রইল তোর কাছে। আম, আপেল আর এক পোয়া কিসমিস কিনবার পর, বাকী টাকা দিয়ে আদ্দেক আদ্দেক পেস্তা বাদাম কিনে নিয়ে যাবি। মোগ্‌লাই পোলাও রাঁধতে আর কি কি লাগে রে মাধব?"

সার্ভিস-রুলে পোলাও রাঁধবার 'মেনু' লেখা থাকলে, বিশ বছর চাকরির পর মাধব সে-সব শিখে ফেলতে পারত। অতএব, বড়সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে মাধব আজ বড্ড অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল। এ-সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে, সে কেন পিওনের কাজ করবে? তাই সে জিজ্ঞাসা করল, "হেড-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বাবুকে ডাকব স্যার? নরেশবাবু তো সবই জানেন।"

"না, থাক। মুলেন স্ট্রীটের বাবুর্চিটা খুব পাকা। তাকে ডেকে নিয়ে আসব কাল। মাধব—" ডাকলেন বড়সাহেব।

টেবিলের কোণায় ফাইলগুলো রেখে মাধব বেরিয়ে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বললে, "স্যার—"

"কাল তো শনিবার, হাফ-ডে। কাল তোর ছুটি। দশটার সময় একবার হাজির দিয়ে, তারপর বিপিন পাল রোডে সোজা চলে যাবি।"

"যাব স্যার। কিন্তু মাঝে মাঝে মিনিস্টার যে ডেকে পাঠান?" দরজার সঙ্গে একরকম ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল মাধব। ফাইলগুলো ধাক্কা দিয়ে একটু সরিয়ে রাখলেন বড়সাহেব। তারপর দরজার দিকে মুখ তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মিনিস্টার? মিনিস্টার এল কোত্থেকে?"

"ওপর থেকে স্যার।" মাধব হাত তুলল সিলিং-এর দিকে।

"কোন্ মিনিস্টার?"

"আমাদের ডিপার্টমেণ্টের স্যার।"

"মিনিস্টার? ও, হাঁ মিনিস্টার। আচ্ছা তুই এবার যেতে পারিস।"

সাড়ে পাঁচটার সময় লালবাড়িটা থেকে রাস্তায় নামল মাধব। দেখে আর কেউ ওকে পিওন বলে চিনতে পারবে না। মাস শেষ হতে আর মাত্র চার দিন বাকী। ভজহরির কাছ থেকে সে বাইশ তারিখে পাঁচ টাকা ধার নিয়েছিল, তাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আনা কয়েক পয়সা পড়ে আছে পকেটে।

চিৎপুরের মোড় পেরিয়ে মাধব বৌ-বাজারের রাস্তায় এসে পড়ল। ডান দিকে একটা রেস্তরাঁ। ফুটপাত থেকেই খাবারের টেবিলগুলো সব দেখা যায়। গোটা তিন টেবিল খালি-ই পড়েছিল। মাধব ঢুকে পড়ল রেস্তরাঁয়। হঠাৎ আজ ওর খুবই খিদে লেগে উঠেছে।

পকেটের আধুলিটা বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে মাধব বলল, "এক পেয়ালা চা, আর একটা মটন কাটলেট।"

'মেন্যুর' ওপর আগেই সে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল। প্রতি পেয়ালা চা-এর দাম দু-আনা আর মটন কাটলেট ছ-আনা। অর্ডার দেবার পরে মাধবের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল অতি অকস্মাৎ। মনে পড়ল সরোজিনীর কথা। সরোজিনীর কথা মনে পড়ল বলেই মাধবের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। এখন যেন সে আধুলিটা টেবিলের ওপর ফেলে রেখে পালাতে পারলে বাঁচে! পালাতে পারছে না মাধব। ভাবছে এই বুঝি বেয়ারাটা কাটলেট আর চা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়! বাবুর্চিখানার দিকে চেয়ে সে ছটফট করতে লাগল। সারা জীবনের দারিদ্র্য ওকে এতটা বিচলিত করতে পারে নি. ঘামিয়ে তুলতে

পারে নি ওকে সরোজিনীর গায়ে মাংস হল না বলে। সাড়ে পাঁচটার সময় যে লোকটা শান্ত ও সুস্থির চিত্তে অফিস থেকে বেরিয়ে এল, সেই লোকটাই পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় জীবনের সব চেয়ে বড় সংগ্রামের মধ্যে আটকে পড়ল সকরুণ সহায়হীন ভাবে। মুহূর্তের সংগ্রামই যেন মাধবকে আজ ভেঙ্গে চৌচির করে দিচ্ছে!

কাটলেটের মধ্যে দাঁত বসাতে গিয়ে মাধবের যেন মনে হল, সে তার নিজের মেয়ের গায়ে দাঁত বসাচ্ছে! অসহায়ভাবে মাধব চাইল ফুটপাতের দিকে। একটা হিলম্যান গাড়ি ট্রামের ও-পাশে এসে হঠাৎ বুঝি আটকে গেল। উল্টোদিক থেকে একটা রিক্সা এসে রাস্তা আটকে দিয়েছে। বড়সাহেবের হিলম্যান নয় তো? কাটলেটে দাঁতে বসাতে দেরি করছে মাধব পিওন। মুহূর্তের মুক্তি যেন মাধবকে তুলে নিয়ে এল মহাপুণ্যের অমৃতলোকে। মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে এখনও সে কাটলেটে দাঁত বসায় নি! হিলম্যান গাড়িটার হর্ন বাজতে লাগল ঘনঘন। বড়সাহেবের গাড়ির হর্নের মতই মনে হচ্ছে। মাধব সহসা চেঁচিয়ে উঠল, "আসছি স্যার, আসছি।" আধুলিটা টেবিলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাধব ছিটকে এসে পড়ল বৌ-বাজারের রাস্তায়। হিলম্যান কই? আর একটু অসাবধান হলেই মাধবের নাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগত ট্রাম গাড়িটার। রিক্সা আর ট্রামের ফাঁক দিয়ে হিলম্যান গাড়িটা কখন যে বেরিয়ে গেছে মাধব তা লক্ষ্য করে নি।

চিৎপুরের রাস্তা ধরে চীনে জুতোর দোকান গুলোকে বাঁ দিকে রেখে মাধব হাঁটতে লাগল এসপ্ল্যানেডের দিকে। ডান দিকের পকেটে তার আর মাত্র চার আনা পয়সা আছে। সরোজিনীর কাছে কত আছে তা সে জানে না। মাস শেষ হতে এখনও চার দিন বাকী। যাক, তাতে কোন ভয় নেই। ভজহরির কাছে হাত পাতলে গোটা পাঁচেক টাকা ধার পাওয়া যাবেই। শুধু হাতে ফিরিয়ে দেবার ছেলে ভজহরি নয়। পয়সার প্রতি ছেলেটার যে মায়ামমতা নেই, মাধব তা অনেক দিন আগেই টের পেয়েছে। অভাবগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে না পারলে যেন ভজহরির রাত্রে ঘুম আসে না। অতএব, আর গোটা

পাঁচেক টাকা ধার চাইলে, ভজহরির মনের শান্তি যে আরও বাড়বে সে-সম্বন্ধে মাধবের আর সন্দেহ রইল না। পা চালিয়ে সে বেণ্টিক স্ট্রীট পার হতে লাগল।

থমকে দাঁড়াল মাধব। দাঁড়াল ঐ সিনেমা হাউসটার উল্টো দিকে। এবার আর হিলম্যান গাড়ি নয়। শোভাযাত্রা আসছে। মিছিল। পা মিলিয়ে মিলিয়ে ছোঁড়াগুলো তো বেশ সুন্দরভাবে রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! মাধবের প্রায় গা ঘেঁষেই মিছিলটা এগিয়ে যাচ্ছে ময়দানের দিকে। মাধবের গায়ে একটু বাতাসও লাগল। জনতা মার্চ করে চলেছে। বাতাস উঠেছে ঐ ওদের চলার উত্তাপ থেকে। বাতাসটা তাই একটু গরম বলে মনে হল মাধবের। ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না মাধব। নিজের পা-দুটোতে যেন ক্রমে ক্রমে নৃত্যের ছন্দ আসছে। আসছে পা মিলিয়ে চলবার অনিবার্য আকর্ষণ। বিরাট একটা গণদেহের শক্তি ওকে টানছে। ভিড়ের মধ্যে সে প্রায় মিশেই যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে করে, মাধব তার নিজের বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। খুব বেঁচে গেছে মাধব। চিৎপুরের মোড় থেকে এতটা পথ সে হেঁটে এসেছে। এর মধ্যে অন্য কেউ যে তার বুক পকেটে হাত ঢোকায় নি, সে-কথা ভেবে মাধব দ্বিতীয়বার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বড়সাহেবের দশ টাকার নোটখানা হারিয়ে যায় নি বেণ্টিক স্ট্রীটের ভিড়ে। হারিয়ে গেল না সে নিজেও।

কফি হাউসের পাশের রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়ল মাধব। নিউ মার্কেটে যাবে। ঢোকবার একটু আগেই সে ডান দিকে চেয়ে দেখল, মিছিলটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু শেষের লাইনের ডান দিকের ঐ ছোঁড়াটা কে? সনাতন না? হ্যাঁ, সনাতনই বটে। বাঃ খাকী প্যাণ্ট পরে সনাতন তো বেড়ে মার্চ করছে! বন্দুকওয়ালা পাঞ্জাবীগুলোর চেয়ে খারাপ নয় একটুও। সনাতনের হাতে বন্দুক পড়লে, ওর চেহারায় রং ধরবে আরও বেশি। ভাবী জামাই-এর চওড়া বুকের ছাতির দিকে চেয়ে মাধবের নিজের বুকটাও বুঝি ইঞ্চি খানেক বাড়ল। মাধব দেখল, সনাতনের চওড়া বুকের ওপর সরোজিনীর ভবিষ্যৎ-টাও যেন ক্রমে ক্রমে বড হয়ে উঠছে।

মাধব পার হয়ে গেল চিত্তরঞ্জন এ্যভিন্যু।

ম্যাডান ষ্ট্রীট আর ধর্মতলার মোড়ে এসে মাধব আবার দাঁড়াল। ট্রাফিক পুলিশটা হাত তুলেছে বলে দাঁড়ায় নি। আঠারো নম্বরের ফেরিওয়ালা বিনয় মান্না দাঁড়িয়েছিল বন্দুকের দোকানটার সামনে। ঘাড়ের ওপর থেকে ঝুলছিল তার রং-বেরং-এর অনেক রকম ছিট কাপড়।

বিনয় মান্না বললে, "আরে মাধবদা যে!"

"তুমি এখানে কি করছ বিনয়?"

"চাঁদনিতে যাচ্ছি, মহাজনের ঘরে।"

"কত বেচলে আজ?" পকেট থেকে বিড়ি বার করল মাধব।

"এক পয়সাও না। আজ একেবারে ফাঁকা ময়দান।"

"ফাঁকা? সনাতন যে এক্ষুনি গেল সেদিকে? নাও বিড়ি ধরাও।" বিনয় মান্নার মুখে সে বিড়িটা নিজেই গুঁজে দিল। ঘাড়ের ওপর আজ তার অনেক বোঝা। সারা দিনে এক পয়সার বোঝাও সে কমাতে পারে নি। দেশলাই ধরাল মাধব। মুখটা একটু এগিয়ে দিয়ে বিনয় মান্না বললে, "আগুনটা একটু তুলে ধরো মাধবদা। কাপড়ের সামনে আগুনের জিবটা যেন লক লক করছে!"

মাধব একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিনয় মান্নার কথা ভেবেই। আজ সে রোজগার করতে পারে নি। বিনয় মান্নার কথা শুনে মাধব বলল, "না, ভয় নেই তোমার।" "ভয়ের কি শেষ আছে মাধবদা? কাল সকালেই তো রেশন তুলতে হবে।—তা কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

"যাচ্ছি? ও হ্যাঁ, সরোজিনীর জন্যে গজ দুয়েক সাদা ছিট কাপড় কিনতে যাচ্ছি। মেয়েটা বড় হয়েছে তো। কাপড়ের ব্যবহার বাড়বেই। এই কাপড়া কত করে গজ?"

বিনয় মান্না টান দিয়ে এক থান কাপড় নামিয়ে নিল নিজের ঘাড়ের ওপর থেকে।

"বোম্বাই মিলের কাপড়, সস্তাই আছে। এক টাকা চার আনা করে গজ।" বললে বিনয় মান্না।

"বাঃ, বেশ সস্তা তো। দাও দিয়ে দু-গজ।" বুক ফুলিয়ে আদেশ দিল মাধব পিওন।

বিনয় মান্না কাপড়ের গাদাটা নামিয়ে ফেলল ঘাড় থেকে। ওখানে বসেই সে গজ দিয়ে দু-গজ কাপড় মেপে চালিয়ে দিল কাঁচি। মোড়ের পুলিশটার চোখ দুটো সতর্ক হয়ে উঠেছে। বিনয় মান্না তাড়াতাড়ি করে কাপড়ের গাদাটা পুনরায় ঘাড়ের ওপর তুলে বললে, "এই নাও দু-গজ। খুব বেঁচে গেছি মাধবদা, পুলিশ ব্যাটা চলন্ত ট্রামের ফাঁক দিয়ে ঠিক দেখেছে যে, আমি কাঁচি ধরেছি। আজ আর কাউকে ভাগ দেব না মাধবদা। মহাজনের টাকা বাকী থাক। কাল আমার রেশন তুলতে হবে।"

মাধব বুক পকেট থেকে দশ টাকার নোটখানা তুলে ধরল বিনয় মান্নার সামনে।

"ওরে বাবা, এ যে বড় নোট দেখছি! খুচরো দেব কোত্থেকে, পকেটে যে কিচ্ছু নেই।"

"আচ্ছা, দাঁড়াও আমি-ই ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আসছি।" মাধব ঢুকে পড়ল বন্দুকের দোকানে। দোকানদার মাধবকে চেনে। বড়সাহেবের জন্যে সে বহুবার এখান থেকে কার্তুজ কিনে নিয়ে গেছে।

আড়াই টাকা বিনয় মান্নার হাতে দিয়ে মাধব জিজ্ঞাসা করল, "কাপড়টা ধোপে টিকবে তো?"

"খুব ভাল কাপড়, গায়ের সঙ্গে একেবারে বসে যাবে। একটু খাপী না হলে সরোজিনী পরতে পারবে কেন? উঠ্‌তি বয়সে পাতলা জমিন ভাল নয় মাধবদা।" পুলিশটার দৃষ্টি থেকে সরে পড়বার জন্যে বিনয় মান্না চলে গেল চাঁদনি চকের দিকে।

মাধব পার হল ধর্মতলার রাস্তা। এরই মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ওর বেরিয়ে গেছে নাক দিয়ে। আরও একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসবার সম্ভাবনা আছে ভেবেই মাধব পিওন ছিট কাপড়ের পুঁটলিটা নাকের সঙ্গে ঠেকিয়ে হন্‌হন্ করে হাঁটতে লাগল হগ্‌ সাহেবের বাজারের দিকে।

পথ দীর্ঘ নয়! তবুও দীর্ঘ বলে মনে হতে লাগল মাধবের। সার্ভিস রুল সে ভাঙ্গে নি, কিন্তু দশ টাকার নোটখানা সে ভাঙ্গিয়েছে। ন্যায়-অন্যায়ের রাস্তা ভেঙ্গে চলতে লাগল মাধব পিওন। জীবনের সব চেয়ে নিরাপদ মুহূর্তগুলোতে আজ কেবল ঝড়ই উঠছে। মনে হয় এ-ঝড়ের সঙ্গে ডব্‌সন রোডের বস্তিতে ওর কোনদিনও সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় নি। টক্কর লড়তে হয় নি নীতি-দুর্নীতির আইন-কানুনের সঙ্গে। এ রাষ্ট্রের আইন নয়, নয় সমাজেরও। একেবারে অন্তরের সঙ্গে এ-নীতির আইন বাঁধা। নিজের সঙ্গে তর্ক করতে করতে সে এগুতে লাগল ফলের দোকানের দিকে। চোদ্দ নম্বর ঘরে যে-কংকাল সদৃশ দেহটা পড়ে থাকে, তার মধ্যে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন উঠেছে আজ। বোধহয় সে প্রথম বুঝতে পারছে যে, মানুষের চরিত্রটা মিছে-অস্তিত্ব নয়। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, আড়াই টাকার অভাবটা ওর আজ মস্ত অভাব! অভাব ঘটেছে চরিত্রের।

এতবড় অভাব নিয়ে সে কেমন করে গিয়ে বড়সাহেবের সামনে দাঁড়াবে?

পেস্তা, বাদাম আর কিসমিস কিনবার পর, মাধবের টাকা কম পড়ল। তিন টাকার বদলে দু-টাকার আম, দু-টাকার বদলে এক টাকার আপেল কিনে মাধব বেরিয়ে এল রাস্তায়। বাসে উঠবার জন্যে দাঁড়াল এসে চৌরঙ্গীর ফুটপাতে। বিপিন পাল রোডে যাবার জন্যে তাকে উঠতে হবে আট নম্বর বাসে। বাস এসে দাঁড়াল ঠিক ওর সামনে। উঠতে গিয়েও সে উঠতে পারলে না, চলে গেল উল্টো দিকের ফুটপাতে। হাওড়ার বাস ধরাই ভাল। বিপিন পাল রোডে আজ সে কিছুতেই যেতে পারবে না। কিন্তু হাওড়াগামী বাসেও সে উঠল না। আবার এল এদিকের ফুটপাতে। এমনি করে বা· কয়েক আসাযাওয়ার পর, শেষ পর্যন্ত হাওড়ার বাসেই উঠে বসল সে। হাঁফাতে লাগল মাধব। হাত পাগুলোও যেন কাঁপছে। কাঁপছে মানব ইতিহাসের একটা মনোরম পরিচ্ছেদ! কেবল পিওন বলে মাধবকে আর ইতিহাস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া চলবে না।

রাত তখন সাতটাই হবে। মাধব এসে ঢুকল বস্তিতে। স্বর্গ-রাজ্যের

মত সুন্দর মনে হল বস্তির পরিবেশ। এখানে নর্দমার গন্ধ আছে, আছে নিরক্ষরতাও। কিন্তু তবু এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ দূষিত হয়ে উঠতে পারে নি। এখানে ভজহরির মত লোক থাকে। থাকে সনাতন।

মাধব ভাবলে, ভজহরি এখনো ফেরে নি স্টেশন থেকে। যত রাত্রেই সে ফিরুক, পাঁচটা টাকা সে চেয়ে নিয়ে রাখবে আজ রাত্রেই। তারপর কাল সকালে আড়াই টাকার অভাব পূরণ করে সে পৌঁছে দিয়ে আসবে সওদা, বিপিন পাল রোডে। পাঁচ নম্বর ঘরটা অন্ধকার। সামনে দিয়ে হেঁটে সে চলে গেল চোদ্দ নম্বরের দিকে।

রাস্তার ওপর বসে সরোজিনী উনোনে রুটি সেঁকছিল। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা দাওয়ার ওপরে জ্বলছে। মাধব পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। ফলের ঠোঙাগুলো রেখে দিল চৌকির তলায়। ছিট কাপড়টা ফেলে রাখল চৌকির ওপরেই। মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করতে লাগল মাধবের। তাই সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দাওয়ার ওপর।

একটু পরেই সরোজিনী দেখতে পেল তার বাবাকে। উঠে এসে দাঁড়াল মাধবের মুখোমুখি হয়ে। আধো অন্ধকারে মাধবের মুখ সে ভাল করে দেখতে পায় নি। সরোজিনীও যেন কি একটা গুরুতর অপরাধ করেছে এমন ভাব দেখিয়ে মাথা নিচু করে বলল, "বাবা, হরিদার বড্ড অসুখ গেছে আজ। কাজে বেরুতে পারে নি। হরিদার রেশন কার্ড নেই—"

"রেশন কার্ড দিয়ে কি দরকার সরোজিনী?"

"হরিদার জন্যে দু-খানা রুটি করেছি আমাদের আটা থেকে।"

"খুব ভাল করেছ মা। যতদিন না ভজহরি কাজে বেরতে পারে, ততদিন ওকে তুমি-ই খাওয়াবে।"

"বাবা!" সরোজিনী এবার সোজাসুজি মাধবের মুখের দিকে চাইল। চাইতে গিয়েই মাধবের শুকনো মুখটা খুব বেশি শুকনো বলে মনে হল সরোজিনীর। সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি বাবা অসুখ করেছে?"

"না তো।"

"তা হলে একটু ফল খেয়ে নাও। কাশীর ল্যাঙড়া আর কাশ্মীরের আপেল আছে ঘরে।" মাধবের হাত ধরে সরোজিনী টানতে লাগল ওকে। পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল মাধব। সরোজিনীর টানেও সে নড়ে চড়ে না!

"কি হয়েছে বাবা?"

"মুখের কথায় তো কাশী আর কাশ্মীর থেকে আম-আপেল আসে না সরোজিনী! কাশীর ল্যাঙড়া টাকায় মাত্র চারটে।"

"আমাদের ঘরে এখন ছ-টা আছে। সর্দার এসেছিল হরিদাকে দেখতে। সে সঙ্গে করে অনেক ফল নিয়ে এসেছিল বাবা। আম তার পেটে সইবে না বলে সবগুলোই দিয়ে দিয়েছে। আপেল দিয়েছে আট-টা। তুমি এখন কটা খাবে, বলো।"

মাধব আর কিছুই বলতে পারলে না। দু-হাত বাড়িয়ে সরোজিনীকে টেনে নিল বুকে। চেপে ধরল প্রাণপণে। মুখটা তার মাথার ওপর রেখে মাধব ভেজা গলায় বলতে লাগল, "সরোজিনী, তোকে আজ আমি ফাঁকি দিয়ে কাটলেট খেতে গিয়েছিলুম। বড্ড খিদে লেগেছিল, কিন্তু খাইনি রে, খাইনি।"

"তোমাকে ফেলে, আমিও আমে হাত দিইনি বাবা। তোমার খিদের কষ্ট আমি জানি। এসো, তোমাকে আজ আমি পেট ভরে খাওয়াব।"

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা এক হাতে নিয়ে, অন্য হাত দিয়ে সরোজিনী মাধবকে ধরে বলল, "চলো।"

"এ আম আমি খাব না। সরোজিনী, ছ-টা আম আর আপেলই আমি নিয়ে যাচ্ছি বড়সাহেবের বাড়িতে।"

"চাকরিতে উন্নতি হবে বুঝি তোমার?" জিজ্ঞাসা করল মাধব পিওনের মেয়ে।

"চোদ্দ নম্বরের উন্নতি আজ চরমে উঠেছে। আর আমি উন্নতি চাই নে মা। যা বুঝলুম আর যা দেখলুম আজ, তার কাছে অফিসের সবচেয়ে উঁচু চেয়ারটাও ছোট মনে হচ্ছে।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাধব রওনা হয়ে গেল বিপিন পাল রোডের দিকে। অনেকটা পথ যেতে হবে, দেরি করে আর লাভ নেই। রেশনের থলির মধ্যে সবগুলো জিনিসই সে ভরে নিয়ে গেছে। ক্ষতিপূরণ করবার উত্তেজিত মুহূর্তে, মাধব ভুলে গেছে যে, কাশীর ল্যাংড়া টাকায় চারটে, ছ-টা নয়।

রাতটা কেটে গেল। অতিবাহিত হল একটা সপ্তাহ। গতকাল বড়-সাহেবের মেয়ে লুকু দিদিমণির বিয়ে হয়ে গেছে পাটনার ছেলের সঙ্গে। মাধব কাল থেকে বিপিন পাল রোডেই আছে। আজ তার ফিরবার কথা ঘরে। হয়তো বিকেলের দিকেই সে ফিরে আসবে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সরোজিনী দরজা খুলেই, দরজাটা আবার তক্ষুনি বন্ধ করতে যাচ্ছিল। ঘরের দিকে পেছন দিয়ে দুটো কাবুলীওয়ালা দাঁড়িয়েছিল। কত নম্বরের দিকে যে ওরা চেয়েছিল, সরোজিনী তা বুঝতে পারল না।

সরোজিনী দাঁড়াল এসে দাওয়ার ওপর। কাবুলীওয়ালাদের উদ্দেশ করেই বলল, "এই, আমার ঘরের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমার কাছে টাকা পাবি না কি? সর্।" কথাগুলো অবশ্যি বললে সে ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দীতেই। কাবুলীওয়ালা জবাব দেবার আগেই, সরোজিনী দেখল, বিগত দিনের ভদ্রলোক সতীশবাবু বাইরে বেরুবার কাপড়চোপড় পরে দরজা খুলল। আকাশের দিকে হাত তুলে কোন দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করতে গিয়েই সে দেখল, সরোজিনীর দিকে মুখ করে কাবুলীওয়ালা দুটো দাঁড়িয়ে আছে! হাত দুটো চট করে নামিয়ে নিয়ে অতি নিঃশব্দে সতীশবাবু ঘরের পেছন দিকের রাস্তা দিয়ে সরে পড়বার জন্যে নেমে পড়ল দাওয়া থেকে। সুর চড়িয়ে সরোজিনী বললে, "পালাচ্ছেন কেন সতীশবাবু? ধার তো আমার বাবাও করেন। লোক দুটোকে একটা কথা দিয়ে যান।" চকিতের মধ্যে কাবুলী-ওয়ালারা ছুটল বত্রিশ নম্বরের দিকে। সতীশবাবুর পথ রুখে দাঁড়াল ওরা।

"রূপেয়া? ভাগ্‌তা কিউ সতীশবাবু?" ভদ্রলোকের হাত চেপে ধরল কাবুলীওয়ালা। সরোজিনী দেখল, কাবুলীওয়ালার হাতটা কী লম্বা! লম্বা

তো বটেই, আফগান-সীমান্ত থেকে ডব্‌সন রোডের বস্তি পর্যন্ত রাস্তা তো কম নয়!

সতীশবাবু তার নিজের চোখ দুটো ইদুরের চোখের মত ছোট করে চাইতে লাগল আশপাশের ঘরগুলোর দিকে। ঋণ শোধ করতে পারছে না বলে তার লজ্জা নেই, লজ্জা তার ঋণের সংবাদ পাঁচ জনের কানে উঠবে বলে। সরোজিনী বত্রিশ নম্বরের সামনে এসে কাবুলীওয়ালাদের ধমকে উঠল, "এটা দুশমনি করবার জায়গা নয়। বড়লোকেদের যেমন ইজ্জত আছে আমাদেরও তেমনি ইজ্জত আছে। হাত ছাড়ো। কত টাকা পাবে?"

"তিরিশ রূপেয়া, সুদ হায় পাঁচ রূপেয়া।"

"দেব, নিশ্চয়ই দেব। ক্যানিং স্ট্রীটের গুদাম থেকে মালটা ক্লাইভ স্ট্রীটের গুদামে পৌঁছে গেলেই, আমার কমিশন পাওনা হবে বাহাত্তর টাকা আট আনা।" বলল সতীশবাবু।

"ওসব কথা শুনে তো ওদের লাভ নেই সতীশবাবু, একটা তারিখ দিন।"

"তারিখ?" ঢোক গিলে সতীশবাবু বলল, "এ-মাসের বিশ তারিখ। এখানে আর আসতে হবে না, আমি নিজে গিয়েই দিয়ে আসব।"

কাবুলীওয়ালাদের দিকে চেয়ে সরোজিনী বললে, "ব্যস্, বিশ তারিখে মিল্ জায়েগা।"

"সুদ? আভি পাঁচ রূপেয়া মাঙতা।"

সতীশবাবু যত্ন নিয়ে তার নিজের পকেটগুলো হাতড়াতে লাগল। টিপে টিপে দেখতে লাগল, কাগজের টাকা সঙ্কুচিত হয়ে পকেটের ভাঁজে মাথা ঢুকিয়ে লুকিয়ে আছে কি না। অনাবশ্যক সময় নষ্ট করতে লাগল সতীশবাবু।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "নেই নিশ্চয়ই? থাকলে এতক্ষণে পাওয়া যেত।— আচ্ছা ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলুন, দেখি সনাতনদার কাছে ধার পাওয়া যায় কি না।"

"হ্যাঁ—আমি কালই আপনাকে ফিরিয়ে দেব। ক্যানিং স্ট্রীটের গুদাম থেকে মালটা···মানে, নেট্ বাহাত্তর টাকা আট আনা কমিশন আমার পাওনা

হয়েই গেছে। দেখুন, দুশমন দুটোকে এখান থেকে একটু সরে যেতে বলুন। ঘুম থেকে উঠেই উনি আবার মোচলমানের দাড়ি দেখতে ভয় পান। পুজো-আর্চা করেন তো।"

সরোজিনী কাবুলীওয়ালা দুটোকে ডেকে নিয়ে এল চোদ্দ নম্বরের দিকে। নিজেদেব ঘরের কাছে এসে সে বলল, "আমাদের দাওয়ার ওপর বসো।" সতীশ-বাবুব ধার শোধ দেওয়ার জন্যে সরোজিনী চলল সনাতনের কাছে টাকা ধার করতে। মাসের প্রথম সপ্তাহ, অতএব সনাতনদার কাছে পাঁচটা টাকা ধার পাওয়া যাবেই। তা ছাড়া, মাধব যখন সনাতনের সঙ্গে বিয়ে ওর এক রকম পাকাপাকি করে ফেলেছে, তখন সে তার স্বামীর টাকাই নিচ্ছে। একে ধার বলা উচিতও নয়।

সরোজিনী দাঁড়াল এসে ভজহরির ঘরের সামনে। নারকোলের দড়ি দিয়ে দরজাটা বাঁধা রয়েছে। আজ খুব ভোরেই হরিদা বেরিয়ে গেছে কাজে। কাজের প্রতি হরিদার অদ্ভুত আকর্ষণ, প্রগাঢ় ভক্তি। কুলীর কাজকেও হরিদা ভগবান মনে করে। কে জানে, হরিদার ভগবান হয়তো মিথ্যে নয়।

যাক, হরিদা নেই, ভালই হয়েছে। তার কাছে হাত পাতলে পাঁচ টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। পাওয়ার নিশ্চয়তা খুব বেশি বলেই সরোজিনীর হাত পাততে লজ্জা করে। বাবা তো হরিদার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে হরিদাকে দিতে পারে নি কিছুই। হঠাৎ যেন সরোজিনী ভজহরিকে সব কিছু দেবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল। এতদিনের মধ্যে কিছু না কিছু দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হরিদাকে দেবার মত সরোজিনীর কি আছে? কথাটা ভাবতে গিয়ে, সরোজিনীর শুকনো গালে অতি পুরাতন টোল-টি ভেসে উঠল। সরোজিনীর মুখে মৃদু হাসি! শাড়ীর আঁচলটা ভোরের ঝির ঝিরে বাতাসে বড্ড মোলায়েম মনে হল সরোজিনীর। ভোরের বাতাস তরঙ্গ তুলেছে সরোজিনীর গায়ে। হরিদাকে দিতে পারে না তেমন লুকনো সম্পদ সরোজিনীর কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না আজ। হাওড়া স্টেশনের কুলীর মাথা ময়দানের মনুমেণ্টের চেয়েও উঁচু। কতগুলো চওড়া চওড়া রাস্তা

আর উঁচু উঁচু বাড়ি থাকলেই দেশটা সভ্য হয় না। যে-দেশ হরিদাকে দেখতে পায় না, সে-দেশের চোখে ইট-সুরকির মনুমেণ্ট-ই চিরদিন বড় হয়ে রইল!

সনাতনদার রাতের ডিউটি ছিল। বোধ হয় এই মাত্র সে ফিরেছে। ঘরে এখনও বাতি জ্বলছে। সনাতনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এক রকম পাকা হয়ে আছে বলেই সরোজিনী কোনদিনও সনাতনের ঘরে ঢোকে না। বাইরে থেকে সে ঘরের দরজায় টোকা মারল। খিল এবং ছিটকিনি খুলতে সময় লাগল সনাতনের। ঘরের সাম্রাজ্য ওর সুরক্ষিত। একটা মুহূর্তের মধ্যেও অসতর্কতার শিথিলতা নেই।

"তুমি? এত ভোরে?" অবাক হল সনাতন।

ভেতরে না ঢুকে পারল না সরোজিনী। সতীশবাবুর ধারের সংবাদ উল্টো দিকের ঘর থেকে কেউ শুনে ফেললে বড্ড অন্যায় হবে।

সরোজিনী বলল, "গোটা কয়েক টাকা চাইতে এলুম।"

জঙ্গী-লাটের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল সনাতন।

"টাকা? এতো ভোরে?"

"টাকার দরকার যে-কোন সময় হতে পারে সনাতনদা।"

"কিন্তু টাকা রোজগার যে-কোন সময়ে করা যায় না সরোজিনী। রোজগারের সময় বাঁধা থাকে। ভজহরির ভগবানের চেয়েও টাকা অনেক বড়। সরোজিনী টাকার মধ্যে আমি তাই কোন কারণেই উশৃঙ্খলতা ঘটতে দিই না।"

"তুমি উশৃঙ্খলতা দেখলে কোথায়?"

"তোমাদের ঘরের সামনে।—যার আয় কম, তার ব্যয় করতে হবে হিসেব করে। টাকার সঙ্গে কেবল তুমি আর আমি বাঁধা পড়ি নি, বাঁধা পড়েছে সমস্ত পৃথিবীটাই। টাকার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে সভ্যতা। খরচ তুমি করতে পারো, কিন্তু নষ্ট করতে পারো না।"

"নষ্ট করলুম কোথায়?"

"ব্যয় যখন আয়ের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সেটা নষ্ট ছাড়া কি? মাধবদার

বয়স বেড়েছে তাই তার মাথার কিছু ঠিক নেই। কিন্তু হিসেবের মধ্যে তোমার তো কোন গলতি থাকা উচিত নয়?"

সরোজিনী অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল। সনাতনদার ওপরে ওর শ্রদ্ধা অনেক। সনাতনদা সত্যপ্রিয় মানুষ। সত্য বলার মধ্যে তার অসাধারণ স্পষ্টতা আছে। কিন্তু আজ যেন তার সত্য বলার মধ্যে অত্যন্ত বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সত্য কথাগুলো হয়ে উঠেছে পাথরের নুড়ির মত রুক্ষ। কানের পর্দায় আঘাত করে। নুড়ির মধ্যে খানিকটা রস না থাকলে, নুড়ি চিরদিন নুড়ি হয়েই থাকবে। মায়া, মমতা, স্নেহ ভালবাসা এবং দয়া ইত্যাদির রস দিয়ে রুক্ষতম সত্যকেও নরম করে আনতে হয়—করে তুলতে হয় সহনশীল। তুর্কী-তরোয়ালের তীক্ষ্নতা সত্য। তাতে ঘাড়ের রক্তই লেগে থাকে, ক্ষমার মাধুর্য থাকে না।

সরোজিনী ঘুরে দাঁড়াল যাওয়ার জন্যে। সনাতন তার পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সতর্কতা তার জীবনের চারদিকে, সতর্কতা তার পকেটের মধ্যেও। আঙুলের চাপে কাগজের নোট নিষ্পেষিত হচ্ছে।

"দাঁড়াও। কত লাগবে তা বলো নি। যা আছে সবই তোমায় দিয়ে দিলুম।" এক টাকা, আর পাঁচ টাকার কখানা নোট সনাতন গুঁজে দিল সরোজিনীর মুঠোর মধ্যে। সরোজিনীর আঙুলে মাংস কম, হাড়ের ঘষা লাগল সনাতনের বলিষ্ঠ হাতে।

"এতগুলো লাগবে না, পাঁচ টাকা হলেই চলবে।" বলল সরোজিনী।

"ঋণ একেবারে শোধ করে দেয়াই ভাল। মিটিয়ে দাও।"

পাঁচ টাকা রেখে বাকী টাকা সব সনাতনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সরোজিনী বলল, "ঋণ আমাদের নয়, সতীশবাবুর। তোমাকে পরশু দিনই টাকা কটা ফিরিয়ে দেব।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সনাতন বললে, "সতীশবাবুদের ঋণ শতাব্দীর পর শতাব্দী কেবল আমরাই বয়ে বেড়াচ্ছি সরোজিনী। আমরা কোন লেখাপড়া শিখি নি বলে অপরাধ সব আমাদের।"

"শিখেই বা কি হতো সনাতনদা? শিক্ষিতদের উৎপাত আবার নতুন করে স্থরু হতো।"

"কেন?" জিজ্ঞাসা করল সনাতন।

"কেন আমি জানি না। পরের লেখা বই পড়তে আমার ভাল লাগে না। আমি চলি। পরশু দিনের মধ্যেই তোমার টাকা পাঁচটা ফিরিয়ে দেব। ঐ ছ্যাখো, কাবুলী দুটো তোমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!" একটু হেসে সরোজিনী বেরিয়ে এল বাইরে। খোলা দরজাটা টেনে দিয়ে এল সে। রাতের ডিউটি দিয়ে এলে কি হবে, দরজা বন্ধ করে সনাতনদা এক্ষুনি হয়তো বই পড়তে বসবে।

পরের দিন সন্ধ্যের সময় লুকু দিদিমণি রওনা হয়ে গেল বিপিন পাল রোড থেকে। আপাতত উঠবে গিয়ে যতীন দাস রোডে। সাত আট দিন পরে সে চলে যাবে পাটনায়। পাটনা থেকে দিল্লী।

লুকু দিদি চলে যাওয়ার পরে, মাধব বেরিয়ে এল বড়সাহেবের বাড়ি থেকে। সে হাঁটতে লাগল ল্যান্সডাউন রোড ধরে, হাওড়ার বাস ধরবার জন্যে। এ-রাস্তার সঙ্গে পরিচয় ওর অনেক দিনের, প্রায় দশ বছরই হল। দশ বছর আগে এখানে এত ভিড় ছিল না, আজ বড্ড বেশি ভিড় জমেছে এই সব পাড়া-গুলোতে। বাড়ি ঘরগুলোতেও এসেছে অনেক রকমের পরিবর্তন। নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে মাধব দেখতে পায় চোখ ধাঁধানো ঢং, জমিদারদের বাড়িগুলোর মত এতে না আছে নির্মাণ-কৌশলের গভীরতা, না আছে সুস্থ সৌন্দর্যের চমৎকারিত্ব। রাত কাটাবার পক্ষে অবশ্যি মন্দ নয়। মন্দ নয় মাদ্রাজী মধ্যবিত্তদের পক্ষেও। একটা দু-শ বর্গ ফুট ঘরে দশ জন মাদ্রাজী মাদুর পেতে ঘুময়! বড়সাহেবের পাশের বাড়িটা মাদ্রাজী জনসংখ্যায় জম্ জম্ করছে। মাধব জানলা দিয়ে এক তলার ঘরখানা দেখতে পেয়েছে কাল রাতে। ওর মনে হয়েছে, রান্না-করা কই মাছের মত লোকগুলো সব পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর পাশাপাশি। তেল মসলার মত ঘামের নোংরায় চুপ-চুপ করছে প্রত্যেকটা দেহ। বেলা নটার সময় এরাই সব ছুটে আসবে অফিস মহলে। চেয়ারে বসে

অর্ডার দেবে লম্বা লম্বা। কোট প্যাণ্ট্‌লুন পরলে বোধ হয় কাউকে আর কই মাছের মত মনে হয় না। মাধব ভাবলে, মাথা পিছু বর্গ ফুটের পড়পড়তা হিসেব করলে, চোদ্দ নম্বরের গড় ওদের চেয়ে বেশিই হবে।

একটা রাত সে বড়সাহেবের বাড়িতে কাটিয়ে এল। অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। সাজানো-গোছানো ড্রইং-রুমে বসে সব মানুষকেই অতি সুন্দর মনে হয়। মনে হয় বড় সাহেবের মত এমন সহৃদয় ও সদাশয় ব্যক্তি অফিস মহলে আর দ্বিতীয়টি নেই। কেষ্টনগরের সরভাজার মত একেবারে সারটুকু হয়ে বসে আছেন ড্রইং-রুমে! অন্দর মহলে ঢুকলেই স্বার্থের অল্প উত্তাপেই সরভাজা সব গলে গলে পড়ে।

কোন পারিশ্রমিক সে পায় নি, প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা সে কাজ করে এল বিপিন পাল রোডে। খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও, বহু খাদ্য সে অপচয় হতে দেখেছে। দামী দামী কাপড়-চোপড় পরা ভদ্রলোক আর ভদ্র-মহিলারা খেয়ে হজম করতে পারেন্‌ না। ঝুড়িতে করে পাতের খাবার তুলে চাকরগুলো ফেলে দিয়ে এল ডাস্টবিনে।

সরোজিনীর জন্যে এতটুকু খাবারও কেউ মাধবের হাতে তুলে দেয় নি। লুকু দিদিমণি চলে যাওয়ার পরে বড়সাহেব ডাকলেন, "মাধব,—"

"আজ্ঞে—"

"কাল তো জামাই-বাড়িতে শুভরাত্রি। বেলা দশটা নাগাদ 'তত্ত্ব' নিয়ে যেতে হবে। যেতে হবে মিছিল করে।"

"মিছিল?—"

"হ্যাঁ মাধব। ওদের একটু চমকে দিতে হবে না? মাধব—"

"স্যার—"

"শেয়ালদা বাজারে খুব ভোরে গিয়ে পৌছতে হবে। এক মন পাকা রুই চাই।"

"মাছ পৌছবার আগেই আমি পৌছে যাব স্যার। ওদিক থেকে প্রথম বাস ছাড়ে পৌনে পাঁচটায়। প্রথম বাসই ধরব।"

"যদি ধরতে না পারিস ? থেকে যা না এখানে ?"

"না স্যার, এক রাত্রি তো রইলুম। মেয়েটা একা রয়েছে।"

সরোজিনীর কথা মনে পড়ল বড়সাহেবের। মাধব চলে আসছিল। বড়-সাহেব আবার ডাকলেন, "মাধব—"

"স্যার—"

"কাল একেবারে একটা শোভাযাত্রা করে 'তত্ত্ব' নিয়ে যেতে হবে।"

"তাই যাব স্যার।"

"সরোজিনীকে নিয়ে আসিস্। জামাই-বাড়িতে কাল খুব ঘটা করে খাওয়াবে। তার ওপর, যারা 'তত্ত্ব' নিয়ে যাবে তাদের নগদ দেবে পাঁচ দশ টাকা করে। কেবল সরোজিনীকে নিয়ে এলেই তো চলবে না, আরও লোক চাই। দূর তো এমন কিছু নয়, বিপিন পাল রোড থেকে যতীন দাস রোড এক দৌড়ের রাস্তা। কুলীর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিয়ে গেলে মোট প্রতি এক টাকার বেশি লাগত না। ওরা অন্তত পাঁচ টাকা দেবেই। পাটনার সমাজে শুনেছি ওদের নাকি খুবই সম্মান। সরোজিনীকে আনতে কিন্তু ভুলিস না।"

"ভুলব না স্যার।"

মাধব চলে এল একেবারে রাসবিহারী এ্যভিনূ-র মোড় পর্যন্ত। পাচের-এ বাস ধরে একেবারে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত পৌছন যাবে। ও-পাশের ফুটপাতে একটা মিষ্টির দোকান চোখে পড়ল মাধবের। মনে পড়ল সরোজিনীর মুখখানা। দু-টাকার সন্দেশ কিনল মাধব। টাকা দুটো আজ আর ওর কাছে বত্রিশ আনা বলে মনে হল না খুবই তুচ্ছ মনে হল সরকারি টাকা দুটোকে। তুচ্ছ মনে হল বড়সাহেবদের। এ-টাকা চালু রাখবার জন্যেই তো রাষ্ট্র-কারখানা চলছে। চালাচ্ছেন বড়সাহেবদের দল।

বাসে উঠল মাধব। মগ্ন হয়ে রইল গভীর চিন্তায়। চাকরির প্রতি ঘৃণা এল অসীম। ঘৃণা এল মানুষের ওপরে। শিক্ষিত মানুষের প্রতি মাধবের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অভিশাপ। জন্তুর চেয়েও নৃশংস এরা। বনজঙ্গল ছেড়ে চেয়ার চেপে বসেছে এসে অফিস-আদালতে। কতকগুলো কলের মানুষ

যেন! হাজার হাজার অভিশাপ ছড়াতে ছড়াতে মাধব এগিয়ে চলল ডব্‌সন রোডের বস্তির দিকে।

অপরাধ ওদের যত গুরুতরই হোক, মানুষ মানুষকে অভিশাপ দিতে পারে না চিরদিন। বাসটা চৌরঙ্গী পৌঁছবার আগেই মাধবের মনে অনুতাপ এল। অভিশাপ দেওয়া তার উচিত হয়নি। বড়সাহেবের বিচার-ভার মাধবের হাতে নেই। কার হাতে আছে, মাধব তা জানাতেও চায় না। কিন্তু ওদের ক্ষমা করবার অধিকার আজ কেবল মাধবের একলারই আছে। ইচ্ছে করলেই সে তার অভিশাপ তুলে নিতে পারে। ইচ্ছে করলেই সে পারে বড়সাহেবদের ক্ষমা করতে। করলও মাধব। চৌরঙ্গী পার হওয়ার পরেই সরোজিনীর মুখখানা আবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। শুকনো মুখ, কিন্তু হাস্যোজ্জ্বল। ক্ষমার হাসিতে সরোজিনীর মুখখানা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তিক্ততা তাতে একটুও নেই। অভিশাপ দিতে গিয়ে মাধবের মনটা খুব ছোট হয়ে গিয়েছিল। ছটফট করছিল মাধব। তিক্ততা স্থায়ী হয় না। স্থায়ী আনন্দ। ক্ষমার মই বেয়ে মাধব উঠে এল সেই আনন্দের স্থায়ী-লোকে। ভজহরি ঠিকই বলে যে, ক্ষমাগুণ মানুষের সব চেয়ে বড় গুণ।

মনে পড়ল মাধবের লুকু দিদিমণির মুখখানা! মুলেন স্ট্রীট থেকে আর তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে না বলে মাধবের যেন দুঃখই হতে লাগল। পাঁচটার পরে, ছোটাছুটি করতে ভাল লাগত না ওর। আজ মনে হচ্ছে, লুকু দিদির জন্যে সে সমস্ত জীবন ধরে ছোটাছুটি করতে পারত মুলেন স্ট্রীট থেকে বিপিন পাল রোড পর্যন্ত। কিন্তু আজ সে চলে গেছে যতীন দাস রোডে।

যাওয়ার আগে লুকু দিদির চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল। মাধবের মনে পড়ল তার নিজের স্ত্রীর কথা। বিয়ের পরের দিন সেও বৌকে নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে এসেছিল। কিন্তু লুকু দিদির মত সে অত সহজে আসতে চায় নি। সে কী কান্না তার! মেয়েকে একরকম জোর করে তার বাবা তুলে দিয়েছিলেন নৌকোতে। সারাটা পথ সে কাঁদল। দু-দিন পর্যন্ত বৌ তার

সঙ্গে একটা কথাও কয় নি। বৌ তাকে ভালবাসেনি প্রথম দিন থেকে। ভালবাসতে তার বোধ হয় অনেকগুলো বছরই লেগেছিল। সত্যিকারের ভালবাসা শক্ত হতে সম্ভবত সময় নেয়। সত্যিকারের ভালবাসা দমকা হাওয়ার মত চলে না—চলে ঝিরঝিরে বাতাসের মত ধীর গতিতে। হঠাৎ সে ওঠে না, হঠাৎ সে ক্ষয়েও যায় না। দমকা হাওয়ায় থাকে ভাঙ্গনের ভয়, ঝিরঝিরে বাতাসে থাকে বৃদ্ধির আশা। ঝিরঝিরে বাতাসের বিস্তার সারা বিশ্বময়, দমকা হাওয়ার গতি সীমাবদ্ধ। মাধব তাই, স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও তাকে ভুলতে পারেনি, ভালবাসার বিস্তৃতি ওর বাড়ছে বই কমছে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাধব বাস থেকে নামল।

পরের দিন ভোরবেলায়ই সরোজিনী এসে ভজহরির দরজায় ধাক্কা মারল। দরজা ওর খোলাই থাকে। ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, "কে? সরোজিনী?"

"হ্যাঁ, হরিদা।"

"ভেতরে এস।" ভজহরি কাজে যাবার জন্যে পোশাক পরছিল। সরোজিনী ভজহরির হাত থেকে পচা-সুতোর হাফপ্যাণ্ট-টা টান দিয়ে ফেলে দিয়ে বললে, "এটা তোমায় আমি আর পরতে দেব না।"

"কেন?" মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল ভজহরি।

"সুতোগুলো সব গলে গলে পড়ছে। মেল্ ট্রেনের মাল নামাতে গিয়ে একদিন তুমি এমন লজ্জাই পাবে—"

"কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ভজহরি একটু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, "লজ্জা পাবো কেন? রুজি রোজগারের মধ্যে কোন লজ্জাই নেই সরোজিনী।"

"আমি সে কথা বলছি না হরিদা।" এই বলে হাসতে হাসতে সরোজিনী কাপড়ের টুকুরোটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এল বস্তির সরু রাস্তার ওপর।

"হরিদা, তোমার ধুতিখানা কোথায়?"

"বালিশের তলায়।"

"ইস্ত্রি হচ্ছে বুঝি ?"

"হচ্ছে না, ইস্ত্রি করাই আছে।"

"খুব ভাল হয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই মনে হয়েছে, দিনটা খুব ভাল কাটবে আজ।"

'কেন ? কি হল, ইস্ত্রি করা ধুতির সঙ্গে দিনটার কি সম্পর্ক ?" বালিশের তলা থেকে কাপড়টা বার করে সরোজিনী বললে, "আজ আমাদের নেমন্তন্ন হরিদা। বাবা বলে গেছেন, আমাকে আর তোমাকে বিপিন পাল রোডে যাবার জন্যে। বড়সাহেবের মেয়ের আজ শুভরাত্রি। আমরা মিছিল করে মাথায় বয়ে নিয়ে যাব 'তত্ত্ব'। হরিদা, আমি কোন দিনও মোট বইনি, আজ তাই আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দের দিন।"

ভজহরির মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে একমুহূর্তও লাগল না। মোট বইবার মধ্যে ওর তিলেক মাত্র লজ্জা নেই। লজ্জা কেবল, ইস্ত্রি-করা ধুতি পরে ওকে বালিগঞ্জ পাড়ায় গিয়ে মোট বইতে হবে বলে। ও-পাড়ার সঙ্গে ওর সম্পর্ক চিরদিনের জন্যে কেটে গেছে বলেই ভজহরির বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সরোজিনী আজ সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দেবার জন্যে ওর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে ভোরবেলায়। ভজহরি গম্ভীর হয়ে আছে দেখে, সরোজিনী বললে, "হরিদা, হাওড়া স্টেশনে যা চলে, বালিগঞ্জের রাস্তায় তা চলে না, আমি তা জানি। কিন্তু আজ আমায় পাঁচটা টাকা রোজগার করতে হবে হরিদা। কাল আমার ঋণ শোধ দেওয়ার দিন। তুমি নিজে না মোট বইতে চাও, না বইলে। আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। তুমি পাশে থাকলে মোট আমার ভারী লাগবে না।"

গম্ভীর ভাবটা মুছে গেল ভজহরির মুখ থেকে। সে জিজ্ঞাসা করল, "ঋণ করলে কার কাছে ?"

"সনাতনদার কাছে।"

হাসতে হাসতে ভজহরি এবার বলল, "ওটা আবার ঋণ নাকি ? ঋণ তো সনাতনদার। তোমার মত মেয়েকে সে ঘরে আনছে ; অতএব মাধবদার

ঋণ সে কোনদিনও শোধ দিতে পারবে না। চলো, বালিগঞ্জেই চলো। সনাতনদা কোথায় ?”

“তার তো রাতের ডিউটি। সে এখনো ফেরেনি। তা ছাড়া, সনাতনদা কোনদিনও মোট বইতে পারবে না। ডব্‌সন রোডের বস্তিতে সনাতনদাই একমাত্র কুলীন। সে শ্রমিক। তার কৌলীন্য কি আমরা নষ্ট করতে পারি ?”

“তাহলে তুমিও তো কম নও সরোজিনী ? তুমি কুলীন-বৌ। এক কাজ করলে কেমন হয় ? তুমি আমার পাশে থাকবে, ‘তত্ত্ব’ বইব আমি; কেমন ?”

“আমাকে পাশে রাখতে তুমি পারবে হরিদা ? ধরো চিরদিনের জন্যে ?”

“এতদিন পাশে থেকে কি করবে ?”

“তোমার গান শুনব। তোমার গান আমায় টানে, হরিদা।”

আলোচনটা যেন ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমায় এসে কেমন জট পাকিয়ে গেল। ঘরের হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। ভজহরি ভাবলে, পাশের ঘরের সনাতন ঠকছে। ঠকছে সে তার অজ্ঞাতসারে। তাই আবহাওয়াকে হালকা করবার জন্যেই ভজহরি বললে, “তোশকের তলায় আমার একটা পাঞ্জাবিও আছে সরোজিনী। কেমন ফুলবাবুটি সাজি আজ দেখবে। তোমার চিরুনিটা একবার ধার দিও তো। মাধবদার সেই জুতো জোড়া কোথায় ? তার তো তাতে পা কাটে। দেখি আমি একবার ট্রাই নিয়ে। আমার পা তো মাধবদার চেয়ে ছোটই হবে। কটার সময় আমরা রওনা হবো ?”

“আট-টায়।” এই বলে সরোজিনী নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সরোজিনীর মনস্তত্ব বুঝবার জন্যে ভজহরির কোন বিজ্ঞানের বই পড়বার দরকার হল না।

বেছে বেছে পাকা রুই কিনতে মাধবের বেশ দেরি-ই হয়ে গেল। বড়-সাহেবের জামাই পাটনার সমাজে খুবই সম্মানিত এবং সমাদৃত। মাধব আজ তাঁদের সবাইকে পাকা রুই খাইয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। পাটনার সমাজ যত

বড়ই হোক। বড়সাহেবের সমাজের চেয়ে বড় নয় কিছুতেই। লুকু দিদির বাপের বাড়ির নাম সে কিছুতেই ডুবতে দেবে না।

বড়সাহেবের বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়েছিল সরোজিনী। ফটকের সামনে নয়, ফটকের এক পাশে। মাধব গাড়ি থেকে টেনে টেনে দুটো পাকা রুই ফেলল ফটকের সামনে। যেন একটা রাজ্য জয় করে ফিরেছে মাধব, এমন ভাব দেখিয়ে বললে, "হুঁ, হুঁ—পাকা রুই, পাকিস্তান থেকে এসেছে। আমাদের দেশ, বুঝলি সরোজিনী? পদ্মার ঢেউ লেগে লেগে—হুঁ, হুঁ, আরে ভজহরি আসে নি?"

"এসেছে। ঐ তো ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে।" জবাব দিল সরোজিনী।

ভজহরির দিকে চেয়ে মাধব অবাক হয়ে গেল। ভজহরি ধুতি, পাঞ্জাবি আর জুতো পরে এসেছে। চেহারা ওর এত বেশি বদলে গেছে যে, ওকে আর পাঁচ নম্বরের লোক বলে চেনা যাচ্ছে না। সরোজিনীর দিকে ঘুরে মাধব বলল, "ভজহরিও সতীশবাবুর মত ডব্‌সন রোডে এসে লুকিয়ে আছে, আসলে ও এ-পাড়ারই লোক।" সহসা সরোজিনী গম্ভীর হয়ে গেল। কেবল গম্ভীরই হল না, ওর একটু ভয়ও এল। পাঁচ টাকা আয় করতে এসে হাতের মূলধনটুকু না জানি ওর খরচ হয়ে যায়! সরোজিনী চুপ করে আছে দেখে মাধব জিজ্ঞাসা করল, "কি রে চুপ করে রইলি যে? কি হল?"

না কিছু হয় নি। জানো বাবা, হরিদা চুল আঁচড়েছে আমার চিরুনি দিয়ে? কোন্ চিরুনিটা জানো? সেই যে গেল বছর মাহেশের রথের মেলা থেকে তুমি কিনে এনেছিলে, সেইটে। আমি নিজে এখনো সেটা মাথায় লাগাই নি।" তারপর ভজহরির পায়ের দিকে আঙ্গুল তুলে সরোজিনীই বললে, "জুতো দেখতে পাচ্ছো? কার ওটা? তোমার।"

"ভজহরির পা কাটে নি?" জিজ্ঞাসা করল মাধব।

"না। একটু ঢিলে হয়েছে। তা হোক। তোমার সেই রুমালটা আমি জুতোর মধ্যে ভরে দিয়েছি। বুড়ো আঙ্গুলটায় তাই একটু লাগছে হরিদার। তা লাগুক, এসব পাড়ায় তো খালি পা-এ আসা চলত না বাবা?"

মাধব এবার নিজের মেয়ের দিকে ভাল করে চাইল। মনে হল তার যে,

সরোজিনীর চোখমুখেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। বোধ হয় ডব্‌সন রোডের আবদ্ধ বস্তিতে আসল সরোজিনী প্রকাশ হতে পারছিল না। বিপিন পাল রোডের ফাঁকা জায়গায় আলোর তেজ অনেক বেশি। আলোর তেজ বেশি না হলে সে এত ভাল করে সরোজিনীকে দেখতে পেত না। বিনয় মান্নার ছিট কাপড় যে কাজে লেগেছে তাও মাধব দেখতে পেলে। মাধবের ইচ্ছে করল, সরোজিনীকে বুকে টেনে নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে একটু আদর করে। লুকু দিদির চেয়েও সরোজিনীকে অনেক বেশি সুন্দর বলে মনে হচ্ছে আজ। মা-মরা মেয়েটার জন্যে মাধব যেন বড়সাহেবের ফটকে দাঁড়িয়ে নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করতে লাগল।

সরোজিনী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, মাথা পিছু ওরা পাঁচ টাকা করে দেবে তো?"

কোন্ এক নতুন বিশ্ব থেকে ফিরে এল মাধব। হঠাৎ-আসার অন্যমনস্কতা জড়িয়ে গেল ওর কথার সুরে। সে বললে, "এ্যাঁ? পাঁচ টাকা? পাঁচ টাকা কেন?"

"তুমি কাল বললে যে, 'তত্ত্ব' যারা নিয়ে যাবে তারা সবাই পাঁচ টাকা করে পাবে?"

"বড়সাহেব তাই তো বলেছেন। কিন্তু আমি ভাবছি, তোদের আমি কোন 'তত্ত্ব'ই মাথায় তুলতে দেব না।"

'তত্ত্ব' মাথায় তুলতে না দেবার নিশ্চয়তা মাধবের কথায় আর একটু বেশি হলেই সরোজিনী কেঁদে ফেলত। কেঁদে না ফেললেও, প্রায় কেঁদে ওঠার মত সুর করে সে জিজ্ঞাসা করল, "কেন তুলতে দেবে না বাবা? আমরা তবে এত কষ্ট করে এত দূরে এলুম কেন?"

"কষ্ট আর বেশি কি, বাসে চেপেই তো এসেছ মা।"

"না, না, তা হয় না বাবা—" সরোজিনী একবার বাঁ পা একবার ডান পা ওপরে নিচে তুলে বলতে লাগল, " 'তত্ত্ব' আমরা নিয়ে যাবই। কেন নেব না বাবা? কেন তবে এলুম?"

মাধব কোন জবাব দিতে পারলে না। অত তাড়াতাড়ি আজ সে জবাব দিতে পারতও না।

বড়সাহেব এসে উপস্থিত হলেন ফটকের সামনে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মাধব, এত দেরি করলি যে? ও, মাছ নিয়ে এসেছিস দেখছি! বাঃ কি চেহারা! চমৎকার!"

ভজহরি একটু দূরে সরে দাঁড়াল। সরোজিনীও সরে গিয়ে দাঁড়াল ভজহরির পাশে।

নতুন বিশ্ব স্থষ্টির মাতলামিতে পেয়ে বসেছে মাধবকে। হঠাৎ সে এবারেও কোন জবাব দিতে পারল না। বড়সাহেব তাই বললেন, "কি রে চুপ করে আছিস যে?"

"কি বলব স্যার, আপনার পছন্দ হয়েছে তো?"

"তোর হয় নি? এর চেয়ে ভাল মাছ বোধহয় আজ পর্যন্ত ডাঙায় ওঠে নি। ফাস্ট´ ক্লাশ! চল্। ভেতরে নিয়ে আয়। আর সময় নেই। এক্ষুনি রওনা হতে হবে। তোর মেয়ে আসে নি? আর সব লোক কই? ছটো মাছ একটা ঝুড়িতে সাজিয়ে দে। কত ওজন হবে?"

"এক মনের চেয়ে আধসের কম স্যার।"

"বুঝতে পেরেছি। তাহলে তো বাঙালীবাবু দিয়ে কাজ চলবে না মাধব? কুলী চাই, মানে রাস্তার কুলী না হলে তো এক মন মাথায় তুলতে পারবে না। কিন্তু লুকু দিদিমণির শ্বশুর বাড়ীতে ওরকম নোংরা কাপড়-পরা রাস্তার কুলী পাঠাই কি করে? সাজিয়ে গুজিয়ে নিতে গেলে তো খরচ অনেক বাড়বে। আরে ঐ বুঝি তোর মেয়ে? বাঃ—"

বড়সাহেব এসে দাঁড়ালেন ফটকের বাইরে। সরোজিনীর দিকে চেয়ে বললেন, "বাঃ বেশ হয়েছে তো মেয়েটা! কত বয়স হলো ওর?"

"ষোলো পার হচ্ছে স্যার।"

"এদিকে আয়, এদিকে আয় শিগগির।"

সরোজিনীকে ধরবার জন্যে বড়সাহেব হাত বাড়ালেন। বাড়ালেন বেশ

একটু লম্বা করেই। সরোজিনী আসতে দেরি করছে বলেই বোধ হয় বড়সাহেব এগিয়ে এলেন সরোজিনীর কাছে। প্রাচীরের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভজহরি। বড়সাহেব তাকেও এবার দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন ভজহরির লম্বা লম্বা হাত এবং বুকের ছাতি। গর্দানের দিকেও চোখ গেল তাঁর। খুব বলিষ্ঠ গর্দান বলেই মনে হল বড় সাহেবের। ভজহরির হাতের, বুকের এবং গর্দানের বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করতে গিয়েই, বড়সাহেব সরোজিনীকে লক্ষ্য করতে ভুলে গেলেন। তিনি মাধবের দিকে চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কে রে মাধব ?"

মাধব কোন কথা বলবার আগেই ভজহরি এগিয়ে এল বড়সাহেবের সামনের দিকে। সে বললে, "আজ্ঞে, আমি ভজহরি। 'তত্ত্ব' নিয়ে যাবার জন্যে মাধবদা আমায় ডেকে নিয়ে এসেছেন। এক মন বোঝা আমি বইতে পারি।"

"রিয়েলী ?" বড়সাহেবের মুখ দিয়ে ইংরেজী বেরুল, কেন বেরুল ভজহরি তা বুঝতে পারল না।

বেলা দশটার একটু আগেই মিছিল রওনা হল বড়সাহেবের বাড়ি থেকে। মেয়ে ও পুরুষ-মানুষ মিলে প্রায় পঞ্চাশ জন চলল লাইন বেঁধে। একজনের পিছনে আরেকজন। ভজহরি সবার আগে। তার আগে মাধব। মাধবের সম্মান আলাদা। সে চলেছে আগে আগে পথ দেখিয়ে। মাথায় তার 'তত্ত্ব' নেই, পাগড়ি আছে। সরকারি পাগড়ি।

ভজহরির মাথায় এক মন মাছ। রুই মাছ। পাকা রুই। জুতোটা ঢিলে বলে ভজহরি ঠিক জুত করে পা ফেলতে পারছে না। আলগা করে তুলে তুলে পা ফেলছে সে। পল্টনদের বুট জুতোর মত ঢব্ ঢব্ শব্দ হচ্ছে ভজহরির জুতো থেকে। সরোজিনী ঠিক ওরই পিছনে ছিল। সরোজিনীর মাথায় সন্দেশের থালা। পেছন থেকে সে ভজহরির পা-এর দিকে চেয়েছিল। চলতে ওর কষ্ট হচ্ছে বলেই মনে হল সরোজিনীর। রাসবিহারী এভিন্যু পার হওয়ার সময় সরোজিনী লাইন ভেঙ্গে দাঁড়াল এসে ভজহরির পাশে। লাইনের দীর্ঘতা একটু

কমে গেল বলে বড়সাহেবের সম্মানে হয়তো আঘাত লাগবে একটু, কিন্তু কথা বলার সুবিধে হল সরোজিনীর। চলতে চলতে সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না হরিদা?"

ঝুড়িসুদ্ধ মাথাটা ঘুরিয়ে ভজহরি জবাব দিলে, "কষ্ট? কই না-ত! কষ্ট তোমারই হচ্ছে সরোজিনী। তোমার থালাটা দাও না আমার ঝুড়ির ওপর চাপিয়ে? মাথা নিচু করব?"

"না হরিদা। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তোমাকে না নিয়ে এলেই ভাল হতো।"

"কেন? আমি কি দোষ করলুম?"

"দোষ নয় হরিদা, এই মিছিলের সঙ্গে তুমি ঠিক খাপ খাওনি। মনে হয়, তুমি আমাদের থেকে আলাদা।"

"এ তোমার দেখার ভুল।"

এই সময় মাধব হাঁক দিল, "এসে গেছি প্রায়। কেউ যেন লাইন না ভাঙ্গে, হুঁশিয়ার।" সরোজিনী ভয় পেয়ে দাঁড়াল এসে ভজহরির পেছনে।

যতীন দাস রোড থেকে একটা সরু রাস্তা গিয়ে পৌঁছেচে বাড়ি পর্যন্ত। বাড়িটা লুকু দিদির ঠিক শ্বশুর বাড়ি নয়। কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি। বিয়ের জন্যেই পাটনা থেকে লুকু দিদির শ্বশুর-শাশুড়ী ইত্যাদিরা এসে এখানে উঠেছেন। দু-একদিনের মধ্যেই এঁরা চলে যাবেন পাটনায়। লম্বা মিছিল এসে দাঁড়াল এই সরু রাস্তাটার ওপরেই। একতলা থেকে তিন তলা পর্যন্ত তিনটে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেল বাড়ির সব লোক। তারা সব মিছিল দেখছে। লুকু দিদির বর একতলার বারান্দায়ই ছিলেন। মাধব তাঁকে সেলাম দিল। অফিসিয়াল সেলাম। ভজহরি ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সবার সামনে। লুকু দিদির বরের ঠিক পাশেই। মাধবের মনে হল, ভজহরির পাশে লুকু দিদির বরকে ঠিক মানাচ্ছে না। ভজহরি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। মাধবের ইচ্ছে হল, ভজহরিকেও একটা সেলাম সে দেয়। দিলও। অফিসিয়াল নয়, আন্তরিক।

বাড়ির চাকর বাকর-রা এসে জিনিসপত্র সব নামিয়ে নিল। নিয়ে গেল ভেতরে। কোন্ তলায় নিয়ে রাখল সব মাধব তা দেখতে পেলে না। পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সে পালন করেছে, অতএব মাধব পুনরায় তার পাগড়ির ইঞ্চি দুয়েক নিচে হাত ঠেকিয়ে বললে, "সেলাম হুজুর—" লুকু দিদির বর বললেন, "তোমরা কেউ চলে যেও না।"

সরোজিনীর স্ফূর্তি দেখে কে! মাধবের কাছে এগিয়ে এসে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, মাথা পিছু পাঁচ টাকা করে দেবে তো?"

"পাটনার সমাজে এঁরা নাম করা লোক। দেবেন নিশ্চয়ই।"

"যদি না দেন তবে কি করব?"

"ওঁরা যা দেন তাই নিতে হবে মা। এটা তো মজুরি নয়, বকশিশ।"

"হলই বা বকশিশ, হাজার হাজার টাকা খরচ করলেন ওঁরা, দু-একশ টাকা আমাদের দেবেন না কেন?"

"না দিলে আমরা কিছু বলতে পারিনে মা। বললে, বড়সাহেবের অপমান হবে। বড়সাহেবের চেনায়-ই তো আমাদের ওঁরা চেনেন।"

এই সময় দু-তিনটে চাকর হাতে কলাপাতা নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সরু রাস্তার ওপর কলাপাতা ফেলতে ফেলতে একজন বললে, "এই, তোমরা সব বসে পড়ো। বসে পড়ো।"

"কোথায় বসব বাবা?" জিজ্ঞাসা করল সরোজিনী।

"বোধ হয় আসনগুলো রয়েছে তিনতলার ছাদে। কাজকর্মের ভিড়ে কে আবার যাবে তিনতলায় মা? এই তো আয়—"

মাধব রাস্তার ওপর হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল। বসে পড়ল সবাই। ভজহরি আর মাধবের মাঝখানে বসল সরোজিনী। সরোজিনীর হাঁটু ভেঙ্গে বসতে একটু কষ্টই হচ্ছিল। মাধব তা বুঝতে পারলো। মেয়ের দিকে মুখ করে মাধব বললে, "এ তো পাকা খাওয়া নয়, মিষ্টি খাওয়া। চটপট শেষ হয়ে যাবে।"

পাতার ওপর দুখানা করে নিমকি আর একটা করে সন্দেশ পড়ল। সরু-রাস্তার মরুভূমিতে যেন তিন ফোঁটা জল! সরোজিনীর মনের ভাব বুঝতে

পেরেই মাধব বললে, "বলেছি না খুব চটপট খাওয়া তোর হয়ে যাবে? এ ভালই হল মা। বসতে তোর খুবই কষ্ট হচ্ছে।"

ভজহরি মাথা নিচু করে নিমকি চিবচ্ছিল। মাথা তুলতে লজ্জা পাচ্ছিল ভজহরি। একটু আগেই সে অজয়কুমার বসুকে এখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। কিছুদিন আগে দিল্লী মেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় সে অজয়বাবুর মাল তুলেছিল। বর্ষাতির পকেট থেকে বেরিয়ে পড়েছিল মিনতির ফোটো।

খাওয়া শেষ হয়ে যেতেই লুকু দিদির শ্বশুর ডাকলেন সবাইকে। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন রোয়াকের ওপরে। মাধবের হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলেন। মাধবের এখানে আলাদা সম্মান। সম্মান তার পাগড়ির। টাকা পেয়ে মাধব বললে, "সেলাম হুজুর।" তারপর তিনি প্রত্যেক-কে ডেকে ডেকে টাকা দিতে লাগলেন, কিন্তু মাথা পিছু এক টাকা।

সরোজিনীর হাত কাঁপল টাকা নিতে। হাত কাঁপল লজ্জায় এবং রাগে। টাকাটা নিতে দেরি করছে দেখে, মাধব সরোজিনীর হাতটা এগিয়ে ধরল সামনের দিকে। সে নিজেই একরকম জোর করে টাকাটা গুঁজে দিল সরোজিনীর মুঠোর মধ্যে। মিছিল ভেঙ্গে গেল। সবাইকে লাইন করে নিয়ে আসবার দায়িত্ব ছিল মাধবের। কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম সে পায় নি বড়সাহেবের কাছে।

একটু পরেই মাধব শুনতে পেলে, কে একজন যেন ভজহরিকে ডাকছে। শুনতে পেল সরোজিনীও। তিন জনেই এক সঙ্গে দোতলার বারান্দার দিকে চোখ উঁচু করে চেয়ে রইল।

"হরিদা, একবার ওপরে আসবে।"

"কে এই মেয়েটি হরিদা?" জিজ্ঞাসা করল সরোজিনী।

"মিনতি।" মাথা নিচু করে জবাব দিল ভজহরি।

"উনি তোমায় ডাকছেন, দেখা করে এসো।"

"যাব?" সরোজিনীর কাছে অনুমতি চাইল ভজহরি।

"নিশ্চয়ই যাবে। আমরা দাঁড়াচ্ছি, তুমি কথা শুনে এস।"

রোয়াকের তলায় জুতো খুলে রাখল ভজহরি। রেখে সে চলে গেল ভেতরে। মাধবের মনে হল, ভজহরি দোতলারই মানুষ। ওকে বড্ড বেশি স্বাভাবিক দেখাল ভেতরে যাওয়ার সময়। বড্ড বেশি ভয় হল সরোজিনীর মনে। পাঁচ মিনিট কাটল, কাটল দশ মিনিট। দশটা মিনিট-ই বেঁচে থাকবে, থাকবে না ষোলটা বছরের অগুনতি মিনিটের মিছিল। নিরর্থক এই মিছিল, কেবল ভিড়, ভিড় আর ভিড়! এই দশটা মিনিট কেবল ভিড় থেকে আলাদা হয়ে রইল। সরোজিনী অস্থির হল না। হল স্থির। বরফের মত জমে গেল দশ মিনিটের মধ্যে। নতুন কাহিনী রচিত হচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে নতুন ব্যথা। ভ্রূণের আর্তনাদ বোবা হয়ে গেল। তীব্রতম ব্যথার শেষ মুহূর্তটা বহন করছে দশ মাসের কেন্দ্রীভূত ভার।

পাঁচ টাকার ঋণ শোধ করবার জন্যে আয় করতে না এলেই পারত সরোজিনী। ঋণ শোধ দেয়া উচিত, কিন্তু সব রকমের ঋণ শোধ দেওয়া যায় না। ঋণের জগতেও জাতিভেদ আছে। তন্ময় হয়ে মিনিট গুনছিল সরোজিনী।

মাধব ওর তন্ময়তা দিল ভেঙ্গে। সে বললে, "চল মা, আমরা যাই।"

"হরিদা যাবে না?"

"বোধ হয়-না।"

"কেন বাবা?"

"ভজহরি ভদ্রলোক।"

মেয়ের হাত ধরে মাধব ঘুরে দাঁড়াল যাওয়ার জন্যে। কিছুটা দূর এগিয়েও গেল। হঠাৎ সরোজিনী মাধবের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেল রোয়াকের দিকে। ভয় পেয়ে মাধবও এল ওর পিছু পিছু.

"কোথায় যাচ্ছিস? দোতলায় উঠতে পারবি নে।" মাধবের গলার স্বর ভেজা।

সরোজিনী ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "জুতো জোড়াটা নিয়ে আসছি। হরিদার পায়ে এ-জুতো আর লাগবে না বাবা।"

দু-পাটি জুতো হাতে ঝুলিয়ে সরোজিনী চেপে বসল আট নম্বর বাসে। বাসে উঠে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কখন আসছ বাবা ?"

"বড়সাহেবকে সেলাম জানিয়ে ফিরতে আমার ঘণ্টা তিন লাগবে। রুই মাছের হিসেব তাঁকে দেয়া হয় নি।"

চোদ্দ নম্বরের দরজা খোলা রেখেই সরোজিনী এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ইচ্ছে করছিল, খুব কাঁদবে ও। কিন্তু কাঁদলেই বা এখন চলবে কি করে ? উনোন ধরাতে হবে না ? রান্নার যোগাড় দেখতে হবে না ওকে ? যতীন দাস রোডের নিমকি চিবিয়ে তো দিন কাটবে না। সরোজিনী তবু ভাবলে, অন্তত দশ মিনিট সময় সে আরও নষ্ট করবে। নষ্ট করবে কেঁদে। ভেতরের ময়লা সাফ করে ফেলাই ভাল।

হঠাৎ সরোজিনীর নজর পড়ল সনাতনের-দেওয়া বইগুলোর ওপর। হাড়গিলের মত সরু সরু বইগুলো যেন খোঁচা দিতে লাগল সরোজিনীর চোখে। কি হবে বই পড়ে ? জীবনের ইসকুলে ক ক্লাশ-ই বা আর সে উঠতে পারবে ? বিয়ের পরে, সনাতনের জন্যে ভাত রাঁধতে রাঁধতে তার জীবন কাটবে। দোতলায় সে কোনদিনই উঠতে পারবে না। দোতলায় না উঠতে পারলে, ভজহরিকে নিয়ে এতদিন সে স্বপ্ন দেখল কেন ? বইগুলো বোধহয় ওর আরও আগে থেকে পড়া উচিত ছিল। হরিদার কথাই ঠিক। জ্ঞানের রাজ্যে উঁচু-নিচু নেই, নেই একতলা দোতলা। সবাই সেখানে একই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু আজ থেকেই যদি সে ভাল করে লেখাপড়া শেখে তবে কি হরিদা ওকে ভাল-বাসবে না ? নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। এই ভেবে সরোজিনী বিছানা থেকে উঠল। বইগুলো তুলে নিল হাতে। এক্ষুনি উনোনটা না ধরালেও চলবে।

বাইরে থেকে ডাকল সনাতন, "মাধবদা আছেন না কি ?"

"না, বাবা নেই।"

"ওঃ, সরোজিনী। তোমার খোঁজে এসেছি।"

"ভেতরে এস না সনাতনদা।"

"না, তুমি-ই বাইরে এস।"

দু-দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "হাতে ওটা কি তোমার ?"

"খাতা পেন্সিল। এই নাও—"

নিতে দ্বিধা করছিল সরোজিনী। সে বললে, "ঋণ আমার প্রতিদিন বেড়েই যাচ্ছে সনাতনদা। তোমার পাঁচটা টাকাও বোধ হয়—"

বাধা দিয়ে সনাতন বললে, "আমার কাছে তোমার কোন ঋণ নেই। আমি চাই একটা পয়সাও যেন অপব্যয় না হয়। টাকার ইতিহাসকে বাদ দিয়ে সভ্যতার ইতিহাস কোন দিনও সম্পূর্ণ হবে না।" এই বলে সনাতন পকেট থেকে অনেকগুলো টাকা বার করে সরোজিনীর হাতে দিয়ে পুনরায় বললে, "আজ থেকে আমার টাকার হিসেব তোমায় রাখতে হবে। খাতা পেন্সিল রইল। সরোজিনী, এর মধ্যে কোন গোপন উদ্দেশ্য নেই। এ একেবারে হাতেনাতে শিক্ষা গ্রহণ করা। লাভ লোকসান খতিয়ে দেখব পরে। টাকা হচ্ছে ভগবান, হিসেব যদি শিখতে পারো, তবে ধর্ম তোমার শেখা হল। আমার নিজের ভগবানকে ছেড়ে দিলুম তোমার হাতেই।"

সনাতন সরোজিনীর জবাব কিংবা মতামত শুনবার জন্যে আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। সরু সরু কখানা বই, খাতা, পেন্সিল আর কতকগুলো সরকারি মার্কা দেওয়া কাগজের ভগবান হাতে নিয়ে সরোজিনী দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত ভাবে। নূতন ধর্ম জন্ম নিচ্ছে সরোজিনীর হাতে, খাতা ও পেন্সিলের সমন্বয় সাধনে।

ভজহরি দোতলা থেকে নেমে এল এক টুকরো কাগজ হাতে নিয়ে। এল প্রায় এক ঘণ্টা বাদে। রোয়াকের তলায় জুতো খুঁজতে গিয়ে সে দেখলে, জুতো সেখানে নেই। নেই সরু রাস্তার কোথাও।

মিনতির ঠিকানা-লেখা কাগজখানা হাতে নিয়ে সে পড়ল এসে বড় রাস্তায়।

রাস্তা এবার কেবল দীর্ঘ হল না, হল জটিল। এ-রাস্তার সুরুটা ওর জানা আছে, কিন্তু শেষটা ওর জানা নেই। হয়তো জানতে হবে।

এক্ষুনি ডব্‌সন রোডে ফিরবার দরকার নেই কিছু। ডব্‌সন রোডের রাস্তা ওর পরিচিত। নতুন রাস্তার নির্মাণ-শিল্প এবার ওকে বুঝে দেখতে হবে। বুঝে দেখবার জন্যেই বোধ হয় ভজহরি বসল এসে বড় রাস্তাটার ওপাশে, দেশপ্রিয় পার্কে। জুতোর ওজন কমে গেছে। পা গুটিয়ে বসল সে বেঞ্চিটায়। ফিরে গেল নতুন রাস্তার সুরুতে—কাটা-বাংলার পূর্ব অংশে।

চতুর্থ খণ্ড

যা ঘটে তাই তো ভাগ্য, আর কোন কিছুই শুধুশুধু ঘটে না।

ভাগ্যের পরিকল্পনা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। হাতের চেটোয় ভাগ্যরেখা যাই বলুক না কেন, বৌরানী সে সব বিশ্বাস করে না। হাত যখন তার নিজের তখন হাতের রেখাগুলো সে ভাগ্য-গণকদের হাতে ছেড়ে দেবে কি কারণে?

ছেড়ে না দিয়েও তো বৌরানীর কোন স্থবিধে হল না। যে-পথে সে তার জীবনটাকে চালাতে চেয়েছে সে-পথে জীবন তার চলেনি। হাতের রেখা-গুলোই বোধ হয় বার বার করে সৃষ্টি করে বিপরীত পরিস্থিতি, ওঠে ঝড়। বৌরানীর শাসন-সংযত উদ্ধত অস্বীকৃতি হাতের রেখার মধ্যেই আবার মাথা কুটে মরে। মনে হয়, বিরাট এই নাগ বাড়িটাই কেবল কয়েদ খানা নয়। ছোট বড় অসংখ্য কয়েদখানা গড়ে উঠেছে বৌরানীর চারিদিকে। তবুও নাকি স্বামী ভাগ্য তার ভাল!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৌরানী তার বাঁ হাতের রেখাগুলো দেখতে লাগলো। পণ্ডিতদের বিগত দিনের গণনাগুলো এই সব রেখাভ্যন্তরে মাথা গুঁজে নির্মম নৈঃশব্দ সৃষ্টি করেছে। করবাশ্রিত নৈঃশব্দের মত করুণ! হাতের চেটোয় পড়ে রয়েছে করুণার কারাগার!! নাগবাড়ির দেয়ালগুলো ভেঙ্গে ফেললেও, এ-কারাগারের প্রাচীর সে ভাঙ্গতে পারবে না। নাগবাড়ির বৌরানী দাঁড়াতে পারবে না এসে গড়পারের রাস্তায় বেলারানী হয়ে।

দাঁড়াতে সে চেয়েছিল। গড়পারের সবকিছু ভাল লাগে বৌরানীর, ভাল লাগত মালবিকাদের ভাঙ্গা বাড়িখানা। উনবিংশ শতাব্দীর ইঁটগুলোর মধ্যে সে দেখতে পেয়েছিল একটা চারিত্রিক বলিষ্ঠতা। জব চার্ণকের কীর্তির চেয়েও

বড় ছিল মালবিকাদের বাড়ি। ভাড়াটে বাড়ি, তা হোক দেবেশ থাকত এইখানেই।

নাগবাড়ির বারান্দাটি যেন নিমেষের মধ্যে মালবিকাদের সেই নড়বড়ে বারান্দার মত মনে হল। খালি গেলাস হাতে নিয়ে সুকুমারী যেন আজো ঐ গড়পারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। মুহূর্তের মধ্যে বৌরানী বেলারানী হল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না বটে, কিন্তু গড়পারে সেদিন ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্ধ্যের একটু পরেই হরিলালবাবু বেরিয়ে গেলেন বাইরে। কোন্ এক হোটেলে খানা খেয়ে বাড়ি ফিরতে তাঁর অনেক রাত হবে। বেলারানী একাই ছিল বাড়িতে। মালবিকা এল সেই সময়। এসে বললে, "দাদা আসবে মার সঙ্গে দেখা করতে, তুই যাবি ?"

কোমরে আঁচল বাঁধল বেলারানী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করবার শৌর্য তার ফুটে উঠল প্রতি অঙ্গে। বাসবদত্তার অভিসার এ নয়। এ হচ্ছে মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়ের বিপ্লব-সাধনা। রাজা দুষ্মন্তের জন্যে এরা কখনো ব্রত পালন করে নি। ফেরারী আসামী দেবেশ দত্তের জন্যে করেছে। দেবেশদা বিপ্লবী। বাংলার আধুনিক ইতিহাস শকুন্তলা-দুষ্মন্তের ইতিহাস নয়— বেলারানী-দেবেশ দত্তর ইতিহাস—বাংলার ইতিহাস। দেবেশের ছবিখানা বই-এর ভাঁজ থেকে বার করে বেলারানী রাখল তার টেবিলের ওপর। আধুনিক কালের এক টাকার আটখানা ফোটোর একখানা এ নয়। এর দাম পাঁচ টাকা। খরচ করে ছবিখানা তুলিয়েছিল বেলারানী। জলখাবার না খেয়ে ওকে জমাতে হয়েছিল আশি আনার প্রতিটি আনা।

ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বেলারানী জিজ্ঞাসা করল, "পুলিশ যদি টের পায় ?"

"বোধ হয় পাবে না। তেমন সম্ভাবনা থাকলে, দাদা নিশ্চয়ই মার সঙ্গে দেখা করতে আসত না।" বললে মালবিকা।

"কিন্তু—" বেলারানী কি যেন ভাবছিল, "কিন্তু আমাকে তো দেবেশদা দেখতে চায় নি ?"

"চেয়েছে। সে যদি তোর সঙ্গে দেখা করতে না চাইত, তা হলে রাত করে তোর কাছে ছুটে এলুম কেন রে ? দাদা অসুস্থ।"

"কি অসুখ ?"

"তা কিছু জানায় নি।"

দরওয়ান চন্দন সিং-কে সঙ্গে নিয়ে বেলারানী চলে এল গড়পারে। চন্দন সিং বসে রইল দরজার সামনে। পেছনের দিকের রাস্তা দিয়ে মালবিকা বেলা-রানীকে নিয়ে পুনরায় পড়ল এসে গড়পারের রাস্তায়। একটু হেঁটে মাণিক-তলার রাস্তা পার হল ওরা।

"দেবেশদা, একি চেহারা হয়েছে তোমার ?" অচেনা বাড়ির ঘরের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল বেলারানী। বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে, অগ্রপশ্চাৎ ভাবে নি, সুখ-দুঃখের সাংসারিক সংঘাত অগ্রাহ্য করছে দেবেশদা অবলীলাক্রমে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের বাইরে সে তার নিজের ভবিষ্যৎকে আলাদা করে ভাবে নি। স্বদেশপ্রেমই তার একমাত্র প্রেম যার মধ্যে দেবেশদার ভবিষ্যৎ, সংগ্রামের আগুনে তিলে তিলে পুড়ে যাচ্ছে। দেবেশ দত্তের ভবিষ্যৎ-ভস্ম গায়ে মেখেছে বেলারানী। তার নিজের জীবনের সবটুকু উত্তাপ ভস্মাদিত দেবেশদার ভবিষ্যতের অংশ ছাড়া আর কিছু নয়।

"আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।" এই বলে মালবিকা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

"তোমার কি অসুখ হয়েছে দেবেশদা ?"

"অসুখ আর কি, ফেরারী আসামীর জীবন তো স্বাভাবিক নয়।"

"তুমি ফেরারী বটে, কিন্তু আসামী নও।"

"রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, অতএব—"

বাধা দিয়ে বেলারানী বললে, "অতএব তুমি বিপ্লবী দেবেশদা।"

"ওরা আমাদের আসামী ছাড়া আর কিছুই বলবে না বেলারানী। রাষ্ট্রের আইন না মানলেই অপরাধী হতে হয়।"

বেলারানী সহসা কোন জবাব দিল না। দেবেশের মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে একটু পরে সে বলল, "কোন আইনই শেষ পর্যন্ত কারু উপকারে আসে না, কেবল ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর ছাড়া। সাতজনকে নিয়েও গোষ্ঠী হয়, আবার সাত কোটিকে নিয়েও হতে পারে।"

"এ-কথা কেন বলছ বেলারানী ?"

"দেবেশদা, ইতিহাস পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ক্ষমতার বিষ সভ্যতার রক্তকে বার বার করে কলুষিত করেছে, অনেকটা সাদা আর্সেনিকের মত। মুষ্টিমেয়র ক্ষমতার বিষ ক্রমে ক্রমে মানুষকে পঙ্গু করে ফেলে। পঙ্গুতা যখন নির্মম হয়ে ওঠে, তখনই আসে বিপ্লবের মুহূর্ত। মানুষ তার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষে করবার জন্যে ঘটায় রক্তপাত। কিন্তু তোমাদের বিপ্লব তো মানুষের জন্যে নয়, রাষ্ট্রের জন্যে !"

সোজা হয়ে উঠে বসল দেবেশ। বেলারানীর দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "ক্ষমতাকে বিষাসক্ত করবার জন্যেই কি আমরা আজ এতগুলো লোক জীবন দিতে বসেছি ? ক্ষমতার লোভে তো আমরা সংগ্রাম করছি না বেলারানী ?"

"সেই জন্যেই তো তোমাদের এত ভালোবাসি ! তোমার ভবিষ্যতের বাইরে আমি তাই আমার নিজের কোন আলাদা ভবিষ্যৎ দেখতে পাইনে দেবেশদা। কিন্তু এতগুলো জীবনের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা-মুক্তো তোমরা সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে, কালক্রমে অপরের হাতে সেটাই হয়ে উঠবে ক্ষমতার বিষ। সমাজের সাধারণ লোকগুলো সেই জন্য চিরদিনই দুঃখ ভোগ করে এল। সভ্যতার ইতিহাসে আমি তো এর চেয়ে বড় অসভ্যতা আর কিছুই দেখতে পাই নে দেবেশদা।"

"বেলারানী, তোমার কথার মধ্যে যেন বৃহত্তর বিপ্লবের সুর আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"কি জানি, আমি বোধ হয় অতদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি নে। তোমাদের

বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সেদিন কেবল গড়পারের রাস্তাটাই দেখতে পেয়েছিলুম। সুকুমারীর খালি গেলাসটার মধ্যে সভ্যতার মুখোসটা যদি অমন করে খুলে না পড়ত, তবে আমি বোধহয় কেবল ইংরেজের প্রভুত্বকে ভারত-ইতিহাসের সব চেয়ে কুৎসিত পরিচ্ছেদ বলেই ভাবতুম। ইংরেজদের প্রভুত্ব লোপ পাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতেও সুকুমারীর গেলাসটায় এক বিন্দু দুধের সঞ্চয় থাকবে না। থাকবে না এই জন্যে যে, নতুন ক্ষমতার চাবুক আবার এসে পড়বে রাস্তার ঐ সাধারণ মানুষটার পিঠে। ব্রাহ্মণের চাবুক থেকে সুরু করে জমিদারদের চাবুকের আঘাত এসে পড়ছে রাস্তার ঐ সাধারণ মানুষটার চামড়ায়। ইংরেজ-বিতাড়নেও কি ঐ দাগগুলো মুছে যাবে দেবেশদা ?"

হকচকিয়ে গেল বিপ্লবী দেবেশ দত্ত। অনুশীলন সমিতির মত অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো যেন ওর সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল ভাঙ্গা ভাঙ্গা উপল খণ্ডের মত। গুলি খেয়ে কদিন আগেই তো ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মরে গেছে। অন্য একটা ম্যাজিস্ট্রেটের সেই শূন্য চেয়ারটায় এসে বসতে সাতদিনও সময় লাগে নি! কোথাও যেন কিছু একটু দাগ লাগে নি। ক্ষতি হয় নি শাসনতন্ত্রের —শহরের স্বাভাবিকতা নষ্ট হল না বিন্দুমাত্র। সবটুকু আলোড়ন কেবল দেবেশের গায়ে লাগল, অংশ নিল বেলারানী বসু। বিপ্লবী দেবেশ দত্তের চোখে এবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গেল উবে। উবে গেল এই জন্যে যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পেছনে সে অন্য একটা বৃহত্তর অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছে, ক্ষমতালোভী মানুষের দুটো বড় বড় চোখ। সে দেখতে পেয়েছে ইতিহাস। সে-ইতিহাসের পাতাগুলোতে লেপ্টে রয়েছে বর্ণাশ্রম ধর্মের ক্লেদাক্ত মসী, সম্রাট-বাদশাহ্‌দের কীর্তি-কালির ক্রম কলঙ্ক। সোজা হয়ে বসে দেবেশ দত্ত ইতিহাসের পাতা ওলটাতে লাগল। রাজনীতির সাময়িকতা পার হতে লাগল অতি দ্রুত। রাজনীতি বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে সমাজতত্ত্ব। জমিদার এল। এল মধ্যবিত্ত। জমির কৃষ্টি ধরে বসে রইল চাষী। জমিদার-অক্ষের চারদিকে ঘুরতে লাগল বাংলার কৃষ্টি-জগৎ। বেশি দিন লাগল না, দু-শ বছর পার না হতেই ক্ষমতার বিষ ফুটে বেরুতে লাগল সমাজদেহের প্রতি রোমকূপ দিয়ে। গ্রন্থিগুলো যেন এরই মধ্যে

ফুলে ফুলে উঠেছে—পক্ষাঘাতের অবশ মুহূর্ত প্রায় সমাগত! কেন হল, কেমন করে হল? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোথায়? কোথায় ছোটলাট আর বড়লাট-রা? গুলি-খাওয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অপরাধ কতটুকু ছিল? কাউকে আর দেবেশ দত্ত দেখতে পাচ্ছে না। সে দেখতে পাচ্ছে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার হস্তান্তর—গোষ্ঠীর স্বৈরাচার। ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠায় এসে তাও বুঝি বদলে গেল। পরিবর্তনের ঢেউ সারা ইতিহাসের বুক জুড়ে কতো কল্লোলই না তুললে। ভেঙ্গে দিলে সমাজ-সৈকতের এপার-ওপার। কিন্তু রাস্তার ঐ সাধারণ মানুষ-টার কোন পরিবর্তনই হল না—দুঃখী জনতার বুকে জমাট বেঁধে গেল ব্যথার ভাঙ্গন। সর্বস্ব খুইয়েও যেন তার সর্বোচ্চ স্তরে মাথা এসে ঠেকছে! ঠেকছে নিশ্চয়ই, নইলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উপলখণ্ডের ফাঁক দিয়ে সে আজ বিছানায় বসে সেই সর্বোচ্চ চূড়ার নিঃশব্দ-বিপ্লব দেখতে পেত না। বেলারানীর বিপ্লবে রক্তপাত নেই!

কিন্তু দেবেশ দত্তের আর ফিরবার পথ নেই। মধ্যবিত্তের রক্ত দিয়েই মধ্যবিত্তের পাপ তাকে মুছে দিতে হবে। তারপর কি হবে দেবেশ তা জানে না। ক্ষমতার বিষ এক হাত থেকে কিংবা কোটি হাত থেকে চুইয়ে পড়বে কিনা তার জ্যোতিষী-গণনা দেবেশ দত্তের জ্ঞানের বাইরে। বিদ্রোহের পতাকা যখন সে একবার উড়িয়ে দিয়েছে, তখন এ-পতাকা তাকে বহন করতে হবেই।

বিপ্লবী দেবেশ শুয়ে পড়ল। বড্ড পরিশ্রান্ত বোধ করছে সে। রাজনীতির পতাকা বলে বড্ড ভারী মনে হচ্ছে, মাথার গৌরব-মুকুট বোঝা হয়ে উঠেছে। পতাকার চেয়ে বেলারানীর হাতের আরাম বুঝি অনেক বেশি। শুয়ে পড়ে দেবেশ বললে, "বড্ড মাথা ধরেছে।"

"আমি টিপে দিচ্ছি। লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, তোমার কষ্ট আমায় বেঁধে দেবেশদা। তোমার কথা আমায় চব্বিশ ঘণ্টাই ভাবতে হয় বলে, আই. এ. পরীক্ষাটা বোধ হয় এ-বছর আমি দিয়ে উঠতে পারব না।"

"শনিবার রাত্রে আমি বাংলা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি বেলা।"

"বেলা নয়, রানী। কোথায় যাচ্ছ দেবেশদা ?"

বেলারানীর হাতটা টেনে নিল দেবেশ। ভারত মাতার বিদ্রোহী সন্তান ক্রমে ক্রমে ভুলে যেত লাগল রক্তের স্বাদ। মনে হল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বুকের গুলি ছুটো বুঝি ওর নিজের বুকেও একটা গর্ত সৃষ্টি করেছে। ইংরেজের উপনিবেশ ভেঙ্গে পড়লেও এ-গর্ত ওর বুঁজবে না। এ-গর্ত বুঁজিয়ে দিতে পারে বেলারানী, পারে ওর ভালোবাসা। বিদ্রোহীর বুকে ভেসে বেড়াতে লাগিল নূতন মন্ত্র। বেলারানীর হাতটা নিজের বুকের ওপর রেখে দেবেশ বলল, "বাংলাদেশের বাইরে যাচ্ছি, এইটুকুই কেবল জানি। কোথায় যাচ্ছি ট্রেনে না চাপলে বলতে পারব না।"

"তা হলে আর কি আমাদের দেখা হবে না দেবেশদা ?"

এ-কথার উত্তর দেবেশ কি করে দেবে ? দেখা হওয়া না-হওয়া ভাগ্যের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। হাতের গণনায় ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ভাগ্যের গণনায় ভুল কিছুতেই থাকবে না।

বেলারানী জিজ্ঞাসা করল, "যদি আর দেখাই না হয়, তাহলে সমস্তটা জীবন আমি কি নিয়ে থাকব দেবেশদা ?"

চল্লিশ কোটি মানুষ কি নিয়ে আছে সেটা বেলারানী জানতে চায় না। সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। গোষ্ঠীর গৌরবে সে গৌরবান্বিত নয়। ব্যক্তি-জীবনের স্তর থেকে বেলারানী তার সুখদুঃখের সংখ্যাগুলো গুনে গুনে দেখছে !

"একটা অনুরোধ করব, রাখবে দেবেশদা ?"

"বলো।"

"আমি তোমায় নেমন্তন্ন করতে চাই। বাবার সামনে তোমায় যেতে হবে না—আমার ঘরে তুমি বসবে।"

"কিন্তু—"

"এতে কিন্তু কিছু নেই দেবেশদা। ভারতবর্ষের একটা তুচ্ছতম ঘর, তাতে না আছে রাজনীতি, না আছে বিপ্লবের সংকেত। তবুও এ ঘরখানাতে

আমায় জীবন কাটাতে হবে। তুমি না এলে আমার ঘরের সাম্রাজ্যে আলো জ্বলবে না।”

“তা হলে, শুক্রবার রাত সাড়ে সাতটার সময় আমি যাব। খিড়কির দরজাটা খুলে রেখো।”

“তুমি সামনের ফটক দিয়েই এসো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।”

বাইরে থেকে মালবিকা বলল, “দাদা, রাত হয়ে যাচ্ছে।” এই বলে সে ঢুকে পড়ল ঘরে। বেশ একটু সময় দিয়েই মালবিকা ঢুকল। তারপর বেলারানীকে নিয়ে সে পুনরায় পার হল মাণিকতলার রাস্তা।

হরিলাল বসু হোটেলে খানা খেয়ে একটু তাড়াতাড়ি-ই সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এলেন। ফটকে চন্দন সিং-কে দেখতে পেলেন না তিনি। খবর নিয়ে জানলেন, বেলারানীও বাড়ি নেই, গড়পার গেছে দরওয়ানকে নিয়ে। কি মনে করে হরিলালবাবু এলেন বেলারানীর ঘরে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বেলারানীর ঘরে তিনি প্রবেশ করেছেন বলে মনে পড়ল না তাঁর। মেয়ে বড় হয়েছে, অতএব খবর না দিয়ে তিনি কেমন করেই বা ঢোকেন? খবর দিয়ে ঢোকার চেয়ে খবর দিয়ে মেয়েকে ডেকে পাঠানো অনেক সোজা।

আজ তিনি নিজের সুবিধে দেখেন নি। সোজাসুজি ঢুকে পড়লেন ঘরে। বর্মা টিকের খাটখানা আজও যেন নতুন দেখাচ্ছে! সাহেব-বাড়ির আভিজাত্যে বর্মা টিক জেল্লা মারছে খুব। বৌ-বাজারের আসবাবে যত ভাল টিক-ই থাক না কেন, পার্ক স্ট্রীটের আভিজাত্য তাতে নেই। হরিলালবাবু হাত রাখলেন খাটের কোণায়।

মোলায়েম লাগছে খাট। বেলারানীর মা যেন কবে মারা গেছে? সে অনেক দিন আগে। হিন্দু সমাজের আইনকানুন কি অদ্ভুত, ভাবলেন হরিলাল বসু। জীবনে যার সঙ্গে আর কোনদিনও দেখা হবে না, তাকেও ফেলে

দেওয়া যায় না, ধরে রাখতে হয় স্মৃতির সম্ভ্রম দিয়ে। এ-সম্ভ্রমের মধ্যে কেবল আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি নেই, আছে সারা জীবনের হাসিকান্নার সাবলীল সমন্বয়। তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কোন অসুবিধেই ছিল না। অসুবিধে হতো না আরও পাঁচ বার বিয়ে করার। কিন্তু···কিন্তু কি যেন একটা অসুবিধে ঘটল?

খাটের পাশ দিয়ে হেঁটে তিনি এসে দাঁড়ালেন জানালার কাছে। বাগানের অর্ধেকটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। রজনীগন্ধার মাথাগুলো বেশ লম্বা লম্বা দেখাচ্ছে। গরাদের ফাঁক দিয়ে নাকটা তিনি একটু বার করে দিলেন বাইরের দিকে। জুঁই-বেলের গন্ধ একই সঙ্গে মেশামেশি হয়ে উঠে আসছে বেলারানীর ঘরে। হোটেলের ককটেলে এমন গন্ধ পাওয়া যায় না -পাওয়া যায় না সমাজের কোন স্তরেই। শিক্ষা ও সভ্যতার সর্বোচ্চ চূড়ায় জুঁই-বেলের স্বাভাবিক সংমিশ্রণ আজও সম্ভব হল না। সম্ভব হয়ে উঠল না হরিলাল বসুর দ্বিতীয়বার বিয়ে করা।

কিন্তু সম্ভব হল না কেন? পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের চেয়ে এ-সমাজের আইনকানুনের সংখ্যা অনেক বেশি। বাইরে থেকে মনে হয়, আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে বড্ড বেশি গোঁড়ামির নিষ্ঠুরতা। সামাজিক স্তরে ধর্মের অনুপ্রবেশ অতি অল্প। অল্প বলেই মুক্তির হাওয়া সেখানে নিশ্চল, জুঁই-বেলের গন্ধ দম আটকে মারা গেল স্বল্প-সীমানার মধ্যে। কিন্তু আইনের বাঁধন যত কঠিনই হোক, এ-সমাজের মধ্যেই রয়েছে মানুষের স্বাধীন চিন্তার বৃহত্তম প্রয়াস, ভাবলেন হরিলাল বসু। চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা কঠিনতম আইনকেও অকেজো করে দিয়েছে। দিয়েছে নিশ্চয়ই, নইলে এ-সমাজ বেঁচে রইল কি করে? তিনি নিজেই বা বেঁচে আছেন কোন্ আইনের জোরে? দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিয়ে করতে পারলেন না। এতগুলো বছর একসঙ্গে বসবাস করবার পরে, তিনি কোনদিনও ভাবতে পারলেন না যে, তাঁর স্ত্রী সত্যি সত্যি পৃথিবীতে আর নেই। নেই? হরিলাল বসু ভাবলেন, পৃথিবীর আয়তন যত বড়ই হোক, তাঁর নিজের মনের চেয়ে বড়

নয় নিশ্চয়ই। স্ত্রী তাঁর বেঁচে আছে মনের পৃথিবীতে। অন্তরের আইন গ্রাহ্য করেনি সমাজের কোন আইনকেই।

গরাদের ফাঁক দিয়ে এবার তিনি হাতটা নামিয়ে দিলেন নিচের দিকে। একটা লতাগাছ এসে পৌঁছেচে বেলারানীর জানালার ও-পাশে। মাধবীলতা হাত দিয়ে ধরা যায়। ধরলেন হরিলালবাবু। আর ক-দিনের মধ্যেই হয়তো মাধবীলতা এসে লুটিয়ে পড়বে বেলারানীর পা-এর কাছে। তিনি ক-টা পাতা ও ফুল ছিঁড়লেন লতাগাছ থেকে, ছড়িয়ে দিলেন বেলারানীর বিছানার ওপর। মাধবীলতার মত মেয়ে তাঁর বাড়ছে, বাড়ছে ওপর দিকে। লতা-গাছটার মত সবুজ ও সাদার সমৃদ্ধি রয়েছে বেলারানীর দেহে ও মনে। প্রকৃতির মূলের প্রেরণা যেন মেয়ের সারা জীবনের প্রেরণা হয়, তেমন একটা প্রার্থনাও তাঁর মনের আকাশে ভেসে বেড়াতে লাগল। প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধির স্বাধীনতা, মাধবীলতাও বাড়ছে সেই স্বাধীন-প্রেরণা থেকে। কিন্তু বেলারানী? ধবধবে সাদা বিছানার চাদরের ওপর হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে হরিলালবাবু মেয়েকে মনে মনে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি কোনদিনও বেলারানীর প্রগতি-পুষ্ট জীবনস্রোতে বাধার সৃষ্টি করবেন না। মাধবীলতা ছাড়া তার নিরুক্ত প্রতিশ্রুতির সাক্ষী রইল না কেউ। মানব-সভ্যতার সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতির মর্ম উদ্ঘাটন করলেন হরিলাল বসু মাধবীলতার কানে।

জানালার কাছ থেকে সরে এলেন হরিলালবাবু। সরে আসতে বাধ্য হলেন তিনি। জ্যোৎস্না-প্লাবিত পৃথিবী মুছে যেতে লাগল, জুঁই-বেলের সত্য সরে গেল নিমেষের মধ্যে, মাধবীলতার সঙ্গে তিনি আর আদান-প্রদানের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁর দৃষ্টি পড়লো গিয়ে ঘরের পূবদিকের কোণায়।

তিনি এলেন সেখানে। হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন একটা পুরাতন পাটি। শীতলপাটিও নয়—অতি রুক্ষ ও সস্তা দরের পাটি মোড়ানো রয়েছে ঘরের কোণায়। তিনি বুঝতে পারলেন, মেয়ে তার পার্ক স্ট্রীটের খাটখানা ব্যবহার করে না। বর্মা-সেগুন কাঁঠাল কাঠের মত পরিত্যক্ত হয়েছে অনাদর ও

অবহেলায়। কিন্তু এ-অবহেলা কেন? তিনি এর কারণিক বিপর্যয় খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। এত বড় ব্যবহারজীবীর চোখে কোন কিছু গোপন করে রাখা সম্ভব নয়। হরিলালবাবু এবার বিছানার দিকে ভাল করে নজর দিলেন। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে, বেলারানী এ-বিছানায় শোয় না। চাদরটা বড় বেশি সাদা, তোশকের ওপর এতটুকু ভাঁজ পড়ে নি, বালিশের শুভ্রতা সন্দেহকে দৃঢ়তর করে। কারু সাহায্য ছাড়াই তিনি তাঁর মেয়ের গোপন জীবনটাকে গড়তে লাগলেন প্রতি পলে পলে।

মেঝের ওপর পাটি পেতে শোয় বেলারানী। কৃচ্ছ্রসাধনের চরমতম স্তর। মাধবীলতার সভ্যতা গত হয়েছে। এখন তিনি নতুন সভ্যতা গড়ছেন। এ-সভ্যতার গতি নিম্নগামী। সামাজিক স্তরের গুহায় এ আবদ্ধ। এ দুর্বলকে আঘাত করে। পদদলিত করে মানবপ্রেমের মুক্ত মুহূর্তগুলোকে, মানবতাকে ঢেকে দেয় আইনের শিরস্ত্রাণ দিয়ে। এর বাণীতে আছে অসংখ্য মারণ-অস্ত্রের শব্দকোষ। কচি পৃথিবীটাকে কেটে খান খান করবার প্রয়োগ কৌশল রয়েছে এর প্রতিটি শব্দে। সেই জন্যেই বোধ হয় পৃথিবীটা জোয়ান হতে পারলে না, কুঁচকে পড়ে রইল কোটি কোটি হরিলাল বসুর পা-এর কাছে।

তিনি এবার তাঁর দৃষ্টি মেঝে থেকে তুলে নিয়ে এলেন বেলারানীর টেবিলের দিকে। বেলারানীর গোপন জীবন স্পষ্টতর হল। দেবেশের ছবিখানা তিনি তুলে নিলেন হাতে। কোথায় যেন ছবিটা তিনি দেখেছেন? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খবরের কাগজে। কোন্ খবরের কাগজে? দিশি এবং বিলেতি কাগজে। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে হরিলালবাবু ক্রমে ক্রমে সব কিছুই স্মরণ করতে পারছেন। জানালা দিয়ে ফুরফুর করে বাতাস আসছিল। স্মরণশক্তি সাহায্য করতে লাগল তাঁকে। দেবেশ, দেবেশ দত্ত। ফেরারী আসামী। কিন্তু বেলারানীর সঙ্গে তার পরিচয় কি করে হল? গড়পারে যেন কে থাকে? মালবিকা। মালবিকার পদবী কি? দত্ত। তা হলে দেবেশ দত্ত মালবিকার ভাই। দেবেশ দত্তের কষ্টের অংশ বেলারানী নিয়েছে অতি স্বাভাবিক কারণেই। কি কারণে যেন? বেলারানী ভালোবাসে দেবেশকে।

ওর কৃচ্ছ্রসাধনের কারণিক সম্বন্ধ রয়েছে দেবেশের ভালবাসার সঙ্গে। দেবেশ ফেরারী আসামী, অতএব কষ্ট তার হবেই।

ফোটোখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে হরিলালবাবু চলে এলেন বাইরে। নিজের ঘরে এসে বাকীটুকু ভাববেন। ভাবতে লাগলেনও তিনি। আরামকেদারায় শুয়ে তিনি বাকীটুকু খুব গভীর ভাবে ভাবতে লাগলেন। সামনের দেওয়ালে স্ত্রীর অয়েল পেন্টিংখানা টাঙানো ছিল। 'আমায় তুমি সাহায্য করো প্রিয়বালা।' স্ত্রীর কাছে প্রার্থনা জানালেন হরিলাল বসু। ফোটো কথা কইল না। একমাত্র সন্তান তাঁর বেলারানী। তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিচয় বহন করবে বেলারানীর সন্তান-সন্ততি-রা। ভবিষ্যতের জন্যে তিনি আর কিছু তো রেখে যেতে পারলেন না, একমাত্র বেলারানীকে ছাড়া। পলু পোকার রেশমী সুতোর মত বেলারানীর দেহ থেকেও জন্ম নেবে নতুন জীব—তিনি বেঁচে থাকবেন সেই জীবগুলোর ক্রম-বৃদ্ধির মধ্যে। সামাজিক মানুষ এর চেয়ে বড় আশা আর কিছু করতে পারে না। রেশমী সুতোর জাল দিয়ে যে যত বেশি সুন্দর করে সংসারটাকে সাজাতে পারে, তার সার্থক সৌন্দর্যকে নষ্ট করবে কে? প্রত্যেকটি পরিবার যদি এমনি ভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তা হলে খেদ করবার আর রইল কি? বংশকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াসের মধ্যেই তো রয়েছে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। 'প্রিয়বালা, আমায় তুমি বুদ্ধি দাও।' দ্বিতীয় বার প্রার্থনা জানালেন হরিলাল বসু। বুদ্ধি এল না দেওয়ালে টাঙানো ফোটো থেকে।

সহসা তাঁর দৃষ্টি পড়ল আইন বইগুলোর ওপর। বইগুলোর মধ্যে ফৌজদারি আইনের বইখানাই আজ রাতের মত হরিলাল বাবুকে বুদ্ধি যোগাতে পারে। প্রত্যুষের কথা তিনি জানেন না। হয়তো তিনি মক্কেল-মুখরিত অফিসঘরে বসে ভুলে যাবেন দেবেশ দত্তর কথা। আজকের এই রাতটা অতি দীর্ঘ মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। কোন একটা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে বলেই বোধ হয় মুহূর্তগুলো বিলম্বিত হচ্ছে। তিনি ফৌজদারি আইনের বইখানা টেনে বার করলেন। পাতা ওলটাতে লাগলেন মনোযোগ দিয়ে। দেবেশকে বাঁচান যায়

না? প্রকাশ্য আদালতে বলা যায় কি, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যেদিন গুলি খেয়ে মারা যান, দেবেশ সেদিন হরিশ মুখার্জি রোডে নেমন্তন্ন খাচ্ছিল? ঢাকায় সে ছিল না সেদিন, ছিল বেলারানীর কাছে? বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করা যায় কি, দেবেশের সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন? 'প্রিয়বালা, আমায় তুমি শক্তি দাও।' আরাম-কেদারায় আবার তিনি এসে শুয়ে পড়লেন। এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার রাত! কালো কুচকুচে এবং কুটিল রাত। হরিলাল বসু ক্ষমতাশালী লোক। দু-দশটা মাধবীলতাকে আঙুল দিয়ে পিষে ফেলতে পারেন তিনি। প্রকৃতির মধ্যে একটু আগেই তিনি বৃদ্ধি দেখেছেন, দেখেছেন প্রকৃতির স্বাধীনতা। তিনি ক্ষমতার খুরপি দিয়ে রজনীগন্ধার বুক থেকে গন্ধ বার করতে পারেন না, মাধবীলতাকে সাজাতে পারেন না ফুলের ঐশ্বর্য দিয়ে। পারেন না সত্য, কিন্তু স্বাধীনতাকে যদি সংগঠনের সামর্থ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তবে মাধবীলতা বেলারানীর জানালার ও-পাশে এসে অপেক্ষা করবে কেন? সে তো হামাগুড়ি দিয়ে চলে যেতে পারত ফটকের দিকে। মাথা নিচু করে পড়ে থাকত চন্দন সিং-এর খাটিয়ার তলায়। সামাজিক শৃংখলা যাতে ভেঙ্গে না যায়, সেদিকেও তাঁকে নজর রাখতে হবে। বেলারানীর স্বাধীনতাকেও বেঁধে দিতে হবে সংগঠনের আইনকানুন দিয়ে। ক্ষমতার প্রয়োগ কৌশলের ওপরই সংগঠনের ভালমন্দ নির্ভর করছে।

পিতা ও কন্যার সম্বন্ধের মধ্যে কেবল ভাবপ্রবণতা নেই, আছে বংশরক্ষার পবিত্রতম নীতি। পরিবারের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব রয়েছে সন্তানের ওপর। 'তবে আমি কি করব প্রিয়বালা?' ফোটোর কাছ থেকে কোন জবাব এল না। হরিলালবাবু উঠে গিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে এলেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার রাতটা খুবই কালো বলে মনে হল তাঁর কাছে।

শুক্রবারের রাতটা বেলারানীর চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিল। রাতের চেহারাটা এত কুশ্রী কেন? মাগো, এ-অন্ধকারে সমস্ত জগৎ-সংসারটাই যে

ডুবে গেল! হরিশ মুখার্জি রোডে অন্ধকারের ঢেউ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেলারানী ভাবছে, সাঁতার দেবে না কি? কি হবে বেঁচে থেকে? দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ শ্মশানে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে প্রতিদিন। স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই সেগুলোকে হিসেবের খাতায় লেখা হচ্ছে। কিন্তু সবগুলোই কি স্বাভাবিক মৃত্যু? বেলারানী যদি আজ অন্ধকারের সমুদ্রে ডুবে মরে, সেটাও তো স্বাভাবিক বলে লেখা হবে!

রাত ন-টাও বাজে নি, রাস্তায় একেবারেই লোক চলাচল নেই। বাঘের ভয়ে বীরপুরুষরা যেন দরজা-জানালা সব বন্ধ করে বসে বসে কাঁপছে। কী হল, কেমন করে হল এমন? বেলারানী তার চারদিকে একটা লোকও দেখতে পেলে না। কেবল দরওয়ান চন্দন সিং-ই আজ বেলারানীর বুকের ঢেউ দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে বটে, কিন্তু গর্জন তার সে শুনতে পায় নি। সেও এখন কাছে নেই। লোটা কম্বল নিয়ে চন্দন সিং সরে পড়েছে। দেশে চলে যাবে বলে সে বিদায় নিয়ে গেছে। এক মাসের মাইনে সে বাকী রেখেই চলে গেল! হরিলালবাবু বাড়ি ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন বোধ করে নি চন্দন সিং। বারো বছর এক নাগাড়ে চাকরি করবার পরে, আজ তার চাকরির ওপর ঘৃণা এসেছে। ঘৃণা এসেছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর। চন্দন সিং চলে যাওয়ার পরে গোটা হরিশ মুখার্জি রোড-টাই জনহীন হয়ে গেল। ফাঁকা রাস্তায় অন্ধকারের ঢেউগুলি শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে—হাত বাড়িয়েছে বেলারানীর দিকে। ভদ্রবেশী ঢেউগুলোকে ভয় করে বেলারানী। সে সরে এল পিছন দিকে। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। উপুড় হয়ে বসে মেঝের বুকে খুঁজতে লাগল স্মৃতিচিহ্ন, ধরে রাখবার মত পদচিহ্ন ফেলে যেতে পারে নি বিপ্লবী দেবেশ দত্ত। বেলারানীর চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। জল ওকে টানে।

শুক্রবার রাত্রে দেবেশ বেলারানীর সঙ্গে দেখা করে যাবে বলে কথা দিয়েছিল। সেইজন্যে সকাল থেকেই বেলারানী ব্যস্ত ছিল রান্নাবাড়া নিয়ে। নিজে হাতে সে আজ রান্না করেছে। দেবেশকে সে সামনে বসে খাওয়াবে।

সকাল বেলায় বাবার কাছ থেকে দশটা টাকা চাইতে গিয়ে হরিলালবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "টাকা কেন মা?"

"বাজারে আজ কিছু বেশি টাকা লাগবে।"

"কেন?"

"আমার এক বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছি।"

"কোন্ বন্ধু?"

"তুমি চিনবে না বাবা।"

"তা বেশ বেশ। কিন্তু কখন তাকে খেতে বলেছিস বেলা?"

"রাত্তিরে।"

"খুব ভাল। দশ টাকায় কি কুলবে মা?"

"এর বেশি আর লাগবে না বাবা।"

হরিলালবাবু একটু ব্যগ্র ভাবেই যেন পার্স খুললেন। এই মাত্র একজন মারওয়াড়ী মক্কেল হাজার টাকা দিয়ে গেছেন। সব একশ টাকার নোট। তিনি পার্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগলেন দশ টাকার নোট। নোটের অরণ্যে হাত চালাতে চালাতে হরিলালবাবু বললেন, "ছোট নোট একখানাও নেই দেখছি। শ-টাকার নোটখানা ভাঙ্গিয়ে নিস। মা বেলা, টাকাগুলো তোর কাছেই থাক।"

"এত টাকা দিয়ে আমি কি করব বাবা?"

"কি আর করবি, খরচ করবি। নিজের জন্যে না করিস, পরের জন্যে খরচ করতে পারিস। হাঁ, দেখ মা, তুই যে বলছিলি, মালবিকারা এত গরীব যে, পরীক্ষার টাকা জমা দিতে পারবে না বলে সে এখন থেকেই মন খারাপ করে বসে আছে। তাকেই না হয় টাকা কটা দিয়ে দিতে পারিস। এ-টাকায় না কুলোয়, আরও কিছু টাকা না হয়—" কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে হরিলালবাবু পেট-ফোলা পার্সটা তুলে ধরলেন মেয়ের সামনে। তুলে ধরে বললেন, "নে, এই পার্সটা আজ তোকে উপহার দিলুম।"

"দরকার হলে চেয়ে নেব বাবা।" বেলারানী চলে এল ঘর থেকে।

হরিলালবাবু অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। খুঁজে বেড়াতে লাগলেন ফৌজদারি আইনের বইখানা। আইনের মারপ্যাঁচ দিয়ে দেবেশকে রক্ষা করা যায় না? কিন্তু দেবেশ যে খুনী? দেবেশকে রক্ষা করলে, বসু পরিবারের রক্তও যে দূষিত হয়ে উঠবে। হাজার হাজার বছর ধরে খুনীর রক্ত প্রবাহিত হবে উত্তরসূরীদের ধমনী-মুখে। ভাল করে খেয়ে দেয়ে, সেজে-গুজে বেঁচে থেকে লাভ কি, যদি দেহের মধ্যে বেঁচে রইল দূষিত রক্তের বীজাণু? প্রত্যেকটি পরিবার যদি ক্রমে ক্রমে বীর্যবান ও বলিষ্ঠ হয়ে না উঠতে পারে, তা হলে পৃথিবীর বুকে সভ্যতার হাট বসিয়ে লাভ কি? জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে লাভ কি যদি না পরিবারগুলো ছোট ছোট পাওয়ার হাউসের মত শক্তিশালী হয়ে না উঠতে পারল?

হরিলালবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। ফেরারী আসামীর ভবিষ্যৎও চঞ্চল হয়ে উঠল হরিলালবাবুর অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি কি করবেন? রাষ্ট্রের আইনকে তিনি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন না। তিনি জানেন, এ-রাষ্ট্রের পিছনে ভারতবাসীর সমর্থন নেই। তিনিও একজন ভারতবাসী। অতএব আইনগুলোকে যদি তিনি ফুঁ দিয়ে উড়িয়েই দেন, তবে তাঁর অপরাধ কোথায়? তা ছাড়া, যারা আজ বিদেশীর হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে চাইছে, ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিচ্ছে হাসতে হাসতে, তাদের পা-এর কাছেই মাথা নত করছে সমগ্র ভারতবর্ষ। তবে তিনি তাদের রক্তে পাপের মিশ্রণ দেখলেন কি করে? খুনীর মধ্যে কি শ্রেণী-বিভাগ নেই?

চাপকানের বোতাম লাগাতে লাগাতে হরিলাল বসু দাঁড়ালেন এসে স্ত্রীর ফোটোখানার সামনে। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "প্রিয়বালা, খুনীর মধ্যে কি শ্রেণী-বিভাগ আছে? দেশপ্রেমের ধোঁয়া দিয়ে খুনীর রক্ত কি শোধন করা যায়?"

না, যায় না। খুন, সব ক্ষেত্রেই খুন—কেবল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ছাড়া। কোন প্রেমের মধ্যেই খুনের সমর্থন পাওয়া যায় না, সিদ্ধান্ত করলেন হরিলাল বসু। চাপকানের বোতাম লাগানো শেষ হয়েছে। আজ তিনি একটু

তাড়াতাড়ি-ই হাইকোর্টে বেরুচ্ছেন। তিনি বড় উকীল, দু-পাঁচ মিনিট দেরি হলেও জজ সাহেবরা অপেক্ষা করেন তাঁর জন্যে। কিন্তু আজ তাঁর অস্থিরতা তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দশটা বাজবার অনেক আগে। আদালতে যাওয়ার মুখে কি একটা কাজ আছে যেন? হ্যাঁ, খুবই জরুরী কাজ। পাপপুণ্যের বিচারভার পড়েছে তাঁরই ওপর। রাষ্ট্রের আইন ছাড়াও মানুষকে তার নিজের আইন মানতে হয়। অন্তরের আইন, নীতি-দুর্নীতির আইন, ধর্ম-অধর্মের আইন ইত্যাদি।

তিনি ডাকলেন মুহুরীবাবুকে। বললেন, "এই নিন বইখানা। এটা আমার সঙ্গে যাবে।"

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মুহুরীবাবু বললেন, "এটা স্যার ফৌজদারি আইনের বই, আপনার বোধহয় ভুল হয়েছে।"

"ভুল?" গর্জন করে উঠলেন হরিলাল বসু, "ভুল? রাষ্ট্রের আইন আলাদা হতে পারে, কিন্তু খুনের আইন সব জায়গায়-ই এক। বিচারে যদি খুনের অপরাধ প্রমাণিত না হয়, তবে আমি অবশ্যি সব ব্যাপারটাই আবার নতুন করে ভেবে দেখব। মুহুরীবাবু—"

"আজ্ঞে—" হকচকিয়ে গেছেন মুহুরীবাবু। তিনি লক্ষ্য করলেন হরিলাল বসুর অন্যমনস্কতা।

"মুহুরীবাবু—"

"কিছু বলবেন আমায়?"

"আপনাকে কি বলব? যা বলবার ওখানে গিয়েই বলব।"

গাড়িতে উঠলেন হরিলালবাবু। মুহুরীবাবুও উঠলেন। ফৌজদারি আইনের বইখানা পড়ে রইল হরিলালবাবুর পাশেই। তিনি বইটই আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। বিচারকের সামনে তিনি আর্গুমেণ্ট করছেন। কোন্ বিচারক যেন? স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারক? না, না—ওসব মানুষটানুষের কাছে তিনি কোন কথাই বলছেন না। আইনের ব্যাখ্যা করছেন হরিলাল বসু দুনিয়ার সর্বোচ্চ আদালতে, সর্বশক্তিমানের কাছে।

"ওখানে দাঁড়িয়ে কে ?" জিজ্ঞাসা করলেন হরিলাল বসু।

"আজ্ঞে, চন্দন সিং।" জবাব দিলেন মুহুরীবাবু।

গাড়িটা তখন রাস্তায় এসে পড়েছে। তিনি বললেন, "গাড়ি থামাও।"

গাড়ি থামল। তিনি নেমে এলেন গাড়ি থেকে। হেঁটে এলেন ফটকের সামনে। চন্দন সিং দ্বিতীয়বার সেলাম দিল।

"দরওয়ান—"

"হুজুর—"

"রাতমে দো-চার ডাকু চলতা হ্যায় ফাটক-কা ইধার-উধার।

"চলতা হ্যায় হুজুর।"

"তুম কেয়া করতা হ্যায় ?"

"কোই ডাকু-কো হাম ফাটকমে ঘুসনে দেতা নেই।"

"কাহে ?"

"ডাকু তো ডাকু হ্যায় হুজুর—"

"ঠিক বাত হায়। কিসিকো ঘুসনে মাত দেও।"

"নেই দেগা হুজুর। মগর—" চন্দন সিং এগিয়ে এল হরিলালবাবুর কাছে, "মগর, দিদিমণি বোলা হায় রাতমে এক বাবু আয়েগা—"

"কিতনা রাতমে ?"

"বোলা হায়, সাড়ে সাত বাজে।"

নিঃশব্দে, হরিলালবাবু গাড়িতে এসে বসলেন। চন্দন সিং-ও অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ফটকের সামনে। অনুতাপ এসেছে দরওয়ানের মনে। দিদিমণিকে সে কথা দিয়েছিল, দেবেশের আসবার খবরটা সে কাউকেই বলবে না। কাউকেই না। কিন্তু কথার ইজ্জৎ সে রাখতে পারলে না। কথা দিয়ে যে কথা রাখতে পারে না সেতো ডাকুর চেয়েও খারাপ, ভাবলে চন্দন সিং।

আদালত থেকে বাবা কখন ফিরবেন বেলারানী তা জানে না। শনিবারে তাঁকে হাইকোর্টে যেতে হয় না বলে বাবা শুক্রবার বেশ রাত করেই বাড়ি

ফেরেন। আজও নিশ্চয়ই সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। হলেই বা কি? বাবা কখনও আসেন না ওর ঘরে। দরকার থাকলে তিনিই তো ওকে ডেকে পাঠান।

বেলারানী সন্ধ্যের আগেই রান্নাবাড়ার কাজ সব শেষ করে রেখেছে। কলেজ কামাই করেছে সে। প্রতিটি রান্নার মধ্যে ওর প্রীতি ও প্রেমের পরিমাণ আজ যেন উপচে উপচে পড়ছে। এমন মনপ্রাণ দিয়ে সে কোনদিনও রান্না করে নি। দেবেশদার জন্যে পারে না এমন কাজ সংসারে কোন কিছুই নেই। বামুন ঠাকুরটাকে আজ সে ছুটি দিয়েছে। বলেছে বেলারানী, "তোমাদের সবাইকে আজ আমি আমার নিজের হাতের রান্না খাওয়াব।"

সন্ধ্যের পরেই, দেবেশের জন্য খাবারগুলো সব আলাদা করে বাটিতে সাজিয়ে এনে বেলারানী রাখল নিজের ঘরে। আসনটা আগেই পেতে রেখেছিল মেঝেতে। বাটিগুলো ঢেকে ঢেকে থালার চারদিকে সাজিয়ে রাখল বেলারানী। জলের গেলাসটা ঢাকল লেসের ঢাকনি দিয়ে। লেসটা সে নিজে হাতেই বুনেছে। সবুজ রং-এর পুঁতিগুলো ঝুলছে ঢাকনির চারদিকে। দেবেশদা খেতে বসলে বেলারানী পাখা নিয়ে এসে বসবে তার সামনে। ইলেকট্রিক পাখা সে আজ খুলবে না। সেই জন্যে আগে থেকেই সে উনোন ধরাবার হাতপাখাটা এনে রেখেছে। খাবার ঘরের বারোয়ারি টেবিলে আজ সে দেবেশদাকে খাওয়াতে পারবে না বলেই বেলারানী নিজের ঘরে নতুন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

বারান্দার ঘড়িতে সাড়ে সাতটা প্রায় বাজে। বারান্দা থেকে রাস্তার ফটকটা পরিষ্কার দেখা যায়। বেলারানী নিজেই তো দেবেশকে অনুরোধ করে এসেছে সামনের ফটক দিয়ে আসতে। তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 'হিরো' আসবে মাথা উঁচু করে ঐ বড় রাস্তা দিয়ে, বেলারানী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখবে তার উঁচু-মাথা। খিড়কির দরজায় দেবেশদার মাথা নিশ্চয়ই ঠেকে যেত। বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল বেলারানী।

দেবেশ সাতটার একটু আগেই মাণিকতলা থেকে রওনা হল। এ-গলি ও-গলির মধ্যে দিয়ে সে পার হচ্ছে রাস্তা। খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে তবে

সে একটা ট্যাক্সি নেবে। ট্যাক্সিতে বসে মনটা ওর কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। দেশপ্রেমের উচ্চতম আদর্শের মধ্যে নারী প্রেমের ভেজাল না মেশালেই যেন ভাল হতো। কেবল তাই নয়, একটা সরল ও সুস্থ মেয়ের জীবনে সে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ভাঙ্গনের ভয়। বেলারানী তার কাছ থেকে কী-ই বা পাবে, আর পাবেই বা কতটুকু? দেশপ্রেমের আগুনে সে তার নিজের ভবিষ্যৎ-কে পুড়িয়েছে। পুড়িয়েছে—সব দিক ভাল করে বিবেচনা না করেই। বিবেচনা করে দেখবার মত বয়সও ছিল না ওর। সেদিন বেলারানীর কথায় দেবেশের বিবেচনা-রাজ্যে প্রথম একটু কম্পন উঠেছিল। স্বাদেশিকতার সুর ছাড়িয়ে সে উঠেছিল অন্য একটা সুরে। সেখানে মানুষের চেহারা অন্য রকম—ক্ষমতালুব্ধ দৃষ্টি তার স্বদেশপ্রেমের প্রলেপ দিয়ে পরিকীর্ণ। সেই মানুষটা কে যেন? নেতা। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রক্ত চেয়েছিলেন তিনি-ই। চাওয়ার নেশা সৃষ্টি করিয়েছিলেন দেবেশের মনে সেই মানুষটাই। কিন্তু—। ট্যাক্সিটাকে দেবেশ ছেড়ে দিল রসা রোডের ওপরেই। আধ মাইল রাস্তা সে এবার হেঁটে যাবে এ-গলি ও-গলির মধ্যে দিয়ে। প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটবার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে গেছেন মৃত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে দেবেশ ঢুকে পড়ল ডান দিকের একটা গলিতে। ঐ বাড়িটার সামনে বেশ ভিড় জমেছে। দালানের গায়ে একটা বিজ্ঞপ্তি লাগান ছিল। গ্যাসবাতির আলোয় দেবেশ পরিষ্কার দেখতে পেল ওর ছবিটা। ছবির তলায় নিশ্চয়ই পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কারের ঘোষণাটাও লেখা আছে। বিজ্ঞপ্তিটা পড়বার জন্যে লোকের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে। পা চালিয়ে দেবেশ পার হয়ে এল ভিড়ের জায়গাটা। সামনের দিকে একটু এগিয়ে এসে ডান দিকে চোখ পড়ল দেবেশের। মস্ত বড় একটা ব্যারাক মত বাড়ি। পুলিশের ব্যারাক বলে বুঝতে পারল দেবেশ। বাড়িটার সামনে সে একটু থামল। কি করবে ভাবছিল দেবেশ। সামনের ফটক দিয়ে মাথা উঁচু করে ঢোকবার নতুন মন্ত্র শুনিয়ে গেছে বেলারানী। নতুন মন্ত্র ওকে টানছিল পুলিশের ব্যারাকের দিকে।

লুকনো পিস্তলের মুখে হাত রাখল দেবেশ। মনে হল পিস্তলের মুখটা ভেজা ভেজা লাগছে। মানব প্রেমের নতুন মন্ত্রের উত্তাপ বোধহয় পিস্তলটা আর সহ্য করতে পারছে না! জনৈক ইংরেজের বুকের রক্ত গলে গলে পড়ছে পিস্তলের মুখ দিয়ে!

. বেলারানীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল দেবেশ। গলির রাস্তা পার হয়ে এবার সে এসে পড়ল হরিশ মুখার্জি রোডে। পিস্তলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে ভাবল দেবেশ। বেলারানী সঙ্গে থাকলে, সে আর কাউকেই ভয় করবে না। প্রেম যেখানে নির্ভেজাল, ভয় সেখানে স্থান পায় না। কটি-দেশ থেকে চকিতের মধ্যে পিস্তলটা সে বার করে নিয়ে ফেলে দিলে ওপাশের ডাস্টবিনে। ভয়শূন্য মন নিয়েই সে মাথা উঁচু করে সামনের ফটক দিয়ে যাবে তার প্রিয়তমার সঙ্গে দেখা করতে। উঁচু মাথায় থাকবে না ওর ক্ষমতার এক বিন্দু গর্ব। বিনয়াবনত শিরে দেবেশ দত্ত উড়িয়ে দিলে নতুন মন্ত্রের জয়পতাকা।

এবার একটু দূর থেকে সে বেলারানীদের বাড়ির ফটকটা দেখতে পেল। দেখতে পেল দরওয়ান চন্দনসিং-কে। থমকে দাঁড়াল দেবেশ। ওপাশের রাস্তা দিয়ে দুটো লোক যেন একটু সন্দেহ জনক ভাবে হেঁটে গেল? ওরাও বুঝি ফটকটার দিকেই যাচ্ছে। শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে না কি ওরা? সহসা বিপ্লবী দেবেশ দত্তের রক্তে ঝড় উঠল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজজাতির বুকে গুলি ছুঁড়বার জন্যে দেবেশ পাগল হয়ে উঠল। কিন্তু পিস্তল? সে আর নেই, ডাস্টবিনে পড়ে আছে। ভালই হয়েছে, ভাবল দেবেশ। পৃথিবীর নোংরাতম ডাস্টবিনে মানুষের নোংরাতম আবিষ্কার সে ফেলে দিয়ে এসেছে একটু আগেই। বেলারানীর নতুন মন্ত্রের সত্য নিয়ে সে এগিয়ে যাবে বাকী পথটুকু।

ডাস্টবিনটার দিকে শেষবারের মত একবার চেয়ে নিয়ে দেবেশ এগিয়ে চলল ফটকের দিকে। ফটকের দু-ধারে বেশ জোরালো দু-টো আলো জ্বালিয়েছে চন্দন সিং। দূর থেকে মনে হয়, হরিলাল বসুর বাড়িতে আজ একটা বিশেষ উৎসবের রাত। বিশিষ্ট কোন অতিথির জন্যে অপেক্ষা করছে গোটা বাড়িখানা। এমন নিরুদ্বেগ-নির্ভাবনায় দেবেশ কোনদিনও পথ হাঁটে নি।

ফটক দিয়ে ভিতরে আর ঢুকতে পারলে না দেবেশ। কোথা থেকে যেন পাঁচ সাত জন সাদা কাপড় পরা পুলিশ এসে ধরে ফেলল ওকে। চন্দন সিং পরিষ্কার দেখতে পেল, দেবেশ পালিয়ে যাবার কোন চেষ্টাই করল না, যেন ধরা পড়বার জন্য সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। উঁচু মাথা করে সে দাঁড়িয়ে রইল। তিলেকমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ পেল না কোন একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। পুলিশের বড় কর্মচারিরা পিস্তল তুলে ধরে আছে দেবেশের বুকের দিকে। দেবেশ সে-সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে চেয়ে আছে বারান্দায় দাঁড়ানো বেলারানীর দিকে।

মুহূর্তের মধ্যেই পুলিশের গাড়ি এসে পড়ল। হাতকড়া পরিয়ে দিল দেবেশের দুটো হাত একসঙ্গে করে। কোমরে দড়ি বাঁধল পুলিশের লোকেরা। সে যেন ওর দেহের সবটুকুই ছেড়ে দিয়েছে পুলিশের হাতে। যা ইচ্ছে তাই ওরা করুক, দেবেশকে কেবল চেয়ে থাকতে দিক বারান্দার দিকে।...

কত তাড়াতাড়ি মুহূর্তগুলো শেষ হয়ে গেল! দড়ি ধরে টান মারল পুলিশের লোকেরা। প্রথম টানে দেবেশকে ওরা টলাতে পারল না। বারান্দার দিক থেকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিতে পারল না পুলিশের বলিষ্ঠতম হাত-ও। সে চেয়ে রইল তন্ময়ভাবে। বেলারানীদের বাড়িটা ভেদ করেও যেন সে আরও অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে! কোমরে ওর দ্বিতীয় টান পড়ল। ঘাড়ের ওপর পড়ল পুলিশের লাঠি। পুলিশ সাহেব তাঁর পিস্তলের গোড়া দিয়ে আঘাত করলেন দেবেশের মাথায়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেবেশ এসে উঠে পড়ল পুলিশের গাড়িতে। গাড়ি ছাড়তে এক মিনিটও বিলম্ব হল না।

বেলারানী যখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারল, তখন সে ছুটে এল নিচে। 'দেবেশদাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!' চাপা মন্ত্রের মত কথাটা উচ্চারণ করতে করতে বেলারানী সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল লাফিয়ে লাফিয়ে। শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হল, হাত-পা বুঝি সব অবশ হয়ে গেছে! পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মুহুরীবাবু। বেলারানী বললে, "দেবেশদাকে ধরিয়ে দিলুম আমরাই।"

বড় উকীলের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে কুড়িয়ে মুহুরীবাবু রোমান্টিক-বিশুদ্ধতা সব হারিয়ে ফেলেছেন। হতভম্বের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তিনি চেয়ে রইলেন বেলারানীর দিকে। বেলারানী দ্বিতীয়বার ঘোষণা করলে, "দেবেশদাকে ধরিয়ে দিলুম আমরাই।"

"এ্যাঁ? কি বললেন?" কণ্ঠে তাঁর বিলম্বিত লয়।

কি মনে করে বেলারানী পুনরায় উঠে এল দোতলায়। নিজের ঘরে এসে ঢুকল। রেকাবি থেকে তুলে নিল এক টুকরো সন্দেশ। টেবিলের ওপর থেকে টেনে নিয়ে এল বেলফুলের মালাটা। ফিরতি পথটা অতিক্রম করল এক নিশ্বাসে। দাঁড়াল এসে ফটকের সামনে। কেউ সেখানে নেই।......

দাঁড়িয়ে আছে কেবল দরওয়ান চন্দন সিং। ডান হাতটা মাথার সঙ্গে ঠেকিয়ে সে রাস্তার দিকে সেলাম জানাচ্ছে, বোধহয় পুলিশের গাড়িটাকেই। গাড়িটার মধ্যে সেদিন বসেছিল দেবেশদা। নতুন এক বিপ্লবের মন্ত্র নিয়ে বিদ্রোহী দেবেশ দত্ত ঢুকল এসে ইংরেজের কারাগারে। বিচার তার হবে। কিন্তু বিচার-ফলের ওপর আর বোধহয় কোন কিছুই নির্ভর করছে না। বেলারানী তার নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছে।

রাত দশটা বাজল। ফটকে আলো দুটো জ্বলছে। চন্দন সিং চলে গেছে বিদায় নিয়ে। চলে যাওয়ার পরে, বেলারানীর মনে হয়েছে যে, চন্দন সিং-এর বিদায়টাও দেবেশদার চাইতে কম মর্মান্তিক নয়। কিন্তু কেন সে হঠাৎ চলে গেল? স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগল বেলারানী।

কিন্তু স্মরণশক্তি আজ ওর অবশ, অতিক্লান্তও বটে। আদিম মানুষদের মত কোন কিছু না ভাবতে পারাই বোধ হয় ভাল ছিল। কি হবে ভেবে? ভেবে ভেবে মানুষ কতটুকুই বা আর উন্নতি করতে পেরেছে! সহস্র আইন-কানুনের মধ্যে ক্ষমার জন্যে এতটুকু নরম স্থান পর্যন্ত রইল না! ক্ষমা?

বাবা এখনও ফেরেন নি। বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে বাড়িটা। মা কাছে থাকলে হয়তো ওর ব্যথার বোঝা খানিকটা কমত। কমে আসত চোখের জল

সাজানো খাবার-থালাটার ওপর টস টস করে চোখের জল পড়ছে অনেকক্ষণ আগে থেকেই। সৃষ্টির প্রথম থেকেই যেন লক্ষ লক্ষ বেলারানীরা কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিল পৃথিবীর বুক। ক্ষমা পেল না কারু কাছেই! আইন-কানুনের বাঁধন তবু শিথিল হল না একটুও।

থালার ওপর জল এখন থৈ থৈ করছে! একটু পরে উপচে পড়বে। পড়লও। বাড়িটা বুঝি ডুবে গেল। ডুবে গেল হরিশ মুখার্জি রোডও। ঢেউ উঠেছে অনেক। এখানকার ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাবে সাগরের দিকে। মিশবে গিয়ে বঙ্গোপসাগরের জল-কল্লোলের সঙ্গে। বেলারানীর ইচ্ছে হল, ঢেউ-এর সঙ্গে গা ভাসিয়ে দেয়। জল ও:কে টানে।

বাতিটা নিবিয়ে দিল বেলারানী। আজ আর ঘুম আসবে না। পাটি পাতবার আর দরকার হবে না আজ। দেবেশদার সঙ্গে সঙ্গে সেও রাত জাগবে—অসংখ্য রাত তাকে জাগতে হবে নীরব তপস্যায়। এ-তপস্যার শেষ নেই, সিদ্ধিও নেই। কেবল বসে বসে ক্ষয় করতে হবে আয়ু।

হরিলাল বসু রাত এগারোটার পরে বাড়ি ফিরলেন। ফটকের বাতি জ্বলে দেখলেন তিনি, দেখতে পেলেন না দরওয়ানকে। ভালই হল। চন্দন সিং-এর সামনে বোধহয় তিনি আজ মাথা উঁচু করে বাড়িতে ঢুকতে পারতেন না। কোথায় কি একটা গুরুতর অপরাধ তিনি করেছেন বলে বিশ্বাস জন্মেছে তাঁর। অপরাধ-উপলব্ধি যেন ক্রমে ক্রমে দুর্বল করে ফেলছে তাঁকে। তবুও তিনি ক্ষমতাশালী লোক। ক্ষমতাশালী বলেই কেউ তাঁকে ফটকের সামনে বাধা দিতে পারল না, রুখে দাঁড়াতে পারল না তাঁর চলবার পথ। ক্ষমতা তাঁর কেবল টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পিতৃত্বের ক্ষমতা তাঁর হাতের অস্ত্র। ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই রয়েছে ক্ষমতার ভিন্ন ভিন্ন স্তর। ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র সাজানো রয়েছে প্রতিপত্তি প্রয়োগ করবার জন্যে। কেবল সন্তান বলে একবিন্দু ক্ষমার অমৃত ভেজাতে পারলে না পিতৃত্বের অস্ত্রটাকে। অস্ত্র তিনি প্রয়োগ করলেন বেলারানীর ওপর।

মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছে বেলারানী, ভাবলেন হরিলালবাবু। পড়ুক

লুটিয়ে। কদিন আর পড়ে থাকবে? আজ নয় কাল, কাল না হয় পরশু ওকে উঠতেই হবে। লুটিয়ে পড়ে থাকা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। ও একটা বিশেষ মুহূর্তের ভঙ্গি—জীবনদ্বন্দ্বের স্থায়ীত্ব ওতে নেই।

নিজের ঘরে এসে চাপকানের বোতাম খুলতে খুলতে তিনি স্বতঃসিদ্ধের মত স্থির করে ফেললেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজ কোন একটি বিশেষ নারীর ব্যক্তিগত অনিয়মকে নিয়ম বলে মেনে নিতে পারে না। খুনীকে ক্ষমা করতে পারে না বিচার-আদালতের অনুমতি ছাড়া। এ ভালই হল। সারাজীবন আসামী হয়ে থাকলে দেবেশ কোন দিনও সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারত না! অতএব এ ভালই হল। বিচারের সুযোগ পেয়েছে দেবেশ। বিচারের সব কিছু ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করবেন। ফৌজদারি আইনের সব চেয়ে বড় বিশেষজ্ঞদের তিনি সব চেয়ে বেশিমূল্য দিয়ে নিয়োগ করবেন দেবেশের স্বপক্ষে। এর চেয়ে বেশি সুবিধে কোন স্নেহান্ধ পিতাই দিতে পারতেন না।

ভৃত্য এসে এরই মধ্যে কোন্ সময় খাবার দিয়ে গেছে হরিলাল বসু তা লক্ষ্য করেন নি। এবার করলেন। চানঘর থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে তিনি খেতে বসলেন। বামুনঠাকুর দাঁড়িয়েছিল দরজার ও-পাশে। সে বললে, "সব রান্নাই দিদিমণি করেছেন।"

বিলাতী কায়দায় ভেটকি মাছ ভাজা হয়েছে। হরিলাল বসু দাঁত বসালেন খুব জোরেই। চিবতেও লাগলেন ভাজা ভেটকি। দাঁতগুলো সব যেন নড়বড় করছে! কি হল? দাঁতের গোড়া সব হঠাৎ আলগা হয়ে গেল কি করে? 'প্রিয়বালা, আমায় তুমি শক্তি দাও।' হরিলাল বসু আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। রাষ্ট্র ও সমাজের আইনের চেয়েও কি রকম একটা বড় আইনের টান তিনি অনুভব করলেন। দাঁতের ডাক্তার তাঁর চিমটে দিয়ে যা সহজে পারতেন না, এই অজ্ঞাত আইনের টান তা পারলে! দাঁতগুলো সব নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। কেবল নড়বড়ে নয়, মনে হল দাঁতগুলো সব বিস্কুটের গুঁড়োর মত ভাজা মাছের ওপরে উড়ে উড়ে পড়ছে।

'প্রিয়বালা আমি বড্ড অসুস্থ বোধ করছি।' মনে মনে বললেন হরিলাল-

বাবু। খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে এসে দাঁড়ালেন প্রিয়বালার ফোটোর তলায়। সেখানে সারি দেওয়া কতকগুলো ড্রয়ার রয়েছে। একটা ড্রয়ার থেকে তিনি হুইস্কির বোতল বার করলেন। কাঁচা হুইস্কি ঢাললেন গেলাসে অনেকটা, খেয়ে ফেললেন ঢকঢক করে।

ভৃত্য অবনী দাঁড়িয়েছিল কাছেই। সে বললে, "বাবু, দিদিমণি কিছুই খায় নি আজ।"

"জানি। আজ খায়নি, কাল খাবে। তুই এবার যা।" দরজাটা তিনি ভেজিয়ে দিলেন। গেলাসটা হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন এসে পিছন দিকের জানালার কাছে। এখান থেকে বেলারানীর ঘরটা দেখা যায়। দেখা যায় মাধবীলতার বিমুগ্ধ বিস্তৃতি। আজ তিনি কিছুই আর দেখতে পেলেন না। বাগানের বাতিগুলো সব নিবিয়ে দিয়েছে মালী। ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়েছে বেলারানী নিজেই।

কী কুৎসিত অন্ধকার! এ-জানালা থেকে ও-জানালার ব্যবধান মিশে গেছে অন্ধকারের কালো দেহে, ভাবলেন হরিলালবাবু। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরে তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না অন্ধকারের নব কলেবর। এমন রাত আর তিনি কোনদিনও দেখেননি। দেখেননি প্রিয়বালার প্রয়াণ রাত্রেও। তিনি সরে এলেন জানালা থেকে। তাঁর নিজের ঘরের বাতিটা এবার নিবিয়ে দিলেন তিনি। এবার বোধ হয় বেলারানীর খুব কাছে এগিয়ে গেলেন হরিলালবাবু। তুটো ঘরের পরিস্থিতির মধ্যে আর হয়তো বিন্দুমাত্র ভেদাভেদ রইল না। একাকার হয়ে গেল পিতা ও কন্যার মানসিক যাতনার দ্বি-রাজ্য।

হরিলাল বসু শয্যা গ্রহণ করলেন। অসুস্থ বোধ করছেন তিনি। প্রতি মুহূর্তে অসুস্থতা তাঁর বাড়তে লাগল। কি একটা অপরাধের বীজাণু বাসা বেঁধেছে তাঁর রক্ত-প্রবাহের মধ্যে। ক্রমে ক্রমে বীজাণুর বিষ থেকে জন্ম নেবে নতুন বংশ। বীজাণু-সংখ্যার ক্রমবিস্তার তিনি আর রুখতে পারবেন না। নিজের জীবনের শেষ তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে এইমাত্র দেখে এলেন। দেখে

এলেন, বেলারানীর ঘরের পেছনে মাধবীলতা মাথাকুটে মরছে। বিষাক্ত-বীজাণুর কারাগারে পাপ-পুণ্যের সায়ংকাল তিনি দেখলেন।

দেবেশের ফাঁসির হুকুম হল। বোধ হয় বয়স খুব বেশি নয় বলেই লাট-সাহেব ফাঁসির হুকুম মঞ্জুর করেন নি। দিলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। হরিলালবাবু সেই যে শয্যাগ্রহণ করেছিলেন, আর তিনি হাইকোর্টে যাননি। কোন আগ্রহ দেখাননি দেবেশের মকদ্দমায়। আগ্রহ দেখায়নি বেলারানীও।

বেলারানী কলেজ যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ঘর থেকে বড় বেশি একটা বার হয় না। মাঝে মাঝে বাবার পাশে গিয়ে বসে। হাত বুলিয়ে দেয় তাঁর মাথার চুলে। দরকার পড়লে ওষুধও খাওয়ায়। তাতে অবনী খানিকটা বিশ্রামও পায়।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হরিলালবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আজকের কাগজ পড়েছিস মা?"

"কাগজ? কোন্ কাগজ বাবা?"

"দৈনিক কাগজ।"

"না আমি খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন মা?"

"কেন যে ছেড়ে দিয়েছি ঠিক মনে পড়ছে না বাবা।"

"কারণ তো একটা আছে নিশ্চয়ই বেলারানী?"

"বোধ হয় একটা নয়, অনেকগুলো কারণই আছে। কিন্তু আজকের কাগজের কথা কেন জিজ্ঞাসা করলে বাবা?"

হরিলালবাবু একটু চুপ করে রইলেন। তারপরে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "দেবেশের বিচার হবে স্পেশাল ট্রাইবুনালে। ওর ওপর ভগবানের দয়া নেই, থাকলে বিচারের ভার সেই ফাঁসির জজের ওপর পড়ত না।"

"ফাঁসির জজ?" কেবল একটা হালকা কৌতূহল মেটাবার জন্যেই বেলারানী প্রশ্নটা করল।

"সেই যে বাঙালী জজ কিরীট নাগ, তিনি আজকাল এইসব স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার করতে বসেন বড় বড় রাজনৈতিক মকদ্দমার। ইংরেজদের খুশী করবার জন্যেই তিনি ফুলের মত ছেলেগুলোকে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন প্রতিবারই।"

"বাবা, তোমার বোধ হয় ওষুধ খাওয়ার সময় হল।" বেলারানী উঠে গিয়ে ওষুধের শিশিটা নিয়ে এল। দাগমারা শিশির চার নম্বর দাগের নিচে বুড়ো আঙুলটা ঠেকিয়ে রেখে বেলারানী ওষুধ ঢালল পেয়ালায়। ওষুধ খেলেন হরিলালবাবু। বড্ড তেতো ওষুধ। মেয়ের হাত থেকে লবঙ্গ নিয়ে ধরে রাখলেন দু-দাঁতের মাঝখানে। তারপরে বললেন তিনি, "তুই কিছু তো বললি না বেলা? দেবেশের ভাগ্য সম্বন্ধে তোর কি কোন আগ্রহ-ই নেই?"

"আগ্রহ দেখালে কি তুমি খুশী হবে? তা ছাড়া, ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে এবং ক্ষমতা ধরে রাখবার জন্যে দু-দলের মধ্যে লড়াই হচ্ছে, এর মধ্যে ভাগ্যের প্রশ্ন অবান্তর।"

"যদি দেবেশরা কোনদিন জেতে?" প্রশ্ন করলেন হরিলালবাবু।

"ব্যক্তিগতভাবে দেবেশদা কোনদিনও জিততে পারবে না। তার দল হয়তো জিতবে। কিন্তু সেই দলের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্যে আবার তৈরি হবে নতুন দল। বাবা, জগৎ জুড়ে এই যে এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে বলে রব উঠেছে, তার মূলে মানুষের কোন উন্নতি নেই।"

"নেই?"

"না বাবা। আছে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করবার প্রচেষ্টা। শঙ্খবিষের মত ক্ষমতার বিষ কচি পৃথিবীটাকে এরই মধ্যে পঙ্গু করে ফেলেছে।......আজ রাতে তুমি কি খাবে?"

"এ্যাঁ? কি বললি মা?"

"তোমার জন্যে কখানা লুচি নিয়ে আসি বাবা? ময়দা আমি নিজে হাতে মেখে রেখেছি।"

"কেন, বামুনঠাকুর কই?"

"সারাদিন খাটে, একটু বিশ্রাম করছে। তা ছাড়া, আমিই বা বসে বসে কি করব?"

সত্যিই বেলারানীর করবার কিছুই ছিল না।

ছ-মাস পরে বেলারানী শুনতে পেল, দেবেশদা আন্দামান যাচ্ছে। নতুন দেশ, নতুন আবহাওয়া এবং নতুন পরিবেশ তার কতটা ভাল লাগবে বেলারানী তা জানে না। জানা সম্ভবও নয়। আউটরামঘাট আর পোর্টব্লেয়ারের মাঝখানে রয়েছে একটা মস্তবড় অজানা ব্যবধান, বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃতি।

রওনা হয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরে, বেলারানী গিয়েছিল গঙ্গার দিকটায় বেড়াতে। একাই গিয়েছিল সে। বুড়ো ড্রাইভারটা গাড়িতে বসেছিল। বেলারানী হাঁটতে হাঁটতে চলে এল আউটরামঘাটের জেটিতে। গঙ্গার জল অতি শান্ত বলে মনে হল ওর। স্রোত আছে, তরঙ্গ নেই। ভাঁটার জল গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে ঢালুর দিকে। কখন যে গঙ্গার স্রোত বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে গিয়ে মিশে যাবে বেলারানী তা জানে না। ঘণ্টা কিংবা সময়ের হিসেব জেনে ওর লাভ নেই। ঘণ্টা মিশে যাবে দিনের সঙ্গে, দিন গড়িয়ে পড়বে মাসের সীমায়, মাস উত্তীর্ণ হবে বছরের বেড়া। তারপরে? আসবে যুগ। একটা যুগের পরেও হিসেব ওর শেষ হবে না। কি হবে ঘণ্টা গুনে? সময়-হীনতার সময়ের মধ্যে গা ভাসিয়ে দেওয়াই ভাল। ভাল এই গঙ্গার তরঙ্গহীন জলও। জল ওকে টানে। টানে ওকে দেবেশদার কোমরে-বাঁধা দড়িটাও।

সিংহের মত সরু কোমর ছিল দেবেশের। বুকের চওড়া ছাতিটা ছিল লোহার মত শক্ত। লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দেখলে মনে হতো, দেবেশদা শিল্পী। ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না পিস্তলের ছোঁয়া লাগে আঙুলগুলোতে। তবুও তো লাগলো! ভাগ্যের রহস্য নিয়ে বাবা দিনরাতই চিন্তা করেন। কিন্তু বেলারানীর কাছে কোন কিছুই আর রহস্য নেই। শক্তিশালীর মুঠোর মধ্যে দুর্বলেরা চিরদিনই রহস্যের সন্ধান পায়। ক্ষমতার কারাগারে আবদ্ধ-মানব ভাগ্যের রেখায় দেখতে পায় রহস্যের অঙ্ক। ভুল অঙ্কের পেছনে আর

বেলারানী ছুটবে না। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে বিনা প্রতিবাদে। দিলও।

ফিরবার পথে বেলারানী গেল গড়পারে। মালবিকার সঙ্গে দেখা হয় নি অনেক দিন। পরীক্ষার তারিখ এগিয়ে এসেছে। ও হয়ত পড়াশুনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত।

গড়পারের রাস্তায় এসে বেলারানীর মনটা ভিজে উঠল ওদের এই ছোট সংসারটার কথা ভেবে। মালবিকার বাবা যা রোজগার করেন, তাতে খরচ কুলয় না। মালবিকা সেই জন্যে সকাল বেলায় যেত ফড়েপুকুরে ছাত্রী পড়াতে। কলেজের মাইনে তাতে কুলিয়ে যেত ওর। উদ্বৃত্ত টাকা যা ওর হাতে থাকত, লুকিয়ে লুকিয়ে সে দিয়ে আসত দেবেশদাকে। মালবিকা তার অর্জিত অর্থের অংশ দিয়ে পরাধীনতার শেকলটাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করছিল। ওরা কেবল আজ একটা শেকলই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু বেলারানী দেখতে পেয়েছে অনেকগুলো।

উপযুক্ত পরিমাণ দুধের অভাবে কোলের ভাইটা গত ছ-মাসে ছ-ইঞ্চিও বাড়তে পারে নি। ওর বাবা একমাস কাজ করে যা ঘরে নিয়ে আসেন তাতে এক গেলাসের বেশি দুধ কিনতে তিনি পারেন না। কিন্তু মালবিকার চোখে দেবেশদার কীর্তি এত বড় হয়ে উঠেছিল যে, সে কোন দিনই কোলের ঐ ছোট্ট ভাইটাকে দেখতে পায় নি। ভারতমাতার শেকলটাকে কেড়ে নিয়েছিল মালবিকার চোখের দৃষ্টি। খুবই আশ্চর্য মনে হতো বেলারানীর কাছে। আশ্চর্য মনে হতো ভারতবর্ষের ইতিহাস। দু-একটা লোকের ভুলের জন্যে বার বার ভারতমাতার পা-দুটোকে বেঁধে দিচ্ছে রাজনৈতিক শেকল। বালাজী বাজীরাও-এর ভুল পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে সীমাবদ্ধ রইল না—ইংরেজের হাতে সেটাই হল সব চেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। মীরজাফর-জগৎশেঠের ভুলের জন্যে দেবেশদা আজ জীবন দিতে বসেছে, জীবন দিচ্ছে কোলের ঐ শিশু ভাইটাও। সমস্ত পরিবারটা বুড়ো লোকের নড়বড়ে দাঁতের মত ঠকঠক করে নড়ছে। ইংরেজ এ-দেশে চিরদিন থাকতে পারবে না। তাকে যেতে হবে। যাবে সে তার ক্ষমতার

বিষে জর্জরিত হয়ে। কিন্তু তারপরেও কি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গ-রাজ্য? বোধ হয় না, ভাবল বেলারানী। ইতিহাসের কোন্ এক বিপর্যয়-মুহূর্তে আবার কে কোথায় একটা ভুল করে বসবে, তার ফলে নষ্ট হয়ে যাবে অসংখ্য মালবিকার কোটি কোটি কোলের শিশুভাইগুলো। এ-মৃত্যু বেলারানী ঠেকাতে পারে না। পারে নি প্রথম কিংবা তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে। পারে নি পলাশিতেও।

মালবিকাদের বাড়ির দরজায় শবদেহ!!

“হার্টফেল করে একটু আগেই বাবা মারা গেলেন।” বললে মালবিকা। সুকুমারী ভাইটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ির ওপর। বেলারানী দেখলে, সিঁড়িটার অর্ধেকটা ভাঙ্গা। সেই ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে ধোঁয়া উঠে আসছে ওপর দিকে। উনোনের ধোঁয়া। সিঁড়ির তলায় মাধব পিওন বলে কে একজন লোক থাকে। এই সবে বিয়ে করে বৌ নিয়ে সে ক-দিন আগেই দেশ থেকে ফিরেছে। দু-টাকা ভাড়া দিতে হয় সিঁড়ির নিচে এটুকু জায়গার জন্যে।

বেলারানী চলে গেল পেছন দিকে। মাধব পিওনের নতুন বৌকে ডেকে বললে, “উনোনটা তোমায় একটু সরিয়ে ফেলতে হবে ভাই।”

এরই মধ্যে মাধব পিওন কোথা থেকে এসে উনোনটাকে হাত দিয়ে টেনে তুলে নিয়ে চলে গেল রাস্তায়। উপুড় করে কয়লাগুলোকে ফেলে দিয়ে, এক ঘটি জল ঢেলে দিল তাতে। ফিরে এসে নতুন বৌ-কে বলল, “আজ রান্না করো না। আমি শ্মশানে যাচ্ছি। তুমি ওপরে যাও—মায়ের কাছে গিয়ে বসো। হায় হায়—কি হবে এখন এই সংসারটার?” ইতিহাসের কোথাও এর জবাব নেই। গামছাটাকে কাঁধের ওপর চেপে ধরে মাধব এসে দাঁড়াল শবদেহের কাছে। বেলারানী চেয়েছিল কোলের বাচ্চাটার দিকে। বাংলার ভবিষ্যৎটা যেন এক হাত পাকানো-দড়ির মত সুকুমারীর দু হাতের মাঝখানে ঝুলছিল! শবদেহের প্রতি নির্বাক-শ্রদ্ধা নিবেদন করে বেলারানী বেরিয়ে এল গড়পারের রাস্তা দিয়ে।

আরও এক বছর কাটল। কাটল অতি শ্লথ গতিতে। হরিলালবাবু অসুস্থ। কি অসুখ, বেলারানী তা সঠিক জানে না। ডাক্তাররাও কিছু বেলারানীকে জানান নি। তবে খুব সাবধানে তাঁকে থাকতে হবে। কোন রকম হঠাৎ-উত্তেজনা তাঁর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। দুশ্চিন্তাও তাঁর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। হার্টের অবস্থা ভাল নয়।

ডাক্তারদের উপদেশ বেলারানী কোনদিনও অমান্য করে নি। মালবিকার বাবার মৃত্যু সংবাদ পর্যন্ত সে জানায় নি হরিলালবাবুকে। জানাবার কোন দরকারই ছিল না। লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর মধ্যে এটাও একটা স্বাভাবিক মৃত্যু। একই শ্মশানে, একই ওজনের কাঠ দিয়ে, একই অনুষ্ঠানের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শবদেহ পুড়ে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক মৃত্যু এগুলো নয়। মৃত্যুর মধ্যে কোন গুরুত্ব থাকলে খবরের কাগজে তা নিশ্চয়ই ছাপা হতো। ছাপাখানায় বসে যে-লোকটা অসংখ্য স্মরণীয় মৃত্যুর খবর রাত জেগে কম্পোজ করেছে তার নিজের মৃত্যুর খবর কাগজে ছাপা হয় না। ছাপা হয় না এই জন্যে যে, তার নিজের মৃত্যুতে কারু কোন ক্ষতি হয় নি। যে-সংসারটা ওর ওপরে নির্ভর করত তার ক্ষতি খতিয়ে দেখবার মত জগতের কোথাও কোন খবরের কাগজ ছাপা হয় বলে বেলারানী জানে না। রাস্তার ঐ সাধারণ লোকটা অসাধারণ হয়ে উঠতে পারল না বলে শোষণ ও শাসনের চাবুক সে নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই। তাই তার মৃত্যুর মধ্যে কেউ কোন দিনও অস্বাভাবিকতা দেখতে পায় না।

সেদিন হরিলালবাবু বেলারানীকে খবর দিয়ে ডেকে পাঠালেন ঘরে। জরুরী দরকার। খবর পেয়ে বেলারানী ছুটে এল। হার্টের অবস্থা তাঁর ভাল না। কি এক গুপ্ত ব্যাধি তাঁকে দ্রুত টেনে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। বেলারানী শুনেছে অবনীর কাছে যে, বাবার গুপ্ত ব্যাধি সুরু হয়েছে বছর দেড়েক আগে কোন্ এক শুক্রবারের সাংঘাতিক রাত থেকে। সে-রাতে ফটকের আলো দুটো সমস্ত রাত ধরেই জ্বলছিল। আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। রজনীগন্ধার গাছগুলো তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন।

চাঁদের আলোয় দেখতে পেয়েছিলেন মাধবীলতার ক্রম উন্নতি। কিন্তু সে-রাত্রেই হরিলালবাবুর জীবনে নাকি সব চেয়ে বেশি অন্ধকার এল ঘনিয়ে, সব চেয়ে বড় ব্যাধির সুরু হল সেই রাত্রেই।

"কি হয়েছে বাবা?" বিছানার পাশে এসে বসে পড়ল বেলারানী। যথারীতি হাত বুলতে লাগল হরিলালবাবুর মাথায়। হঠাৎ-উত্তেজনা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত খারাপ।

"কি হয়েছে বাবা?" দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল বেলারানী।

"জগদীশ তার সম্মতি দিয়ে গেছে।" বললেন হরিলালবাবু।

"জগদীশ? কোন্ জগদীশ?" বেলারানীর কণ্ঠে চাপা হাহাকারের সুর। এ-সুর তরঙ্গ বাহিত হয়ে আন্দামানের তটে গিয়ে কোনদিনও পৌঁছুবে না। বড্ড বেশি চাপা বলেই হয়তো পৌঁছুবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু হরিলালবাবুর কানে হাহাকারের সুর ধরা পড়ল না। তাই তিনি বললেন, "জগদীশ, আমাদের জমিদার জগদীশ নাগ। অনেক নিয়েছি ওঁদের কাছ থেকে, কিন্তু দিতে পারি নি কিছুই।"

"তুমি ওঁদের উকীল, পাওনার বাইরে তো কিছু নাও নি বাবা?"

"আইনের চোখে পাওনা বটে, কিন্তু তাতে কোন নীতির সমর্থন নেই মা। সেই জন্যেই মনে হয়, বেশির ভাগ টাকাই আমি ঋণ করেছি। মরবার আগে, আমায় তুই ঋণমুক্ত করে দে, মা।"

বেলারানীর বদলে, চোখ দিয়ে জল ফেললেন হরিলালবাবু। জল ওঁকে টানে।

বাবার মাথায় হাত বুলতে বুলতে বেলারানী বললে, "ঋণ শোধ দেওয়ার ব্যবস্থা করো। দিন ঠিক করো।" এই বলে বেলারানী বেরিয়ে আসছিল ঘর থেকে। নিজের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে ভেবেছিল। ভেবেছিল, জানালার ও-পাশে হাত নামিয়ে দিয়ে মাধবীলতাকে টেনে তুলে নিয়ে আসবে নিজের মুখের কাছে। মাধবীলতার সঙ্গে কি একটা গোপন কথা ছিল বেলারানীর। আবেগের গভীরতা ওর ঠোঁট দুটোকে চঞ্চল

করে তুলেছে। কেবল মন-দেয়া নেয়ার ভাবপ্রবণতা এতে ছিল না। সবটুকু দেওয়ার আধ্যাত্মিক পরিণতি যেন বেলারানীকে আজ পাগল করে তুলেছে। উদ্বেল বন্যা স্রোতের সঙ্গে ও বুঝি ভেসে যেতে চায়! কোটি কোটি বছরের মধ্যে এমন মুহূর্ত আসে না। স্থান-কাল-পাত্রের সজ্ঞান অনুভূতি সময়হীনতার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে না পারলে এমন মুহূর্তের অভিজ্ঞতা অতি অসম্ভব। এমন মুহূর্তের ক্ষয় নেই। কিন্তু হরিলালবাবু বেলারানীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন সাংসারিক স্তরে, বংশরক্ষার স্বাভাবিক আলোচনায়।

"একটু দাঁড়া মা।" দাঁড়িয়ে গেল বেলারানী।

"আমার যদি আর একটা সন্তান থাকত, তোর বিয়ে আমি দিতুম না।"

"কেন বাবা?"

"ভয় হচ্ছে, জগদীশ যেন না ঠকে। কিন্তু আমার তো আর উপায় নেই মা। আমার সঙ্গে সঙ্গে যদি বসু-পরিবারটা একেবারে লোপ পেয়ে যায়, তা হলে স্বর্গে গিয়েও আমি শান্তি পাব না।"

"কিন্তু আমি তো তোমার মেয়ে, ছেলে নই?"

"তবুও আমার ছিটেফোঁটা লেগে থাকবে নাগবংশের অধস্তন অসংখ্য পুরুষদের মধ্যে। তোর কাছ থেকে এইটুকু অঙ্গীকার পেলে আমি শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারি মা।"

"অঙ্গীকার তুমি পেলে বাবা।" বেলারানী চলে এল ঘর থেকে।

"প্রিয়বালা, পৃথিবীতে এসে আমরা কেবল অরণ্যে রোদন করে গেলুম না। বেলারানী আমাদের পারিবারিক পরিচয় বাঁচিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। এবার আমি তোমার কাছে চলে যাব। হিন্দুর জীবনে এর চেয়ে ভাল মৃত্যু আর কি-ই বা হতে পারত প্রিয়বালা?"

আপাতত এর চেয়ে ভাল কিছুই হতে পারত না।

তারপরে দু-টো বছর অতীত হল। বসু-পরিবারের ছিটেফোঁটার অস্তিত্ব দেখে যেতে পারলেন না হরিলালবাবু। অন্যান্য লোকেদের মত একই শ্মশানে,

সেই তিন মন কাঠের আগুনে তাঁর দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই জানলো সবাই। কিন্তু বেলারানীর বিশ্বাস, এ-মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

হরিশ মুখার্জি রোডে খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ শেষ করলেন জগদীশবাবু। তাঁর কর্তব্যে কেউ কোথাও এতটুকু অবহেলা দেখতে পেল না। কেবল 'দানসাগরই'-ই করলেন না তিনি, দালাল পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন দশ-বিশটা বিধবা আশ্রমের সেক্রেটারীদের। মুক্ত হস্তে দান করলেন অনেক টাকা। হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে গোটা তিন নতুন দরওয়ান নিযুক্ত হয়েছে। জগদীশবাবু তাদের পাঠিয়ে দিলেন কালীঘাটের দিকে। দরওয়ানরা তাড়া করে নিয়ে এল হাজার খানেক ভিক্ষুক! রাস্তার ওপর ওরা পাতা পেতে বসে গেল সবাই। প্রচুর খাওয়া! ভিক্ষুকদের পেটের চামড়া ফুলে উঠল কোলা ব্যাঙের মত। বাকি তিনশ-চৌষট্টি দিনের খাবার যদি ওরা পেটের ফাঁকে জমিয়ে রাখতে পারত, জগদীশবাবু তাতেও আপত্তি করতেন না। হরিলালবাবুর মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখবার যাবতীয় ব্যবস্থা অবাক করে দিল বৌরানীকে।

সমস্তটা দিন কাজকর্মে ব্যস্ত রইলেন জগদীশবাবু। দেওয়ানজী টাকার খুতি হাতে নিয়ে লেগে রইলেন জগদীশবাবুর গায়ের সঙ্গে। সন্ধ্যের দিকে দেওয়ানজী বললেন, "ক্যাশ প্রায় সবই ফুরিয়ে এল।"

"ক্যাশ?" গলাটা তাঁর এরই মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে কাঠের মত, "ক্যাশ? ক্যাশ সব ফুরিয়ে গেল না কি? কিন্তু—" জগদীশবাবু দেওয়ানজীর হাতে ঝোলানো টাকার খুতিটার দিকে চেয়ে বললেন, "কিন্তু শ-খানেক টাকা আমার এক্ষুনি ক্যাশ চাই।"

"শ-খানেক টাকা এতে আছে।"

"তা হলে আপনি একটু দাঁড়ান দেওয়ানজী। আমার সঙ্গে একটু বাইরে যেতে হবে।"

জগদীশবাবু চলে এলেন দোতলায়। দু-পেগ হুইস্কি ঢেলে গলাটাকে ভিজিয়ে নিলেন। তারপরে, পা টিপে টিপে এলেন হরিলালবাবুর ঘরে। শ্মশান থেকে হরিলালবাবুর এক টুকরো হাড় তিনি কাগজে পেঁচিয়ে এনে রেখে দিয়েছিলেন

এই ঘরে। পুরো এক মাস এই ঘরেই রাখবার আদেশ পেয়েছিলেন তিনি ফকীর সাহেবের কাছে। এটা নিয়ম, নইলে সাচ্চা দাওয়াই তৈরি হবে না।

দেওয়ানজীকে সঙ্গে নিয়ে জগদীশবাবু গাড়িতে এসে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, বৌরানীর মাথার চুল আনা হয় নি। সেটাও নিতে হবে। কায়দা করে তিনি আগেই বৌরানীর দু-তিনটে লম্বা লম্বা চুল টুকরো টুকরো করে কেটে রেখে দিয়েছিলেন তাঁর নস্যির কৌটোতে। সোনার কৌটো। এটাতে তিনি নস্যি কখনও রাখতেন না। ওপরের ঘরে এসে জগদীশবাবু ড্রয়ার থেকে কৌটোটা বার করে পকেটে রাখলেন। বৌরানী দেখল না কি? না, সে ধারে-কাছে কোথাও নেই। মাত্র দু-বছর পার হয়েছে বিয়ের পরে, এর মধ্যেই বৌরানী জগদীশবাবুর ধারে-কাছে থাকতে চায় না, ভাবলেন তিনি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিনি হঠাৎ একটু থেমে গেলেন। প্রশ্ন করলেন নিজের মনে: দু-বছর আগেও কি বৌরানী জগদীশবাবুর ধারে-কাছে থাকতে চাইত? না, চাইত না। কেন চাইত না? অন্য কাউকে ভালবাসত না কি?

গাড়িতে বসে ভাবলেন তিনি, স্বামীর কর্তব্য তিনি পালন করতে পারেন নি। বৌরানী কেন, কোনো স্ত্রী-ই স্বামীর অক্ষমতাকে ক্ষমা করে না। বৌরানীও করে নি। জগদীশবাবু পারেন নি বৌরানীকে মাতৃত্বের সিংহাসনে বসাতে। প্রতি পলের কামনা তার নস্যির মত উবে গেছে নষ্ট-সম্ভোগের উত্তপ্ত হাওয়ায়।

পকেটে হাত দিয়ে তিনি দেখলেন, নস্যির কৌটো-টা যথাস্থানে আছে কি না। কিন্তু চুলের টুকরোগুলো? সাত দিন আগের সংগ্রহ, বৌরানী যদি আবর্জনা ভেবে কৌটো-টা পরিষ্কার করে রেখে থাকে? গাড়িটা তখন ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। হাতঘড়িতে সময় দেখলেন তিনি। সাতটা বেজে গেছে। সাড়ে আট-টার মধ্যে গিয়ে ফকীর সাহেবের কাছে পৌঁছুতে হবে। যখন তখন ওষুধ তৈরি হয় না। কোটি কোটি বছরের অগণিত মুহূর্তের মধ্যে বিশেষ একটি মুহূর্ত ছাড়া সন্তান পাওয়ার

ওষুধ কেউ পারে না তৈরি করতে। কিন্তু চুল? কৌটোটা বার করে জগদীশবাবু ভাবলেন, আঙুল ঢুকিয়ে একবার দেখে নেবেন। হঠাৎ বাতাসের জোর বাড়ল। কৌটোর মুখটা তিনি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেললেন, যেন সাত রাজার ধন এক মাণিকটিকে তিনি সোনার কৌটোয় বন্ধ করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে!

ফকীর সাহেব তাঁর ভাঙ্গা-আস্তানায় অপেক্ষা করছিলেন জগদীশবাবুর জন্যে। জগদীশবাবু এলেন, সময়মতই এলেন। গাড়িটা তিনি রেখে এসেছেন বড় রাস্তার ওপরে। দেওয়ানজী বসে রইলেন গাড়িতে।

ফকীর সাহেব হাত বাড়ালেন। সামনে তাঁর আগুন জ্বালানো রয়েছে। আগুনের ওপর দিয়েই হাতটা তিনি লম্বা ভাবে তুলে ধরলেন জগদীশবাবুর নাকের কাছে। পকেট থেকে প্রথমে তিনি বার করলেন হরিলালবাবুর আধ-পোড়া অস্থি। তারপরে সোনার কৌটোও দিয়ে দিলেন ফকীর সাহেবের হাতে।

এবার ওষুধ তৈরি হচ্ছে। জগদীশবাবু লক্ষ্য করলেন, ফকীর সাহেব তাঁর সবটুকু একাগ্রতা ঢেলে দিয়েছেন ওষুধ-প্রস্তুতির মধ্যে। অনেক রকমের মালমসলা, অস্থি আর চুলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললেন ফকীর সাহেব। পার হল এক ঘণ্টা। হাত ঘড়িতে দেখলেন তিনি, দু-ঘণ্টাও শেষ হয়ে গেল। সন্তান-সৃষ্টির মুহূর্তটাকে বোধহয় ফকীর সাহেব ধরতে পারছেন না। জগৎ ও জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত! সৃষ্টির মুহূর্ত! এ-মুহূর্তটির ওপর কর্তৃত্ব করছেন ভগবান নিজেই, ভাবলেন জগদীশবাবু। মধ্যরাত্রির গাম্ভীর্য ভেদ করে ফকীরসাহেব কথা বললেন। চোখ খুললেন তিনি। কোথা থেকে তিনি ধরে নিয়ে এলেন সেই মুহূর্তটিকে?

তিনি বললেন, "এই নিন ওষুধ। এতে খোদার মেহেরবানি রইল।"

"কেমন করে খেতে হবে? ক-বার এবং ক-দিন খাবো?" জিজ্ঞাসা করলেন জগদীশবাবু।

"সাত বার এবং সাত রাতে। দেহের সব বিষ কাটিয়ে দেবে এই দাওয়াই।

কোনো বিষই টিকতে পারবে না এর কাছে, কেবল সেঁকো বিষ ছাড়া।" ফকীর-সাহেব ওষুধটা ভরে দিলেন সোনার কৌটোতে।

জগদীশবাবু তাঁর বাঁ হাতের মুঠোয় কৌটোটাকে প্রাণপণে চেপে ধরে রাখলেন। অনুভব করলেন, জন্ম নিচ্ছে জীব। নাগবংশের আগামী পুরুষ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাবার জন্যে পার হচ্ছে পথ। সারাটা পথের ওপর ওষুধের গুঁড়োগুলোকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে জগদীশবাবু ছটফট করতে লাগলেন। বৌরানী হয়তো এখনও ঘুমিয়ে পড়ে নি। আজ রাতেই তিনি ওষুধ খাবেন প্রথম। সৃষ্টির মুহূর্তটিকে যখন ফকীরসাহেব ধরে দিয়েছেন কৌটোর মধ্যে, তখন আর অপেক্ষা করা কেন?

দশ টাকার দশখানা নোট ডান পকেট থেকে বার করে জগদীশবাবু বললেন, "ক্যাশ সব ফুরিয়ে গেছে। কাজ হলে এর দশগুণ এসে দিয়ে যাবো ফকীরসাহেব।"

"টাকা দিয়ে তো খোদাতালাকে খুশী করা যায় না বাবু! আপনি সওয়া পাঁচ আনা পয়সা ওখানে রেখে যান।"

"সওয়া পাঁচ আনা?" পকেট হাতড়াতে লাগলেন জগদীশ নাগ, "সওয়া পাঁচ আনা পয়সা যে কি করে গুনতে হয়, তাও আমি জানি না—মানে, সওয়া পাঁচ আনা পয়সা মানুষের কি কাজে লাগে ফকীর সাহেব?" কি এক অদ্ভুত রকমের উত্তেজনায় জগদীশবাবুর কথাবার্তা সব জড়িয়ে আসছিল। অসংলগ্ন ঠেকছিল তাঁর প্রতিটি কথা। ফকীর সাহেব বললেন, "সওয়া পাঁচ আনা বাদ দিয়ে তো এক-শ টাকা হয় না বাবু। তা বেশ তো, কাল না হয় কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।"

"না, না আমি নিয়ে আসছি এখুনি। গাড়িতে দেওয়ানজী আছেন। সওয়া পাঁচ আনা পয়সা আমি আজও চোখে দেখিনি ফকীর সাহেব।"

"সম্ভব, খুবই সম্ভব।" মাথা নেড়ে বললেন ফকীর সাহেব।

একটুপরেই, মধ্যরাত্রির অবগুণ্ঠন ভেদ করে গাড়ি ফিরে চলল কলকাতার দিকে। সমস্তটা রাস্তায় জগদীশবাবু জনমানব দেখতে পেলেন না। ফুরফুরে

বাতাসে তাঁর একটু তন্দ্রা এল। তন্দ্রার মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, পৃথিবীটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে। তিনিই বুঝি পৃথিবীর প্রথম মানুষ। বড্ড একা একা লাগছে প্রথম মানুষের। কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না জগদীশবাবু। গল্প রচনা করতে লাগলেন তিনি। নারী এল। সঙ্গী পেলেন তিনি। রতি-বিলাসের প্রথম রাত্রি সমাগত!

"ড্রাইভার, রোকো, গাড়ি রোকো।" জাগ্রত জগদীশবাবু হুকুম দিলেন ড্রাইভারকে। গাড়ি সে দাঁড় করাল। গাড়িটা দাঁড়াল আলীপুরের পোলটার কাছে।

তিনি বললেন, "দেওয়ানজী, চিৎকার শুনেছেন?"

"চিৎকার? কই না তো!" বললেন দেওয়ানজী।

"না? এই মাত্র আমি একটা শিশুর চিৎকার শুনলুম?"

রাস্তার ডানদিকে, গাড়িটার খুব কাছে একটা ডাস্টবিন ছিল। হঠাৎ সেখান থেকে সত্যিসত্যি একটা চিৎকার শোনা গেল এবার। চিৎকার ঠিক নয়, পরিত্যক্ত নবজাতকের প্রথম প্রতিবাদ। প্রতিবাদ তার মানুষের বিরুদ্ধে। "দেওয়ানজী—" জগদীশবাবু দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পারলেন না। দেওয়ানজী একরকম জোর করেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "ড্রাইভার, গাড়ি ছাড়ো।" পোল পার হয়ে গাড়ি চলে এল অনেকটা দূরে।

"একি করলেন দেওয়ানজী?"

"কর্তাবাবু, এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়ত। বড্ড বিপদে পড়ে যেতেন বাবু। লজ্জার আর সীমা থাকত না।"

তারপরে, আরও দুটো বছর কেটে গেছে—পার হয়ে গেছে পঞ্চম বর্ষও। কিন্তু জগদীশবাবুর লজ্জা ঘুচিয়ে দিতে পারল না কেউ। মানুষ কত দুর্বল, মানুষ কত অক্ষম! ভাবলেন বারোদির বড় জমিদার জগদীশচন্দ্র নাগ।

কদিন হল সুরমাকে হাসপাতালে পাঠাবার কথা হচ্ছিল। একরকম জোর করেই ওকে হাসপাতালে পাঠাতে চাইলেন জগবন্ধুবাবু। ফরাসগঞ্জ রাস্তার

পাঁচ নম্বর বাড়িটা স্থরমা ছাড়তে চায় না। ছাড়তে চায় না খোকা এবং স্বামীকে। কিন্তু জগবন্ধুবাবুর আর কোন উপায় নেই। ডাক্তার বলে গেছেন, হাসপাতালে না পাঠালে বিপদ হতে পারে। সেখানে গেলেই যে স্থরমা বেঁচে যাবে তেমন কথা কেউ অবশ্যি জোর করে বলতে পারে না।

স্থরমার দ্বিতীয়বার সন্তান হওয়ার সময় বিপদ ঘটল। প্রায় আট ঘণ্টা স্থরমার জ্ঞান ছিলনা!

হিন্দুস্থানী দাই এসেছিল প্রসব করাতে, দেখতে এসেছিল বৌরানী। জগবন্ধুবাবু রাস্তায় পায়চারি করছিলেন। স্থরমার চিৎকার তিনি রাস্তা থেকে শুনছিলেন।

ভজহরি বাড়ি ছিল না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে পার্কে চলে গেছে খেলা করতে। জগবন্ধুবাবু ইচ্ছে করেই ওকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজেই ওকে এগিয়ে দিয়ে এসেছেন গলিটার মুখ পর্যন্ত। যাওয়ার সময় ভজহরি বলল, "বাবা, আজ আমি খেলব না।"

"কেন খোকা?"

"মার বড্ড অস্থখ। আমি আজ মাঠে যাব না বাবা।" বড়রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনুরোধ করল ভজহরি।

"এক ঘণ্টা পরে ফিরে এসো। ঐ দেখো, বাপী আর জয় তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। যাও—"

"যাচ্ছি, কিন্তু আমি আজ কিছুতেই খেলব না।" এই বলে ভজহরি পেছন দিকে চাইতে চাইতে চলে গেল পার্কের দিকে।

গলির মুখে জগবন্ধুবাবু প্রায় পাঁচ মিনিট পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। স্থরমার চিৎকার তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। এমন সময় বড়রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল গলির মুখে। জগবন্ধু শুনতে পেলেন ফজ্‌লু কোচোয়ানের গলা, "ওস্তাদজী, রাস্তা দিজিয়ে—"

বন্ধগাড়ির দরজা খুলে বৌরানী বলল, "উঠে আস্থন।"

"বৌরানী?" বিস্ময়ের স্থর ভেসে উঠল জগবন্ধুবাবুর কণ্ঠে।

"সুরমাদিকে দেখতে এলুম। এত শিগগির বাচ্চা হবে আপনি তো আমায় বলেন নি?"

"সাধারণত এত শিগগির হয় না। সেই জন্মেই ভয় হচ্ছে—"

"কি ভয় হচ্ছে?" বৌরানীর স্বরে সহানুভূতি না হেঁয়ালী জগবন্ধুবাবু বুঝতে পারলেন না।

মুখ বার করে বৌরানী দেখল, গলির মধ্যে লোকজন কেউ নেই। সে নিজেই দরজা খুলে নেমে পড়ল রাস্তায়। জগবন্ধুবাবুর পাশে এসে দাঁড়াল। তারপরে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

জগবন্ধুবাবু বললেন, "এই সময়ে আপনি না এলেই পারতেন।"

"অন্য সময়ে এসে আমার কি লাভ হতো?" জিজ্ঞাসা করল বৌরানী।

"লাভ-লোকসান জানি না, তবে সুরমার এই কষ্ট আপনি চোখে দেখতে পারবেন না।"

"কষ্ট?" বৌরানীর মুখে মৃদু হাসি ভেসে উঠল; "সৃষ্টির পেছনে কষ্ট থাকবেই। কিন্তু সব কষ্টই সার্থক হয় না ওস্তাদজী।"

"কি? মানে, আপনি কখন্ যে কি বলেন!" জগবন্ধুবাবু কেমন ছেলেমানুষের মত চঞ্চলতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

বৌরানী বলল, "আমি ঠিকই বলি জগবন্ধুবাবু। সব কষ্ট থেকেই সৃষ্টি আসে না। বোধহয় ওপরওয়ালার খানিকটা আশীর্বাদ চাই।"

"কোন্ ওপরওয়ালা? মানে, আপনি ভগবান মানেন না কি?"

"কোন দিন মানি নি······বুঝবার চেষ্টাই করি নি। তবু মনে হয়, কোন-কিছু একটা মানা ভাল ছিল। নইলে—"

"নইলে কি বৌরানী?" জগবন্ধুবাবু জবাব শুনবার জন্যে তার মুখটা নামিয়ে ধরল বৌরানীর মুখের ঠিক তিন চার ইঞ্চি দূরে। তাঁর নাকের নিশ্বাস লাগল বৌরানীর মুখে। পেছন দিকে একটু সরে গিয়ে বৌরানী বলল, "নইলে বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কেবল তাই নয়, জীবনের বন্ধ্যাত্ব বোধহয় কোন দিনও ঘোচে না।"

বসবার ঘরে এসে পৌঁছল বৌরানী। সুরমার চিৎকারে দুজনেই যেন ঘুম থেকে উঠে এল হঠাৎ। জগবন্ধুবাবু বললেন, অনেকটা অনুরোধের সুরেই, “আপনি এখানেই বসুন, ওঘরে আপনি যেতে পারবেন না।”

“কেন, ওঘরটাতো আমার চেনাই আছে। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় ঐখানেই—কেবল পরিচয়ই নয়······মাগো, কী শক্ত আপনার হাত দুটো!” বৌরানী দু-ঘরের মাঝখানের দরজাটার ওপর হাত রাখল। জগবন্ধুবাবু এবার একরকম মরিয়া হয়েই বৌরানীর হাতটা দরজার ওপর থেকে টেনে তুলে নিয়ে এসে বললেন, “না, না, আপনার ওসব দেখবার দরকার নেই।”

বৌরানী যেন ইচ্ছে করেই ঝুঁকে দাঁড়াল জগবন্ধুবাবুর দিকে। আর একটু বেশি ঝুঁকলে জগবন্ধুবাবুর চওড়া বুকের ওপর বৌরানীর মাথাটা এসে ঠেকত। কিন্তু বৌরানীর বুদ্ধি সজাগ হয়ে ওঠে ভাল মন্দর সীমায় এসে। এক সুতোর ব্যবধানে যে গড়িয়ে পড়ে যেতে পারত অনেক নিচে, সে সামলে নেয় তার শেষ পদক্ষেপ অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। তারপরে সে ঘরে পৌঁছয় সমতল রাস্তা দিয়ে হেঁটে। এমনি করে বৌরানী হাঁটছে অনেক দিন থেকেই—রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনটাও তাই তার অত্যন্ত সমতল হয়ে উঠেছে।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বৌরানী বললে, “আমি ওসব দেখবই, দেখবার জন্যেই এসেছি।”

“কিন্তু সুরমার কষ্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি দেখবেন কি করে? আপনার কাছে অসহ্য মনে হবে!”

“সহ্য করবার ক্ষমতা যে আমার কত, আপনি তা জানেন না ওস্তাদজী!”

জগবন্ধুবাবু আবার এসে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলেন। বৌরানীর কথা তাঁর আর মনে রইল না। তিনি কেবল ভাবতে লাগলেন সুরমার কথা। চিৎকার শুনতে শুনতে তিনি যেন বধির হয়ে উঠলেন। এর পরে, দুনিয়ার কোন চিৎকারই বুঝি আর তাঁকে বিচলিত করতে পারবে না।

ফজ্‌লু খানিকটা দূরে বসে বিড়ি টানছিল। টানছিল বেশ আরাম করেই। কাজের ওপর তার এখন শ্রদ্ধা এসেছে। এসেছে দায়িত্ব। গাড়ির ওপর বসে সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালায় না - যন্ত্রের একঘেয়েমি উধাও হয়েছে ফজ্‌লুর কাজ থেকে। সে সতর্কভাবে বুঝে সুঝে আজকাল দায়িত্বসম্পন্ন কোচোয়ানের মত গাড়ি চালায়। চাবুক চালায় না ঘোড়ার পিঠে, মাঝে মাঝে শূন্য আকাশে চাবুক দিয়ে আওয়াজ তোলে মাত্র। তাতেই ঘোড়াটা অতি সুন্দর ভাবে ছুটতে থাকে, ছন্দ ওঠে ঘোড়ার পা-এ। ছন্দ ওঠে ফজ্‌লুর জীবনে। বৌরানীর দায়িত্ব সব ফজ্‌লুর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন জগদীশবাবু। বাড়ি থেকে বেরুবার পরে বৌরানীর স্বাধীনতা খর্ব হয়ে যায়, বৌরানীর স্বাধীনতার অংশ পায় ফজ্‌লু।

গাড়ির আড়ালে বসে সে মনের আনন্দে আজ বিড়ি টানছিল। ওস্তাদজীর সঙ্গে বৌরানীর দেখা হলেই যেন ফজ্‌লু বিড়িতে টান্ মারে জোরে জোরে। গুণ গুণ করে সুর তোলে গলায়। কোন গানই ও পুরোপুরি জানে না। দু-একটা করে কলি সময় বুঝে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে ওর। যেন বৌরানীর মনের কথাগুলো গানের সুরে প্রকাশ করতে থাকে ফজ্‌লু শেখ।

আজও সে তেমনি একটা গানের কলি গলায় তুলেছে। পরকীয়া প্রেমের অর্থ রয়েছে গানের কথাগুলোতে। মাঝে মাঝে সে গান থামিয়ে তবলার চাটির মত জিব দিয়ে টাকরার ওপর তাল তুলছিল। বৌরানীর জন্যে আজ সে সমস্ত রাত রাস্তায় বসে টাকরার ওপর তাল তুলতে পারে!

গান থামিয়ে ফজ্‌লু শেখ এল ঘোড়ার কাছে। কোচ-বাক্সের তলায় বস্তায়-ভরা কাঁচা ঘাস ছিল। টান্ দিয়ে বস্তাটা সে নামিয়ে ফেলল রাস্তায়। আস্তাবলে ঘোড়াটা ঘাস খেয়েছে প্রচুর। জমিদারের ঘোড়া খাদ্যের অভাবে কোনদিনই কষ্ট পায় না। কিন্তু ফজ্‌লু আজ সবাইকেই দিতে চায়। দিয়ে সে ফতুর হয়ে যেতে চায়। বস্তাটা খুলে ঘাসগুলো সব ঢেলে দিল ঘোড়াটার মুখের কাছে। লাগামটা দিল মুখ থেকে আলগা করে।

গাড়ির পেছন দিকে এসে আবার একটা বিড়ি ধরাবে ভাবছিল ফজ্‌লু

শেখ। কিন্তু ধরাবার প্রয়োজন বোধ করল না সে। গাড়ির পেছনে বসেছিল খোকাবাবু—ভজহরি।

"আরে খোকাবাবু! লাও ধরো—" ফজ্‌লু শেখ পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তুলে ধরল ভজহরির সামনে।

"না, টাকা আমি নেব না।" বলল ভজহরি।

কিন্তু টাকা না নিলে ফজ্‌লু আজ ছাড়বে কেন ওকে? সবই সে আজ উজাড় করে দিতে চাইছে!

"খোকাবাবু তুমি তো আমার বেটার মত। লাও, টাকা লাও।"

"টাকা নিয়ে আমি কি করব?"

"মিঠাই খাবে।"

"না, আমি আজ মিঠাই খাব না।"

"কেন খোকাবাবু?"

"মার বড্ড অসুখ। খেলতে তাই আজ ভাল লাগল না। তোমার এখানে আমি বসে থাকি, কেমন? জমিদারবাবুরা রাগ করবেন না তো?"

"না, না - জমিদারবাবু কোথায় এখানে? গাড়ির মালিক তো এখন আমি খোকাবাবু। গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসো।"

"না, আমি তোমার পাশেই বসব।"

"কেন খোকাবাবু, আমার পাশে বসবে কেন? তোমরা তো সব ভদ্দরলোক?"

"না, আমরা গরীবলোক। গরীবলোকেরা সব এক জায়গায় বসে।"

ভজহরির কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল ফজ্‌লু শেখ। গানের একটা কলিও আর ওর মনে রইল না। স্মরণশক্তি বোবা হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে।

বোবা করে দিল জগবন্ধুবাবুর ছেলেটা! ইস্‌কুলে ভর্তি হয়েছে ভজহরি। বড় ওস্তাদের ছেলে ভজহরি। ইস্‌কুলের সব ছেলেরাই জানে সে-খবর। সবাই আসে ওর সঙ্গে ভাব করতে। কিন্তু সে কখনও বড় লোকদের ছেলেদের সঙ্গে মেশে না। কথা সে এমনিতেই কম কয়। কিন্তু কথার মধ্যে থাকে

নতুন ধরনের সুর। জগবন্ধুবাবুও তা টের পেয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, সমাজের সবচেয়ে নিচু স্তরের দিকেই ছেলেটার দৃষ্টি আছে আবদ্ধ হয়ে। কি করে হল, কেমন করে হল তা তিনি জানেন না। জমিদার-বাড়িতে গিয়ে সে কারো সঙ্গে কথা কয় না। পালিয়ে যায় আস্তাবলের দিকে। ফজ্‌লু শেখের সঙ্গে বসে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাষায় গান করে। কি গান? খেয়াল-ঠুংরী খোকার ভাল লাগে না। কেন ভাল লাগে না খোকা? জিজ্ঞাসা করেন জগবন্ধুবাবু। ভাল লাগে না এই জন্যে যে, ফজ্‌লুরা এসব গান বুঝতে পারে না। "বাবা, আমায় তুমি এমন গান শিখিয়ে দাও, যে-গান আমি সবাইকে বোঝাতে পারি। গাইতে পারি মাঠে-ময়দানে, বোঝাতে পারি রাস্তার লোকদের।" অবাক হয়ে জগবন্ধুবাবু শোনেন খোকার বক্তব্য!

"কিন্তু রাস্তার লোকেরা লেখাপড়া শেখেনি বলে তোমার খেয়াল-ঠুংরী ওরা বুঝতে পারে না খোকা।"

"তা হলে আমি লেখাপড়া শিখব না বাবা।"

উত্তেজিত হয়ে জগবন্ধুবাবু ডেকে নিয়ে আসেন সুরমাকে। ডেকে বলেন, "শোনো তোমার ছেলের কথা! গাড়োয়ানদের সঙ্গে মিশে মিশে কি বিচ্ছিরি ধরনের কথাবার্তা শিখেছে।" খোকার দিকে চেয়ে তিনি পুনরায় বলেন, "গান আমাদের কাছে ভগবানের মত বড়, খোকা।"

"কিন্তু ফজ্‌লু বলে কি জানো বাবা?"

"কি বলে?"

"বলে যে, গাড়িটা ওর কাছে আল্লা! গাড়ি চালানো ওর মস্তবড় ধর্ম। ধর্ম কি বাবা?"

জগবন্ধুবাবু কোন জবাব দিলেন না। তিনি চেয়ে রইলেন সুরমার দিকে। ধলেশ্বরীর ঢেউ যেন সুরমার দেহের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ভজহরিকে, নিয়ে যাচ্ছে পিতার ইচ্ছাকৃত রাস্তায় নয়—অন্য এক দিকে। খেয়ালের বিস্তার সেখানে অহেতুক আর্তনাদ বলে মনে হচ্ছে তাঁর। মনে হচ্ছে, ধলেশ্বরীর ঢেউ এসে পুরোনো ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে গেল! তারপরে সর্বনি

স্তর থেকে ভেসে উঠল নতুন মাটির বুক। খোকা আর ফজ্‌লু সেখানে হাত-ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে। খেয়াল-ঠুংরীর স্থর তখনও অনাগত রহস্যের জন্ম-কোষে আবদ্ধ। স্থর সেখানে একটা, অতএব বিস্তারের বৈচিত্র্য ওরা কোনদিনও জানতে পারবে না। নতুন মাটিতে স্থরের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সর্বজনীন বৈচিত্র্যহীনতা নিরর্থক উল্লাসে মাতিয়ে তুলেছে সঙ্ঘবদ্ধ জনতার সঙ্গীতহীন কণ্ঠ। জগবন্ধুবাবু অসংশয়ে ভেঙ্গে দিলেন মাতৃত্বের অহংকার। তিনি বললেন, "তোমার মধ্যে সভ্যতার শেষ আমি দেখলুম। এখন কেবল পড়ে রইল ভগবান-বিবর্জিত মস্তবড় একটা বালুচর।"

"ভগবান আছেন সর্বঘটে। তাঁরই আশীর্বাদ ঝরে পড়বে বালুচরের প্রতিটি বালি-কণায়।" এই বলে স্থরমা খোকাকে দু-হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চলে গেল রান্না ঘরে।

সে-কাহিনীও আজ পুরোনো হয়ে গেছে। স্থরমার দ্বিতীয় সন্তান জন্ম নেবার সময় হল।

ফজ্‌লু শেখ মিষ্টির ঠোঙা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভজহরির সামনে। ভজহরিকে আজ সে লুব্ধ করতে পারছে না কোনরকমেই। সে আজ ভজহরির মনের খবর কিছুই জানে না। ফজ্‌লু বুঝতে পারেনি যে, পাঁচ নম্বর বাড়িতে একটু আগেই, ওস্তাদজীর একটি মৃত সন্তান জন্ম নিয়েছে।

বাইরের ঘর থেকে বৌরানী বেরিয়ে এল। ফজ্‌লু তাঁকে দেখতে পেয়েই খাবারের ঠোঙাটা ফেলে দিল হাত থেকে। বৌরানীর পেছনে পেছনে জগবন্ধুবাবুও এলেন। ফজ্‌লু গিয়ে কোচ-বাক্সে বসে পড়ল।

বৌরানী বলল, "এবার আপনি স্থরমার কাছে গিয়ে বস্থন। আমি গিয়ে এক্ষুনি বড় ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"কিন্তু—" জগবন্ধুবাবু কি যেন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন।

"ছেলেই হয়েছিল, কিন্তু বাঁচে নি। আপনার দোষ কিছু নেই, জন্ম-মৃত্যুর ওপর মানুষের বোধহয় কোন হাত নেই।" গাড়িতে উঠল বৌরানী। গাড়ির ও-পাশের দরজাটা বন্ধ করাই ছিল। জানালাগুলো তো আগে থেকেই বন্ধ

থাকে। বৌরানী এ-পাশের দরজা দিয়ে মুখ বার করে বলল, "সুরমাকে বাঁচিয়ে তুলুন। আপনার কৃতিত্ব তো এখানেই শেষ হচ্ছে না, দুঃখ কিসের?"

জগবন্ধুবাবু কোন জবাব দিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন বৌরানীর শাড়ীটার দিকে। খানিকটা জায়গায় তিনি রক্তের দাগ দেখতে পেলেন। সুরমার পক্ষে যা স্বাভাবিক, বৌরানীর শাড়ীতে তা অত্যন্ত নোংরা মনে হল জগবন্ধুবাবুর। তিনি গাড়ির দরজাটা নিজেই বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন।

ফজ্‌লু লাগাম ধরে টান মারল। গলি থেকে গাড়ি বেরিয়ে যেতে বোধহয় দু-মিনিটও লাগল না। গাড়ির মধ্যে খুবই অন্ধকার মনে হল বৌরানীর। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু বাইরে বেশ আলোই ছিল। জগবন্ধুবাবু দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার পরে, গাড়ির মধ্যে যেন নেমে এল মধ্যরাত্রি। মনে হল, দম আটকে আসছে তার। জগবন্ধুবাবু গাড়ির দরজাটা অমন শব্দ করে বন্ধ করলেন কেন? বৌরানী স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছেন যে, জগবন্ধুবাবু তাঁর লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন গাড়ির হাতল পর্যন্ত, একটু বেশি জোরেই যেন তিনি হাতল ধরে টান মারলেন। এতবড় একটা জোয়ান মানুষের এত বেশি শক্তি ক্ষয় করার দরকার ছিল কি? পুরুষ মানুষ তার শক্তি নষ্ট করবে কেন? বৌরানী ঘামতে লাগল গাড়ির অন্ধকারে বসে। সমস্ত শরীরটা তার ভিজে উঠল, ভিজে উঠল শাড়ীটাও। মনের কল্পনা দিয়ে সে ভিজেয়ে দিতে চাইল বন্ধ-গাড়ির স্বল্প আয়তনটাকে। সুরমার ব্যথার তীব্রতা সে দেখে এসেছে। আয়তনটুকু ভিজে উঠবার পরে বৌরানীর যেন মনে হল, তারও বুঝি ব্যথার বন্যা শরীরের বাঁধ ভেঙ্গে বয়ে চলেছে হু হু করে। ব্যথার তীব্রতা সুরমার চেয়ে কম নয় তাঁর!

দরজা খুলল ফজ্‌লু শেখ। গাড়ি এসে থেমেছে ডাক্তারবাবুর বাড়ির দরজায়। বৌরানী বলল, "ডাক্তারবাবুকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।"

"জী—" সেলাম ঠুকে ছুটল ফজ্‌লু শেখ।

ফজ্‌লু চলে যাওয়ার পরে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ভজহরি। সে জিজ্ঞাসা করল, "বৌরানী—"

"কে ?" চমকে উঠল বৌরানী।

"আমি। আমি ভজহরি।"

"খোকা? গাড়িতে উঠে আয়। তুই কোথায় ছিলি খোকা?"

"গাড়ির পেছনে বসেছিলুম।"

"কেন, গাড়ির পেছনে কেন দুষ্টু ছেলে ? উঠে আয় খোকা, তুই আমার কোলে বসবি। আয়—" হাত বাড়াল বৌরানী।

"আমি পেছনেই বসব। কিন্তু তুমি কাঁদছিলে কেন বৌরানী ?"

"না, আমি কাঁদি নি।"

"এই মাত্র আমি নিজের কানে শুনেছি। আমার কান কি মিথ্যে হতে পারে ? মা বুঝি বাঁচবে না বৌরানী ?"

ডাক্তারবাবু এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। ভেতর থেকে বৌরানী বলল, "আপনি এখুনি একবার ওস্তাদজীর বাড়ি যান। তাঁর স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করেছেন। তিনি নিজেও……টাকা-পয়সা যা লাগে আমি দেব।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এখুনই যাচ্ছি। মেয়েদের ব্যাপার, আমি সঙ্গে করে ডাক্তার বোসকে নিয়ে যাব। তিনিই এখন এ-শহরের সেরা চিকিৎসক, গাইনাকোলজিস্ট।"

"হ্যাঁ, তবে তাই করুন। টাকা—আচ্ছা ভজহরিকে দিয়ে টাকা আমি ওস্তাদজীর বাড়িতেই পাঠিয়ে দেব।"

"রাত করে ছেলেমানুষের হাতে টাকা পাঠাবার দরকার নেই। কাল আমি নিজেই যাব।"

"কেন ? ফজ্‌লু আমার সঙ্গে থাকবে ডাক্তারবাবু।" মন্তব্য করল ভজহরি।

বৌরানী বলল, "বেশ, তাই হবে। তুই এবার গাড়িতে উঠে আয় খোকা।" হাত বাড়িয়ে সে খোকার জামা ধরে একটা টান মারল। ফজ্‌লু ওকে ঠেলা দিয়ে তুলে দিল গাড়িতে। বৌরানী বলল, "ফজ্‌লু,—"

"জী—"

"চল্, রমণার দিকটায় একটু ঘুরে আসি।"

"জী হুজুর।"

কোচ-বাক্সে বসে চাবুকের আওয়াজ তুললো ফজ্‌লু শেখ। খানিকটা দূরে যাওয়ার পরে, খোকা জিজ্ঞাসা করল, "মাঠের দিকে চললে যে? টাকা দেবে না?"

"দেব। টাকার জন্যে তো চিকিৎসে আর আটকে থাকবে না।"

"না, তা থাকবে না। কিন্তু—" থেমে গেল ভজহরি।

রমণা-মাঠের পাশ দিয়ে গাড়িটা চলেছে। রাস্তাঘাট খুবই নির্জন এ-অঞ্চলে। বড় বড় বাগানওয়ালা বাড়িতে সাহেব সুবোরা থাকেন। রাস্তা থেকে বাড়ির একটু একটু দেখা যায়। গোটা বাড়িগুলো গাছপালা দিয়ে এক রকম ঢাকাই থাকে। রাত্রিতে আর কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে দু-একটা ইলেক্‌ট্রিক বাতির ভাঙ্গা-ভাঙ্গা টুকরো এগাছ-ওগাছের ফাঁক দিয়ে এসে বাড়ির সীমানা পর্যন্ত পৌঁছয়। দু-পাশের নির্জনতা ভেঙ্গে দিয়ে ফজ্‌লুর গাড়ি চলেছে রমণা-মাঠের পাশ দিয়ে। বৌরানী দু-দিকের দরজাই দিল খুলে। রমণার মাঠে আবরুর কোন দরকার নেই।

"খোকা, তুই আমার পাশে আয়। কোলে বসবি?" জিজ্ঞাসা করল বৌরানী।

"না। বড়লোকদের কোলে আমি বসব না।"

"কেন?"

"তোমাদের কোলে আছে কি? কেবল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।"

"না, খোকা, আমার তাও নেই। আমি বড্ড গরীব। আমার অভাব তো তুই জানিস না।"

কোন কথা বলল না ভজহরি। কথা বলল না বৌরানীও। গাড়ি চলেছে ফজ্‌লুর হাতের টানে। ফজ্‌লুর হাতে আজ অনেক দায়িত্ব। চাবুকটা সেই থেকে সে শূন্য আকাশে তুলে ধরে গাড়ি চালাচ্ছিল। তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছিল ফজ্‌লু।

ডানদিকে রমণার কবরখানাটা ওর চোখে পড়ল। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে,

সে চাবুকটা নামিয়ে ফেলল। ফেলে রাখল একেবারে দৃষ্টির বাইরে, চালের ওপর। কবরের সামনে যেন উদ্ধত চাবুকটা নুইয়ে পড়ল নিজের ইচ্ছেতে। মানুষ কত দুর্বল! মানুষ কত অক্ষম! নাগবাবুদের হাজার টাকা খরচ করেও সে পারে নি তার বিবির জীবনটা রক্ষা করতে। সে মরে গেল! ঐ তো সেই কবরখানাটা। এখানেই সে বিবিকে কবর দিয়েছিল। কাফনের মধ্যে কোন কান্নাই সে শুনতে পায় নি সেদিন—কেউ পায়ও না। যারা হারায় তারাই কেবল সাঁতার দিয়ে মরে কান্নার মাঝ দরিয়ায়। ভালোবাসার মত সাচ্চা চীজ আর কি আছে দুনিয়াতে? কবরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে ফজ্‌লু শেখ প্রশ্ন করল দুনিয়ার ছোট-বড় সবাইকে। কি হবে লড়াই করে, কেন লড়াই? প্রশ্নের বন্যায় ফজ্‌লুর মন তোলপাড় হচ্ছে! কতকগুলো বই-কেতাব পড়ে বাবু এবং বাদশারা চলেছে দুনিয়া জয় করতে! দুনিয়া জয় করে কি হবে হুজুর? কি হবে জাঁহাপনা? কবরের ঐ মাটিটুকু জয় করতে পারবে? পারবে না। তবে? সহসা চাবুক তুললো ফজ্‌লু শেখ। অন্ধকারের ত্বকের ওপর দাগ পড়ল, চাবুকের দাগ। গোটা শিক্ষিত সমাজটার চামড়ায় দাগ ফেলতে পারলে ফজ্‌লুর মনের দুঃখ অনেকটা ঘুচত। কবরের মাটিতে যারা ভালোবাসার ফুল ফোটাতে পারে না, তারাই তো বুক চিতিয়ে কলম আর কামান দিয়ে দুনিয়ার মাটি চষে ফেলছে। কিন্তু কেন? মানুষকে ছোট-বড় করবার জন্যে। কি ফুল ফুটবে ও মাটিতে? কবরের সীমানা প্রায় শেষ হয়ে এল। ফজ্‌লুর মনে পড়ল তার বিবির কথা। সহসা চাবুকটা সে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করল কবরের মাটিকে। চাবুকের গা বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা জল।

জল বৌরানীকে টানে। কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ সে অনুভব করে জলের টানে! ভেসে যেতে পারলে যেন সে পৃথিবীর দিকে আর ফিরেও চাইত না। কি হবে তার পৃথিবীতে ঘর বেঁধে? অনেক তো সে দেখেছে, দেখার আর বাকী রইল কি? যৌবন প্রাপ্তির আগেইতো পৃথিবীটা বুড়ো হয়ে গেল! ক্রমবিবর্তন পৌঁছতে পারলে না তার উন্নতির উর্ধতম স্তরে। শঙ্খবিষের

ক্ষয় বড্ড-বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে আজ। মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রিয়তম ঐশ্বর্য, মুক্তমনের স্বাধীন বিস্তৃতিকে পঙ্গু করে দিল ক্ষমতার বিষ। পিতৃত্বের ক্ষমতা বাবার হাতে হয়ে উঠল বিষাক্ত অস্ত্র। বেলারানীর মনের ঐশ্বর্য বিক্ষত হল সেই অস্ত্রের আঘাতে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন পেলেন বাবা।

কিন্তু সে কথা ভেবে আর লাভ নেই। উপস্থিত বৌরানী খোকার মাথাটা বুকের ওপর চেপে ধরে গাড়িতে বসে রইল চুপ করে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে, গাড়ি এসে পৌঁছল নাগ-বাড়ির সামনে।

"একটু দাঁড়া ফজ্‌লু।" এই বলে বৌরানী ভজহরিকে নিয়ে চলে এল জেনানামহলের দিকে। চলে এল নিজের ঘরে। আলমারি খুলে বার করল এক গাদা টাকা। ভাঁজ করা শাড়ীর ফাঁক থেকে ঝরা-শিউলির মত ঝরে পড়তে লাগল পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোট! ভজহরি উবু হয়ে বসে মেঝে থেকে টাকা তুলতে তুলতে বলল, "আর কি হবে বৌরানী?"-

টাকাগুলো হাতে নিয়ে ভজহরি চেয়ে রইল বৌরানীর দিকে। ভজহরির যেন কি করে বিশ্বাস হল, বৌরানী সত্যি সত্যিই গরীব হয়ে গেলেন!

পাশের ঘর থেকে শাড়ীটা বদলে এসে বৌরানী জিজ্ঞাসা করল,

"তুই কি করে জানলি খোকা যে, মার অসুখ?"

"বা রে, ক-দিন থেকে ডাক্তার আসছিল যে।"

"কিন্তু কি অসুখ তা তো তুই জানিস না?"

"তাও জানি।"

খোকার টাকাসুদ্ধ হাতটা টেনে নিয়ে বৌরানী তার নিজের মুখের ওপর বুলতে বুলতে জিজ্ঞাসা করল, "কি অসুখ যদি বলতে পারিস, তা হলে তোকে আমি কলকাতার বাড়িটা দিয়ে দেব।"

"লোভ দেখালে আমি আর কিছুই বলব না।" ভজহরি জবাব দিল বড় মানুষের মত।

"আচ্ছা, কলকাতার বাড়ি তা হলে থাক। তুই এবার বল।"

"আমার এবার বোন আসবে।"

"কি করে আসবে ? হঠাৎ কেন বোন আসতে যাবে ?"

"তোমার আসে নি বলে মার আসবে না কেন ? হাত ছাড়ো. দেরি হয়ে যাচ্ছে।" যাওয়ার জন্যে ভজহরি ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে। হঠাৎ কি মনে করে বৌরানী ঘোষণা করল, "চল্, আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

রমাকান্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, বৌরানী ভজহরির হাত ধরে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। দেয়ালের ঘড়িতে তখন প্রায় আট-টা বাজে।

হিন্দুস্থানী দাই চলে গেছে মাংসের পুঁটলিটাকে কাপড় দিয়ে বেঁধে নিয়ে। গেছে অনেকক্ষণ আগেই। ঘরে জগবন্ধুবাবু একলাই ছিলেন। শোবার ঘরটাকেই আঁতুড়-ঘর করা হয়েছে। ঘর থেকে সব জিনিসপত্র সুরমা সকাল-বেলায়ই সরিয়ে রেখেছিল। তবলা জোড়াটা কেবল পড়ে ছিল এক কোণায়। বিয়ের পরে, তবলায় ঠেকা দেওয়া সে শিখেছিল জগবন্ধুবাবুর কাছেই। তারপরে, এপর্যন্ত সুরমা জগবন্ধুবাবুর সঙ্গে সঙ্গত করে এসেছে। সংসারের হাসিকান্নার সঙ্গে তাল রেখে এসেছে সে। তাল কখনও কাটে নি।

একটু আগেই সে চোখ খুলল। মুহূর্তের জন্যে মূর্ছা তার কেটে গেল। ক্ষীণস্বরে সে জিজ্ঞাসা করল, "বাচ্চাটা বুঝি বাঁচে নি ?"

"না।" জবাব দিলেন জগবন্ধুবাবু।

"আমিও বোধ হয় বাঁচব না। ওগো, খোকা কোথায় ?"

"রাস্তায় সে তো দাঁড়িয়েছিল। আচ্ছা দেখছি।" জগবন্ধুবাবু বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে দেখলেন, খোকা সেখানে নেই। তিনি ডাকলেন, "খোকা, খোকা—" সাড়া পেলেন না জগবন্ধুবাবু। সুরমাকে একলা রেখে তিনি কি করে এখন খুঁজতে যাবেন ? বৌরানী নিশ্চয়ই খোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। তিনি এলেন সুরমার কাছে। সুরমা চোখ বুঁজে ছিল। তিনি ডাকলেন, "সুরমা, সুরমা।" সুরমা কোন জবাব দিল না। তিনি বুঝলেন, সুরমা আবার মূর্ছা গেছে। জগবন্ধুবাবু ভয় পেলেন খুব। কি করবেন ভেবে উঠতে পারলেন না। ডাক্তার এল কই ? বৌরানী কি ভুলে গেল না কি ?

মরণ বাঁচনের মুহূর্তে ডাক্তার ডাকতে কেউ তো ভুলে যায় না! তবে কি বৌরানী ইচ্ছে করেই ভুলে গেল? কি লাভ হবে তাতে? অন্তত জগবন্ধুবাবুর জীবনে যে বৌরানীর বিন্দুমাত্র লাভের অংশ লগ্নি করা চলবে না, সে-কথা কি সে জানে না? জগবন্ধুবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। মৃদুভাবে ডাকলেন তিনি, "সুরমা, সুরমা—" তাঁর ডাক শুনে নয়, এমনিতেই সে চোখ খুলল। জিজ্ঞাসা করল আবার, "খোকা? খোকা এল না?"

"আসবে, এখুনি আসবে।"

"আমার বোধ হয় সময় ফুরিয়েছে। ওগো, আঁতুড়-ঘরে বৌরানী এসেছিল কেন?"

"তোমায় দেখতে।"

"দাইটার সঙ্গে ফিসফিস করে কি কথা কইছিল বৌরানী?"

চুপ করে বসে রইলেন জগবন্ধুবাবু। কি জবাব দেবেন তিনি?

"ওগো, আমি মরে গেলে, তোমার সঙ্গে তবলা বাজাবে কে?"

"কেউ না সুরমা। গান আমি ছেড়ে দেব।"

"কেন? বৌরানী তবলা বাজাতে পারে না?" জগবন্ধুবাবুর হাতটা ধরবার জন্যে সুরমা তার নিজের হাতটা তুলতে গেল, কিন্তু পারলে না। জগবন্ধুবাবু নিজেই এবার হাতটা সুরমার মুঠোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সুরমা যেন তার শেষ শক্তিটুকু ক্ষয় করে জগবন্ধুবাবুর হাতটা চেপে ধরল তার নিজের বুকের ওপর।

"ওগো—"

কথাটা শেষ হল না। কি রকম একটা হেঁচকা টান উঠল সুরমার গলা দিয়ে। তারপরে? তারপরে আর কিছু নেই। কারোই থাকে না। জগবন্ধুবাবু সুর চড়িয়ে ডাকলেন, "সুরমা, সুরমা—" নিজের মুখটা নামিয়ে নিয়ে এলেন সুরমার মুখ অবধি। নামিয়ে নিয়ে এলেন তার ঠোঁটের ওপর। মরা ঠোঁট! এর অনুভূতি আলাদা। স্বামী-স্ত্রীর শেষ চুম্বনের মধ্যে কি ছিল কে জানে! হয়তো স্বর্গ-মর্তের মধ্যে সেতু গড়তে চেষ্টা করলেন জগবন্ধু রায়।

এক রকম ছিটকে এসেই ঘরের মধ্যে পড়লেন দু-জন ডাক্তার। জগবন্ধুবাবুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন ডাক্তার রায়। সুরমার হাত চেপে ধরে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা হল নানান রকমের। পরীক্ষা করলেন দু-জনেই। বৌরানীর কথায় ওঁরা এসেছেন, অতএব অবহেলা করা চলবে না। ডাক্তার এবং রোগীর সম্পর্ক এটা নয়। এটা বৌরানী এবং টাকার সম্পর্ক। প্রথমটা না থাকলে দ্বিতীয়টার অর্থ কিছুই থাকে না।

"বড্ড দেরিতে খবর পেলুম," দুঃখ প্রকাশ করলেন শহরের সবচেয়ে বড গাইনাকোলজিস্ট, "সময় মত খবর পেলে হয়তো বাঁচাতে পারতুম।" জবাব দেওয়ার কোন কথা নেই বলে জগবন্ধুবাবু মুখ তুললেন না। ঘড়ির কাঁটায় ভুল থাকতে পারে, কিন্তু মরণের কাঁটা মেরামত সাপেক্ষ নয়।

ডাক্তার দু-জন কখন যে চলে গেছেন, জগবন্ধুবাবু তা টের পেলেন না। টের পেযে লাভও হতো না। ওঁদের মুখ থেকে দুঃখের কথা শুনে তিনি কি করতেন? সবচেয়ে বড দুঃখের মূলের খবর ওরা জানেন না। ওঁরা জেনে যেতে পারলেন না যে, জগবন্ধুবাবুর জীবনের সবটুকু সঙ্গীত সুরমা সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল!

তবলা জোড়া মাটির ঢেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

বাড়ির সামনে বৌরানীর গাড়ি এসে দাঁড়াল। ভজহরি লাফিয়ে নেমে গেল রাস্তায়। চৌকাঠ টপকে ঢুকে গেল ঘরে। ফজলু এসে যথারীতি গাড়ির দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল। বৌরানী নামতে গিয়ে আর নামল না। কি হবে নেমে?

ডাক্তার রায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমরা এসে পৌঁছুবার আগেই—" বৌরানী তার মুখটা চটকরে সরিয়ে নিলে ভেতর দিকে। হাত দিয়ে কান ঢাকল সে। অন্ধকার বলে ডাক্তার রায় দেখতে পেলেন না বৌরানীর দুটো কানের একটা কানও। তিনি আগের ঘোষণাটাই শেষ করলেন, "এক ফোঁটা ওষুধ দেবার আগেই—সি ওয়াজ ডেড্!"

ভুম্ করে একটা বোমা পড়ল ফরাসগঞ্জের গলিতে! কি করবে বৌরানী? গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে সে বসে রইল। প্রায় দশ বছর আগে, হরিলাল বসুর ফটকের সামনেও একটা বোমা পড়েছিল। সে দিন বেলারানী কি করেছিল? কিছুই না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়েছিল সে। চেয়েছিল ঐ ফটকের দিকটাতে, যেখান থেকে দেবেশকে কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশের লোকেরা। সমাজ, রাষ্ট্র ও পিতৃত্বের আইনের ওপর বেলারানী জোর খাটাতে যায় নি। মানুষের স্বাধীনতা ওরা পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল বলে বেলারানী যায় নি ওদের স্বাধীনতার ওপর জোর খাটাতে। কোন কিছুতে জোর না খাটাতে যাওয়ার মধ্যে বেলারানী দেখতে পায় কৃষ্টি ও সভ্যতার চরম বিকাশ। কিন্তু জোর না খাটালেই বা ক্রমবিবর্তনের মধ্যে উন্নতির বিপ্লব আসবে কি করে? বেলারানীর বিশ্বাস, ওর মত কোটি কোটি বেলারানীর বুকের ঢেউ একদিন ভেঙ্গে দেবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কারাগারটাকে। ক্ষমতার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মানব-মর্মের মুক্তি আনবে কোটি শহীদের ব্যথার বন্যা। বৌরানী আজও গাড়িতে বসে শহীদ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগল। সরে যেতে লাগল লোভের সীমানা থেকে, সরে যেতে লাগল জগবন্ধুবাবুর কাছে থেকে। জোর করে কোন কিছু আর সে ধরতে যাবে না।

ভজহরি টাকাগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়াল এসে সুরমার সামনে। বাবার চেয়ে ধৈর্য তার অনেক বেশি। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল। কাঁদবার ছেলে ভজহরি নয়। ধলেশ্বরীর ঢেউ ওর রক্তে রয়েছে বাঁধা—সারা জীবনের কান্না বোধ হয় ছেলেটা জমিয়ে রাখছে ভবিষ্যতের জন্যে। জগবন্ধুবাবু ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, "খোকা, মাকে এবার শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। লোক ডাকতে যাচ্ছি। তুই কাছে থাকিস।"

টাকাগুলো কচলাতে কচলাতে ভজহরি বলল, "তুমি তাড়াতাড়ি এস বাবা।"

"আসব। টাকাগুলো দিয়ে আর তো কোন কাজ হবে না খোকা।"

"তা হলে তুমি নিয়ে যাও, বৌরানীকে ফিরিয়ে দিও।"

"বৌরানী? তিনি এসেছেন না কি?"

"গাড়িতে বসে আছেন।" এই বলে ভজহরি টাকাগুলো বাবার হাতে গুঁজে দিল। জগবন্ধুবাবু টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন জগবন্ধুবাবু। বৌরানী দরজা দুটো দু-দিক থেকে টেনে দিয়ে মাঝখানে একটু ফাঁক করে রাখল। পুরোনোদিনের মত নাগ-বাড়ির বৌ দূরে সরিয়ে দিল জগবন্ধুবাবুকে। প্রাচীর তুলল বৌরানী।

জগবন্ধুবাবু বললেন, "সুরমা মারা গেছে।" দু-এক মিনিটের নৈঃশব্দ। তারপরে তিনিই আবার বললেন, "আপনার টাকাগুলো আপাতত কাজে লাগল না। তাই ফিরিয়ে দিতে এলুম।"

দরজার ও-পাশ থেকে বৌরানী বলল, "ফজলুর হাতে দিয়ে দিন।"

জগবন্ধুবাবু হাত বাড়ালেন কোচ-বাক্সের দিকে।

"একটু দাঁড়ান।" অনুরোধ করল বৌরানী। জগবন্ধুবাবুর লম্বা বলিষ্ঠ হাতটা বৌরানী দেখল দরজার ফাঁক দিয়ে। আঙুলগুলো কি সরু সরু! শিল্পীর হাত বলে বুঝতে আর কষ্ট হয় না। ঠিক এমনি ধরনের আরেকটা হাতের সঙ্গে বৌরানীর পরিচয় ছিল-- দেবেশদার হাত।

জগবন্ধুবাবু বললেন, "আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।"

বৌরানীর মনে হল, জগবন্ধুবাবু তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। আর বোধ হয় কোনদিনও দেখা হবে না। দেবেশদার ভাগ্যে বিদায় নেবার সুযোগও ঘটে নি! ফটকের বাইরে থেকে হাত বাড়াতে পারে নি বিপ্লবী দেবেশ দত্ত। মানুষ কত অসহায়, ভাবল বৌরানী। যে-হাত দিয়ে দেবেশদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের টুটি চেপে ধরতে চেয়েছিল, সে-হাতটা সেদিন হরিশ মুখার্জি রোডে এক ইঞ্চিও লম্বা হতে পারে নি! কিন্তু আজ যদি সে জগবন্ধুবাবুর লম্বা হাতটা ধরে রাখে?

"টাকাগুলো তা হলে ফিরিয়ে নিন।" বললেন জগবন্ধুবাবু।

"দিন।" এই বলে দরজার ফাঁক দিয়ে বৌরানী হাতটা তার বার করে দিল। মুখটা ঢাকা রইল দরজার আড়ালে। জগবন্ধুবাবু বৌরানীর হাতের

তালুটার দিকে চেয়ে রইলেন মুহূর্ত কয়েক। ভাগ্যবতীর হাত। এ-হাত থেকে সবকিছুই নেয়া যেতে পারে, হাতের তালুতে এতটুকুও ময়লা নেই। দুনিয়ার ময়লা সাফ করবার জন্যেই বুঝি এমন হাতের সৃষ্টি হয়েছে। বৌরানীর হাতের তালু ভেজা! জগবন্ধুবাবুর দুঃখ, সুরমা বৌরানীর হাতের ইতিহাস জেনে যেতে পারলে না। দেখে যেতে পারলে না, শ্বেত-পদ্মের ওপর বৌরানীর চোখের জল টলমল করছে।

"বৌরানী—"

"ওস্তাদজী—"

দরজার ফাঁক দিয়ে বৌরানী দেখল, জগবন্ধুবাবু টাকাগুলো পকেটে রেখে দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে গেলেন গলিটার বাইরে।

আজ কদিন থেকে জগদীশবাবুর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছিল। রাত্রে এবং দুপুরে একটু একটু করে ঘুমের ওষুধও খাচ্ছিলেন। কিন্তু ঘুমের মধ্যে তেমন গভীরতা আসছিল না। মস্তবড় বিছানা। খাটের পালিশটা ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় চকচক করে। দেহটাকে কোন রকমে এনে বিছানার ওপর ছেড়ে দিতে পারলেই, গদীর গভীরতা তাঁর ওজনটাকে টেনে নেয় অতি অনায়াসেই। তাঁর নিজের একটুও আর পরিশ্রম করতে হয় না। কেবল রমাকান্তই নয়, এ-বাড়ির দেওয়াল ও মেঝে থেকে সুরু করে বিছানায় ফেলে-রাখা ছ-সাতটা বালিশ পর্যন্ত জগদীশবাবুকে সাহায্য করে। বিছানায় শুয়ে পড়বার পরে ডান পাশের লম্বা বালিশটা লেগে থাকে গায়ের সঙ্গে। ঢিলে-মাংসের এক রত্তি অংশও ঢলে পড়তে পারে না শিথিল বিস্তৃতির মধ্যে। ঢিলে মাংসকে ছড়াতে দিলে বড্ড কুৎসিত দেখায়!

ঘুম এল না বলে আজ তিনি সন্ধ্যের আগেই শয্যা ত্যাগ করলেন। রমাকান্ত জানে, রাত আট-টার আগে তাঁর দুপুরের ঘুম শেষ হয় না। তাই সে ধারে কাছে কোথাও ছিল না। জগদীশবাবু পাশের ঘর থেকে নিজেই আজ পাঞ্জাবিটা নিয়ে এলেন। কোঁচানো ধুতিটা গোল পাকানো ছিল আলনার

কোণায়। সেটাও নিয়ে এলেন তিনি। তারপর জমিদার সেজে বেলজিয়ামের আয়নায় মুখ দেখলেন ভাল করে। মনে হল গত পাঁচ বছরে যেন তাঁর পঁচিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। তা যাক। বয়স তাঁর এক জায়গায় থেমে থাকলেই বা কি হতো? বৌরানী কি পেত তাঁর কাছে? সাতাশ পার হয়ে গেছে বৌরানীর। কিন্তু আরও তো সাতাশ তাকে পার হতে হবে। এই দীর্ঘ সময় কি নিয়ে থাকবে সে? নাগ-বাড়ির অন্তঃপুরে তার জন্যে কোন আকর্ষণই তো জগদীশবাবু সৃষ্টি করতে পারেন নি। তবে? প্রশ্নটার উত্তর তিনি এখন দিতে পারবেন না। গানবাজনা শেষ হওযার পরে, তিনি প্রশ্নটার উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন। সারারাত তো তাঁর ঘুম আসবে না—সময় কাটাবেন প্রশ্নোত্তর নিয়ে। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বলেই বোধ হয় তিনি আজকাল নিদ্রা-হীনতায় কষ্ট পাচ্ছেন।

মাথার দিকে বালিশের কাছেই মালাক্কা বেতের ছড়িটা রেখে দেয় রমাকান্ত। দামী ছড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ছড়িটা নিয়েই তিনি নেমে আসেন। দেহের খানিকটা ওজন চাপিয়ে দিতে হয় ছড়ির ওপরে। হাঁটতে গিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়, গাঁটগুলো সব আলগা হয়ে গেছে, হঠাৎ বুঝি পড়েই যাবেন। পক্ষাঘাত? কি জানি, হতেও বা পারে। আজ হয় নি, কাল হয়তো হবে। জগদীশবাবু ছড়িতে ভর দিয়ে নামতে লাগলেন একতলায়। কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে, তিনি ছড়িতে ভর দিয়ে নামছেন। জগতের সবাই যদি দেখে বুঝতেও পারত, তাতেও তাঁর কিছু এসে যেত না। কিন্তু বৌরানী? না, না, তাকে বুঝতে দিলে তিনি আর বেঁচে থাকতে পারবেন না। কিন্তু সুন্দর এই মালাক্কা বেতের শক্তি যেদিন শেষ হয়ে যাবে, সেদিন তিনি কি করবেন? আরও শক্ত লাঠি তাঁকে নিতে হবে। শক্ত লাঠিতে ভর দিয়ে কেমন করে তিনি গিয়ে দাঁড়াবেন বৌরানীর সামনে? তিনি বুঝলেন, এ-প্রশ্নটার মধ্যে কোন জটিলতা নেই বটে, কিন্তু নানান রকম মনস্তত্ত্বের বেদনা রয়েছে। তা থাক। উপস্থিত এ-প্রশ্নটার জবাব দেবারও চেষ্টা করবেন না তিনি। আরও তো অনেক দিন ঘুম আসবে না, তখন না হয় বিছনায় শুয়ে, বালিশগুলোর মাঝখানে থলথলে

মাংসগুলোকে সঙ্কুচিত করে এই শেষ প্রশ্নটার জবাব একটা সাজিয়ে নেওয়া চলবে।

তিনি একতলার বারান্দায় এসে নামলেন। তারপরে? হল্-ঘরটায় গিয়ে কোন লাভ নেই। শিল্প ও সঙ্গীতের সমাজ এখনো এসে উপস্থিত হয় নি সেখানে। রাত আট-টার আগে সে-সমাজের উপস্থিতি আশা করে লাভ নেই। কি মনে করে তিনি বাগানের মধ্যে দিয়ে পূব দিকের রাস্তা ধরলেন। ডান দিকের ঐ রক্তের মত লাল গোলাপ ফুলটার নামটা যেন কি? ও, হ্যাঁ—মনে পড়েছে, কারেজ। জগদীশবাবুর মনে পড়ল, এক সময়ে তিনি বাগানের প্রতি ইঞ্চি মাটির সব খবরই রাখতেন। প্রতিটি ফুলের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর পরিচয়। কত রকমের গোলাপ তিনি লাগিয়েছিলেন! আজ এরা কেবল মাইনে-করা মালির যত্নই পাচ্ছে। টবে-লাগানো গোলাপ গাছগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেললেন তিনি। কাপ্তেন ক্রিস্টি, ল্য ফ্রঁস, লেডী হিলিংডনের নামগুলো তাঁর ক্রমে ক্রমে মনে পড়তে লাগল। হাত বুলতে লাগলেন গাছগুলোর গায়ে। দু-চারটে ফুল গাছে ফুটে রয়েছে বটে, কিন্তু কাপ্তেন ক্রিস্টির মধ্যে কাপ্তেনী করবার জৌলুস আর নেই—নেই ল্য ফ্রঁস-এর পাপড়িতে ফরাসী-প্রিয়ার পীচফলের রং। অযত্নের মাটিতে ফুলের রং গেছে বদলে। টবগুলোর চারদিক দিয়ে পাথীলতার আর হংসলতার গাছগুলো ব্যূহ রচনা করেছে। দু-চারটে টব ও গোলাপ গাছ এরই মধ্যে হারিয়ে গেছে ওদের আলিঙ্গন-অরণ্যে। ক্রমে ক্রমে সবাই এরা হারিয়ে যাবে। যত্ন ও সংগঠনের অভাব ঘটলেই বুনোঘাসের আক্রমণ এরা ঠেকাতে পারবে না। ওপাশের উইপিং উইলোর চোখগুলো সব ভিজে উঠেছে বলে মনে হল জগদীশবাবুর! বাবার আমলের লাগানো ঝাউগাছ, অবকেরিয়া কুকির ছাতলা-পড়া ছালের গায়ে হেলান দিয়ে তিনি কি যেন ভাবতে লাগলেন। বাগানটার মত নাগপরিবার-টারও আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। মনটা তাঁর ভিজে উঠল, মাথাটাও ঝিম ঝিম করতে লাগল। তিনি এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। চোখ দুটো তাঁর ঝাপসা হয়ে উঠেছে।

ওগুলো কি ফুল? হঠাৎ তার নামটা মনে পড়ল না, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মালিটা গেল কোথায়? রজনীগন্ধা? ও, হ্যাঁ রজনীগন্ধা। ফুলগুলো সব হাঁ করে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। কিন্তু কেন? মানুষের কাছেই তো তার সবচেয়ে বেশি আদর? জগদীশবাবু ছড়িটার ওপর ভর দিয়ে নিচু হতে গেলেন। কিন্তু কেন? বৌরানীর কাছে তিনি কটা রজনীগন্ধা এখুনি তুলে নিয়ে যাবেন। হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে তিনি অনেক রজনীগন্ধা দেখেছেন। বৌরানী নিশ্চয়ই পছন্দ করে এই ফুল।

নিচু হতে গিয়ে জগদীশবাবু বসে পড়লেন মাটিতে। ইচ্ছে করে বসলেন না, হাঁটু দুটো যেন হঠাৎ কি রকম আলগা হয়ে গেল! আর একটু ঝুঁকে হাতটা বাড়াতে পারলেই, প্রথম ফুলটা তিনি অনায়াসেই ধরতে পারতেন। কিন্তু তবুও তিনি দেহের কাছে পরাজয় মানতে চাইলেন না। মাটিতে বসেই জগদীশবাবু অর্ধেক-হামাগুড়ি দেওয়ার মত করে দেহটাকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে এলেন রজনীগন্ধার কাছে। ফুল তুললেন তিনি, তুললেন রজনীগন্ধা। ওটা কি ফুল? বেল। হ্যাঁ, বেলফুলই বটে। বৌরানী বেল-ফুলও ভালবাসে। বেলফুল তুলতে হলে তাঁকে আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে। মালি ব্যাটা কোথায় গেল? কিন্তু, আজ তিনি নিজে হাতে ফুল তুললেই বোধহয় ভালো হয়। ভালো হবে বলেই হয়তো ভগবান সরিয়ে দিয়েছেন মালিটাকে। বৌরানীর জন্যে তিনি নিজেই আজ ফুল তুলবেন। তুললেনও। জামা কাপড়ে মাটি লাগল তাঁর। হাতটা কেঁপে উঠল। তবুও বাঁ হাত দিয়ে ফুলগুলো ধরে রাখলেন তিনি। ডান হাত দিয়ে ছড়ির ওপর ভর দিয়ে উঠতে গেলেন। প্রথমবার পারলেন না। দু-হাতের পুরো সামর্থ্য প্রয়োগ করা দরকার। ফুলগুলোর গায়ে আঘাত লাগলেও চলবে না।

দ্বিতীয় চেষ্টা তাঁর সার্থক হল। বারোদির প্রতাপশালী জমিদার জগদীশ নাগ রমাকান্তের সাহায্য ছাড়াই সোজা হয় দাঁড়ালেন। তারপর ডান পা-টাকে একটু টেনে টেনে চলতে লাগলেন পূব দিকে। ওপরের বারান্দা থেকে বৌরানী দেখল নাকি? তিনি থামলেন একটু। ঘাড় ফিরিয়ে পশ্চিম দিকে চেয়ে

দেখলেন তিনি, বৌরানী বারান্দায় নেই। নেই? ভগবান রক্ষা করেছেন। ভাবলেন জগদীশ নাগ। এখন ভগবান যদি শেষ পর্যন্ত তাঁকে রক্ষা করতে পারেন তো ভালই।

পূব দিকের রাস্তা ধরে খানিকটা আসবার পরে, জগদীশবাবু এসে উপস্থিত হলেন আস্তাবলের সামনে। বড় ঘোড়াটাকে তিনি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন না গাড়িটাকেও। ফজ্‌লু? সেও নেই। বাঁ হাতটা কেঁপে উঠল জগদীশবাবুর। ফুলগুলো পড়ে গেল মাটিতে! তিনি সরে এলেন ওখান থেকে। গাড়ির চাকার তলে এ-ফুলের ইতিহাস মুছে যাবে চিরদিনের জন্যে। মানুষ কত অসহায়, ভাবলেন জগদীশ নাগ।

কিন্তু এবার তিনি কোন্ দিকে যাবেন? আস্তাবলটাকে বাঁ পাশে রেখে জগদীশবাবু চললেন উত্তর দিকে। সেখানে কি আছে? জগদীশবাবুর সবচেয়ে বড় কীর্তি আছে উত্তর দিকে। ব্যারাকের মত সারি সারি চারখানা ঘর আছে সেখানে। ছেলেরা থাকে। দশ বারোটি গরীব ছেলে। ঘোড়াগুলোর মত গায়ের সঙ্গে লেগে লেগে থাকে না ওরা। বড় বড় ঘর, চারদিকে জানালা দরজা আছে অনেক। আলো বাতাসের প্রাচুর্য প্রখর। আস্তাবলেও প্রচুর আলো বাতাস রয়েছে, কিন্তু এখানকার মত মানুষের কোলাহল তাতে নেই। জগদীশবাবু কোলাহল ভালোবাসেন, ভালোবাসেন সঙ্গীত। এ-কোলাহল ও হল্‌-ঘরের সঙ্গীতের মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য দেখতে পান।

ব্যারাকের বারান্দার সামনে এসে পৌছুতেই, ছেলেদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সবচেয়ে ছোট ছেলেটা নিতাই, ছুটে এল সবার আগে। মা আছেন বারোদি গ্রামে। জগদীশবাবুরই প্রজা এরা। হঠাৎ কি একটা অসুখ হয়ে নিতাই-র বাবা মারা গেছেন দেড় বছর আগে। তিনি নিতাইকে শহরে নিয়ে এসেছেন মানুষ করবার জন্যে। গত পনরো বছরে এখান থেকে অনেক ছেলে মানুষ হয়ে গেছে। বি.এ., এম.এ. পাশ করে দু-চার জন মুন্সেফ আর ডেপুটিও হয়েছে। রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় কর্তব্যের অংশ নিয়েছেন জগদীশ নাগ।

ছেলেদের একটা পয়সা লাগে না এখানে। সব খরচ জগদীশবাবুর।

ইস্কুল-কলেজের মাইনেও তিনি দেন—দিয়ে আসছেন বৌরানীকে বিয়ে করে আনবার আগে থেকেই। ব্যারাকের মত বাড়িটাকে তিনি ভালোবাসেন, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই ভালোবাসেন। কেন ভালোবাসেন? নিজের কোনো সন্তান নেই বলে না কি? টাকা থাকলে মানুষ কত রকমের শৌখিনতাই যে করতে পারে! কিন্তু তিনি তো এটা শৌখিনতা বলে মনে করেন না? বৌরানীকে ঘরে আনবার আগে থেকেই তো তিনি এ-পাশটায় বাগান তৈরি করছিলেন। এ-বাগান তিনি নিজে হাতেই সাজিয়েছেন। মালির হাতে ছেড়ে দেন নি এর সিকি অংশের প্রস্তুতি। এ-বাগান তৈরির পুরো কৃতিত্বই জগদীশবাবুর। মানুষ-বাগান। কত রকমের ফুল তিনি ফুটিয়েছেন এখানে। নিতাই এখানকার সবচেয়ে ছোট ফুল।

সে ছুটে এসে দাঁড়াল জগদীশবাবুর সামনে। বাঁ হাত দিয়ে তিনি কাছে টেনে নিলেন নিতাইকে। মাথাটা নিচু করে চুমু খেলেন নিতাই-র ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলে। ডান হাতে তাঁর মালাক্কা বেতের ছড়ি, বাঁ হাতে নিতাই! মুহূর্তের জন্যে জগদীশবাবু ভুলে গেলেন বেল আর রজনীগন্ধার অস্তিত্ব।

"বাবু, তুমি যে এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছিলে, তা থেকে আমি দশটা আম খেয়ে ফেলেছি।" বললে নিতাই।

"খুব ভালো করেছ। আরো খাও।"

"কি আম পাঠিয়েছিলে বাবু?"

"মালদার ফজলী—খুব ভালো আম। ও-আম আমিও খাই নিতাই।"

"কিন্তু তোমার তো ফোড়া হয় নি বাবু?"

"আম খেলে বুঝি ফোড়া হয়?" জিজ্ঞাসা করলেন জগদীশবাবু।

"হ্যাঁ, এই ছাখো—" নিতাই এবার তার মুখটা তুলে ধরল ওপর দিকে। জগদীশবাবু দেখলেন, নিতাই-র কপালে আর চিবুকের নিচে সত্যি সত্যি ছোট ছোট ফোড়া হয়েছে কটা। তিনি বললেন, "আচ্ছা ডাক্তারবাবুকে বলে দেব, কাল তিনি তোমায় ওষুধ দেবেন।" একটু থেমে, তিনি যেন ডুবে গেলেন কোন্ এক অতীত-অন্বেষণের তমিস্রায়। ডুবে রইলেন দু-এক মিনিট। তারপরে

সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন, "না নিতাই, ডাক্তারদের বিশ্বাস নেই, আমি কবরেজ পাঠাব।"

"দরকার নেই বাবু, এমনিতেই সেরে যাবে। কবরেজ এলে আমায় যে আম খেতে বারণ করবে!"

. এর মধ্যে অন্যান্য সব ছেলেরা এসে জগদীশবাবুর সমনে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সৌরেন। এম. এ. পড়ে। সৌরেন বলল, "এ মাসে আমরা কেউ এখনও স্কুল-কলেজের মাইনে দিতে পারি নি।"

"কেন? কেন? দেওয়ানজী কোথায়? কেন তিনি তোমাদের মাইনের টাকা পাঠান নি? মাসের আজ কত তারিখ?"

"দশ তারিখ।"

"দশ তারিখ? এটা কি মাস যেন? ও, দশ তারিখ!"

জগদীশবাবু হঠাৎ যেন মাস ও তারিখের ওপর বারে বারে হোঁচট খেতে লাগলেন। মাস এবং তারিখের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক-ই নেই। তিনি কৃষ্টি-সম্পন্ন লোক, তিনি বাংলার জমিদার, তিনি শিল্প ও সঙ্গীতের মস্ত বড় পৃষ্ঠপোষক, তিনি হিরো—মাস ও তারিখের সাংসারিক স্তরে তাঁকে নামতে হলে, ওপরের স্তরটা যে ভেঙ্গে পড়ে!

কিন্তু ওপরের স্তরটাই বা তিনি ধরে রাখতে পারলেন কই? টাকা পয়সার ক্ষমতা দিয়ে সামাজিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরটা আর বোধ হয় বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। ক্ষমতার শেকল দিয়ে সভ্যতা কিংবা কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়ও না। বাঁচিয়ে রাখতে পারছেন না তিনি তাঁর জমিদারির বিরাট বিস্তৃতি-টা, ভেঙ্গে পড়ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই ভাঙ্গনের সুর উঠেছিল সর্বত্র। জগদীশবাবু তা শুনতে পান নি। শুনতে দেয় নি তাঁকে ধ্রুপদ-খেয়ালের রাগ-রাগিণী। কিন্তু আজ তিনি ভাঙ্গনের সুর শুনতে পেলেন সৌরেনের কথায়।

জগদীশবাবু বললেন, "সরকারি-খাজনা জমা দেবার জন্যে দেওয়ানজী বোধহয় ব্যস্ত আছেন। ব্যস্ত থাকার কারণটা তোমরা জান না।"

মুখ নিচু করে সৌরেন বলল, "না।"

"টাকার টানাটানি চলেছে খুব। তা হোক, সেরেস্তা থেকে কালই তোমরা সব মাইনের টাকা নিয়ে নিও। আমার টাকার টানাটানি হচ্ছে বলে তো স্কুল-কলেজ সব উঠে যেতে পারে না!" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জগদীশবাবু বারান্দা থেকে নেমে এলেন সামনের মাঠে। বাগানের রাস্তা ধরেই তিনি আবার ফিরে যাবেন বলে ভাবলেন। ঘণ্টা দুই আগে থেকেই আজ তিনি হল্-ঘরটায় বসে থাকবেন। জগবন্ধু রাত আট-টার আগে কোন দিনও আসে না। তা না আসুক, হল্-ঘরটার আবহাওয়ায় সঙ্গীতের সুর সব সময়েই ভাসতে থাকে। যার কান আছে, তার পক্ষে কোন অসুবিধে হয় না।

নিতাই দৌড়ে এসে দাঁড়াল জগদীশবাবুর সামনে।

"কি রে নিতাই? কিছু বলবি?"

"বাবু, আম আমি আর খাব না।"

"কেন, ফোড়া হয় বলে বুঝি?"

"না বাবু, তোমার টাকার টানাটানি চলেছে খুব।"

মৃদু হেসে জগদীশবাবু বললেন, "আম কিনবার পয়সা আমার মরণের দিন পর্যন্ত থাকবে।" জগদীশবাবু চলে যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে নিতাই আবার ডাকল, "বাবু—"

ঘুরে দাঁড়িয়ে জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আবার কি হল?"

"ভীষণ একটা খারাপ কাজ করেছি বাবু।"

"কি, শুনি?"

"তোমার পাঞ্জাবির তলায় আমি হাত-মুখ মুছেছি—"

"সে কি রে?" জগদীশবাবু বাঁ হাত দিয়ে পাঞ্জাবির তলাটা টেনে তুললেন ওপরে। "তাই তো, আমের দাগ লেগে গেছে! ওকি নিতাই, পাঞ্জাবিটা নোংরা হল আমার, আর চোখে জল এল তোর? ধুয়ে ফেললেই তো ময়লা সব উঠে যাবে রে। যাও, এবার সৌরেনদার কাছে গিয়ে কালকের পড়াটা শিখে নাও।"

জগদীশবাবু পাঞ্জাবির প্রান্তটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে হাঁটতে লাগলেন

বাগানের দিকে। আস্তাবলটা পার হয়ে এলেন তিনি। ফজ্‌লু এখনো ফিরে আসে নি নিশ্চয়ই। তা না আসুক, সংসারের কারু জন্যেই তিনি আর অপেক্ষা করে নেই।

দক্ষিণদিকের সীমানা ঘেঁষে উঁচু প্রাচীর তুলে গেছেন পূর্বপুরুষরা। প্রাচীরের ঠিক ওপাশেই বুড়ীগঙ্গা। শীতকালে নদীর জল শুকিয়ে চলে যায় অনেক দূরে। বর্ষায় জল এসে ঠেকে প্রাচীরের গায়ে। কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বুড়ীগঙ্গার জোর যে কতটা তা তাঁর পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয়ই জানতেন। জানতেন, ত্রিশ ইঞ্চির পুরু প্রাচীর বুড়ীগঙ্গা কোন দিনও ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না। তবুও তাঁরা নিশ্ছিদ্র করে প্রাচীরটাকে তৈরি করে গেছেন। জগদীশবাবু কিছুদিন আগে প্রাচীরের গায়ে একটা বড় ফটকের মত দরজা বসিয়েছেন। হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটার ফটকের মতই মাপ সমান। সেখানে ফটকের বাইরে ছিল রাস্তা, এখানে আছে বুড়ীগঙ্গা। এখানকার বৌ-ঝিয়ের আব্রু রাখতে হয় বলে, জগদীশবাবু ফটকের ওপাশে একটা সিঁড়ি তৈরি করিয়েছেন। বড় সিঁড়ি নয়, গোটা পাঁচ ধাপ। বৌ-ঝিরা ফটক খুলে সিঁড়িতে বসে গল্পগুজব করতে পারবে।

পাঞ্জাবির তলাটা মুঠোর মধ্যে ধরে তিনি আজ এসে দাঁড়ালেন এই ফটকের কাছে। দরজাটা লোহা দিয়ে তৈরি। তিনি লক্ষ্য করলেন, লোহার গায়ে একটাও ফুটো নেই। বুড়ীগঙ্গা যদি কোনদিন অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে দুলে ওঠে, তা হলেও নাগ-বাড়ির পেছন দিকের ফটক সে অতিক্রম করতে পারবে না।

দরজাটায় তালা লাগান ছিল, মস্ত বড় এবং বিলেতী তালা। জগদীশবাবুর সঙ্গে চাবি ছিল না। চাবিটা রমাকান্ত রেখে দিয়েছে তাঁর শোবার ঘরের সিন্দুকে। এ-বাড়ির সবগুলো চাবিই সেখানে থাকে। তাঁকে না বলে রমাকান্ত কোন চাবি কাউকে কখনও দেয় না। দেবার হুকুম নেই।

জগদীশবাবু ফিরে এলেন ওখান থেকে। পাঞ্জাবির তলাটা ধরে থাকতে তাঁর ভাল লাগছিল আজ। বৌরানীর জন্যে ফুল তুলতে গিয়ে পাঞ্জাবির পেছন দিকটায় মাটি লেগেছে। সে-মাটিটা নোংরা মনে হয় নি জগদীশবাবুর।

তবে কেন মানুষ-বাগানের আমের দাগটা তাঁর কাছে ময়লা বলে পরিগণিত হবে? বেল এবং রজনীগন্ধার কাছে নিতাই-ফুলকে কেন তিনি ছোট করে দেবেন? দেবেন না, দিতে পারেন না। অতএব— ? "কে? কে ওখানে?"

একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন দেওয়ানজী।

"খাজনা সব ট্রেজারীতে জমা দিয়েছেন?" জিজ্ঞাসা করলেন জগদীশ নাগ।

"দিয়েছি, কিন্তু কিছু টাকা ধার করতে হয়েছে।"

"ধার? ও, হ্যাঁ ধার। ধারের টাকায় ঘি খাওয়ার শাস্ত্র তো আমরা জানি। কিন্তু, ধার যদি কোন দিন না পাওয়া যায়?"

"সেই জন্যেই আমি বলছিলুম কি কর্তাবাবু—"

"থেমে গেলেন কেন দেওয়ানজী?"

"আমি বলছিলুম, বাজারে যা ঋণ আছে সবটা একবারে শোধ দিয়ে দেয়া ভাল। সুদের টাকাও গুণতে হবে না, আর—"

"আর কি দেওয়ানজী?"

"আর এবার থেকে দান-খয়রাতের পরিমাণ কিছু কমাতে হবে। সারা দেশ জুড়ে ইস্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেই যে সুশিক্ষা বাড়বে তেমন আশা করা যায় না।"

"কেন যায় না?"

"ছেলেরা কেউ আর পড়তে চাইছে না। রাজনীতির বিষ ঢুকেছে শিশু-গুলোর মনে।"

"আমার দান-খয়রাতের মধ্যে কোন বিষ নেই দেওয়ানজী। বৌরানী বলেন, রাজনীতির মধ্যে থাকে বিষ, ষড়যন্ত্র—কিন্তু ব্যক্তি-সম্বন্ধের মধ্যে থাকে দয়া, মায়া, মহত্ত্ব, ক্ষমা এবং সর্বোপরি ভালোবাসা। সে যাক, ঋণের কথাই বলুন। ঋণ সব শুধবেন কি করে?"

"হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িখানা বেচে দিয়ে।"

রমাকান্ত এসে এর মধ্যেই জগদীশবাবুর পাশে দাঁড়িয়েছিল। পাঞ্জাবির তলাটা ফস করে ছেড়ে দিয়ে তিনি রমাকান্তের ঘাড়ে বাঁ হাতটা রাখলেন।

মালাক্কা বেতের ছড়ি আর রমাকান্তকে দু-পাশে রেখে তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। অনেকটা পথ তিনি আজ হেঁটে এসেছেন। দু-দুটো বাগান দেখেছেন তিনি। বিশ্রাম তাঁর দরকার। রাত আট-টার সময়ই তিনি এসে হল-ঘরে বসবেন। জগবন্ধুর গান তিনি শুনবেন আজ তন্ময় হয়ে। বেল আর রজনীগন্ধার গন্ধের সঙ্গে নিতাই-ফুলের গন্ধ গেছে মিশে। মনের আবহাওয়া মশগুল!

সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে জগদীশবাবু বললেন, "দেওয়ানজী, ছেলেদের মাইনের টাকা সব কাল দিয়ে দেবেন। ওরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ...... ওরাই তো আমার মালাক্কা বেতের ছোট ছোট ছড়ি। ওর তো আমারও ভবিষ্যৎ দেওয়ানজী।"

তিনি তো তাঁর ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন মালাক্কা বেতের ছোট ছোট ছড়িগুলোর মধ্যে, কিন্তু বৌরানীর ব্যবস্থা কি হবে? তার ভবিষ্যৎ কি? হ্যাঁ, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি জবাবটা খুঁজবেন আজ। জবাবটা খুবই কঠিন, তবুও আজ তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে দেখবেন যে, ক্ষমার সঙ্গে বৌরানীর ব্যর্থতার কোন সমন্বয় আনা যায় কি না। কেবল সমন্বয় আনলেই চলবে না, ব্যক্তি সম্বন্ধের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁকে আসতে হবে সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে। নীতি-দুর্নীতি ও ধর্ম-অধর্মের সংঘাতের মধ্যে সমন্বয়ের সৌধ তাঁকে গড়তে হবে। কঠিন কাজ সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু ক্ষমার চেয়ে কঠিনতর কাজ সংসারে আর কিছু আছে কি? নেই।

"রমাকান্ত, আরাম-কেদারাটা বারান্দায় নিয়ে আয়। আজ আমি এখানেই বসব। জগবন্ধু এলে খবর দিস।"

"আচ্ছা।" রমাকান্ত গেল আরাম-কেদারা আনতে। জগদীশবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন ছড়ির ওপর ভর দিয়ে।

ফরাসগঞ্জ পাড়ার অনেকেই এল ওস্তাদজীর ডাক শুনে। অন্য দিন এরাই আসত জগবন্ধুবাবুর গান শুনবার জন্যে। ডাকতে হয় নি কোনদিনও। বিনি

পয়সায় এতবড় ওস্তাদের গান শোনা ভাগ্যের কথাই বটে। কিন্তু আজ? সুরমার শবদেহ কাঁধে তুলবার জন্যে জগবন্ধুবাবুকে যেতে হয়েছে প্রত্যেকের দরজায়, দরজায়। হাত জোড় করে বলতে হয়েছে, "ভজহরির মাতৃদায়, এই আধঘণ্টা আগে তিনি মারা গেলেন! শ্যামপুরের শ্মশানে যে একটু যেতে হবে ভাই। আমার অনুরোধ—"

অনুরোধ? অনুরোধ করা ছাড়া তিনি কি-ই বা করতে পারতেন! এক ঘণ্টার মধ্যে গলির রাস্তায় ভিড় জমে গেল।

বৌরানী কখন যে চলে গেছে জগবন্ধুবাবু তা জানেন না। গাড়িটা নেই। রোয়াকে দাঁড়িয়ে গলিটার এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত সবই দেখা যায়। জগবন্ধুবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন রোয়াকেই।

শবদেহ নিয়ে যাবার জন্যে বসবার ঘরের চৌকিটা ব্যবহার করা হবে বলে ঠিক হল। ঠিক করল পাড়ার লোকেরাই।

ভজহরি মায়ের পাশে বসেছিল চুপ করে। হাতের মুঠো আলগা। টাকাগুলো বাবাকে দিয়ে দিয়েছে। অনেক টাকা। কি হবে টাকা দিয়ে ভজহরি তা জানে না। জানবার চেষ্টাও করে নি। মা মরে গেছে, এইটুকুই সে কেবল জানে।

প্রতিবেশী ভোলা রায় শোবার ঘরে ঢুকে ভজহরিকে আলগা করে তুলে ফেলল কোলে। এনে বসিয়ে রাখল বসবার ঘরের মেঝের ওপর। শবদেহ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ভোলা রায় মড়া পোড়াচ্ছে বারো বছর বয়স থেকে। কলেরা-বসন্তের মড়াও তার কাছে অস্পৃশ্য নয়। দিন এবং রাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, খবর পেলেই সে ছুটে আসে। মড়া পোড়াতে পোড়াতে তার মনের অবস্থা এত স্বাভাবিক হয়েছে যে, কোন মৃত্যুই তাকে আর উদ্বেলিত করতে পারে না। কোন ব্যাধি-ই ওকে পারে না ভয় দেখাতে। ভয় কেবল সে জীবনে একবারই পেয়েছিল। গেল বছর ভোলা রায়ের ঠিক হাঁটুর ওপরেই একটা ফোড়া হয়। পুরোনো ঘি গরম করে দু-দিন লাগাবার পরে, ফোড়াটা চামড়ার ওপর যেন বেশি করে সেঁটে বসে গেল। ডাক্তার

ডাকতে হল। ডাক্তার বললেন, "ছুরি দিয়ে মুখটা খুলে দেয়াই ভাল।" ডাক্তারের কথা শুনে সে কী কান্না ভোলা রায়ের! পাড়ার লোকেদের কাছে সে ডিলিরিয়ামের মত বকতে লাগল, "আমি বোধ হয় আর বাঁচব না।"

যার হাত দিয়ে এতগুলো শবদেহ পার হয়ে গেল, তার ভয় কেবল ফোড়ার জন্যে।

ভজহরিকে মেঝেতে বসিয়ে দিয়ে ভোলা রায় বললে, "বলরাম কোথায় রে? রাত যে দশটা বাজল, তাড়াতাড়ি করে বেঁধে ফেল।"

এ-ঘরে এসে সে চেয়ে রইল সুরমার দিকে। মরা মানুষ সম্বন্ধে তার যা জ্ঞান, তা বোধ হয় গোটা চিকিৎসাশাস্ত্র খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। সে শবদেহের দিকে চেয়েই বললে, "বলরাম, এ-মড়া পোড়াতে দু ঘণ্টাও লাগবে না। খুব পুণ্যবতী, পাপের চেহারা এ নয়।"

বলরামের সাধ্যই ছিল না ভোলা রায়ের মত বিশেষজ্ঞের উক্তি অস্বীকার করে। অতএব বলরাম মাথা নেড়ে বললে, "তুমি ঠিকই বলেছ ভোলাদা।"

"পরশু দিনের ব্যাপার জানিস তো বলরাম?"

"কি ব্যাপার ভোলাদা?"

"সেই যে নবাবপুরের কোটিপতি, কি নাম যেন তাঁর?"

"ও-অঞ্চলে তো গোটা তিন কোটিপতি আছে, কার কথা বলছ?"

"আরে ঐ যে—হ্যাঁ নিমাই সাহা। ব্যাটা পরশু দিন মারা গেল। কোটিপতিই বটে। ব্যাটার বসন্ত হয়েছিল সারা গায়ে······হ্যাঁ, সেও প্রায় কোটির ওপরে হবে। চিতার ওপরে তুলে দিলুম বেলা বারোটা নাগাদ—ছটা বেজে যায়, ন মন কাঠ শেষ হয়ে গেল, ব্যাটা তবুও ছাই হতে চায় না। তিনটে ছেলের মধ্যে একটাও কাছে এল না খারাপ রোগ বলে। বড় ছেলেটা দূর থেকেই একটা আগুনের গোল্লা ছুঁড়ে মারল বাপের মুখে, মুখাগ্নি হচ্ছে! ছটার সময় বললুম, আপনারা আর বসে বসে কষ্ট করছেন কেন, বাড়ি চলে যান। নাভিটাকে বাগে আনতে আরও একটু সময় নেবে। বড় ছেলেটা বললে কি জানিস?"

"না তো।"

"বললে যে, বাবার কিছু ঠিক নেই, ঐ নাভি থেকেই সে ফুট্ করে বেরিয়ে আসতে পারে! জিজ্ঞাসা করলুম, সে কি মশাই? ছোট ছেলেটা জবাব দিলে, দাদা ঠিকই বলেছে। সিন্দুকের চাবিটা আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে বাবা নাভি থেকেও উঠে আসবার ট্রাই নিতে পারে। বাবার শেষ আমরা দেখেই যাব। দেখুন তো ভোলাবাবু, আর এক মন কাঠ বোধ হয় লাগবে। বলরাম, ব্যাপারটা বুঝলি তো?"

"সে কি আর বুঝি নি ভোলাদা, কোটিটাকার ব্যাপার, ভস্মকে পর্যন্ত বিশ্বাস নেই! নিমাই সাহার মত দুঁদে লোক যে ভস্ম থেকে বেরিয়ে আসে নি সে কেবল তোমার পোড়াবার গুণে।"

"তা যা বলেছিস! দে, তোর নস্যির কৌটো বার কর বলরাম।"

বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। ফজলু গাড়ি নিয়ে আবার এসেছে। গাড়ির মাথায় একটা মেহগনি খাট, খাটের ওপরে তোশক, তোশক-ভর্তি অনেক তুলো। তার ওপরে ফুল। গাড়ির দরজা বন্ধ। জগবন্ধুবাবু রোয়াকের ওপর থেকে একটু সরে দাঁড়ালেন পাশে। জমিদারের গাড়িটা সবাই চেনে। খাট এবং ফুলগুলো নামিয়ে নেবার জন্যে অনেকেই এগিয়ে এল কাছে। ভোলা রায়ও এল। বাঁ হাতের চেটো থেকে নস্যির গুঁড়োটুকু ডান হাতের দু-আঙুল দিয়ে চেপে ধরে সে বললে, "পুণ্যবতীর দেহ রাখবার মতই খাট হয়েছে। যাদব, যাদব কোথায় গেলি?"

"এই যে ভোলাদা।" যাদব এসে সামনে দাঁড়াল।

"তোর হাতের মাংস এখনও মেয়েদের মত নরম, ফুলগুলো তুই-ই নামিয়ে নিয়ে আয়।"

ফজলু গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে আগেই। সরে দাঁড়িয়েছে বেশ কিছুটা দূরেই। হিন্দুরা সব পূজোটুজো করে, অতএব সে ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে গিয়েই দাঁড়াল। মৃত্যুর পরেও মানুষ যে কেন মানুষকে ছুঁতে পারে না, সে-কথা

ভেবে সময় কাটাতে লাগল ফজ্‌লু। সময় কাটাতে লাগল চোখের জল বন্ধ করবার জন্যে।

খাটের ওপরে বিছানা পাতা হল। এমন সুন্দর বিছানায় সুরমা এক মিনিটের জন্যেও শুতে পায় নি সারা জীবনে। এমন সুন্দর বিছানার ওপরে গা ছড়িয়ে দিতে যে কেমন লাগে, তাও সুরমা জেনে যেতে পারে নি। পারে নি বটে, তবুও সুরমা একটা ছেলে রেখে যেতে পেরেছে। মেঝেতে শুয়েই সে হতে পেরেছে মা। বৌরানী তো তাও পারলে না!

জগবন্ধুবাবু এবার ভজহরিকে নিয়ে ভেতরের ঘরেই এলেন। সুরমাকে এবার খাটে তোলা হবে। খোকার সামনেই তার মাকে তোলা উচিত। হাজার হলেও সুরমার ওপর খোকারই অধিকার বেশি ছিল। সব সন্তানেরই বোধহয় থাকে। গুরুত্বের দিক থেকে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধটা মা ও সন্তানের সম্বন্ধকে কোনদিনই অতিক্রম করতে পারে নি। জীবজগতের এই বিস্ময়কর সত্য জগবন্ধুবাবু দেখতে পেয়েছিলেন ধলেশ্বরীর বুকে। খোকার প্রথম চিৎকারের পরে সুরমা যখন চোখ খুলল, তখন সে পৃথিবীর আর কিছুই দেখতে চায় নি কেবল ঐ মাংস পিণ্ডটা ছাড়া। তার পরেও গত কয়েকটা বছর ধরে সুরমার অন্তর্লোকে খোকাই ছিল তার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। তবলা-তানপুরার সত্য সে অস্বীকার করে নি বটে, কিন্তু খোকার কাছে সেগুলো চিরদিনই ছোট হয়ে রইল।

বলরাম বললে, "ভোলাদা, তুমি এস—এবার তুলতে হবে।"

ভোলা রায় জবাব দিল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সুরমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল সে। কি দেখছিল ভোলা? বলরাম এবার একটু ব্যস্ত হয়েই ডাকল, "ভোলাদা, শিগগির এস না। ধরো মাথার দিকটায়।"

"না, আমার হাত দুটো আগুনের তাপ লেগে লেগে বড্ড শক্ত হয়ে গেছে। ওস্তাদজীর বৌ ইনি·····দ্যাখ্‌না যাদব, টাটকা দুধের ফেনার মত দেহটা যেন ঘরের মেঝেতে ভাসছে! না, আমি ছুঁতে পারব না। তোরা তুলে নিয়ে আয়।" ভোলা রায় সরে দাঁড়াল ভজহরির দিকে।

মেহগনি খাটের ওপরে শবদেহ তোলা হল। সাজানো হল ফুল এবং ফুলের মালা দিয়ে। যারা কাঁধে তুলবে তারা সব গামছাগুলো ভাঁজ করে কাঁধের ওপরে রাখল। বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "ওস্তাদজী, অনুমতি দিন।"

"অনুমতি দেবে খোকা।—খোকা।" ডাকলেন জগবন্ধুবাবু।

"বাবা—" ভজহরি চাইল বাবার দিকে।

"মাকে এবার নিয়ে যাবেন এঁরা। তুমি অনুমতি দাও।"

"আমি সঙ্গে যাব বাবা। শ্যামপুরের শ্মশান আমি চিনি।"

"তোমাকে তো যেতেই হবে, মায়ের মুখে আগুন দিতে হবে তোমাকেই।" সুরমার সঙ্গে জগবন্ধুবাবুর আর কোন সম্বন্ধ নেই, যদি থাকে সে আছে খোকার। সুরমা খোকার মা। কেবল মা।

ভজহরি খাটের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপরে সে কারু কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই মায়ের দু-পায়ে মাথা ঠেকিয়ে দু-বার প্রণাম করল। খোকার চোখে জল নেই!

এবার ওরা খাট-টা আলগা করে তুলতে যাচ্ছিল। জগবন্ধুবাবু বললেন, "একটু দাঁড়ান।" তিনি বসবার ঘর থেকে নিয়ে এলেন তানপুরাটা, নিয়ে এলেন তবলা জোড়া। তুলে দিলেন খাটের ওপরে। কেউ কোন প্রশ্ন করল না, শুধু অবাক হল।

এবার ভোলা রায় বললে, "একটু দাঁড়ান আরও কাজ বাকী আছে।" এই বলে ভোলা রায় এদিক, ওদিকে চাইতে লাগল। সবাই দেখতে লাগল ওকে। যা খুঁজছিল তা এ-ঘরে দেখতে পেল না বলে ভোলা রায় এল বাইরের ঘরে। ঘরের পূব দিকের দেওয়ালে একটা বেশ বড় কুলঙ্গি ছিল। কুলঙ্গিটা ছিল সুরমার পূজোর মন্দির। সেখানে সে বসিয়েছিল লক্ষ্মী মূর্তি। ভোলা রায় এসে এই কুলঙ্গির মধ্যে হাত ঢোকালো। রেকাবির ওপরে সকাল বেলাকার ক-খানা বাতাসা রয়েছে—পূজোর প্রসাদ। ভোলা রায় মাথা নিচু করে একটা বাতাসা মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে খুঁজতে লাগল সিঁদুরের কৌটো। কুলঙ্গিতেই সে সিঁদুরের কৌটোটা পেল। এ ঘরে এসে ভোলা রায় বললে, "সিঁদুর না

পরিয়ে তো মৃতদেহ বার করা চলবে না! সধবার হাত দিয়ে সিঁদুর পরাতে হবে।”

“সধবা? সধবা এখন কোথায় পাওয়া যাবে?” জিজ্ঞাসা করল বলরাম।

“তোরা একটু অপেক্ষা কর, সধবা আমি নিয়ে আসছি।”

উল্টো দিকে দরজায় পা ফেলতেই, ভোলা রায় দেখল, সধবা একজন দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

“আপনি? আপনি কে?” অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল ভোলা রায়।

“আমি বেলারানী, সধবা। স্বামীর নাম করতে নেই, সরুন।” ভোলা রায়ের হাত থেকে সিঁদুরের কৌটোটা টেনে নিয়ে বৌরানী বসল সিঁদুর পরাতে।

ভজহরি তার কাছে এসে ডাকল, “বৌরানী?”

“খোকা—” হাত দিয়ে কোলের কাছে ভজহরিকে টেনে নিল বৌরানী।

বিয়ের পর প্রথম এই কাজ পেল বেলারানী নাগ। পেল ফরাসগঞ্জের পাঁচ নম্বর বাড়িটায়।

আরাম-কেদারায় শুয়ে জগদীশবাবু ভেবেছিলেন যে, দু-চারটে জরুরী প্রশ্নের জবাব তিনি আজ মনে মনে ঠিক করে রাখবেন। সবচেয়ে বড় প্রশ্নটার কথাই তিনি প্রথম ভাবলেন, বৌরানীর ভবিষ্যৎ কি? তিনি নিজে অক্ষম, অতএব বংশ রক্ষার কোন পথ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তার ওপরে, চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে এসেছে তাঁর চারশ বছরের শিথিলতা। চামড়া কেবল ঢিলে হয় নি, বুকে পিঠে অনেক জায়গায় ছাতলা পড়ে গেছে। ভাল এবং পরিষ্কার জামাকাপড় পরবার সুবিধে আছে বলে সে সব ঢেকে রাখা চলে। সারা মুখে যখন ছাতলা পড়তে আরম্ভ করবে তখন তিনি কি করবেন? অর্থ এবং প্রতিপত্তির ক্ষমতা দিয়ে ভেতরের ব্যাধি তিনি ঢেকে রাখতে পারবেন না। অর্থের ক্ষমতাই বা টিকল কই? জায়গা জমি অনেক সব বাঁধা পড়েছে। প্রতিমাসে ঋণের অঙ্ক

বাড়ছে। কেন বাড়ছে তা তিনি জানেন না। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় হোক বা না হোক, সরকারি খাজনা তারিখ মত তাঁকে জমা দিতে হবেই। খাস জমি যা ছিল তাও বিলি করে দিতে হয়েছে। কেন এসব হল, জগদীশবাবু তা বুঝতে পারলেন না। তবে কি বৌরানীর কথাই ঠিক? কি কথা যেন? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কোন রকম ক্ষমতাই চিরস্থায়ী হয় নি। ক্ষমতার মধ্যেই ধ্বংসের বীজ লুকনো থাকে। ক্ষমতা বলতে বৌরানী সব রকমের ক্ষমতার কথাই বলে। গায়ের জোর থেকে আরম্ভ করে জ্ঞানের জোর পর্যন্ত সবই। কথাটা কি সত্যি? সত্যি বলেই মনে হল জগদীশবাবুর। সত্যি না হলে, জমিদারি সব ভেঙ্গে যাচ্ছে কি করে? জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সামাজিক ব্যবস্থাগুলোও তো সব ওলোট পালট হতে বসেছে। এযাবৎকাল মধ্যবিত্তের সভ্যতা ও কৃষ্টি গাধাবোটের মত জমিদারদের পিছু পিছু চলছিল, তাও তো ওরা ধরে রাখতে পারছে না—গাধাবোট দিশে হারিয়ে ফেলেছে। তার ওপরে আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। এই সব গোলমালের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীটার ভবিষ্যৎ-ই অবাঞ্ছিত অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। নতুন আলো কখন এবং কোন দিক থেকে যে আসবে তা তিনি জানেন না। তবে তিনি আর বৌরানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি করবেন? ছাতলা কেবল তাঁর নিজের গায়ে পড়ে নি পৃথিবীর গায়েও তিনি ছাতলা দেখতে পেলেন। জগদীশবাবু চোখ বুঁজে তলিয়ে যেতে লাগলেন মূলের সমস্যায়। সেখানে তিনি দেখলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর নেই, বারুদ সব নিভে গেছে। ভাঙ্গা চোরা পৃথিবীর বুকে তৈরি হয়েছে একটা মস্ত বড় নর্দমা। সেই নর্দমা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ক্ষমতার বিষ। গড়িয়ে চলেছে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে। সংখ্যাগুরুর হাত সেখানে অনেক, অসংখ্য। মুষ্টিমেয়ের হাত থেকে অসংখ্য হাতের মুঠোয় গিয়ে সেই পুরনো বিষই নতুন করে জমাট বাঁধছে। তা বাঁধুক, জগদীশবাবু তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। বৌরানীর ভবিষ্যৎ সে নিজেই সৃষ্টি করে নিক। কেবল স্বামী-হওয়ার ক্ষমতার জোরে তিনি তার চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারেন না। আদিম মানবী হয়ে

বৌরানী ঘুরে বেড়াক জগবন্ধুর স্বরের রাজ্যে। তারপরে? তারপরে জগদীশ-বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যেই কি যেন একটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। বৌরানীর কোলে বোধহয় একটা বাচ্চা এসেছে। কি করে এল? সমাজের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না? দরকার নেই। তিনিই সমাজ। তিনিই পিতা। তিনি গোটা পাঁচ ইস্কুলের প্রেসিডেণ্ট। ছেলের অভাব কি? অভাব কেবল একটা ছেলেরই। বংশ রক্ষার জন্যে বৌরানীর কোলে একটা ছেলে এলেই কাজ হবে। একটা মুহূর্তের ব্যাপার। সে-মুহূর্তটা তিনি দেখতে যাবেন না। ঘুমের মধ্যেই জগদীশবাবু তাঁর দেহে উত্তেজনা অনুভব করলেন। জাগ্রত অবস্থায় তেমন উত্তেজনা তাঁর আসে না। অতএব ঘুমের মধ্যেই তিনি জগবন্ধুকে ক্ষমা করলেন। বৌরানী কিংবা জগবন্ধু কাউকে তিনি চান না—চান কেবল কোলের ঐ বাচ্চাটা। বংশ রক্ষার পলতেটাকে জ্বালিয়ে রাখতে পারলেই সমাজ-লণ্ঠনের গায়ে তিনি দুর্নীতির কালি লাগতে দেবেন না।

ঘুম থেকে যখন তিনি উঠলেন, তখন আট-টা বেজে গেছে। সামনেই রমাকান্ত দাঁড়ান ছিল। জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "জগবন্ধু আসে নি রমাকান্ত?"

"না।"

"কটা বাজল?"

"নটা প্রায় বাজে বাবু।"

"বলিস কি? হল-ঘরে সবাই এসেছেন?"

"অনেকেই এসেছেন। জগবন্ধুবাবু বোধ হয় আজ আর এলেন না।"

"না এলে চলবে কেন? মাইনে যখন তাঁকে দেওয়া হয়......রমাকান্ত বৌরানী কি এখনো ফেরেন নি?"

"না বাবু।"

চুপ করে রইলেন জগদীশবাবু।

বর্ষায় এবার বুড়ীগঙ্গা নতুন রূপ ধরেছে। কোথা থেকে রাশি রাশি জল,

এসে নদীটার স্বাস্থ্য দিয়েছে ফিরিয়ে। দিনরাতই যেন বুড়ী গঙ্গা হাতপা ছুঁড়ছে বলে মনে হল জগদীশবাবুর। লোহার দরজাটায় এসে নদীর ঢেউগুলো আছাড খেয়ে পড়ছে। বারান্দায় বসেই তিনি আওয়াজ পেলেন।

"নদীটা হঠাৎ যুবতী হয়ে উঠল কেন রে রমাকান্ত? সবারই তো বয়স বাডছে, বুড়ী গঙ্গার বয়স চলেছে কমের দিকে গডিয়ে।"

"তা হোক আমাদের দেওয়াল ছাপিয়ে এ-জল কোনদিনই নাগবাড়িতে ঢুকতে পারবে না—বড্ড মজবুত দেওযাল বাবু।" জগদীশবাবুব পা টিপতে টিপতে বললে রমাকান্ত।

"জগবন্ধু এল না কেন রে?—কেউ যদি নিয়মকানুন না মানে, তবেই বা সংসারটা চলে কি করে?"

"সবই ঠিক মত চলত বাব, তুমি যদি একটু সোজা হয়ে দাঁডাতে পাবতে। তোমার ঠাকুরদা ছিলেন এসব ব্যাপারে খুবই শক্ত লোক!"

'কোন্ সব ব্যাপারে?" জগদীশবাবু মুখ তুলে চেয়ে রইলেন রমাকান্তের দিকে। জগদীশবাবুর পা টিপতে টিপতে রমাকান্ত তার নিজের পা ফেলল গর্তে। এখন তাব নিজের চেষ্টায়ই নিজের পা টেনে তুলে নিয়ে আসতে হবে গর্ত থেকে।

"কি রে রমাকান্ত, চুপ কবে বইলি কেন?" ধমকানির সুর ছিল জগদীশ-বাবুর গলায়।

"সে বাবু মস্ত বড় কাহিনী! তোমরা ত ইংরেজী লেখাপড়া শিখে পূর্ব-পুরুষদের কীর্তি সব শুনতে চাও না। তোমার ঠাকুরদা ধনপতি নাগ ছিলেন সে-আমলের মস্ত বড় বীর। সারাটা জীবন কেবল লড়াই করেছেন বিক্রমপুরেব রঘু দত্তের সঙ্গে।" রমাকান্ত কথার ফেনা তুলতে লাগল, আসল ব্যাপারটাকে ঢেকে রাখবার জন্যে। জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "রঘু দত্তের নামটা যেন শুনেছি—"

"রঘু দত্ত ছিলেন সে যুগের সব চেয়ে বড় ডাকাত। ধনপতি নাগ আর রঘু দত্তের লড়াই-কাহিনীর কাছে তোমাদের ইংরেজ-জর্মানের যুদ্ধ শিশুর মত

ছোট মনে হয়। এরা যুদ্ধ করছে দেশ দখলের জন্যে, আর ধনপতি নাগ যুদ্ধ করেছিলেন তোমার ঠাকুরমাকে উদ্ধার করবার জন্যে।"

"কি রকম?"

"সে বাবু বিরাট কাহিনী! বুড়ী গঙ্গা শুধুশুধু বুড়ী হয় নি—ওর তলায় রয়েছে তোমার ঠাকুরমা দম আটকে। আটকে রেখেছেন ধনপতি নাগ। শুনেছি তোমার ঠাকুরদার আঙুলগুলো সব লোহার মত শক্ত ছিল! ক্ষমতা রাখতেন ধনপতি নাগ।"

এইসময় সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন দেওয়ানজী। এমন সময় তিনি কখনো আসেন না। জগদীশবাবু খুবই অবাক হলেন। পা দুটো মেঝেতে রেখে সোজা হয়ে বসলেন তিনি আরাম-কেদারায়। বললেন তিনি, "ব্যাপার কি দেওয়ানজী?"

"জগবন্ধুবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন, তাই তিনি আজ আর গান গাইতে আসবেন না। যদি অনুমতি দেন তো কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই'।"

জগদীশবাবু তাঁর নিজের স্ত্রীর কথা ভাবতে লাগলেন। ধনপতি নাগের নাতি তিনি, বৌরানী তাঁর স্ত্রী! অতএব—

"মানুষের এটা সবচেয়ে খারাপ সময় বাবু। টাকা কিছু—"

"কার খারাপ সময় বললেন দেওয়ানজী?"

"জগবন্ধুবাবুর।"

"ও, হ্যাঁ—খারাপ সময়।" জগদীশবাবু ধাক্কা মেরে মেরে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। দেওয়ানজীর কানে তাই খুবই অদ্ভুত ঠেকল জমিদার জগদীশ নাগের কথাগুলো। তিনি চেয়ে রইলেন রমাকান্তের দিকে। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলেন না। মনে মনে একটু ভয়ও পেলেন।

জগদীশবাবু আরামকেদারায় আর বিন্দুমাত্র আরাম পেলেন না। আরাম পাওয়া সম্ভবও নয়। সামনে বুড়ীগঙ্গা, মাটির তলায় রয়েছে ঠাকুরমার দম আঁটকে, আটকে রেখেছে ধনপতি নাগের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো। তাঁর নিজের আঙুল তেমন শক্ত হতে পারে নি, শঙ্খবিষ সব গাঁটগুলোকে শিথিল

করে দিয়েছে। মালাক্কা বেতের ছড়িটায় ভর দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন নিজের ঘরের দিকে। পথ দীর্ঘ নয়, তবু দীর্ঘ মনে হল জগদীশবাবুর কাছে। নিঃসঙ্গ জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক-মুহূর্তটা তিনি দেখতে পেলেন এই পথটুকুর মধ্যে। মুহূর্তটা যেন তাঁর পায়ে ঠেকতে লাগল। সুরমার মৃত্যুতে তিনি কেন এতটা নিঃসঙ্গ বোধ করছেন, সংসারের কেউ তা জানতে পারবে না। জানাতে পারবেন না কাউকে। তিনি ধনপতি নাগের মত কেবল আঙুলের ক্ষমতা দিয়ে কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারেন না। একটা শতাব্দীর ব্যবধানে সব কিছুই বদলে গেছে। তিনি নিজে বদলেছেন প্রচুর। তিনি শিক্ষিত, রঘু দত্তের মত ডাকাতের সঙ্গে লড়াই তাঁকে করতে হবে না। এ যুগের রঘু দত্তরাও শিক্ষার পোষাক পরে চেহারা সব বদলে ফেলেছে। অতএব —তিনি দরজার এ-পাশে থামলেন একটু। ভাবতে লাগলেন, তিনি কি করবেন এখন। বৌরানীর অতিপ্রিয় ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর কোন দিনই তিনি হাত দিতে চান নি। ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দিতে গেলে সভ্যতা এবং কৃষ্টির টুটিতেও হাত দেওয়া হয় বলে আজকাল তিনি বৌরানীর অজ্ঞাত-সারেই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার হাত আলগা হলেই যে বৌরানী তার ব্যক্তিস্বাধীনতার মর্যদা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, তারও তো প্রমাণ কিছু তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। সামাজিক এবং সাংসারিক আইন ভেঙ্গে ফেললেই তো ভাঙ্গনের শেষ সেখানে হচ্ছে না। জগদীশবাবু যেন দেখতে পেলেন, বৌরানী তার নিজের আইনও ভাঙ্গছে—তার অন্তরের আইন।

দেওয়ানজীকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "আপনি নিজে গিয়ে টাকা পৌছে দিয়ে আসুন। ··ওস্তাদজীকে বলবেন, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে আমার নিজের দুঃখ কম নয়। ··দেওয়ানজী, কাল সকাল থেকে ফজ্‌লুর কাজ ফুরলো। জবাব দিয়ে দেবেন। আর—"

"আর কি কর্তাবাবু?" প্রশ্ন করলেন দেওয়ানজী।

"আর বারোদির সেরেস্তায় পাঠিয়ে দেবেন জগবন্ধুকে। আমাদের আর্থিক

অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। অতএব—হ্যাঁ, অতএব একই মাইনেতে তাকে গান গাওয়া এবং সেরেস্তায় কাজ করা, দুটোই করতে হবে। বারোদি গ্রাম এখান থেকে বেশী দূর নয়, মাঝে মাঝে সে যেন এসে ভজহরিকে দেখে যায়। দেওয়ানজী, ভজহরিকে ফরাসগঞ্জ থেকে তুলে নিয়ে এসে পুঁতে দিন আমার মানুষ-বাগানে। সেখানেই সে বড় হোক।”

রমাকান্ত এবং দেওয়ানজী দুজনেরই চোখে পড়ল জগদীশ বাবুর ডান হাতটা। হাতের ওপরে ছ্যাঁতলা পড়েছে। সেই হাত দিয়েই জগদীশ নাগ চোখ মুছলেন।

দেওয়ানজী নিঃশব্দে নেমে এলেন নিচে।

জগবন্ধুবাবুর জন্যে দুঃখ তাঁর কম নয়। ওস্তাদজী স্থানচ্যুত হচ্ছেন। কেবল ওস্তাদজী নন, সমস্ত মধ্যবিত্ত সমাজটাই স্থানচ্যুত হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে টুকরো টুকরো হয়ে। ইচ্ছে করলে, তিনিও আর একে ধরে রাখতে পারেন না। পারেন না জগদীশ নাগও।

বড় হল্‌-ঘরটায় এসে উপস্থিত হলেন দেওয়ানজী। সমবেত ভদ্রলোকদের তিনি বললেন, “কর্তাবাবুর আজ শরীর খুব অসুস্থ। তা ছাড়া ওস্তাদজীর স্ত্রী একটু আগেই মারা গেলেন।”

সুরমা একা মরে নি, মেরে রেখে গেল জগদীশবাবুর সঙ্গীতের আসরটিকেও। নূতন সঙ্গীতের নব-সূচনা কোথায় এবং কবে যে আবার আসর জমিয়ে বসবে, দেওয়ানজী তা জানেন না। জগদীশবাবুর আসর ভেঙ্গে গেল এ-কথা সত্যি। এ-কথা সত্যি যে, ভাঙ্গতে সাহায্য করল সবাই। দেওয়ানজীর বিশ্বাস, জগদীশবাবু একদিন এদের ক্ষমা করবেন।

পঞ্চম খণ্ড

দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বেরিয়ে এল ভজহরি। পার্কের বেঞ্চিতে পা গুটিয়ে বসে সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভেবেছে পশ্চাৎ-ইতিহাস। ইতিহাসই বটে! সে-ইতিহাসের শেষ সে ঢাকায় বসেই দেখে এসেছে। শেষ বলেই হয়তো চরিত্র-গুলোর মধ্যে ভজহরি দেখতে পায় বিয়োগান্ত নাটকের গভীর বিস্তৃতি। জগদীশবাবুর আলিঙ্গনের মধ্যে যে-বিস্তৃতি সে দেখে এসেছে তার আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন। সে নিজে কোনদিনও মুক্তি পেতে চায় নি, আজো বোধ হয় চায় না—কিন্তু ইতিহাস যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখানে সে পড়ে থাকবে কি করে? শেষ অধ্যায়ের পাতাগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকলেও তার কোন লাভ হতো না। পড়ে থাকতে সে পারেও নি। পারে নি এই জন্যে যে, নতুন ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ এরই মধ্যে লেখা স্থরু হয়ে গেছে। ডব্‌সন রোডের বস্তিতে এসে পৌঁছতে দেরি করলে, ভজহরি হয়তো ভবিষ্যৎ-ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে বাদ পড়ে যেত। সনাতনই দখল করে বসত সবগুলো পাতা।

মাধবদার বিশ্বাস, ডব্‌সন রোডের বস্তিতে সনাতনই একমাত্র যোগ্যতম পাত্র। সে মোট বয় না, ফেরি করে ছিট কাপড় বিক্রি করে না শহরের রাস্তায় রাস্তায়। সনাতন শ্রমিক, কেবল সাধারণ শ্রমিক নয়, স্থতো-শিল্পের ওস্তাদ কারিগর। ভবিষ্যৎ-সমাজের কুলীনশ্রেষ্ঠ এই সনাতন দত্ত। পার্কের দরজা দিয়ে ফুটপাতে এসে দাঁড়াল ভজহরি। মুখে ওর ভেসে উঠল মৃদু হাসি। সনাতনদা যত বড় শ্রমিকই হোক না কেন, তবু সে দত্ত। স্থানচ্যুত মধ্যবিত্ত সমাজের সেই পুরনো রক্তমাংসের ছিটেফোঁটাগুলোই যেন ডব্‌সন রোডের

বস্তিতে এসে ভোল বদলাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করছে, মধ্যবিত্তের অস্থি দিয়ে নতুন অস্ত্র তৈরি করবার। ক্ষমতার অস্ত্র। সেই পুরনো ক্ষমতার ইস্পাতের মুখে ধার তুলছে নতুন করে। কিন্তু এ-অস্ত্র কি সনাতনদা ধরে রাখতে পারবে? সঙ্ঘবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠের দল ছিনিয়ে নেবে তার হাত থেকে। তারপর আবার নতুন করে পৃথিবীর বুকে তৈরি হবে ক্ষমতার কারাগার। রাস্তার ঐ সাধারণ মানুষটাকে আবার নতুন করে ঠকাবার চেষ্টা করছে সনাতনদা। শেষ পর্যন্ত নিজেও সে ঠকবে। ঠকেছেন জগদীশবাবুও। তাঁর মুষ্টিবদ্ধ ক্ষমতার বিষ ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলাদেশে, ছড়িয়ে পড়েছিল তার নিজের সংসারের মধ্যে। সেই বিষের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বৌরানী পালিয়ে গেলেন। পালিয়ে না গেলে এ-বিষ তিনি রুখতে পারতেন না, শান্তি পেতেন না হয়তো আরও ত্রিশটা বছর। কিন্তু জগদীশবাবু পালাতে পারলেন না। বাঁধা পড়ে গেলেন বিষচক্রের মধ্যে। এ-বিষ তিনি নিজে সংগ্রহ করেন নি। রাষ্ট্র ও সমাজ তাঁর মুঠোতে গড়ে তুলেছে বিষের ক্রমসঞ্চয়। সঞ্চিত হয়েছে পুরুষানুক্রমে। এর পেছনে ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের গভীর ষড়যন্ত্র। জগদীশবাবুরা চোখ বুঁজে হাত পেতেছিলেন ওদের দিকে। অতি বলিষ্ঠ হাত। এ-হাতের প্রয়োজন ছিল সেদিন। সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তেই সমাজ ও রাষ্ট্র বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জগদীশবাবুদের ওপর। অমৃতের নাম করে হাতের মুঠোয় ঢুকিয়ে দিয়েছে শঙ্খবিষ। আজ যখন কাজ ফুরিয়ে গেল, তখন জগদীশবাবুদের ছুঁড়ে ফেলে দিল ওরাই। ভজহরি ভাবলে, অকৃতজ্ঞতা সভ্যতার শত্রু। যে সমাজ ক্ষমার অস্তিত্ব নিসংশয়ে মুছে দিতে পারল, সে-সমাজে আর রইল কি?

সনাতনদা ভুল করছে। মুষ্টিমেয় জমিদারদের শূন্য সিংহাসনে নতুন ক্ষমতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের পোশাক পরিয়ে বসাবার চেষ্টা করছে ওরা। ক্ষমতার বিষ একজনের মুঠো থেকে চুইয়ে পড়লেও বিষ, আর এক কোটি লোকের সঙ্ঘবদ্ধ মুঠো থেকে চুইয়ে পড়লেও সে বিষ। সনাতনদা ভুল করছে।

কিন্তু ক্ষমতার সিংহাসন তো শূন্য থাকতে পারে না? বায়ুস্তর যেমন

তার নিজের শূন্যতা ঘুচিয়ে দেয়, মানবসমাজও তেমনি তার ক্ষমতার সিংহাসন শূন্য রাখতে পারে না। মানুষ সেই পুরনো ক্ষমতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে নতুন অভিষেকের মন্ত্র দিয়ে। সনাতনদার কণ্ঠে নতুন মন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পেয়েছে ভজহরি।

সে পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল রসা রোডের দিকে। ডব্‌সন রোডে তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। নতুন ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ লেখা হচ্ছে। বেশিক্ষণ বাইরে বসে থাকলে, সনাতনদা প্রবল হয়ে উঠবে। দখল করে বসবে সবগুলো পাতা। প্রবলের মাথা যদি বেশি উঁচু হয়ে ওঠে তাকে প্রমাণ সাইজের করে রাখার ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়েই ভজহরি এসে উপস্থিত হয়েছে ডব্‌সন রোডের বস্তিতে। স্থানচ্যুত মধ্যবিত্তসমাজ হাল-ভাঙ্গা নৌকোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে এদিকে, সেদিকে। নতুন হাল জুড়ে দেবার দায়িত্ব ভজহরির, সনাতনের নয়। রসা রোড আর রাসবিহারী এ্যাভিনূর মোড়ে এসে দাঁড়াল ভজহরি। বাঁ পাশের ফুটপাতের ওপরে ওর মত বয়সের ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড়। প্রায় সবার মুখেই সাদা সাদা সিগারেট। হঠাৎ যেন ভজহরি দেখতে পেল, মোড়ের ওপর অনেক জল। ধীরে ধীরে বাতাস উঠল, আকাশে মেঘ জমছে। ক্রমে আকাশ কালো হয়ে এল, ঝড় উঠল রসা রোড আর রাসবিহারী এ্যাভিনূর মোড়ে। হাল-ভাঙ্গা নৌকোটা ভেসে যাচ্ছে বড় ঢেউ-এর দিকে। নৌকোতে কেবল মাধবদা, সরোজিনী, সনাতন কিংবা জয়গোবিন্দই নেই, রসা রোডের এ-পাশের ছেলেরাও আছে। কিন্তু দিক্‌নির্ণয়ের চেষ্টা কারু নেই। নেই নৌকোটাকে শাসন করবার চেষ্টাও। ভজহরি যেন নতুন হালটা ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে সাঁতার দিল। সাঁতার দিল রসা রোড আর রাসবিহারী এ্যাভিনূর মোড়ের দিকে।

ভজহরি রক্তে তার ঢেউ-এর প্রাবল্য অনুভব করল বটে, কিন্তু মোড়ের ওপর একবিন্দু জল ছিল না। এ-পাশে দাঁড়ানো ছিল ছেলের দল। ও-পাশে দাঁড়িয়েছিল একটা রিক্সা। ভজহরি মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখল, রিক্সার ওপরে

জগদীশবাবু বসে আছেন। তাঁর পাশে বসেছে রমাকান্ত। পুলিশ হাত তুলেছে বলে রিক্সাটা আটকে পড়েছে। এই পরিস্থিতিটা খুবই অদ্ভুত ঠেকল ভজহরির কাছে। এ-পাড়ায় মোট বইতে এসে একটু আগেই সে নৌকো বাইতে চলেছিল। এখন মনে হল, ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে সে যেন দু-পারের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে। কিন্তু জগদীশবাবুর রিক্সাটা মোড় পার হয়ে চলে গেল দক্ষিণ দিকে। গেল ওর সামনে দিয়েই। কথা বলবার চেষ্টা করল না ভজহরি। মৃত অতীতের সঙ্গে কি কথাই বা সে বলতে পারত? ছেলেদের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে ভজহরি এগিয়ে গেল সামনের দিকে। আর দু-পা হেঁটে গিয়ে এবার সে বাসে চেপে বসবে। বসলও।

বাসে উঠে ভজহরি জগদীশবাবুর কথাই ভাবতে লাগল। কী কুৎসিত-ই হয়েছে তাঁর চেহারাটা! মাংস সব ঝুলে পড়েছে, আলগা হয়ে পড়েছে দেহ থেকে। অর্ধাঙ্গ অবশ। মাঝে মাঝে পুরো দেহটাই অবশ হয়ে যায়। তখন কথা বেরয় না মুখ দিয়ে, চুলের গোড়াগুলো পর্যন্ত নেতিয়ে পড়ে, নিষ্করুণ সহায়হীনতা বিঁধতে থাকে তাঁর অনুভব শক্তিকে। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন রমাকান্তের দিকে। বৌরানীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংসারটা পালিয়ে গেল। কিন্তু রমাকান্ত পালায় নি। থলথলে মাংস আর ছাতলা-পড়া মুখ দেখে দেখে রমাকান্তের চোখে এখনও ঘৃণা জন্মায় নি। জন্মাতে পারে না। বহিরাবরণের ব্যাধি রমাকান্ত কেবল ব্যাধি বলেই জানে। জগদীশবাবুর হৃদয়ের স্বাস্থ্যকে সে কখনও ব্যাধি বলে ভুল করে নি। কিন্তু বৌরানী? সে অনেক কথা।

"টিকিট?"

ভজহরি পকেট থেকে একটা টাকা বার করল। প্রায় এক মন মাছ বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে টাকাটা সে পেয়েছে পাটনার বাবুদের কাছে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছে বলে ওকে কেউ বিশেষ কোন উপরি সম্মান দেখায় নি। দেখালে, ভজহরি অসম্মানই বোধ করত। কিন্তু এই টাকাটা আজ সে তার মেহনতের দাম হিসেবে পায় নি। পেয়েছে বকশিশ। ভজহরি টিকিট কাটল হাওড়ার।

ডব্‌সন রোডে এখুনি সে আর ফিরবে না। বসে থাকবে গিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ডাউন মেল ট্রেনগুলো সকালের দিকেই সব এসে গেছে। ভালই হয়েছে। আজ সে আর মোট বইবে না।

বাস থেকে নেমে হাঁটতে লাগল স্টেশনের দিকে। হাঁটতে ওর কোন কষ্ট হচ্ছিল না। ভালই করেছে সরোজিনী জুতো জোড়াটা নিয়ে গিয়ে। পায়ের ওজন কমে গেছে। পল্টনদের জুতোর মত ঢব্‌ঢব্‌ শব্দ তুলে সারা কলকাতাকে সজাগ করে দিয়ে লাভ হতো কি? সরোজিনীকেই যখন সে জাগাতে পারলে না, তখন শহরের অন্য কেউ জাগল কি না তাতে ভজহরির কি যায় আসে? সরোজিনী ওকে ভুল বুঝে গেছে। বালিগঞ্জ-পাড়ার লোক ভেবে সরোজিনী ওকে যেন সমাজচ্যুত করে দিয়ে গেল। একটু হেসে ভজহরি ভাবলে, সরোজিনী তার নিজের সমাজ চেনে না। একটা আবদ্ধ জায়গার মধ্যে সারি সারি খোলার বাড়ি দেখলেই মেয়েটা মনে করে, ওগুলো সব সমাজের একেবারে নিচের অস্তিত্ব। তাই যদি হবে, তা হলে বৈদ্যবাটীর সেই চটকলের মজুরগুলো দো-তলা পাকা বাড়িতে বাস করে সরোজিনীদের এত নিচে পড়ে রইল কি করে? সেদিন সরোজিনী গিয়েছিল ভজহরির সঙ্গে চন্দননগরে। মজুরদের একটা বিরাট্‌ মিটিং ছিল সেখানে। সনাতন বস্তির সবাইকে নেমন্তন্ন করেছিল তার বক্তৃতা শোনবার জন্যে। তার আগে সনাতন দু-দিন দরজা বন্ধ করে বই থেকে গোটা তিন পাতা একেবারে টানা মুখস্থ করেছে। মুখস্থ করবার খবরটা দিয়েছিল সরোজিনী-ই। সনাতনের বক্তৃতা অবশ্যি খুবই ভাল হয়েছিল। যেমন ভাষা, তেমনি কণ্ঠ! এই রকমের ভাষা ও কণ্ঠের মাধুর্য ভজহরি কিছুক্ষণ আগেই শুনে এসেছে রসা রোড আর রাসবিহারী এ্যভিনূর মোড় থেকে।

চন্দননগরে ওরা গিয়েছিল সেদিন বাসে চেপে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু-ধারে বস্তির খুব বেশি ভিড় ওরা দেখতে পায় নি। সরোজিনী অবশ্যি চোখ খুলে বসেছিল বস্তি দেখবার জন্যেই। ও ভেবেছিল রাস্তার দু-ধারে খোলার ঘর সব গিজগিজ করবে! কিন্তু বৈদ্যবাটীর রেল লাইন পেরিয়ে ডানহাতি একেবারে রাস্তার ওপরেই ওরা একটা চটকল দেখতে পেল। বাসটা থামল

এসে ওখানেই। বাসে বসেই সরোজিনী দেখল, চাঁপদানি চটকলের ঠিক পাশেই লম্বা লম্বা ইটের বাড়ি। সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে সব কারা থাকে হরিদা?"

"চটকলের মজুর-রা।" জবাব দিল ভজহরি।

"না, তুমি জানো না। বাস থেকে নেমে গিয়ে তুমি একবার জিজ্ঞাসা করে এস।"

'বাস এক্ষুণি ছেড়ে দেবে। চাকরির চেষ্টায় এসব জায়গা আমি ঘুরে গেছি। আমি জানি সরোজিনী।"

"তোমার সঙ্গে কেউ ঠাট্টা করে নি তো হরিদা?"

ওদের কথাবার্তা শুনে পাশের থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "ওটা মজুরদেরই ব্যারাক।"

সরোজিনীর কথা ভাবতে ভাবতে ভজহরি ঢুকল এসে ছ-নম্বর প্ল্যাটফর্মে। পায়ে আর জুতোর বোঝা নেই। পা দুটো বেঞ্চির ওপর তুলে ভজহরি এবার ভাবতে লাগল মিনতির কথা। মিনতি অসুস্থ। কাগজে একটা ঠিকানা লিখে দিয়েছে। কদিন পরে নাকি সেই ঠিকানায় মিনতি গিয়ে উঠতে পারে। পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করে ভজহরি ঠিকানাটা দেখে নিলে একবার। কলকাতার রাস্তাঘাট বিশেষ কিছু এখনও সে চিনে উঠতে পারে নি। চোখের সামনে কাগজের টুকরোটা তুলে ধরে ভজহরি নিজের মনেই প্রশ্ন করল: কত নম্বর বাস ধরে যাদবপুর যেতে হয়?

তারপরে দুটো সপ্তাহ কেটে গেছে। ভজহরি তার কাজে নিয়মিত যোগ দিতে যায়। ফিরেও আসে যথা সময়ে। জয়গোবিন্দ ক-দিন থেকে খুবই কাশতে আরম্ভ করেছে। মাঝে মাঝে সে কাজে কামাই দিচ্ছে। বেলফুলের মালা বেচতে যায় সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে। দু-একদিন সন্ধ্যের সময় সে ফিরেও এসেছে। ফুলগুলো বেচতে পারে নি।

আজ রাত্তিরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে ভজহরি দেখল, চৌকাঠের এ-পাশে

অনেকগুলো রজনীগন্ধা ও বেলফুলের মালা পড়ে রয়েছে। একটু এলোমেলো ভাবেই পড়ে আছে। সরোজিনীর হাতের স্পর্শ পেলে এরা অমন অগোছাল হয়ে পড়ে থাকত না কিছুতেই। তাছাড়া আজ প্রায় পনরো দিন থেকে সরোজিনী পাঁচ নম্বরের দিকে আসে না।

চার নম্বর থেকে ডাকল জয়গোবিন্দ, "ভজহরি, একবার ইদিকে একটু এস তো ভাই।"

প্রতিবেশীর ডাক ভজহরি কোনদিনও অগ্রাহ্য করে নি। আজও করল না।

"কি হয়েছে জয়গোবিন্দ ?"

"জ্বর।"

"সর্দি জ্বর নাকি ?"

"ভেবেছিলুম তাই। কিন্তু—" কাশতে আরম্ভ করল জয়গোবিন্দ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ভজহরি। কাশির আওয়াজটা কানের পর্দায় ওর আতঙ্কের সৃষ্টি করল।

"জয়গোবিন্দ, কাল একবার ডাক্তারের কাছে চলো।"

"ডাক্তার ? টাকা ?"

"টাকা কি তোমার কাছে কিছুই নেই ?"

"ফুল-বেচা পয়সা ঘরে তো ভাই পড়ে থাকে না, খেলাতে হয়। মালীদের কাছে কিছু আগাম দেওয়া আছে। ভজহরি, জ্বর খুব বেশি নয়, কিন্তু জ্বরটা আসে সন্ধ্যের দিকেই। বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছি।"

"তা হলে আর দেরি করা উচিত হবে না, টাকা তো কিছু আমার কাছে আছে। প্রথম দিকের ধাক্কাটা এই টাকা দিয়েই সামলানো যাবে।"

জয়গোবিন্দ কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল ভজহরির উদ্দেশে। তারপর বললে, "ওখানে ঐ জলের গেলাসটা আছে, একটু জল গড়িয়ে দাও কুঁজো থেকে।"

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিল ভজহরি। বিছানার পাশে বসে সে হাত রাখল জয়গোবিন্দর মাথায়। জয়গোবিন্দ বলল, "কুলীর কাজ করলে কি

হবে, তুমি আমাদের মত ছোটলোক নও। আমি টের পেয়েছিলুম অনেকদিন আগেই।"

"এখানে কেউ ছোটলোক নয় জয়গোবিন্দ।"

"নয়? সে আমি শুনব কেন দাদা? আমরা সবাই ছোটলোক। নইলে—"

জয়গোবিন্দ আবার কাশতে আরম্ভ করল। কাশি থামবার পরে ভজহরি বললে, "বেশি কথা কওয়া উচিত নয় তোমার। তুমি এবার চুপ করো।" এই বলে ভজহরি উঠতে যাচ্ছিল। জয়গোবিন্দ ফস্ করে ভজহরির হাতটা চেপে ধরে বলল, "আমরা যদি ছোটলোকই না হবো, তা হলে তোমার মত মানুষকে আমরা পাঁচ নম্বর থেকে তাড়াতে চাই কেন?"

"কই আমি তো তা জানি না!" সংবাদ শুনে আশ্চর্য হল ভজহরি।

"হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ। দু-দিন আগেই তো এখানে মিটিং হয়ে গেল। মাধব পিওনের মেয়েটা বলে যে, তুমি নাকি ভদ্দরলোক! সনাতন ছোঁড়াটা সরোজিনীর মাথা খাচ্ছে—"

"কি খাচ্ছে বললে?" একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ভজহরি।

"ঐ যে সরোজিনী, মাধব পিওনের মেয়ে গো, দাওয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আর সুর করে করে বই পড়ে। কাল আমার কাছ থেকে একজোড়া বেলফুলের মালা নিয়ে গলায় পরলে! দাম চাইলুম, আর অমনি আঙুল তুলে বললে, দাম দেবে ছ-নম্বর। ভজহরি, আমি বলছি সনাতন ওর মাথা খাচ্ছে। আমরা হলুম গিয়ে ছোটলোক, ওসব বিদ্যের জয়ঢাক নিয়ে দাওয়ায় বসে পা দোলালে তো উনোনের কয়লা সব পুড়ে যাবে দিদি! তা ছাড়া—"

"বড্ড বেশি হাঁপাচ্ছ জয়গোবিন্দ।" বাধা দিয়ে বললে ভজহরি।

"তবুও তো দাদা, সত্যি কথা বলতে হবে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে সব মোটা মোটা মাছি—সবাই বড়লোক। কিন্তু তোমার মত ভদ্দরলোক কটা আছে? এই যে ফস্ করে কপালের ওপর হাত রাখলে আমার, কই কেউ তো এমন করে আমায় আজ পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখে নি

ভজহরি! পা ডুলিয়ে বই পড়লে কি হবে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে শুনে সরোজিনী এদিকের মাটিতে আর পা দেয় না।"

"বোধ হয় অন্য কারণ আছে।—কাল তা হলে ডাক্তারের কাছে কখন যাচ্ছ?"

"তোমার যখন সুবিধে হয়। সকালের দিকেই ভাল হবে।"

"বেশ, আমি কাল আর ডাউন মেল ট্রেনের মাল নামাতে যাব না।"

"কাজে কামাই দেবে?"

"তোমার কাজটা তো খুবই জরুরী জয়গোবিন্দ। তুমি এবার ঘুমোবার চেষ্টা করো।" এই বলে ভজহরি মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে।

বিপিন পাল রোড থেকে ফিরে আসবার পরে, সরোজিনী বস্তির সরু রাস্তা দিয়ে ডাউনের দিকে খুব বেশি আর আসে না। আসতে দেখে নি ভজহরি। সনাতন দু-বেলায়ই যায় চোদ্দ নম্বরে। সরোজিনীর রান্না খুবই পছন্দ হয়েছে ওর। দু-সংসারের রান্না একসঙ্গে হয় বলে খাবারের পরিমাণ-ই কেবল বাড়ে নি, তেল-মসলার পরিমাণও অনেক বেড়েছে। আলু সেদ্ধ আর ডাল ভাত খেয়ে খেয়ে সনাতনের মুখের স্বাদ গিয়েছিল বদলে। কদিন থেকে কাটা-পোনার ঝাল, আর কই মাছের তেল-চচ্চড়ি খেয়ে সনাতনের মনের ঝাল অনেকটা কমে এসেছে।

দাওয়ায় বসেছিল সনাতন। রাত আট-টার আগে সে খেতে আসে না। আজ এসে পড়েছে অনেকটা আগেই। সরোজিনী ও-বেলার ঝাল-চচ্চড়িটা গরম করছিল। কড়াইটা নামিয়ে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "বই পড়া কি ছেড়ে দিলে নাকি সনাতনদা?"

"পাগল নাকি। বই না পড়লে মানুষ হবো কি করে?"

"আমার তো মনে হয় বই না পড়লেই ভাল। বড়লোকদের তো আজ-কাল গালাগালি করো না?"

"এখানে করি না বটে, মিটিং-এ গিয়ে করি। আজকাল কত হাততালি পাই জানো?"

"কি করে জানব, মিটিং-এ আর যাই কই। কে-ই বা নিয়ে যায়!"

"কেন ভজহরির কি হল?" প্রথম থেকেই সনাতন ভজহরির কথাটা তুলবার চেষ্টা করছিল, এবার সে সুযোগ পেল।

"হরিদার সঙ্গে দেখাই হয় না।" দাওয়ার ওপর আসন পেতে বলল সরোজিনী, "হাতটা এবার ধুয়ে এস।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন, তোমার বাবা এলে একসঙ্গেই খাবো।—হ্যাঁ, কি বলছিলে যেন?"

"কি বলছিলাম যেন?" সরোজিনী গেলাসে জল ঢালল।

"ঐ যে, ভজহরির কথা। দেখা হয় না কেন, স্বদেশী আমলে রেলগাড়ির সংখ্যা বাড়ল না কি? এত বেশি মোট বইলে ঘাড়ের দফা রফা করবে ভজহরি।"

ভাতের থালাটা সামনে দিয়ে সরোজিনী বললে, "তা তুমি ঠিকই বলেছ। মোট বইবার মত হরিদার ঘাড় অত শক্ত নয়।"

"কেন? কেন?" হাত না ধুয়েই ভাতের মধ্যে হাত দিল সনাতন। তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করল, "ঘাড়টা ওর হঠাৎ আবার নরম হল কবে থেকে? শুনেছি হাওড়া স্টেশনে ওর নাম খুব।"

"ঠিকই শুনেছ তুমি। হরিদা তার মেহনতকে ভগবান বলে ভক্তি করে। তা ছাড়া হরিদা তো আসলে কুলী নয়, ভদ্রলোক।" উল্টো দিকে কথা ঘোরালো সরোজিনী। চরিত্রের বিপরীত বিশ্লেষণ শুনে সনাতন এবার কাটা-পোনায় দাঁত বসাল।

"চমৎকার হয়েছে রান্নাটা!—ফুঃ ভদ্রলোক! ও সব সতীশবাবুরই ক্ষুদে সংস্করণ! গা ঢাকা দিয়ে আছে।—এই রান্নাটা তুমি শিখলে কোথায় সরোজিনী? চমৎকার!"

"আর একখানা মাছ দেব?"

"তা দাও। কিন্তু রান্নাটা আবার ভুলে যাবে না তো? অভ্যাস না থাকলে মানুষ অ-আ-ক-খও ভুলে যায়।"

"আমি ভুলব না সনাতন দা। ভুললেও আবার শিখে নেব। বৌদি তো কাছেই থাকেন ?"

"বৌদি ?" প্রশ্নটা করে সনাতন জল খেল এক ঢোঁক, "বৌদি ? বৌদি কে ?"

"ঐ যে ভদ্রলোক—সতীশবাবু, তার স্ত্রী। আগে বালিগঞ্জেই ছিল ওরা।"

নিঃশব্দে ভাত মাখতে লাগল সনাতন।

একটু পরেই মাধব এসে দাঁড়াল দাওয়ার সামনে। মুখে তার হাসি। পরের চাকরি করার ক্লান্তি তার মুখ থেকে মুছে গেছে। মনে হয়, অফিস থেকে বেরিয়ে মাধব বোধ হয় ভাল করে খেয়েদেয়ে ময়দান থেকে প্রচুর স্বাস্থ্য নিয়ে ঘরে ফিরেছে। মাধবের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতে পেল সনাতন। দেখল সরোজিনীও। বিয়ের আগেই ভাবী জামাইকে তার মেয়ে রান্না করে ভাত খাওয়াচ্ছে এমন দৃশ্য দেখবার ভাগ্য বিপিন পাল রোডের ক-জন বাপের আছে ? মাধব তার সরকারি পোশাক পরেই বসল এসে দাওয়ার ওপর, সনাতনের পাশে। নিজের ছেলের পাশে বসলেও, এর চেয়ে বেশি আনন্দ আর পাওয়া যেত না। মাধবের মুখে হাসি দেখে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "বড়সাহেব বুঝি তোমায় দু-এক টাকা বকশিশ দিয়েছেন বাবা ?"

"টাকা ছাড়া বুঝি বকশিশ হয় না রে ?"

"হ্যাঁ, বড়লোকদের দু-একটা মিষ্টি কথা মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লেই তো আমরা ঢেঁকুর তুলতে তুলতে পৃথিবীটাকে কাঁপিয়ে তুলি।" কথাটা শেষ করে সরোজিনী চাইল সনাতনের দিকে।

সনাতনের গলায় শেষ গ্রাসটা ঠেকে গেল। কোন রকমে সে ভাতগুলো টেনে নিয়ে বললে, "এর চেয়ে বড় সত্য কোন বইতে আর পাওয়া যাবে না।"

"কিন্তু—" মাধব সনাতনের দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু বড়সাহেব তো কোন মিষ্টি কথা বলেন নি আমায়। আজ তিনি আমায় ধম্‌কেছেন খুব।"

"ওঃ, বড়সাহেবের আস্পদ্দা তো কম নয়! সনাতনদা, তুমি এর একটা

বিহিত করো। বড়সাহেবরা যদি ভদ্দরলোকদের মান-মর্যাদা না রাখতে পারেন, তা হলে তুমি একটা মিছিল বার করো।"

"মিছিল? মিছিল কেন মা?"

"প্রতিবাদ করতে হবে না বাবা? একজনের কথায় কেউ তো কান দেয় না, দু-একশজন জড়ো হলেই বড়সাহেব তার ভুল দেখতে পাবেন।"

"কিন্তু দোষ তো আমারই ছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ডিউটির সময় ঘুমনো আমার উচিত হয় নি।"

"তা হলে তুমি সরকারি পোশাক খুলে রেখে এস বাবা। ওপাশে জল তুলে রেখে এসেছি। হাত মুখটা ভাল করে ধুয়ে ফেলো। তোমার জন্যে ভাত বাড়ছি বাবা।"

সনাতন গম্ভীর ভাবে সরোজিনীর কথাগুলো শুনছিল। সরোজিনীর মুখেই সে শুনল যে, মাধব ভদ্দরলোক। মাধব যদি ভদ্দরলোক হয়, তা হলে সে কি করে সরোজিনীকে বিয়ে করবে? সে খুবই বিস্ময় বোধ করল। তবে কি বই পড়ে পড়ে সরোজিনীর বুদ্ধি সব বদলে গেল? সরোজিনীকে তা হলে ওর লেখাপড়া শেখান উচিত হয় নি। সতীশবাবুদের ভগ্নাংশ হবার জন্য কি দরকার ছিল পয়সা খরচ করে বই কিনবার? সনাতনের কাছে টাকা পয়সা হচ্ছে ভগবান। অপব্যয় করলে তো ধর্ম ওর বাঁচবে না!

মাধব পোশাক বদলাবার জন্যে দাওয়া থেকে উঠল। ওর হাতে একটা কাগজের প্যাকেট ছিল। সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "হাতে ওটা কি তোমার বাবা? সরকারি কাগজ নাকি? ওসব জঞ্জাল তুমি আবার বাড়ি বয়ে নিয়ে এলে কেন বাবা?"

সরোজিনীর ভাব দেখে মাধব কাগজের প্যাকেট-টা গোপন করতে চেয়েছিল। মেয়েকে তার বিশ্বাস নেই। বই পড়ে পড়ে সরোজিনী বড়লোকদের অত্যন্ত ঘৃণা করতে শিখেছে। বড়সাহেবকে যখন তখন মেয়েটা অপমান করে। দোষগুণ মিলিয়েই তো মানুষ। কথার কোন জবাব না দিয়ে

মাধব চলে যাচ্ছিল ঘরে। সরোজিনী গলার স্বর চড়িয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কিছু বললে না তো বাবা?"

"পরে বলব।"

"পরে কেন?"

"উনোনের কাছে বসে বসে তোর মাথা গরম হয়ে আছে এখন।"

"কি বললে? আমার মাথা গ-র-ম? বেশ, কাল থেকে আমি আর রাঁধতে পারব না। কেন রাঁধব? কার জন্যে রাঁধব? কে খাবে আমার রান্না?" এই পর্যন্ত বলে সরোজিনী ছটফট করতে করতে চাইল একবার পাঁচ নম্বরের দিকে। সনাতন দেখতে পেল না সরোজিনীর চোখ, কিন্তু মাধব দেখল। বাপের চোখে মেয়ের আসল ছটফটানি ধরা পড়ল।

মাধব হাসতে হাসতে বলল, "তোমার রান্না না খেলে, আমার আর সনাতনের খিদে মিটবে না সরোজিনী।"

"তা হলে মজুরি দিতে হবে। হরিদার কথাই ঠিক।"

"কোন্ কথা?" সনাতনের স্বরে গভীরতা ছিল।

ওর প্রশ্নটা শুনে সরোজিনী এবার গম্ভীর হল। চেষ্টা করতে লাগল স্বাভাবিক হবার জন্যে।

শাড়ীর আঁচলটার একটা অংশ আঙুলে পেঁচাতে পেঁচাতে সরোজিনী বলল, "হরিদা বলেন যে, মেহনত করলেই তার একটা মজুরি পাওনা হয়ে যায়।"

"ভজহরি যা বলবে তা-ই সত্যি হতে পারে না। আমাদের সে ভাঁওতা দিচ্ছে কি না কি করে বুঝলে?" জিজ্ঞাসা করল সনাতন।

"হরিদা ভাঁওতা দেবার মানুষ নন।"

"বাপের জন্যে রান্না করে মেয়ে মজুরি চাইছে, সেটা কি? ভাঁওতা নয়?"

"হরিদা তো মজুরি চাইতে বলেন নি? তিনি কেবল বলেছেন যে, মজুরি পাওনা হল। চাওয়া না-চাওয়া সেটা বিচার করব আমি।" মাধবের সামনে সরোজিনী নতুনভাবে প্রকাশ হচ্ছে। ওর ছেলেমানুষির মধ্যে মাধব

মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছে দু-চারটে গম্ভীর মুহূর্ত। মাধব তাতে খুশী হয় না, ভয়ই পায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে চৌকাঠের ও-পাশে দাঁড়িয়ে মাধব জিজ্ঞাসা করল, "কি রে, মজুরি দিতে হবে না কি? লুকু দিদি তোর মজুরি পাঠিয়েছে।"

"লুকু দিদি? সে কোথায় বাবা?"

"পাটনা থেকে কাল সে কলকাতায় এসেছে। খবরটা দেবার জন্যে বড়-সাহেব ঘন ঘন বেল টিপছিলেন, আর এদিকে বেঞ্চিতে বসে আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছি।"

"তারপর?" লুকু দিদির খবর জানবার জন্যে হঠাৎ ওর উৎসাহ বাড়ল, "তারপর কি হল বাবা? বর আসে নি? দু-জনার মধ্যে খুব ভাব হয়েছে বুঝি?"

"তা তো হবেই। আমায় কিন্তু ভোলে নি।"

"আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করে নি?"

"করে নি আবার! বিপিন পাল রোডে ঢুকতেই দো-তলার বারান্দা থেকে সে আমায় দেখতে পেয়েছে। ছুটে এসেছে নিচে। এসে জিজ্ঞাসা করেছে, 'কেমন আছ মাধবদা? সরোজিনী কেমন আছে? ভিড়ের গোলমালে বাবার কি অন্যায় হয়েছে! সরোজিনীকে নেমন্তন্ন করতে ভুলে গেছে বাবা। তুমি-ই বা কি রকম মানুষ মাধবদা? বিয়ের দিন সরোজিনীকে কেন তুমি নিয়ে এলে না? চলো, আজ আমি নিজে গিয়ে সরোজিনীকে নিয়ে আসব। পেট ভরে নেমন্তন্ন খাওয়াবো। শীগগির চলো।' আমি তো অবাক?"

"তারপরে কি হল বাবা?"

"সে ছুটে গেল ওপরে। একটু বাদেই আবার ফিরে এল। এসে বললে, এই নাও দু-খানা শাড়ী, সরোজিনীর জন্যে আলাদা করে তুলে রেখেছিলাম। পেটিকোটের কাপড় আছে আড়াই গজ, বিলেতী ভয়েলের ব্লাউজ আছে একটা। ওর গায়ে ফিট করবে কিনা জানি না। আদ্দি আছে দু-গজ। ভেতরের জামাকাপড় ও যেন এ দিয়ে তৈরি করে নেয়। ওর মাপ জোখ তো

আমার জানা নেই। এই দশটা টাকা ওকে দিও। মিষ্টি কিনে যেন ও ভাল করে খায়। চলো, শীগগির চলো'—

'কোথায় ?'

রাস্তায় বেরিয়ে লুকু দিদি বললে, 'মুলেন স্ট্রীটে।'

'মুলেন স্ট্রীটে আবার কেন দিদি ?'

'তুমি জানো না মাধবদা, পল্টুদাও আমার বিয়েতে আসে নি।'

'সে তো দু-হাতে বাপের টাকা ওড়াচ্ছে, আসবার সময় কই তার ?'

'না, না, তুমি জানো না মাধবদা, বাবা ওসব পল্টুদার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করে বেড়াচ্ছে। আমি জানি, পল্টুদা খুবই আঘাত পেয়েছে এ-বিয়েতে। চাকরি করে না বলে বাবা পল্টুদাকে পাত্তাই দিলে না! এস, এই রিক্সাটায় উঠি।"

"তুমি এক সঙ্গেই বসলে বুঝি বাবা ?" জিজ্ঞাসা করল সরোজিনী।

"বসলুম তো—কোলেপিঠে করে আমি-ই তো মানুষ করলুম। আমার আর লজ্জা কি ?"

"তোমার লজ্জা হবে কেন বাবা ? লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল লুকু দিদির। ও-পাড়ার লোকদের বোধ হয় লজ্জা সরম কম।"

সনাতনের পেটের ভাত এর মধ্যেই হজম হয়ে গেছে! কোন্ এক অস্তিত্বহীন স্বর্গরাজ্যের গল্প শুনছিল বলে মনে হল সনাতনের। কোথায় ডব্‌সন রোড আর কোথায় বিপিন পাল রোড! মাধববাবু যাচ্ছেন সেই বিপিন পাল রোড দিয়ে রিক্সায় চেপে! কোথায় যাচ্ছেন তিনি ? মুলেন স্ট্রীটে। মুলেন স্ট্রীট কলকাতায় না বিলেতে সনাতন তা বুঝতে পারল না। এসব নাম শুনলেও ওর মনে থাকে না। মনে রাখিবার মত একটা রাস্তারই নাম জানে সনাতন। সে জানে, জীবন তার সুরু হয়েছিল গড়পার থেকে। গড়পার ওর জন্মস্থান। কেবল জন্মস্থানই।

কিন্তু মুলেন স্ট্রীটে ওর কি আছে ? কিছু নেই। মুলেন স্ট্রীট যদি কলকাতায় না হয়ে বিলেতেই হতো, তাতে ওর কিছু এসে যেত না। হবে

কেন সে সময় নষ্ট করে মাধববাবুর রিক্সা-চড়ার গল্প শুনবে? সনাতনের যেন মনে হল, বিলেতের সেই পুরনো মুলেন স্ট্রীট-টা লম্বা হতে হতে ভারতবর্ষকে প্রদক্ষিণ করে পৌঁছল এসে গড়পার পর্যন্ত। এ-রাস্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূলধন দিয়ে এ-রাস্তার স্থরু—শেষ হয়েছে এসে ক্লাইভ স্ট্রীট পর্যন্ত। সনাতন জানে, আজ আর ক্লাইভ স্ট্রীট নেই, কিন্তু ক্লাইভ রো আছে।

আছে সবই। সাহেব স্থবোদের সাম্রাজ্য ভোল বদলেছে, পরিবর্তন এসেছে কেবল পোশাকটার মধ্যে। গড়পারের রাস্তা এখন অনেক চওড়া। ভাঙ্গা বাড়িটাও আর নেই। সেটা এখন মস্তবড় ম্যানসন। ম্যানসনের তলায় চাপা পড়ে গেছে দত্ত পরিবারটা। তবে আর কেন মুলেন স্ট্রীটের গল্প শোনা? আর কত লম্বা হবে রাস্তাটা? ইংরেজের শাসন শেষ হওয়ার পরে সে-রাস্তাটা কি মরেনি? মাধবদাদের আগ্রহ দেখে সনাতনের মনে হল, রাস্তাটা বুঝি আক্রমণের কৌশল বদলেছে। বদলেছে নিশ্চয়ই, নইলে মাধববাবুর মুখে রিক্সা-চড়ার গল্প এমন সরসভাবে জমে উঠত না।

"আমি চলি। রাত তো কম হয়নি। আপনি এবার খেতে বস্থন।" বললে সনাতন।

"হ্যাঁ, বসছি। তুমি চললে যে? এত তাড়া কিসের?"

"না, তাড়া কিছু নেই।"

"কেন, বই পড়বার তাড়া নেই সনাতনদা?" বাবা ঘরের মধ্যে চলে-গেছে দেখে সরোজিনী-ই আবার বললে, "মান্থষের চেয়ে বই কখনো বড় নয় সনাতনদা।"

"না, তা নয়।" কোন কিছুই আজ আর সে অস্বীকার করবে না বলে ঠিক করেছে।

"তবে তুমি উঠে যাচ্ছিলে কেন?" সরোজিনীর মধ্যে বোধ হয় মুলেন স্ট্রীটের উত্তাপ জমে উঠছে। উঠছে ঠিকই, কিন্তু উঠছে লুকু দিদির উল্টো দিক থেকে। মুলেন স্ট্রীটে বড়সাহেবের মেয়ে তার স্বামীকে ঠকাচ্ছে মনে করেই

সরোজিনী যেন সনাতনের কাছে তার নিজের বক্তব্য খাঁটি করে তুলতে চাইছে। লুকু দিদির পাপ সে তার নিজের পুণ্য দিয়ে ক্ষালন করে দিতে চায়। শাড়ী ও ব্লাউজের কথা তাই সে ভুলে গেল অবলীলাক্রমে।

একটু পরেই মাধব এসে বসল ভাত খেতে। সরোজিনী থালার ওপর ভাত ও তরকারি সাজিয়ে থালাটা রাখল মাধবের সামনে। গেলাস থেকে একটু জল নিয়ে আগেই সে থালা রাখবার জায়গাটা নিকিয়ে দিয়েছে। এই অভ্যাসটা ওর মার কাছ থেকে শেখা। ও জানে, মাটিতে রেখে কেউ ভাত খায় না। তবুও সে এই নিয়মটা চালু রেখেছে আজো। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গেলে যার কোন মানে পাওয়া যায় না, শ্রদ্ধা দিয়ে বুঝতে গেলে তারই মানেটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে সরোজিনীর কাছে। খাবারের চেয়ে বড় বস্তু সংসারে দ্বিতীয় কিছু নেই। নেই বলেই বস্তু-জগতের ভক্তি-কাব্য সরোজিনী সৃষ্টি করে ভাতের থালার নিচে, নিষ্ঠার স্বাতন্ত্র্য দিয়ে।

মাধব ভাত মুখে দিয়ে বলল, "শাড়ী দু-খানা খুবই দামী।" "ঘুষের জিনিস একটু দামী না হলে চলবে কেন বাবা?" ফস্ করে বলে বসল সরোজিনী। কথার ধাক্কা খেয়ে সনাতনও যেন একটু সচেতন হয়ে উঠল।

"ঘুষ? আমি তো সারা জীবনে একটা পয়সাও ঘুষ খাইনি মা?" সরোজিনীর কথায় ব্যথা পেল মাধব।

"ওটা লুকু দিদি তোমায় ঘুষ দিয়েছে বাবা, তুমি বুঝতে পারো নি।"

"তুই বুঝিয়ে দে।"

"মুলেন স্ট্রীটে নিয়ে যাবার জন্যে সে তোমায় ঘুষ দিয়েছে।"

"সম্ভব, খুবই সম্ভব।" মাথা নেড়ে সায় দিল মাধব।

"তা হলে শাড়ী দুটো কালই তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

জবাব না দিয়ে মাধব এক ঢোঁক জল খেলো।

"বড্ড বেশি ঝাল লাগছে, লঙ্কাবাটা বোধ হয় বেশি পড়েছে।" লঙ্কার ঝাল না সরোজিনীর মুখের ঝাল, সেটা বুঝতে গিয়ে তার খাওয়া প্রায় শেষ করে ফেলল। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল মাধব পিওন।

"জয়গোবিন্দর ঘরের পাশ দিয়ে আসবার সময়, শুনলুম ছেলেটা খুব কাশছে। ব্যাপার কি রে সরোজিনী ?"

"ওর গলা দিয়ে রক্ত উঠছে বাবা।"

"রক্ত !" সনাতন একেবারে সোজা সটান দাঁড়িয়ে পড়ল, "রক্ত ? কই আমি তো কিছু দেখিনি ?"

"আমি দেখেছি।"

"কি রকম রক্ত ?" জিজ্ঞাসা করল সনাতন।

"ডাক্তার ছাড়া তা কেউ বলতে পারবে না।"

মাধব জিজ্ঞাসা করল, "সন্ধ্যের দিকে জ্বরটর কিছু হয় না কি ?"

"হয়।" বললে সরোজিনী।

সনাতন ভয় পেয়েছে। সে মাধবের দিকে চেয়ে বলল, "এসব রোগী এখান থেকে সরিয়ে ফেলা ভাল।"

"তুমি ঠিকই বলেছ সনাতন। তা ছাড়া, ওসব রোগীর এত কাছাকাছি তোমার নিজেরও থাকা উচিত নয়। বড্ড ছোঁয়াচে রোগ। হ্যাঁরে সরোজিনী, বত্রিশ নম্বরের সতীশবাবুরা নাকি চলে যাচ্ছে ?"

"যেতে পারে।"

"কবে যাবে ?" জিজ্ঞাসা করল সনাতন।

"ক্লাইভ স্ট্রীটের কোথায় যেন তার বাহাত্তর টাকা আট আনা কমিশন পাওনা আছে, সেটা পেলে আর যাবে না।"

"তার মানে ?"

"সেই টাকাটা পেলে ঘরের ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে পারবে সতীশবাবু। বৌদির তো আজ কদিন থেকে চোখে ঘুম নেই।"

"তা হলে—"মাধব দৃষ্টি দিল তার নিজের ঘরের দিকে, "তা হলে সনাতনের খুবই সাবধান থাকতে হবে।"

সরোজিনী পাঁচ নম্বরের দিকে চেয়ে বললে, "অসুখটা সনাতনদার ঘরে

তো সোজাসুজি গিয়ে উঠতে পারবে না বাবা? পাঁচ নম্বরটা রয়েছে তার আগে—সেটাকে ডিঙিয়ে যেতে হবে।"

"পাঁচ নম্বর নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। তুই নিজেই তো সেদিন মিটিং-এ ঠিক করলি যে, এখানে ভজহরির মত ভদ্রলোকেরা কেউ থাকতে পারবে না?"

"ভদ্রলোকেরা যদি আমাদের অপমান করে, তা হলে কেন আমরা ওদের এখানে জায়গা দেব? ওরা দো-তলায় গিয়েই থাক।"

"কিন্তু তুলেই বা দিবি কি করে? সে তো ভাড়া দিয়ে থাকে?"

"আমরা সবাই যাদ একদল হয়ে যাই, তবে সে এখানে থাকতে পারবে না—একটা না হয় দশটা করে মিটিং আমরা করব প্রতি মাসে। ক-মাস সে এখানে টিকতে পারবে?" সরোজিনী কথাটা শেষ করল সনাতনের দিকে চেয়ে।

ব্যাপারটা আবার জটিল হয়ে যাচ্ছে মনে করেই মাধব বলল, "পাঁচ নম্বরে যা হয় হোক গিয়ে, ভজহরির সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি না।" সনাতন ডাউনের দিকে তখন চলে গেছে খানিকটা। চলে গেছে মনে করেই মাধব একটু নিচু স্বরে বললে, "ওকে এখান থেকে তুলে দিতে হলে সব ধার আমায় শোধ দিয়ে দিতে হবে।" কথাটা শুনতে পেয়ে সনাতন একটু দূরেই ঘুরে দাঁড়াল। সরোজিনী বলল, "ধার তার সব শোধ করে দাও বাবা।"

সনাতন এগিয়ে এল দু-পা আপের দিকে।

"শোধ?—সে যে এখন অনেক টাকা পাবে রে! প্রায় এক-শ কুড়ি টাকা হয়ে গেছে!"

সনাতন দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল সরু রাস্তা দিয়ে, ডাউনের দিকে।

পরের দিন মাধব অফিসে যাওয়ার পরে, সরোজিনী দরজা বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়ল। ঘুমবার জন্য নয়, বই পড়বার জন্যে। সনাতনের বইগুলো সে মাধবের টিনের বাক্সের ওপর সাজিয়ে রেখে দেয়। সবাই দেখতে পায় সেই

বইগুলো। কিন্তু একখানা বই সে বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল দু-দিন আগে। দুপুরবেলা একটু একটু করে বইখানা সে প্রায় পড়া শেষ করে এনেছে। সরোজিনী লুকিয়ে লুকিয়ে উপন্যাস পড়ছে। কেন যে সে লুকিয়ে লুকিয়ে উপন্যাস পড়ে তার কারণ সরোজিনী আজও ধরতে পারে নি। উপন্যাসখানা সে এনেছে সতীশবাবুর স্ত্রী রেণু বৌদির কাছ থেকে।

চিত হয়ে শুয়ে আজও সে উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করল। অনেক ঘটনা এবং অনেক কান্নাকাটির ধাক্কা সামলে নায়িকা প্রায় নায়কের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে! আঁচল দিয়ে সরোজিনী এরই মধ্যে বার পাঁচেক চোখের জল মুছে ফেলেছে। নায়িকার সঙ্গে সঙ্গে সরোজিনীও কাঁদছে। কেন কাঁদছে সরোজিনী? নায়কটি তো ভদ্রলোক! মাথার ওপরে তার বাবা আছে, বাড়িঘর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাকা বাড়ি এবং দো-তলা। রুজি রোজগারের ঝামেলা নেই—কোথা থেকে যে টাকা আসছে নায়িকা তা জানে না, অতএব সরোজিনীও জানে না।. নায়িকার ওসব জানবারই, বা দরকার কি? আর জানতে চাইলেই বা সে জানবে কি করে? বই তো প্রায় শেষ হয়ে এল! বাকী পাতা কটা আজ আর সে পড়বে না। বুকের ওপর সে ফেলে রাখল খোলা বইখানা। কাল আবার নূতন করে কাঁদবার সুযোগ পাবে সরোজিনী।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সে। বইখানা বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখে সে এসে দাঁড়াল সরু রাস্তাটির ওপর। অফিসে যারা কাজ করে তারা সবাই চলে গেছে। ভুজঙ্গের বৌ আট নম্বরে বসে মুড়ি ভাজছে। যাবে না কি একবার ডাউনের দিকে? আট নম্বর থেকে পাঁচ নম্বরের দূরত্ব বেশি নয়। সাতদিন তো হল সরোজিনী ওদিক পানে যায় নি।

হাঁটতে হাঁটতে সে আট নম্বর পার হয়ে গেল, পার হল সাত নম্বরও। সনাতনের ঘরের দরজায় মস্ত বড় একটা তালা ঝুলছে। তার পাশেই ভজহরির ঘর। ঘরের দরজাটা তার প্রতিদিনকার মত আজো নারকোলের দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে। দড়িটা খুলে ফেলল সরোজিনী।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে এসে দাঁড়াল খাটিয়ার পাশে। চারদিকে চেয়ে দেখল, ঘরের কোথাও কিছু পরিবর্তন হয় নি। তানপুরাটা বেড়ার গায়ে যেমন হেলান দেওয়া ছিল তেমনি আছে। হরিদা নিশ্চয়ই গত সাত দিনের মধ্যে তানপুরায় হাত দেয় নি। গান গায় নি একদিনও। গান সরোজিনীকে টানে। গানের কথাটা ভাবতে গিয়ে ওর মনটা একটু ভিজে উঠল। উপন্যাসের নায়িকার মত ওর যেন কাঁদতেও ইচ্ছে করল। কেন সে হরিদাকে নিয়ে বিপিন পাল রোডে গেল? যাওয়ার জন্যে অবিশ্যি এমন কিছু অপরাধ হয় নি, অপরাধ হয়েছে হরিদা দো-তলায় উঠল বলে। মেয়েটা কে? ঐ যে-মেয়েটা হরিদাকে ডেকে নিয়ে নিয়ে গেল দো-তলায় সে মেয়েটাকে হরিদা নিশ্চয়ই ভালবাসে। ভাল না বাসলে অমন আদেখ্‌লের মত হরিদা ছুটে গেল কেন? আর গেলই যদি ফিরে আসতে তার এত দেরি হল যে? সরোজিনী সেদিন বিপিন পাল রোড থেকে ফিরে এসে সমস্তটা দিন চোখ রেখেছিল পাঁচ নম্বরের ওপর। দিন কেটে গেল, সন্ধ্যে হল। সন্ধ্যেও পার হয়ে গেল, হরিদা কই? রাতের রান্না চাপিয়ে দিয়ে সে মাঝে মাঝে গিয়ে আট নম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখে এসেছে, তখনও হরিদা ঘরে ফেরে নি। রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত সরোজিনী ছটফট করেছে খবর আনবার জন্যে হরিদা ফিরল কিনা। ফিরল সে অনেক রাত্রে। এগারোটারও বেশি রাত। মা গো, মেয়েটা প্রায় বারো ঘণ্টা হরিদাকে ধরে রেখেছিল সেদিন!

খাটিয়ার ওপর বসে পড়ল সরোজিনী। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার পরেও, ভজহরির ঘরখানা ওর কাছে খারাপ লাগে না। খারাপ তো দূরের কথা, এই ঘরটার মধ্যে সরোজিনীর স্বাস্থ্যে যেন জোর আসে, জোর আসে মনেও।

হঠাৎ সরোজিনীর মনে পড়ল, সে এখানে এসেছিল হরিদার সেই আসল ঐশ্বর্যটির খবর নিতে। কি যেন সেই ঐশ্বর্যটি? ও, হ্যাঁ—সেই ইস্ত্রিকরা পাঞ্জাবিটা। সরোজিনী তোশকটা আলগা করে দেখল যে, পাঞ্জাবিটা সেখানেই আছে। মেয়েটির সঙ্গে তা হলে হরিদা দেখা করতে যায় নি! ওপাড়ায় গেলে, সরোজিনীর বিশ্বাস, ভজহরি নিশ্চয়ই ইস্ত্রিকরা পাঞ্জাবি

পরেই যাবে। তা হলে কি সে হরিদার ওপর অন্যায় করল? হ্যাঁ, অন্যায় সে করেছে। অন্যায় করেছে ভেবে সরোজিনী ভজহরির বালিশের ওপর মুখ ঢাকল। একটু আগেই সে উপন্যাস থেকে কান্নার মালমসলা সব সঙ্গে করেই এনেছিল। এখন সে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে আরম্ভ করল। হরিদা না জানি কত ব্যথাই না পেয়েছে! কেমন করে সে এখন তার কাছে ক্ষমা চাইবে? কখন তার সঙ্গে দেখা হবে ওর? রাত্রে মাত্র কয়েক ঘণ্টাই সে থাকে এই বস্তিতে, অথচ সরোজিনীর যেন ধারণা, হরিদা চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে আছে! মানুষটার অনুপস্থিতিতে এমন করে তার অস্তিত্বটাকে খাড়া করে ধরে রাখে কে?

লজ্জা পেল সরোজিনী। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে সে তানপুরাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারের ফাঁকে আঙল ঢুকিয়ে একটু আওয়াজ তুলতে গিয়েই, বাইরে থেকে একটা বড় আওয়াজ এসে সরোজিনীকে নিমেষের মধ্যে চঞ্চল করে তুলল। রাস্তা দিয়ে কে যেন আসছে। কার পা-এর শব্দ ওটা? সনাতনদা নয় তো? ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল সরোজিনীর! কাজটা ভাল হয় নি। সনাতনদার সঙ্গে বিয়ে যখন এক রকম পাকাপাকি হয়েই গেছে তখন হরিদার ঘরে এমন করে ঢোকা তার খুবই অন্যায় হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা যা ইচ্ছে তা করতে পারে, কিন্তু মাধব পিওনের মেয়ে তো যা তা করতে পারে না! তা ছাড়া ওসব পাড়ায় লুকু দিদিরা নিয়ম-কানুন মানে না বলে সরোজিনী কেন তার নিজের নিয়ম ভাঙতে গেল? ওদের টাকাপয়সা আছে, আর কিছু না থাকলেও চলে। সরোজিনীদের টাকাপয়সা নেই, কিন্তু আর সব কিছু থাকতেই হবে। এই জন্যেই বোধ হয় হরিদা বলে, বস্তির লোকেরা কেউ গরীব নয়। মাঁ গো, লোকটা কী হেঁয়ালি করেই না কথাবার্তা কয়!

পায়ের শব্দ এবার ঘরের কাছে এগিয়ে আসছে। বরফের মত জমে গেল সরোজিনী। নাকের নিশ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছে সে। তানপুরাটা সে এক রকম দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গেল। ধরলও। তানপুরা ওকে রক্ষা

করতে পারলে না। ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল চন্দ্রনাথ দুবে। খোলবার সঙ্গে সঙ্গে সর্দার ডাকল, "ভজুয়া, কা ভইলবারে ভজুয়া—তুম্ ?"

তানপুরাটা তখনও সরোজিনীর আলিঙ্গনাবদ্ধ, তারের গায়ে সুরের রেশ! সরোজিনীর চোখ দিয়ে হঠাৎ-আতঙ্ক গলে গলে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এমন দৃশ্য দেখবে বলে চন্দ্রনাথ দুবে কল্পনা করে নি। কল্পনা করেনি সরোজিনী যে, এমন দৃশ্য সে দেখাতে পারে! সর্দারের দুঃখ, তার ভজুয়া আজ এখানে উপস্থিত নেই।

সরোজিনীকে দু-বাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে সর্দার জিজ্ঞাসা করল, "রোতী কিঁউ ? তুম্ সে ভজুয়াকো হাম শাদি দেগা—ভজুয়া মেরা বেটা হ্যায়।"

"দুস্‌রে সে মেরি শাদি ঠিক হুয়া সর্দার।" বলল সরোজিনী।

"উ শাদি ঝুটা হায়। জিস্‌কো সাথ মহব্বত হুয়া, উস্‌কো সাথই শাদি হোগা। ধরম তো পানি সে আতা নেহি, আতা নেহি আসমান সে। ধরম আতা হায় মহব্বত সে। বেটি, ডর মত করো। ভজুয়া কাঁহা হ্যায় ?"

"কেন সর্দার, সে তো সকালবেলায়ই কাজে বেরিয়ে গেছে।"

"দো রোজ সে ভজুয়া আতা নেহি।"

"সে কি সর্দার ?"

"কোই দুস্‌রা জাগামে ভজুয়া যাতা ?"

চুপ করে রইল সরোজিনী। কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। বালিগঞ্জের নতুন ঠিকানার কথা উল্লেখ করলে সর্দার হয়তো দুঃখই পাবে। দুঃখ পাবে এই জন্যে যে, হরিদা চিরদিনই হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকবে না। পড়ে থাকবার মত মানুষ সে নয়, সরোজিনী তা বুঝতে পেরেছে। সর্দার বোধ হয় আজো তা বুঝতে পারে নি। ভালবাসার আগুনে সরোজিনী তার নিজের মনটাকে পুড়িয়েছে, সর্দারও একদিন পুড়বে। প্ল্যাটফর্ম থেকে হরিদা একদিন আলাদা হয়ে যাবেই। যাবে ডব্‌সন রোডের এই বস্তি থেকেও। একটা উপসংহারে পৌঁছল ভেবেই সরোজিনী বলল, "বালিগঞ্জমে কভি কভি যাতা হ্যায়।"

"পহেলি সে মেরা মালুম হুয়া ষ্টিশনকা টিকযুমমে ভজুয়া রহেগা নেহি। উস্‌কো দুনিয়া ঝুটা হায়।"

কার দুনিয়া ঝুটা? মধ্যবিত্তের দুনিয়া? সরোজিনী কি? এই বস্তিটায় কে থাকে? শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে কারা? র মধ্যবিত্তরা নয়? ঝুটা কথাটার আওয়াজ সরোজিনীর কানে যেন খুব জোরে একটা ধাক্কা মারল আজ। আওয়াজটা ওর ভাল লাগে নি। সর্দার তার আলিঙ্গন থেকে খালাস করে দিল সরোজিনীকে। সর্দার চলে গেল জুতোয় আওয়াজ করতে করতে। কাঁচা চামড়ার জুতো, জুতোর তলায় লোহার নাল বাঁধা আছে। নালের শব্দটা সরোজিনীর কানে এসে আঘাত করতে লাগল অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

সরোজিনী বাইরে এসে দাঁড়াল। দরজাটা নারকোলের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল সে। হরিদার ঐশ্বর্য চুরি করে নিতে পারে, তেমন চোর বস্তি-অঞ্চলে নেই ভেবে সরোজিনী হাঁটতে লাগল বত্রিশ নম্বরের দিকে। বৌদির সঙ্গে দু-দশ মিনিট বসে গল্প করবে আজ। ভুজঙ্গের বৌ তো এখনও বসে মুড়ি ভেজে চলেছে। মুড়ি না ভাজলেও, সরোজিনী আসে না ভুজঙ্গর ঘরে তার বৌর সঙ্গে গল্প করতে। আসলে তার রেণু বৌদিকেই ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে, তা সে জানে না। ভাল লাগা না-লাগা নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার। অতএব সে কারু কাছেই জবাবদিহি করবে না।

পাঁচ নম্বর থেকে বত্রিশ নম্বর পর্যন্ত হেঁটে আসতে অনেকটা সময় লাগল সরোজিনীর। পায়ের গতি কমে এসেছে অনেক। দেহটাও যেন আজ কদিন থেকে ভারী-ভারী ঠেকছে। হঠাৎ ওর গায়ে মাংস গজাল নাকি? দু-সংসারের রান্না এক সঙ্গে হচ্ছে বলে খাবারের পরিমাণ খানিকটা বেড়েছে বটে, কিন্তু তাতে তো এত তাড়াতাড়ি মাংস বাড়ার কথা নয়। তবুও সরোজিনী বাড়ছে।

বত্রিশ নম্বরের সামনে এসে সে ডাকল, "বৌদি, আছেন না কি?"

"এস, ভেতরে এস।"

"সতীশবাবু ঘরে নেই বৌদি। সেদিন বললে, ভজহরি তোমায় ভালবাসে ?

"থাকলেই বা তোমার ভয় কি ?"

করলে সতীশবাবুর বৌ। কিন্তু ভালবাসলেই কি পাওয়া

"আমার কোন ভয় নেই বৌদি, আপনাদের যদি অ—

"সব অসুবিধের মধ্যেও তোমার জন্যে জায়গা থাকবে ভাই। রেখে সবটুকু দিতে

রেণু বৌদি সরোজিনীর হাত ধরল। সরোজিনী,

ভেতরে গিয়ে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা বৌদি, আপনারা শুনলুম একদিন বড়লোক ছিলেন ?"

"হ্যাঁ, ওঁর হাতে অনেক টাকাই ছিল। বাড়িও একটা ছিল।"

"খুব বড় বাড়ি নিশ্চয়ই ? দো-তলা ?"

"দো-তলা। আমরা থাকতুম দো-তলায়। এক-তলায় উনি ভাড়াটে বসিয়েছিলেন।"

"কষ্ট হয় না বৌদি ?"

"হয়। কিন্তু উপায় তো কিছু নেই ভাই।" এই বলে সতীশবাবুর স্ত্রী একটু হাসল।

রেণু বৌদির মুখে হাসি দেখলে সরোজিনীর রাগ হয় খুব। দো-তলা থেকে নেমে এসে মানুষ আবার অমন করে হাসতে পারে না কি ? সরোজিনী আজ তাই সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এমন একটা ভাঙ্গা বস্তিতে বসে আপনি হাসেন কি করে বৌদি ?"

"তুমি কি করে হাসো সরোজিনী ?"

"আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

"তোমার কাছ থেকেই বোধ হয় অভ্যেসটা আমি পেয়েছি ভাই।"

রেণু বৌদির কথা শুনে সরোজিনী চুপ করে রইল। ঘরের এক কোণায় একটু জায়গা করে সতীশবাবুর স্ত্রী একখানা মূর্তি বসিয়েছেন। মূর্তির সামনে একটা ছোট্ট রেকাবি। একটা ফুল আর দুটো বাতাসা পড়ে রয়েছে তাতে। মা বেঁচে থাকতে, তিনিও ঘরের মধ্যে জায়গা করে লক্ষ্মীর মূর্তি বসিয়েছিলেন।

...পাঠ করতেন। সরোজিনীর কখনো সন্ধ্যের সময় বাইরে থাকত না। পদ্য-পড়া শেষ হয়ে গেলে, মা বলতেন হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি করে ছুটে আসত সরোজিনী। ...তি লক্ষ্মীর দিকে, মা রেকাবি থেকে সন্দেশ দিতেন সরোজিনীর প্রসাদ বলে সন্দেশসুদ্ধু হাতটা একবার সে কপালে ঠেকিয়ে গপাৎ সন্দেশটা সব খেয়ে ফেলত। বাইরে কোথাও সন্দেশ খাবাব সময় তাকে কপালে কখনো হাত ঠেকাতে হয নি। মা মারা যাবার পরে পূজো-আচা সব উঠে গেছে। বাবো ঘণ্টা কাজ করবার পরে বাবার তো গলা দিযে পদ্য পড়বার স্থর বেরয় না।

"আচ্ছা বৌদি, আপনার তো লক্ষ্মী দেবীর ওপর খুবই রাগ হওয়ার কথা।"

"কেন?" জিজ্ঞাসা করল সতীশবাবুর স্ত্রী।

"টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘর সবই তো তিনি দিয়ে আবার নিয়ে গেলেন।"

"তিনি দেন বটে, কিন্তু রাখবার ভার তো আমাদেব ভাই। উনি যদি সব পয়সা উড়িয়ে দেন, তা হলে দোষ কার বলো?"

"সেই জন্যে আবার বুঝি বাড়ি ঘর সব ফিবে পাবেন বলে লক্ষ্মী পূজো করছেন? পূজো করলে কি সব কিছু পাওযা যায় বৌদি?"

"কিছু পাওয়ার জন্যে আমি পূজো করি না"

"তবে?"

"পূজো করি ভক্তির জন্যে। জীবনেব সব সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সাজিয়ে দিই রেকাবির ওপবে।"

"ভুলে থাকবাব জন্যে বুঝি?" জিজ্ঞাসা করল সরোজিনী।

"উদ্দেশ্য নিযে পূজো করতে বসি না ভাই। মন ডুবিয়ে পূজো করতে বসলে ভুলে যাই সব কিছু।"

"এবার থেকে আমিও তা হলে পূজো করব। আমার আর সময় কাটছে না বৌদি।"

"সে কি কথা? এই যে সেদিন বললে, ভজহরি তোমায় ভালবাসে? আরও কত কি সব বললে না?"

"ঠিকই বলেছি, মিথ্যে কিছু বলি নি। কিন্তু ভালবাসলেই কি পাওয়া যায়?"

"যায়।" বলল সতীশবাবুর স্ত্রী, "হাতে যদি কিছু না রেখে সবটুকু দিতে পারো, মনের শান্তি তোমার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সরোজিনী, আমার মাথার ওপর দিয়ে কত বড় ঝড়ই না বয়ে গেল! তারপরে কি করলুম জানো?"

"না তো?"

"ভগবানের পায়ে নিবেদন করে দিলুম নিজেকে। সর্তহীন নিবেদন। সেই থেকে আমার মনের শান্তি কেউ কেড়ে নিতে পারে নি। সেদিনের সেই কাবুলীওয়ালাগুলোও আমায় মুহূর্তের জন্যে বিচলিত করে নি।"

"কথাগুলো বড্ড শক্ত লাগছে বৌদি। কাজটা যে আরও কত বেশি শক্ত তা আমি আন্দাজ করতে পারি। বাবার সঙ্গে কালই আমি কালীঘাট যাব। আমি নিজে বেছে বেছে আমার পছন্দমত মূর্তি কিনে আনব। কি মূর্তি কিনব? সরস্বতী। আজকাল তো আমার অনেক শাড়ী! একটা নতুন শাড়ী কেটে মুর্তির জন্যে তৈরি করব ছোট একটা কাপড়। নীল রংয়ের শাড়ীতে কি পাড় মানাবে বৌদি? সোনার পাড়। হাত খানেক সোনার পাড় আপনার কাছে পাওয়া যাবে না?"

"সে সব আর কিছু নেই ভাই।"

"থাক দরকার হবে না।"

"যে-কোন রকমের পাড় পেলেই সরস্বতী খুশী হবেন।"

"কি করে বুঝব খুশী হবেন কিনা? যদি না হন?"

"খুশী হওয়া না হওয়া নির্ভর করবে তোমার ভক্তির ওপর, পাড়ের ওপর নয়।"

"তা হলে লুকু দিদির সেই ঢাকাই বুটিদার শাড়ী থেকে পাড় আমি কেটে

নেব। কিন্তু—" অসহায় ভাবে সরোজিনী চাইল লক্ষ্মী মূর্তির দিকে, "কিন্তু গোটা শাড়ীটাই তো আমি দিতে চাই বৌদি! শাড়ী দিয়ে আমি কি করব? আমার কি দরকার ভাল শাড়ীর? আমি যে হঠাৎ কেমন বুড়ীয়ে গেছি— এই রে সতীশবাবু এসেছেন!"

সরোজিনী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে রইল একটু। সতীশবাবু রাস্তাটা যেন জুড়ে রয়েছে। পথ দিচ্ছে না সরোজিনীকে। হাঁ করে চেয়ে রইল মাধব পিওনের মেয়ের দিকে। সরোজিনী ধমকে উঠল, "রাস্তা ছাড়ুন। বুড়ো হয়েছেন, লজ্জা করে না?"

ঠেলা গাড়ির ওপর শুয়েছিল ছট্টু। সরোজিনীর ধমক শুনে ছট্টু উঠে বসল। ওখানে বসেই সে জিজ্ঞাসা করল, "কা হুয়া সরোজিনী?" ছট্টুর গলার স্বরে গর্জন! সম্ভবত ছট্টুর গর্জন শুনেই সতীশবাবু তাড়াতাড়ি করে রাস্তা ছেড়ে দিল। সামনের দিকে এগিয়ে আসতেই সে দেখতে পেল, ছট্টু বত্রিশ নম্বরের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। সতীশবাবুর ঘাড়টা মটকে দেবার জন্যে ডান হাতটা ওর উদ্যত হয়ে উঠেছে।

"থাক, তোমায় আর যেতে হবে না।" বললে সরোজিনী।

"কাহে? কাহে নেহি যায়গা? সতীশবাবু বদমাস হায়।"

"ঠিক হায়। পুরুষমানুষরা আবার ভাল হল কবে থেকে ছট্টুবাবু?"

ছট্টু তবু যাবার জন্যে ছটফট করতে লাগল। সে বললে, "সরজিনী, সতীশ-বাবু সে হাম্ লড়েঙ্গে। এক তামেচা মারকে হাম উস্‌কো গর্দান টুট্ দেগা।"

ছট্টুর কথা শুনে সরোজিনী মনে মনে খুশী হল। যে-পুরুষ মেয়েদের হয়ে লড়তে পারে না, তাকে ওর ভাল লাগে না। হরিদা কেন সনাতনের সঙ্গে যুদ্ধ করে না? বাবা যে সনাতনের সঙ্গে ওর বিয়ে সব পাকাপাকি করে ফেলেছে সে খবর তো হরিদার জানাই আছে। তবে কেন হরিদা চুপ করে সব দেখে যাচ্ছে? ছট্টুর মতো সেও তো পারে ওর হয়ে লড়াই করতে? ছট্টু হিন্দুস্থানী বলে মানুষের গর্দান ভাঙ্গতে যায়, কিন্তু হরিদা বাঙালী হয়ে পারে না কেন বিয়েটা ভেঙ্গে দিতে?

ছট্টু এগিয়ে যাচ্ছে দেখে সরোজিনী পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, “সতীশবাবু আমাদের বস্তির লোক, তার গায়ে তুমি হাত দিতে পারবে না।”

“মেরা রুপেয়া মাঙ্‌নে যাতা হ্যায় হাম।”

“রুপেয়া?” সরোজিনী যেন আকাশ থেকে পড়ল!

“হাঁ রুপেয়া! হাম্‌সে পাঁচ রুপেয়া লিয়া সতীশবাবু দো-মাহিনা আগে। বোলাথা এতোয়ার মে দে দেগা। লেকীন কিত্‌না এতোয়ার আতে যাতে, সতীশবাবু রুপেয়া দেতা নেহি। সরুজিনী, দো-রোজ সে হাম এক পয়সা কামায়া নেহি। ঘরমে বাচ্চা লোগ কেয়া খায়েগা?”

“গর্দান টুট্‌ নে সে রুপেয়া আয়েগা নেহি ছট্টু। আও মেরি সাথ। হাম দশ রুপেয়া ধার দেগা, তোম্‌কো ঘর মে ভেজ্‌ দেও।”

যে হাতটা ছট্টুর বত্রিশ নম্বরের দিকে ছুটে যাচ্ছিল সতীশবাবুর ঘাড় ধরবার জন্যে, সেই হাতটাই নেমে পড়ল সরোজিনীর মাথায়। ছট্টু তার নিজের মাথা নিচু করে বললে, “তুম্‌ মেরা বেটি হ্যায় সরুজিনী!”

বাড়িওয়ালাবাবুর ম্যানেজার এলেন রবিবার দিন সকালে। এলেন তিনি প্রথমে সনাতনের ঘরে। কি সব কথাবার্তা হল দু-জনে মিলে ভজহরি তা বুঝতে পারল না। আজ সে সকালে কাজে যায় নি। সমস্ত রাত বসেছিল জয়গোবিন্দর বিছানার পাশে। টাকা পয়সা যোগাড় হয়ে ওঠে নি বলে জয়গোবিন্দকে নিয়ে সে আজও কোন ডাক্তারের কাছে যেতে পারে নি। বুকের ফোটো তুলতে যোলো টাকা লাগবে। ডাক্তারকে তাঁর মজুরি দিতে হবে আলাদা। এই সব খবর জানবার জন্যে ভজহরি সাইনবোর্ড পড়ে পড়ে অনেকগুলো ডাক্তারখানা ঘুরে এসেছে। কথা বলে এসেছে ডাক্তারদের সঙ্গে। দু-দিন তাই সে কাজে যেতে পারে নি। একটা দিন তো সে হাসপাতালে গিয়ে বসেছিল। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে কলেজ স্ট্রীটের ঠিকানা বার করতে ভজহরি দু-বার ভুল ট্রামে উঠে বসেছিল। কতকগুলো পয়সা অনর্থক নষ্ট হয়েছে ওর। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে গিয়েও কোন সুবিধে করে উঠতে

পারে নি। কোন খবরই সে আনতে পারল না। তবে এইটুকু সে বুঝে এসেছে যে, গোটা পঞ্চাশ টাকা হাতে না নিয়ে জয়গোবিন্দকে কোন ডাক্তারের কাছে নেওয়া চলবে না। শালখের ডাক্তার কুণ্ডু বলেছেন যে, শ-খানেক টাকায় তিনি কনট্রাক্ট নিতে পারেন। কনট্রাক্ট মানে, অসুখ সারিয়ে দেবার কনট্রাক্ট নয়, বুকের ফোটো তোলা থেকে হাসপাতালে ভর্তি করা পর্যন্ত সবই তিনি করবেন। তাঁকে হাসপাতালে ছোটাছুটি করতে হবে, ধরাধরি করতে হবে কত বড় বড় লোক। অতএব, এক-শ টাকার কমে তিনি কেমন করেই বা এতবড় একটা সাংঘাতিক রোগী হাতে নেবেন ?

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভজহরি দাঁতন করছিল। ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে সনাতন যাচ্ছিল আপের দিকে, বোধ হয় মাধব পিওনের কাছে। দরজায় তালা লাগিয়ে বাঁ দিকে চাইতেই সনাতন ভজহরিকে দেখতে পেল। সে জিজ্ঞাসা করল, "হরিভাই, কাজে যাও নি ?"

"না। ডাউন ট্রেনগুলোকে আজ ছেড়ে দিতেই হল।"

"কেন ?" সনাতন প্রশ্ন করল চার নম্বরের দিকে চেয়ে।

"জয়গোবিন্দর অসুখ, তাই আমায় রাত জাগতে হয়েছে।"

"অসুখ ? কি অসুখ ?"

"এখনও কিছু সঠিক করে বলা যাচ্ছে না। আচ্ছা সনাতনদা, তোমাব কোন চেনাপরিচিত ডাক্তার নেই ?"

"সে তো আমাদের কারখানার ডাক্তার—শ্রমিকদের জন্যে বাঁধা-মাইনেব বিলেত-ফেরত ডাক্তার। জয়গোবিন্দকে তিনি দেখবেন কেন ? তা ছাড়া, আমি তো কারখানার মালিক নই ভজহরি। কিন্তু অসুখটা কি ? মানে কি কি উপসর্গ দেখতে পাচ্ছো ?"

ভজহরি তার দাঁতনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সামনের ঐ খোলা নর্দমাটায়। দিয়ে বললে, "জ্বর আছে, কাশিও খুব। বুকের মধ্যে কি রকম একটা শব্দ হয় ঘড় ঘড় করে। কাল রাত্তিরে আমি জয়গোবিন্দর বুকে কান রেখে শুনেছি।"

"করেছ কি ভজহরি? ওসব ফুসফুসের ব্যারাম, অতটা কাছে বোধ হয় না যাওয়াই ভাল।"

"না গেলেই বা জয়গোবিন্দকে দেখবে কে? তোমার মত ওদের তো আর সঙ্ঘ নাই।"

"যারা ফুল বেচে, তাদের মধ্যে একটা ইউনিয়ন থাকা উচিত।" একটু মোড়লি চালে কথাটা বলল সনাতন।

"উচিত, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। আগেকার দিনের মত আত্মীয়-স্বজনদের কাছে হাত পাতাও চলে না। বিপদে আপদে জমিদারদের কাছেও হাত পাতা চলতো, কিন্তু তাঁরাও তো কেউ নেই। আচ্ছা সনাতনদা, তোমাদের কলকাতায় এত লোক আছে, অথচ কেউ কারো আত্মীয় নয়। এখানে কি আত্মীয় বলে কোন লোক থাকে না?"

"থাকে, কিন্তু লুকিয়ে।"

"কেন সনাতনদা?"

"পুরনো নিয়ম কেউ আর মানতে চায় না। কেন মানবে বলো? যদি মানতো, তবে আমাদের সংসারটা অমন করে ভেঙ্গে পড়ত না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খুন করে আমার দাদা আন্দামান গেলেন। আমরা কাউকে খুন করি নি, অথচ সমাজ, রাষ্ট্র এবং আত্মীয়স্বজনেরা আমাদের খুন করলেন! আমরা ভেসে গেলাম নর্দমা দিয়ে।"

ভজহরি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ আর সে কোন কিছুই বলতে পারলে না। সনাতন ম্যানেজারকে নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে, ভজহরি রাস্তায় নেমে এল। দু-পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, "সনাতনদা, তোমার দাদার কি নাম ছিল?"

মুখ ঘুরিয়ে সনাতন জবাব দিল, "দেবেশ দত্ত।—শুনেছি বিশ-পঁচিশ বছর আগে খবরের কাগজে তাঁর ছবি ছাপা হতো! আর এখন? কার সব ছবি ছাপা হয় হরিভাই? থুঃ—"

সনাতন চলে গেল চোদ্দ নম্বরের দিকে। ভজহরি দেখল, সনাতনদা সত্যি

সত্যি রাস্তায় থুথু ফেলে গেল। এবার সে উল্টো দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল নিজের ঘরের সামনে। দাঁতন করা তাব শেষ হয়েছে, মুখটা ধুয়ে ফেলবার জন্যে জলের বালতিটা নামিয়ে নিয়ে এল রাস্তাব ওপর, নর্দমাটাব পাশেই।

মাধব পিওন দাওয়ায় বসে চা খাচ্ছিল। ছুটির দিন। সরোজিনী উনোনেব ওপর ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, আমার রান্না কি আজকাল তোমার পছন্দ হচ্ছে না?"

"কেন?"

"ক-দিন থেকে তুমি তো ভাল কবে খাচ্চ না; এ সপ্তাহে চাল কিছুটা বেঁচে গেল কেন তবে? মাব মত আমি বোধ হয় বাঁধতে পাবি না।"

রবিবার বলে সরোজিনী অন্যদিনের চেয়ে খানিকটা বেশি চাল ছেড়ে দিল হাঁড়িতে। দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "কি বাবা, জবাব দিচ্ছ না যে?"

চা-খাওয়া শেষ করে মাধব বলল, "আমাব খাওয়া ঠিকই আছে সরোজিনী। আর সনাতন যা খায় তাও তো দেখছি এক রকমই আছে, কমে নি।"

"তবে কম খাচ্ছে কে?"

কে কম খাচ্ছে তার নামটা জানবার জন্যে সরোজিনী চেয়ে বইল তার বাবার দিকে। মাধব বললে, "নাম জেনে তার তুই কি কববি?"

"না বাবা নামটা তুমি বলো। কেন সে কম খাচ্ছে, তার কারণটা জানতে হবে না?"

"হ্যাঁ, কারণটা জানা উচিত আমাদের।" মাধবের গলায় কৌতূহলের স্বর, "কিন্তু তুই কি তার নাম জানিস না?"

"না বাবা।"

"কম খাচ্ছিস তো তুই নিজেই মা। কেন রে সরোজিনী? কি হয়েছে তোর?" সরোজিনী জবাব দিল না। ধীরে ধীরে হেঁটে সে ঘরের মধ্যে চলে গেল। একটু বাদেই সে একটা খাতা হাতে নিয়ে বসল এসে বাবার পাশে।

খাতার দিকে চোখ রেখে সরোজিনী বলল, "এবার তুমি বাজারে যাও। আজ একটা নতুন রান্না খাওয়াবো তোমাদের। কি কি আনবে জানো তো? চিংড়ি মাছ, কুচো নয়। মাঝারি সাইজের। নারকোল একটা। টক দই আধপোয়া—আর—"

"আর কি? বল্ না মা।"

"আর একখানা সরস্বতী মূর্তি।"

অবাক্ হয়ে মাধব চেয়ে রইল তার মেয়ের দিকে। মনে মনে সে ভাবল যে, মেয়ে তার ভদ্রলোকদের মত লেখাপড়াকে ভালবাসতে শিখেছে। ভালবাসতে চেষ্টা করছে সনাতনকে। দু-বছর আগে থেকেই সনাতন সরোজিনীকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে খুবই চেষ্টা করছিল। একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল মাধব পিওন। ভজহরি ছেলে হিসেবে যত ভালই হোক, সে করে কুলীগিরি। কুলীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে বড়সাহেব রাগ করবেন। সরোজিনীর যেন ভাল ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয় তেমন উপদেশ সে পেয়েছে বড়সাহেবের কাছে। তিনি বিয়ের বাবদ মাধবকে তিনশ টাকা দেবেন বলে কথাও দিয়েছেন।

খাতাটার দিকে মাধব এবার নজর দিল। সে দেখল, ওতে সব নতুন রান্নার কথা লেখা রয়েছে। লিখেছে সরোজিনী। হাতের লেখা সুন্দর হয়েছে দেখতে। এত অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েটা এত বেশি উন্নতি করল কি করে?

"এই রান্নাটা কার কাছে শিখলি রে?" জিজ্ঞাসা করল মাধব।

"রেণু বৌদির কাছে। কত রকমের রান্নাই যে জানেন বৌদি!"

"জানবেন-ই তো। এক সময়ে তো ওঁরা বড়লোকই ছিলেন। তা বেশ। এবার থেকে নতুন নতুন রান্না খাইয়ে সনাতনের মুখের স্বাদ একটু বদলে দিস্।"

রুখে উঠল সরোজিনী, "আমি কেন বদলে দিতে যাব বাবা?"

"তুই না দিলেও, ওর মুখের স্বাদ বদলে যাবেই। জানিস তো, সনাতন বোধ হয় আসছে মাস থেকে সুতোবিভাগের হেড-কারিগর হবে? মাইনে

পাবে একশ পঞ্চাশের ওপর ! ইচ্ছে করলে, সে তখন একটা রাঁধুনে বামুনও রাখতে পারবে।"

"তা হলে সনাতনদাকে তাই করতে বলো বাবা। আমি আর তাকে রান্না করে খাওয়াতে পারব না। নতুন রান্নাটা আমি আজ আর রাঁধব না। কেন রাধব ? কার জন্যে রাঁধব ? কে খাবে আমার রান্না ? খেতে বসে সনাতনদা তো আজকাল কেবল বড় হোটেলের গল্প করে।"

"না করলে, সে যে হেড-কারিগর হতে যাচ্ছে তা আমরা বুঝব কি করে মা ?"

"তা হলে সনাতনদা হোটেলেই বন্দোবস্ত করে নিক। পরশুদিন এত কষ্ট করে, রেণু বৌদিকে ডেকে এনে আলুর চপ তৈরি করে খাওয়ালুম। খেয়ে সনাতনদা দু-তিনটে ঢেঁকুরও ছাড়ল, আর যাওয়ার সময কি বলে গেল জানো ?"

"না তো।"

"বলে গেল যে, চপটা নাকি ও-পাড়ার মত হয় নি! মানে কি বাবা ? আমরা কেন ও-পাড়ার মত চপ তৈরি করতে যাব ?"

"কক্ষনো না, আমরা তৈরি করব এ-পাড়ার মত চপ। সনাতনের স্বাদ যদি বদলায় তো বদলাক, আমরা আমাদের মতোই থাকব। দে তো বাজারের ব্যাগটা।"

সরোজিনী দাওয়ার পশ্চিম কোণা থেকে ব্যাগটা নিয়ে এসে বলল, "মাথা পিছু দুটো করে চিংড়ি মাছ আনবে বাবা।"

"হ্যাঁ, ছ-টা আনলেই হবে।" দাওয়া থেকে নিচে নামল মাধব।

"একটু দাঁড়াও বাবা। ছ-টা আনলে তো চলবে না, আরও দুটো বেশি আনতে হবে।" সরোজিনী মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি ফেলল পাঁচ নম্বরের দিকে। রবিবারের সকালটায় কোন রকম হল্লা-চিৎকার হয়, মাধব তা চায় না। কি কথা বললে যে সরোজিনী চেঁচামেচি সুরু করবে, তাও আজকাল মাধব বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না, কেমন করে মেয়ে তার এক বছরের মধ্যে এতটা

বদলে গেল! মা-মরা মেয়েটার জন্যে মাধব সব কিছুই করতে পারে—পারে না কেবল ওকে ব্যথা দিতে। বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মাধব পিওন ভাবল, এবার থেকে সে সরোজিনীর মনটাকে ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করবে। অফিসের ফাইলগুলোকে বুকে জড়িয়ে সে বসে আছে লালদীঘিতে বিশ বছর, কি লাভ হল তাতে? ক-টা কথাই বা সে বুঝতে পেরেছে? তার চেয়ে সরোজিনীকে বুকে জড়িয়ে বসে থাকাই ভাল। সরোজিনীর মনের কথাটা যদি বুঝতে পাবে, তা হলে সংসারের আর কোন কথাই সে বুঝতে চাইবে না। কি লাভ বুঝে? সরোজিনীকে সুখী করাই ওর সবচেয়ে বড় কাজ। কেবল বাপ হওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন?

সন্তানকে সুখী করবার জন্যে যদি তাকে লালদীঘির কাজে ইস্তফা দিতে হয়, মাধব পিওন আজ তা করতেও রাজী আছে। কেন সে রাজী থাকবে না? বিশ বছরের অন্ধকূপের মধ্যে সে তার নিজের ভবিষ্যৎ খুইয়ে বসেছে বলে সরোজিনীর ভবিষ্যৎ-টা সে নষ্ট হতে দেবে কেন? লালদীঘির রাস্তায় আজ অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিচিহ্নটা নেই বটে, কিন্তু কলকাতার ভিড়ের মধ্যে অন্ধকূপের সংখ্যা তো কম নয়! উপযুক্ত বাপ হবার জন্যে মাধব পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল বাজারের দিকে। আট-টা মাছ তাকে কিনতে হবে। দুটো বেশি মাছের মধ্যে যেন পিতা ও কন্যার মনের মিলন আজ সুসম্পূর্ণ হতে চলেছে! মাধব আজ সমস্তটা দিন সরোজিনীর ওপর চোখ রাখবে।

সকাল থেকে দুটো হিন্দুস্থানী দরওয়ান এসে বসেছিল বত্রিশ নম্বরের সামনে। কাবুলীওয়ালা নয়। সরোজিনী দু-একবার একটু এগিয়ে গিয়ে দেখেও এসেছে। না, কাবুলীওয়ালা নয়। সরোজিনী জানে, কাবুলীওয়ালার ধার সতীশবাবু শোধ দিয়ে দিয়েছে। ওদের ধার শোধ দেওয়ার তারিখটা সরোজিনী ভুলতে দেয় নি সতীশবাবুকে। সে রেণু বৌদিকে বার বার করে তারিখটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে, "বৌদি, ওরা যেন এসে ফিরে না যায়। সতীশবাবুকে একটু মনে করিয়ে দেবেন।" সতীশবাবু সরোজিনীর মুখ রক্ষা

করেছে। তারিখমত টাকা পেয়েছে কাবুলীওয়ালারা। কিন্তু ওদের ধার শোধ দিতে গিয়ে সতীশবাবু বাড়ি ভাড়া বাকী ফেলেছে ছ-মাসের। পনরো টাকা মাসিক ভাড়া দিতে হয় সতীশবাবুর। একখানা বড় ঘর, পেছন দিকে রান্না ঘর আছে আলাদা। তা ছাড়া, একটা বারান্দাও আছে। সতীশবাবু বারান্দাটার মাঝামাঝি জায়গায় চট দিয়ে একটা পর্দা টাঙিয়ে নিয়েছে। তাতে খাবার ঘরের মত একখানা ঘর তৈরি হয়েছে বারান্দাটাব উত্তর দিকে। রেণু বৌদি এখানে তাঁর সংসারের বাড়তি জিনিসগুলো সরিয়ে রেখেছেন। ছোট ছেলেটা বড্ড দুষ্টু, হাতের কাছে কোন জিনিস পেলেই নষ্ট কবে ফেলে।

দুটো হিন্দুস্থানী দরওয়ান ভোর রাত্রি থেকে বত্রিশ নম্বরের সামনে বসে খৈনী খাচ্ছে। ছট্টুর লোক নয় তো? কিন্তু ছট্টু তো বাত থাকতেই চলে যায় বড়বাজারের দিকে? ঠেলাগাড়িটা সরোজিনী দেখতে পেল না। রবিবার বলে ছট্টুর তো ছুটি নেই। তবে ওবা কারা?

সনাতন এল ড্রাউনের দিক থেকে। বসল এসে দাওযার ওপর। একটু আগেই মাধব চলে গেছে বাজারে। সনাতন যখন সরোজিনীর সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা করছিল, তখন ম্যানেজারবাবু চলে গেলেন বত্রিশ নম্বরেব দিকে। সরোজিনী দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করল, "ও কে? ম্যানেজারবাবু না সনাতনদা?"

"কোথায়? ও, হ্যাঁ—ম্যানেজারবাবুই হবেন।"

"হঠাৎ তিনি এখানে কেন? বত্রিশ নম্বরের দিকে যাচ্ছেন বুঝি?"

"হবে। তাঁর তো মানুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, ভাড়া পেলেই হল।"

"তা ঠিক। চা খাবে না কি সনাতনদা?"

"দাও। আজ তো'আর কারখানায় যেতে হবে না—ছুটি। কি করবে সারাটা দিন? আমার তো আর ছ-নম্বরে থাকতে ইচ্ছে করে না।"

ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে সরোজিনী মগে করে জল চাপিয়ে দিল উনোনে। সনাতন ততক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সরোজিনী কিছু না বললে সনাতন নতুন করে কোন আলোচনাই আরম্ভ করতে পারছিল না। সরোজিনী

চায়ের পেয়ালার মধ্যে দুধ ঢালল, চিনি দিল দু-চামচে। তারপর, ছাঁকনিটার মধ্যে চায়ের পাতা রেখে, সেটা ঠেকিয়ে রাখল পেয়ালার মুখের ওপর। এখন গরম জলটা ঢেলে দিলেই তাড়াতাড়ি চা তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু জলটা গরম হতে একটু সময় নেবে মনে করে, সরোজিনীও এসে বসে পড়ল সনাতনের পাশে। সে জিজ্ঞাসা করল, "ছ-নম্বরে তোমার থাকতে ইচ্ছে করে না কেন সনাতনদা?"

"বড্ড বেশি রক্ত উঠছে জয়গোবিন্দর গলা দিয়ে। ভজহরি তো দিনরাত ওর সঙ্গে লেগে লেগে রয়েছে।"

"বলো কি?"

"ঠিকই বলছি সরোজিনী। ভজহরির তো জামা কাপড় বদলাবার কোন বালাই নেই। সেই একই কাপড় পরে থাকে দিনরাত। এদিকে আর ওর না আসাই ভাল। আমাদেরই উচিত নয় ওকে আসতে দেওয়া।"

"অনেকদিন হয়ে গেল হরিদা এদিক পানে আসেই না। কিন্তু এসব অসুখের এত কাছে যাওয়া তো ঠিক নয়।" সরোজিনী তন্ময় হয়ে গেল নিজের চিন্তার মধ্যেই। তন্ময়তা ভাঙ্গাল ওর সনাতন।

"এতো কাছে বলেই আমি ভাবছি ঘর আমি বদলাব। সাত টাকার জায়-গায় আমি পনরো টাকা দিতেও রাজী আছি।"

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে সরোজিনী বলল, "না, না, তুমি কেন এখান থেকে চলে যাবে? জয়গোবিন্দকে হাসপাতালে সরিয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করো।"

"সেইজন্যেই তো কাল গিয়েছিলাম ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। জয়-গোবিন্দর জন্যে তো পুরো বস্তিটাই মরতে পারে না। তার ওপরে, ভজহরির গায়ে এর মধ্যে কত যে হাজার হাজার পোকা বাসা বেঁধেছে কে জানে। এসব ব্যারামের পোকাগুলো বড্ড বেশি তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। বসবার জায়গা পেলেই শুয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। বাসা বাঁধতে এক মিনিটও সময় লাগে না।"

"তা হলে কি হরিদাকেও হাসপাতালে পাঠাতে হবে না কি?"

"না, না—মানে, ভজহরি তো অন্য কোন জায়গায় ঘর ভাড়া নিতে পারে। তুমি তো সেদিনের মিটিং-এ বললে যে, ভজহরি ভদ্রলোক? এটা তো ভদ্র-লোকদের থাকবার জায়গা নয় সরোজিনী।"

"তা নয়। হরিদা চলে গেলেই বা তোমার কি লাভ? পনরো টাকা দিলে তুমি দুটো ঘরই রাখতে পারো বটে, কিন্তু আমি তোমায় ও-ঘরে থাকতে দেব না। এসব রোগের পোকা সহজে মরে না সনাতনদা।" এই বলে সরোজিনী গরম জল ঢালতে লাগল পেয়ালার মধ্যে।

হাতমুখ ধুয়ে ভজহরি ঘরের মধ্যে এল। তানপুরাটার দিকে চাইল একবার। ধুলো জমেছে কাঠের গায়ে। তারগুলোর মধ্যে একটা তার গেছে ছিঁড়ে। অনেকদিন হল ভজহরি আর গান করতে বসে নি। জয়গোবিন্দর একটা কিছু ব্যবস্থা না হলে, গান তার গাওয়া উচিতও হবে না। তানপুরার দিকে না চেয়ে তার চাইতে হবে প্রতিবেশীর দিকে।

ছ-নম্বর ঘরের প্রতিবেশীর কথা এবার সে ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল দেবেশ দত্তর কথা। কোথায় গড়পার, আর কোথায় এই ডব্‌সন রোড! বৌরানীর কাছে সে কত কথাই না শুনেছে। পালিয়ে যাবার আগে বৌরানী তার ডায়ারী বইখানা দিয়ে গেছে ভজহরিকে। কত বড় ইতিহাসই না তাতে লিখে রেখে গেছে বৌরানী। উল্টেপাল্টে অনেক কথা ভাবতে লাগল ভজহরি। স্বদেশপ্রেমের জন্যে দেবেশ দত্ত একটা সাহেবকে খুন করতে পেরেছিল, আর সমাজ ও রাষ্ট্র খুন করেছে দেবেশ দত্তের গোটা পরিবারটাকে। আজ আবার সনাতনদা তৈরি হচ্ছে নতুন খুনের জন্যে। সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর সে প্রতিশোধ নেবে। ভজহরির মনে হল, ইতিহাসটা যেন খুনোখুনির বিষচক্রের মধ্যে আটকে পড়েছে। যে-রাষ্ট্রকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখেছিল দেবেশ দত্ত, তাকে আবার নষ্ট করবার জন্যে সনাতন দত্ত মেতে উঠল কেন? কেন সে মাতিয়ে তুলছে বস্তির লোকগুলোকে? কি হবে দল পাকিয়ে? কোন খুন থেকেই তো কল্যাণ আসে নি? দেবেশ দত্ত আন্দামান চলে গেল বলে

ইতিহাসের উন্নতি হয় নি এতটুকু। কেবল বৌরানীলর হাতাটা ঢুকিয়ে দিল জীবন নাগ-বাড়ির দেয়ালে, দেয়ালে। দেবেশ দত্তের স্থলগুলো সেদ্ধ হয়েছে বৌরানীর প্রেম তুচ্ছ ছিল না কোন দিক থেকেই। প নম্বরের দিকে।

কি মনে করে ভজহরি তোশকটা তুলে ফেলল এক টান দিয়ে।বছিল। কান দিকে চেয়ে রইল সে। ইস্ত্রি-করা পাঞ্জাবির ভাঁজগুলো এমন করে সে শুনতে কে? ধুতি ও পাঞ্জাবিটা ওর এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। তোশকট,না কি? ঠিক করে রেখে ভজহরি বসে পড়ল মাটিতে। খাটিয়ার তলা থেকে টি হাতে স্যুটকেসটা টেনে বার করল। স্যুটকেসের মধ্যে বৌরানীর ডায়ারীখানা রয়েছেল। ডায়ারীর মধ্যে রয়েছে কয়েদখানার উঁচু উঁচু প্রাচীর। শেষ পর্যন্ত বৌরানী সবগুলো প্রাচীরই ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়ে গেল! মাটিতে বসে ভজহরি ভাবলে, সনাতনদাও আজ বস্তির মধ্যে নতুন করে প্রাচীর তুলছে। একদিন সরোজিনীও হয় তো প্রাচীরের গায়ে মাথা কুটে মরবে। সনাতনদা জানে না, মাধব পিওনের কাছে সে কতোটা ঋণী! ঋণ কেবল তার একলার নয়,-সমস্ত পরিবারটারই। ডায়ারী বইখানা হাতে নিয়ে নাডাচাড়া করতে করতে ভজহরির নজরে পড়ল স্যুটকেসের দ্বিতীয় ঐশ্বর্য। খালি স্যুটকেসটাকে যেন ঐ পাথরের টুকরোটা ভরাট করে রেখেছে! নাগ-বাড়ির বিগ্রহ রক্ষা করছে পাঁচ নম্বরের ভজহরি রায়। এই ঘরের মধ্যে সরোজিনী কেবল ধুতি আর পাঞ্জাবিটাই দেখল, দেখতে পেল না ভগবানের বিশ্বজয়ী ক্ষমতা। দেখতে পাচ্ছে না পৃথিবীর একটা লোকও।

চার নম্বর থেকে ডাকল জয়গোবিন্দ, "ভজহরি, একবার এস তো।"

স্যুটকেসটাকে খাটিয়ার তলায় সরিয়ে রেখে, ভজহরি ছুটে এল জয়গোবিন্দর কাছে। জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে?"

"আবার রক্ত পড়ল!" সিগারেটের টিন-টা জয়গোবিন্দ ঠেলে দিল ভজহরির দিকে। ভজহরি টিন-টা হাতে নিয়ে দেখল, থুতুর সঙ্গে সত্যিসত্যি রক্ত পড়েছে।

জয়গোবিন্দ বলল, "আজ সন্ধ্যের সময় আমায় তুমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে নিয়ে চলো। সেই মারওয়াড়ীবাবু বলেছিলেন যে, দরকার

"না, না—মানে, কোতার শহরে সবকিছু করতে পারেন। প্রকাণ্ড বড় তুমি তো সেদিনের মতো তাঁর।"
লোকদের থাকে?" জিজ্ঞাসা করল ভজহরি।

"তা নয়, আমার কাছ থেকে রোজই তিনি এক টাকার ফুল কিনতেন। দিলে তুমি তাঁর কেউ থাকত না, সেদিন তিনি আমার সব ফুলই কিনে নিয়ে দেব না গল্প করতেন আমার সঙ্গে। বলতেন, ছেলেবেলায় মাথায় করে সরে কাপড় ফেরি করতেন। গরীবলোকদের দুঃখ তিনি মরবার আগের দিন পর্যন্ত ভুলবেন না। ভজহরি, আমি বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছি।"

"কিছু খাবে? কাল রাত্তিরে আমি অনেক ফল এনেছি জয়গোবিন্দ।"

"জানি ভাই। তোমার কত টাকাই না খরচ হচ্ছে!"

"টাকা তো খরচ করবার জন্যেই। এখনো আমার কাছে পঁচিশ টাকা আছে। একবার মাধবদার কাছে যাই। আর গোটা পঞ্চাশ টাকা পেলেই, তোমায় এখুনি নিয়ে যাব ডাক্তার কুণ্ডুর কাছে। কনট্রাক্টের বাকী পঁচিশ টাকা পরে দেব।" এই বলে ভজহরি বেরিয়ে এল বাইরে।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়ে সনাতনের মনে হল, ভজহরির জন্যে সরোজিনীর উদ্বেগ তার চেয়ে একটুও কম নয়। ভজহরিকে এখান থেকে সরাতে না পারলে, সরোজিনীর উদ্বেগ বাড়বে বৈ কমবে না। সনাতন জানে, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আজ এখানে কেউ আর কাউকে ধরে রাখতে পারে না। সনাতন শ্রমিক। ভজহরি কিংবা সতীশবাবুদের মত সে সংসার-সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে না। সে ইউনিয়নের একজন নামকরা সদস্য। হাজার হাজার সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের অংশ সে। দরকার হলে, সঙ্ঘ এসে দাঁড়াবে ওর পেছনে। এক ঢোঁক চা খেয়ে, সনাতন যেন একটা কাল্পনিক যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

ভজহরি আসছিল চোদ্দ নম্বরের দিকে। মাধবদার কাছে এতগুলো টাকা এক সঙ্গে পাওয়া যাবে কি না কে জানে। দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়াল

ভজহরি। সরোজিনী হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। পেতলের হাতাটা ঢুকিয়ে দিল হাঁড়িব মধ্যে। আঙ্গুল দিযে টিপে টিপে দেখতে লাগল, চালগুলো সেদ্ধ হয়েছে কি না। সনাতন একটু অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল বত্রিশ নম্বরের দিকে। আসলে, সনাতন এতক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে বত্রিশ নম্বরের কথাই ভাবছিল। কান পেতে বেখেছিল ওদিক পানেই। কোন হল্লা চিৎকার এখন পর্যন্ত সে শুনতে পেল না কেন? তবে কি ম্যানেজারবাবু ভাডা পেয়ে গেলেন না কি? ম্যানেজাবগুলো বাডিওয়ালাবাবুদেব চেয়ে বেশি বজ্জাত। বাকী ভাড়া হাতে পেয়ে অমনি চুপ কবে গেলেন। সনাতনেব বক্ত ক্রমশই গরম হতে লাগল। ওসব ম্যানেজাব দিয়ে কোন কাজ হবে না। সতীশবাবুকে তুলে দেবার দাযিত্ব ওকেই নিতে হবে। ডবসন রোডেব বস্তিতে বত্রিশ নম্বরটাবই সবচেয়ে বেশি ভাডা, সবচেয়ে বেশি জাযগা এখানেই। সবোজিনীকে কেবল বিয়ে করলেই চলবে না, তাকে হাত পা ছডাবাব জন্যে একটু বেশি জায়গাও দিতে হবে। তা ছাডা আগামী মাস থেকে সে হেড কারিগব হবে, তাব জায়গা একটু বেশি লাগবেই।

সবাই চুপ করে আছে দেখে ভজহরি বলল, “জযগোবিন্দকে ফেলে এক পা-ও নডতে পারছি নে। একটু চা খাওয়াও না সরোজিনী।”

“চা?” সরোজিনীর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা আতঙ্কের স্বর। বয়েবসে চা খাওয়ার আর সময হল না সনাতনের। সে চুমুক দিয়ে সবটা চা একবারেই খেয়ে ফেলল। সনাতন বলল, “তোমার গেলাসটা নিয়ে এস হবিভাই।”

“কেন সনাতনদা?” জিজ্ঞাসা করল ভজহরি।

“জয়গোবিন্দর রোগটা তো বড্ড ছোঁযাচে—”

“ও, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ সনাতনদা। আমার গেলাসটা আমি নিয়ে আসছি। আমার একটু আলাদা হয়েই থাকা উচিত।” ভজহরি গেল গেলাস আনতে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করল, “কি রাগ করলে না কি সরোজিনী?”

"রাগ? কই না তো। তুমি তো উচিত কথাই বলেছ। এক পেযালা চা খেয়ে হরিদার শরীরের আর কি উপকারই বা হতো? রাত জাগছে কদিন থেকে কে জানে!" এই বলে সরোজিনী ঘর থেকে দুধের কডাইটা নিয়ে এল। তিন পোয়া করে দুধ রাখা হয়। আধ সের সনাতনের, এক পোয়া মাধব ও সরোজিনীর। উনোনে দুধের কডাইটা চাপিয়ে দিয়ে সবোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "দুধের মাপ জানো তো সনাতন দা?"

"তার মানে?"

"এক পেয়ালা দুধে এক পোয়া হয়। তোমার ভাগে কম পডছে না তো?"

"আজ থেকে আমি দুধ এক পোয়াব বেশি খাবো না সবোজিনী।"

"কেন? আমরা তোমায় ঠকাচ্ছি না কি?"

"কি যে বলো তার ঠিক নেই। তোমার আর আমার মধ্যে কোন কিছুতেই কমবেশি হওয়া উচিত নয়। বলো, ঠিক কি না?" বত্রিশ নম্ববেব দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল সনাতন।

"কেবল ঠিক বললে সবটুকু বলা হবে না সনাতনদা। তোমার মত বিচার-বুদ্ধি আমি অন্য কারু মধ্যে সত্যিই দেখতে পাই না।'

সরোজিনীর দিকে চেয়ে সনাতন একটা বিডি ধরাল।

ভজহরি এবার খুব ধীরে ধীরে হেঁটে এল। আসবার যেন খুব একটা ইচ্ছে ছিল না ওর। ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, "মাটিতে রাখব গেলাসটা?"

"রাখো হরিদা।" সরোজিনী নিবিষ্ট মনে দুধের দিকে চেয়েছিল। সকালের গরম-করা দুধের ওপরে মোটা রকমের সর পডেছে। বেশি গরম করতে গেলেই সরটা যাবে গলে। সরোজিনী তাই সতর্কভাবে চেযে রইল কড়াইটার দিকে।

উনোন থেকে প্রায় তিন হাত দূরে ভজহরি গেলাসটা রাখল। নিজে দাঁড়াল আরও দূরে। যক্ষা বড্ড ছোঁয়াচে রোগ, বীজাণুগুলোকে বিশ্বাস করা যায় না। সরোজিনীর দিকে চেয়ে ভজহরি বলল, "আমি কিন্তু চা খাবার জন্যে আসি নি।"

"চা তোমায় খেতে দিচ্ছে কে হরিদা? যাও না একবার বাইশ নম্বরের তারাপদ নাপিতের কাছে, তার আয়না দিয়ে মুখের চেহারাটা একবার দেখে এস।"

"সে পরে গেলেই হবে। তারপদ এখন কাজে বেরিয়েছে। মাধবদা কোথায়?"

সরোজিনীর হয়ে সনাতনই জবাব দিল, "তিনি বাজারে গেছেন। আসতে একটু দেরি হবে। ছুটির দিনের বাজার কি না, মাছ তরকারি দেখেশুনে কিনতে হয়। আর কিনতে হয় একটু বেশি বেশি। ছুটির দিনে খিদে একটু বাড়ে। তা মাধববাবুকে তোমার কি দরকার হরিভাই?"

"না, আমার নিজের কিছু দরকার নেই। টাকার অভাবে জয়গোবিন্দর চিকিৎসে হচ্ছে না, কিছু টাকা—"

"কত টাকা?" জিজ্ঞাসা করল সনাতন।

"গোটা পঞ্চাশ হলেই এখনকার মত চলে যায়।"

"পঞ্চাশ? আচ্ছা—" এই বলে সনাতন তার ট্যাঁক থেকে ছ-খানা দশ টাকার নোট বার করে তুলে ধরল ভজহরির দিকে, "ষাট টাকাই নিয়ে যাও। জয়গোবিন্দর উপকারে লাগবে। কাল আমরা সব বোনাস্ পেয়েছি।" ভজহরির হাতে টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে সনাতন চাইতে গেল সরোজিনীর দিকে। চাইতে গিয়েই কেমন একটা ধাক্কা খেল সনাতন। সরোজিনী কড়াই থেকে হড় হড় করে প্রায় আধ সের দুধ ঢালছে ভজহরির গেলাসে। পুরু সরটা ভেসে উঠল দুধের ওপর। গেলাসটা নিয়ে সরোজিনী ভজহরির হাতের দিকে তুলে ধরে বলল, "রাত জেগে ওসব খারাপ ব্যারামের কাছে পড়ে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। নাও দুধটা খেয়ে নাও।—সনাতনদা, তোমাদের ওসব টাকা পয়সার ব্যাপার তোমরাই বুঝবে। বাবার কী যে কাণ্ড! কেবল ধার আর ধার। তুমি আজ আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা করেছ সনাতনদা। নইলে লজ্জায় আমরা হরিদার কাছে মুখ দেখাতে পারতুম না। —নাও, দুধটা এক টানে খেয়ে নাও।"

গেলাসটা ধরতে গিয়েই বত্রিশ নম্বর থেকে হল্লার আওয়াজ শুনতে পেল ভজহরি। শুনতে পেল ওরাও। সরোজিনী গেলাসটা নামিয়ে রাখল মাটিতে। রেণু বৌদি এদিক পানেই ছুটে আসছে।

"কি হয়েছে বৌদি ?" জিজ্ঞাসা করল সরোজিনী।

"ভোর থেকে বাড়িওয়ালাব দরওয়ান দুটো দরজায় বসে পাহারা দিচ্ছিল। ম্যানেজারবাবু ভাড়া চাইতে এসেছেন। ওঁর কাছে টাকা ছিল না। উনি গিয়েছিলেন ডব্‌সন রোডে কোন্ এক বন্ধুর কাছে টাকা চাইতে। ফিবে এসেছেন উনি, কিন্তু টাকা পান নি। দরওয়ান দুটো ওঁকে ধরে রেখেছে, আর ম্যানেজারবাবু আমাদের সব জিনিসপত্তর রাস্তায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। আমরা কোথায় যাব সরোজিনী ? তোমরা যদি আমাদের পাশে না দাঁড়াও, তবে আমরা যাই কোথায় ?" সতীশবাবুব স্ত্রী কেঁদে ফেলল। কোমরে আঁচলটাকে ভাল করে জড়িয়ে সরোজিনী বললে, "চলুন তো দেখি, ম্যানেজারবাবুর মুরদ কত দেখে আসি। সনাতনদা, চলো—দরকার হয তোমার দলকে খবর দাও।" কারু জন্যে অপেক্ষা না করে সরোজিনী চলে গেল বত্রিশ নম্বরের দিকে। সনাতন তার ট্যাকের পয়সা সব বার করে দিযে চলে গেল উল্টো রাস্তায়, ডাউনের দিকে। ভজহরি কি করবে ভাবছিল। ওকে কেউ ডাকে নি, ডাকল না সরোজিনীও। তবুও সতীশবাবুরা যখন প্রতিবেশী, তখন না ডাকলেও যেতে হবে। ভজহরি এল বত্রিশ নম্ববের সামনে।

সরোজিনী হিন্দুস্থানী দুটোর সামনে এসে ধমকে উঠল, "এই, এখানে মরতে এসেছিস্ কেন ? হাত ছাড়্—ছাড়্ বলছি।" দাওয়ার ওপর থেকে ম্যানেজারবাবু ভেংচে উঠলেন, "এদের জন্যে তোমাব এত দরদ কেন দিদি ? এঘর তো খালি করছি তোমার জন্যেই। ফুলশয্যা পাতা হবে না ? সনাতন যে পঞ্চাশ টাকা আগাম দেবে—আর দরওয়ানদের দেবে দশ টাকা। কই, সনাতন গেল কোথায় ?"

সনাতনের বদলে এল ভজহরি। ওপাশের রাস্তা দিয়ে কোথা থেকে

এসে উপস্থিত হল ছট্টু। ছট্টুকে দেখতে পেয়ে, সরোজিনী গিয়ে হাত চেপে ধরল ছট্টুর। কান্নার সুরে বলতে লাগল, "ছট্টু, শীগগির আয়। ভদ্রলোকের ইজ্জৎ আর রইল না! ঐ দুটো খোট্টাকে দু-ঘা বসিয়ে দে।" ছট্টুকে টানতে টানতে নিয়ে এল সরোজিনী। ছট্টু এসেই একটা হিন্দুস্থানীর ঘাড চেপে ধবল। ম্যানেজারবাবু হুংকার দিয়ে উঠলেন। উত্তেজনায় চেঁচাতে লাগল সরোজিনী। মাধব যেন বাজার থেকেই সবোজিনীর চিৎকার শুনতে পেয়েছে। বাজাবের থলিটা রাখবারও সময় পায় নি। চিংড়িমাছ আর তরকারি ভর্তি ব্যাগটা হাতে নিযেই সে এসে দাঁডাল ভজহবির পাশে।

ভজহরি ম্যানেজাববাবুব কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা কবল, "কত টাকা বাকী পড়েছে?"

"নব্বই টাকা।"

"এখন ষাট টাকা নিন।—বিয়ে তো সরোজিনীর এক্ষুনি হচ্ছে না, সনাতনদা আর কটা দিন ছ-নম্বরেই কাটিয়ে দিতে পারবে।" এই বলে ভজহবি ম্যানেজারবাবুকে টাকা দিযে ওপাশের রাস্তা ধবে বেরিয়ে গেল বস্তির বাইবে।

মাধবের হাত ধবে সরোজিনী, কেবল সবোজিনীই কাঁদতে লাগল জনতাব সামনে। সরোজিনীর এত বেশি কান্নাব কাবণ বুঝতে পাবল না পিতা মাধবচন্দ্র দাস।

সতীশবাবুর মানসম্মান বাঁচাবার জন্যে ভজহরি যা করে এল তা অবিশ্যি প্রশংসারই যোগ্যই বটে। কিন্তু জয়গোবিন্দর এখন কি হবে? মারওয়াড়ী-বাবুর ওপর নির্ভর কবে বসে থাকা উচিত হবে না। টাকার ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। এসব রোগ ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, এগোয় খুব দ্রুত। ভজহরিও হাঁটতে লাগল তাডাতাডি। সর্দারের কাছে হাত পাতবে আজ।

হাওডা স্টেশনে এসে ভজহরি সর্দারকে কোথাও খুঁজে পেল না। দেখা

খোদা বক্সের সঙ্গে। খোদা বক্সও সর্দারের খুব পেয়ারের লোক। এক জেলাতেই ওদের ঘর।

খোদা বক্সের কাছে খবর শুনে ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ দেশে চলে গেল কেন সর্দার? ঘরে তার কে কে আছে?"

আছে বৌ এবং কাচ্চাবাচ্চা। কাল রাত্তিরে তার মন নাকি ভীষণ খারাপ হয়ে পড়েছিল। সামনেই দাঁড়ান ছিল দিল্লী এক্সপ্রেস। সে আর বাড়ির টান রুখতে পারল না, গাড়িতে চেপে বসল।

"কবে আসবে? কোন কথাই কি সে বলে যায় নি?"

কি বলবে এবং কাকে বলবে? ভজহরির সঙ্গে তার দেখাই হয় না। সর্দার না কি ক-দিন থেকে খোদা বক্সকে বলছিল যে, কলকাতায় এসে কোন মানুষকেই সে তেমন করে ভালবাসতে পারে নি, কেবল ভজহরিকে ছাড়া। নিজের ব্যাটা বলেই সে ভাবত ভজহরিকে। সমস্তটা দিন তার মন খুব খারাপ হয়েছিল। গাড়িতে উঠবার আগে সর্দার বলছিল যে, বংগালী লোগ বেইমান। ব্যাটার মর্যাদা সে রাখতে পাবে নি। একদিন না দেখলে সে পাগল হয়ে যেত, আব সর্দারকে দেখবার জন্যে ভজহরি তেমন কোন টান অনুভব করে না। দিনের পর দিন সে কাজে কামাই দিচ্ছে। এখানে সে কেবল মোটই বইতে আসে, সর্দারের মনটাকে বুঝতে পারে নি ভজুয়া। গাড়িতে উঠে খোদা বক্সকে কাছে টেনে নিয়ে সর্দার বলেছে যে, ভজুয়া একদিন এই স্টেশন ছেড়ে চলে যাবে। স্টেশনটার তাতে ক্ষতি হবে না, কিন্তু সর্দারের নাকি ক্ষতি হবে খুব। সে ভেঙ্গে পড়তে পারে, কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে দেশে। কিংবা পাটনা স্টেশনে গিয়ে সে সাধারণ একজন কুলী হয়েও থাকতে পারে। ভজুয়া তাকে এরই মধ্যে খুব বেশি আঘাত দিয়েছে! আঘাত সে সহ্য করতে পারে নি, তাই সে কাল দেশে চলে গেছে। নিজের রক্তমাংসের ব্যাটাগুলোকে দেখতে গেছে সে। ভজুয়ার আঘাত ভুলবার জন্যে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কী-ই বা হতে পারত?

কথা বলতে বলতে খোদা বক্স কোন্ সময় যে ভজহরির মুখে একটা বিড়ি

গুজে দিয়েছিল ভজহরি তা টের পায় নি। দাঁত দিয়ে বিড়িটা চেপে ধরে ভজহরি কথা শুনছিল তন্ময় হয়ে। সংসারে কাউকে আঘাত দেবে না বলেই সে ঢাকা থেকে একদিন প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। বৌরানীর সারা জীবনের তপস্যাই সে তার নিজের তপস্যা বলে মেনে নিয়েছে। বৌরানী কোন দিনও কাউকে আঘাত করেনি। অসংখ্যের আঘাত সে সহ্য করেছে প্রতি পলে পলে। বৌরানীর তপস্যা তার নিজের তপস্যা, বৌরানীর মন্ত্র ওর নিজেরই মন্ত্র। কি যেন সেই মন্ত্রটা? বৌরানী ভজহরিকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে যে, কোন আঘাত থেকেই কল্যাণ আসে না। ব্যক্তি-জীবনে যা সত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনেও তা সত্য। দেবেশদা ভুল করেছে, অতি মারাত্মক রকমের ভুল। দেশপ্রেমের নামে সে মানবপ্রেমকে অগ্রাহ্য করেছে। ফল কি দাঁড়াল? সে কেবল নিজেই মরল না, মেরে রেখে গেল গোটা পরিবারকে, মেরে রেখে গেল বৌরানীকে। দেবেশ দত্ত আজ হারিয়ে গেছে, স্বাধীন ভারতবর্ষ তাকে শহীদ বলে স্বীকার করে নি। স্বাধীন ভারতবর্ষের সিংহাসনে বসে আজ যাঁরা রাষ্ট্র চালাচ্ছেন, তাঁরা দেবেশ দত্তকে চেনেন না। ক্ষমতার বিষ হস্তান্তরিত হয়েছে, অতএব বৌরানীর মত নিঃশব্দে বসে থাকতে হবে বিষের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলে, এ-সিংহাসনের পতন দেখাও অসম্ভব হবে না। কিন্তু দেবেশ দত্ত কিংবা বৌরানীর তাতে সুবিধে হল কি? কিছুই না। তাদের আর কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পারবে না সনাতনও। পারবে না এই জন্যে যে, সনাতনদের হাতে কেবল প্রতিশোধের অস্ত্রই তৈরি হচ্ছে আজ। অস্ত্রের শাসন দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সৃষ্টি করা যায় না আত্মীয়তার স্বাভাবিকতা। যতদিন না মানুষ অপর মানুষকে আত্মীয়ের মর্যাদা দিতে পারবে, ততদিন পর্যন্ত বৌরানীর তপস্যা ভাঙবে না। বৌরানী পালিয়ে গেছে বটে, কিন্তু তপস্যার তন্ময়তা ধরে রাখবার আদেশ দিয়ে গেছে ভজহরিকে। জগদীশ নাগের বংশ রক্ষা হল না বলে বৌরানীর দুঃখ কিছুই ছিল না। বৌরানীর রক্তের ছিটেফোঁটা ভজহরি

পায় নি, কিন্তু তার তপস্যার সবটুকুই পেয়েছে ভজহরি। ওর চেয়ে যোগ্যতর ওয়ারিস জন্ম দিতে পারতেন না বারোদির জমিদার জগদীশচন্দ্র নাগ। এত বড় বিশ্বাস নিয়ে বৌরানী পালিয়ে গেছে নাগ-বাড়ির কারাগার ভেঙ্গে শ্রাবণের সেই রাতটা কী ভয়ংকরই না ছিল! পৃথিবীর বুকে এত বড় যুদ্ধ সংঘটিত হতে কেউ দেখছে বলে ভজহরির বিশ্বাস হয় না।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে খোদা বক্স বলল, "লে ভজুয়া—"

মুখ থেকে বিড়িটা নামিয়ে নিয়ে ভজহরি বলল, "আমি তো বিড়ি খাই না!"

"হুঁ, হুঁ, হাম জান্‌তা তুম বিড়ি পিতা নেহি, মগর পিনেসে কেয়া হোতা?"

প্রশ্ন করতে গিয়ে একটা দেশলাইয়ের কাঠি নষ্ট হল খোদা বক্সের। ভজহরি কোন জবাব দিল না, বিড়িটা খোদা বক্সের হাতে গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সর্দার কতদিন থাকবে দেশে?"

"বোলা, দশ রোজ।"

ভজহরি চলে এল স্টেশনের বাইরে। জয়গোবিন্দর কি হবে? মিনতির কাছে একবার যাবে নাকি? সে তো ভালই আছে। কোন্ এক লোহার কারখানায় বিশু কাজ শিখছে। বিশুও নিশ্চয়ই ভাল আছে। অজয়বাবুর দয়ায় মিনতি স্থান পেয়েছে যতীন দাস রোডে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে। বিশুকে লোহার কারখানায় ঢুকিয়েছেন অজয়বাবুই। অজয়বাবু এখানে কোথায় মস্তবড় চাকরি করেন। পাটনার লোক এঁরা। লুকু দিদিমণির ভাসুর এই অজয়কুমার বসু। যতীন দাস রোডে তাঁর মামা থাকেন, কিরীটকুমার নাগ। অবসরপ্রাপ্ত জজ। মামীমাও বেঁচে আছেন। বয়স হয়েছে, বাত হয়েছে সর্বাঙ্গে। কিরীটবাবু অনেকদিন থেকে একটি রিফিউজী মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। অবিবাহিতা হলে ভাল হয়; বালবিধবা হলে আরও ভাল। স্ত্রী হেমলতা দেবীর বিছানার পাশে বসে সে হাত-পাগুলো তাঁর টিপে দিতে পারবে। দু-জনের সংসার, কাজ খুব বেশি নয়। তা ছাড়া বাড়িতে একটা ঝি আর চাকর আছে, অতএব হেমলতা দেবীর হাত-পাগুলো কেবল টিপে দিলেই চলবে। থাকা এবং খাওয়ার কোন ভাবনা নেই। মাসে পাঁচ টাকা

রে তিনি মাইনেও দেবেন। প্রফেশনাল নার্স কিংবা ঝি রাখতে গেলে অনেক টাকা মাইনে দিতে হতো। ভাগ্যে অজয়কুমাব বসু দিল্লী থেকে বদলি হয়ে এসেছেন কলকাতায় প্রায় দু-বছরই হলো। স্ত্রী প্রতিমা দেবী পাটনার বাড়িতেই থাকেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। গেল বছর পূর্ববঙ্গে কি একটা গণ্ডগোল হল। খবরেব কাগজ পড়ে কিবীটবাবু জানতে পারলেন যে, ওদিক থেকে হাজাব হাজাব লোক আসছে। কিবীটবাবু টেলিফোন কবলেন বেলা দশটা নাগাদ।

"হ্যালো, কে? অজয?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"খববেব কাগজ পড়েছিস্ তো?"

"না—টিফিন টাইমে পডব। কেন? কি হযেছে?"

"লোক আসছে ওদিক থেকে। বিফিউজী!!"

কিবীট নাগেব গলাব স্বব যেন হাতেব মত লম্বা হয়ে গেল, তিনি সেই হাত দিয়ে আকাশ ছুঁতে চেষ্টা কবলেন। অনেকদিন চেষ্টা করেও তিনি একটি বালবিধবার সন্ধান কবে উঠতে পাবেন নি—হেমলতা দেবীব হাত-পা টিপে দেবাব জন্যে যোগাড কবতে পাবেন নি একটি মধ্যবিত্তের মেয়ে। আজ আবাব একটা সুযোগ এসেছে—বিফিউজী মেযে একটি তাঁব চাই ই।

"হ্যালো, অজয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।"

"তুই তো খুব বড কর্মচাবি, একটু চোখ বাখিস্ ওদেব দিকে।"

"তা বাখব।"

"বাখতেই হবে। যে যেদিক দিয়েই আসুক না কেন, সাহায্য নিতে হলে ওদের আসতেই হবে তোর কাছে।"

"আমাব কাছে আসবার দবকাব নেই, আমার ফাইলে ওরা আসবেই।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে একই কথা হল। হ্যালো, অজয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।"

"তোর মামীমার যা অবস্থা! আমার খুড়তুতো ভাই জগদীশকে চিনিস্ তো?"

"চিনি না, নাম জানি।"

"কত বড় প্রতাপশালী জমিদারই না ছিল! এখন কি অবস্থা?"

"কি অবস্থা আমি কি করে জানব মামা?"

"না জানলে চলবে কি করে?"

"কি দরকার আমার সময় নষ্ট করবার?"

"তবুও ইতিহাস জানতে হয় অজয়।"

"ইতিহাস আমি জানি মামা। এম. এ পাশ করেছি ইতিহাস নিয়েই।"

"এটা স্ব-দেশের ইতিহাস। জগদীশের মধ্যেই বাংলার প্রায় দু শ বছরের ইতিহাস জমাট বেঁধে আছে। এখন কী অবস্থা। পাঠান-মোগলদের মতই মর্মান্তিক! তোর মামীমার পায়ের গাঁটগুলোও জগদীশের মত আলগা হয়ে যাচ্ছে রে।"

"তুমি সাবধান থেকো।"

"সাবধান থেকেই বা কি করব, আমার তো ডায়বেটিস—পা দুটো বুঝি কাঁপছে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা সন্ধ্যের সময় দেখতে যাব।"

"মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে আসিস্। বালবিধবা হলেই ভাল হয়। তাবও একটা হিল্লে হয়ে যায় অজয়।"

"দেখব, দেখব, ফাইলের মধ্যে সবই পাওয়া যাবে—হাত, পা, মুখ, চোখ সবই।"

"বলিস্ কি, আজকাল দরখাস্তের সঙ্গে ফোটো পাঠায় বুঝি? আমাদের আমলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল অন্য রকমের। আজকাল—"

"আজকাল কি মামা?"

"আজকাল ফাইলের মধ্যেই মানুষকে পাওয়া যায়।"

"এটা টেক্‌নোলজির যুগ, ব্যাপার কত সহজ হয়ে গেছে।"

"কোন্ ব্যাপারটা যেন ?" জিজ্ঞাসা করলেন কিরীট নাগ।

"মানুষের ব্যাপারটা। তোমরা রামায়ণ পড়ে যা না জানতে পারো, আমরা মাত্র একটা ফাইল পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি জানি। চাও তো দু-চারটে রামায়ণ আমরা লিখেও দিতে পারি।"

"পারবিই তো—অফিসগুলোতে ঘাস গজিয়েছে অনেক; হাজার হাজার ছোকরা-বাবণ চেয়ার চেপে বসে গেছে। তোদেব হাতেই তো আজকাল সর্ব ক্ষমতা! ডাল, চাল থেকে সুরু করে মায অশোকবন পর্যন্ত সবই তোদেব হাতে। যাক, তোব মামীমার জন্যে একটি রিফিউজী মেয়ে নিয়ে আসিস্ অজয়।"

"আনব, পুরো ফাইলটাই নিয়ে আসব। তুমি বেছে নিও।"

"ফাইল ? না, না তা আমি পারব না। আগেকাব মত আমার না আছে কান, না আছে চোখ!"

"অনেক 'রায়' লিখেছ মামা, ফাঁসি আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেয়া ছিল তোমার বিচারের গুণ! শুনেছি বাংলাব মরুভূমিতে কত মা আর বৌ নাকি আজও চোখের জল ফেলে ?"

"কি বললি ? হ্যালো ?"

"ইতিহাস। শুনবে নাকি ?"

"সঙ্গে করে নিয়ে আসিস্—মানে ইতিহাস নয়, ফাইল।"

টেলিফোন কেটে দিলেন কিরীট নাগ। কেটে দিয়েছেন এক বছর আগেই।

টেলিফোন করবার আর দরকার হয নি। ফাইল থেকে মিনতিকে খুঁজে বার করলেন অজয়কুমার বসু। মিনতির একটা হিল্লে হয়ে গেল।

স্টেশনের বাইরে এসে ভজহরি ঠিক করল, মিনতির কাছেই সে যাবে। ঢাকা থেকে আসবার সময় বিশু আব মিনতির ভাড়ার টাকাটা দিতে হয়েছিল ভজহরিকে। সে-টাকা মিনতি আজও শোধ দেয় নি। সব টাকা না পারুক, চাইলে হয়তো কিছু টাকা সে দিতে পারবেই। দেওয়া উচিত। নইলে

জয়গোবিন্দর উপায় হবে কি? লোকটা কি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে? ভজহরি পাঁচের-এ বাসে উঠে বসল।

বড়সাহেবের মনটা ভাল ছিল না। এত দেখে শুনে মেয়েটার বিয়ে দিলেন তিনি, খরচ করলেন পনরো হাজারের ওপর, কিন্তু মেয়েটা কলকাতায় এসে কেবল পন্টুদার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জামাই দিল্লীতে চলে গেছে, ঘর সংসার সাজিয়ে বসেছে বলে সে চিঠিও দিয়েছে। অথচ লুকুব দেখছি কলকাতা থেকে নড়বার নামই নেই। বিয়ের আগে হলে মেয়েকে তিনি কঠিন হাতে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু বিয়েব পবে মেয়ের ওপর কোন কর্তৃত্বই নেই তাঁব! কাল তাঁর মেয়ের সঙ্গে এই নিয়ে খানিকটা কথা কাটাকাটিও হয়ে গেছে। "শাস্তির আর বাকী বেখেছো কি বাবা? কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিলে, চলে গেলুম পাটনা।"

"পাটনায তোকে থাকতে হবে না, থাকতে হবে দিল্লীতে।" বললেন বড়সাহেব।

"কলকাতার বাইরে যদি যেতেই হয, তবে পাটনা আর দিল্লীর মধ্যে কোন তফাত-ই নেই। কলকাতার বাইরে বাকী ভারতবর্ষটাই একরকম। তার চেয়ে বেগুসরাই বরং ভাল ছিল। পাঁচ মিশেলী জনতার ভিড় সেখানে নেই।"

"বেগুসরাই তুই কবে দেখলি লুকু?"

"দেখি নি. নাম শুনেই অস্থির!"

বিপিন পাল রোডে পন্টুদার গাড়ি এসে থামল। হর্ন বাজাল পন্টুদা। বড়সাহেব বললেন, "ঐ, ঐ লোফারটা বুঝি এসেছে?"

"পন্টুদা লোফার নয়; শিল্পী। বাবা যদি তার লাখ লাখ টাকা রেখে মরে গিয়ে থাকেন, তবে পন্টুদা কি করবে?"

"কি আর করবে, টাকা ওড়াবে।"

"সে আবার আর এক মুশকিল হয়েছে পন্টুদার! টাকা সে ওড়াতে চায় না। কোন একজন সৎলোকের কাছে গচ্ছিত রাখতে চায়। তাই সে একজন

বিদ্যসাগরের মত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি এই টাকাগুলোর একটা ব্যবস্থা করে দাও না বাবা? চেক কাটবার সুবিধে থাকবে না, আবার দরকারের সময় খাই খরচের টাকাটা যেন ঠিক মত সে পায়। কিন্তু পণ্টুদা এবং আমার বিশ্বাস, কলকাতার রোড, স্ট্রীট আর লেনগুলো সব খুঁড়ে ফেললেও একটা বাচ্চা-বিদ্যাসাগর পর্যন্ত পাওয়া যাবে না! দেশের কি যে অবস্থা হয়েছে খবরের কাগজগুলো দেখলেই ভাল বোঝা যায়।"

"কি বোঝা যায় বললি?" বড়সাহেব একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

"বোঝা যায় দেশের অবস্থা। দিনরাত শুধু গঙ্গা কোম্পানীর কালি দিয়ে মেকী-প্রফেটদের ছবি ছাপা হচ্ছে! কই বিদ্যাসাগর? সেই জন্যেই পণ্টুদা কখনও খবরের কাগজে ছবি ছাপতে দেয় না। পণ্টুদা শিল্পী। গাড়ির হর্ন বাজাচ্ছে—" সবে পড়বার জন্যে লুকু ছটফট করছিল। বড়সাহেব রাস্তা আটকে দাড়ালেন। বড্ড মুশকিলে পড়েছেন তিনি। মাত্র পনরো দিনের মধ্যে জামাই তাঁর ঠকতে ঠকতে বোধ হয় বুড়ো হয়ে গেল। সমাজের এ কি চেহারা?

"সেজে গুজে হুট্ করে তো চললি পণ্টুদার সঙ্গে, ওদিকে দিল্লীতে বসে বিজয় কি ঠকছে না লুকু?"

"ম্যানেজ করে নেব।"

"আমার বাড়িতে থেকে ম্যানেজ করা চলবে না।" গর্জন ছাড়লেন বড়সাহেব। রয়েল বেঙ্গল টাইগারগুলো সব ইদানিং কালে আত্মহত্যা করে মরে গেছে বলে বড়সাহেবের গর্জনটা লুকুর কানের পর্দা পর্যন্ত পৌছতে পারল না। মাত্র তিন হাতের ফারাকের মধ্যে গর্জনটা তলিয়ে গেল অতি অনায়াসে। লুকু তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বড়সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, চুপ করে রইলি যে? জবাব দে।"

"আমি গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে গিয়েই উঠছি। মাধবদাকে দিয়ে আমার স্যুটকেসটা সেখানে পাঠিয়ে দিও।" আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে লুকু বেরিয়ে গেল বড়সাহেবের পাশ কাটিয়ে। হরিশ মুখা[illegible]পিতা হরিলাল বসু বেলারানীর কাছ থেকে এমন জবাব কোনদিনও শুনতে পান নি!

আজ রবিবার। বড়সাহেব কিরীটবাবুর বাড়িতে যাবেন বলে ঠিক করলেন। নতুন আত্মীয় বলেই যে তিনি কিরীট নাগের সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা করতে যাচ্ছেন তা নয়। সেখানে গেলে সারা বালিগঞ্জের লেটেস্ট খবর সব তিনি জানতে পারবেন। লুকু ও পল্টুদার ব্যাপারটা কিরীটবাবুর কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে কি না সেটা জানতে পারলেই, বড়সাহেব বালিগঞ্জের আর কোন খবরই জানতে চান না।

"কেমন আছেন?" জিজ্ঞাসা করলেন বড়সাহেব। লেক অঞ্চল থেকে সকাল বেলায় নাগ মশাই হাওয়া খেয়ে ফিরে আসেন। এসে গীতা পাঠ করেন। গীতাপাঠের পর, এক গেলাস ফলের রস খান। বেলা বাড়লে খাবারের পরিমাণ ও পছন্দ বদলাতে থাকে ক্রমে ক্রমে। এইমাত্র তিনি গীতাপাঠ শেষ করে আরাম-কেদারায় আরাম করে বসলেন। বসলেন বড়সাহেবও। বড়সাহেব দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন, "কেমন আছেন?"

'ভাল নেই। শ্রবণশক্তি কমছে। কমে যাচ্ছে চোখের দৃষ্টিও।"

শ্রবণশক্তি কমে যাচ্ছে শুনে বড়সাহেব খুশী হলেন মনে মনে। সুতরাং শ্রবণশক্তি সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা না তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যাটারাক্ট ন্য কি?"

"বোধ হয় ম্যাচিওর করে নি। ডাক্তার সেনকে একবার দেখানো দরকার।"

"কবে দেখাবেন, আমায় বলবেন। চেনা পরিচয় আছে। তাছাড়া ডিপার্টমেণ্টের মিনিস্টার তো আমার ওপর তলায়ই বসেন। তাঁর হাতে টেলিফোনটা কেবল তুলে দিলেই কাজ হবে। অর্ধেক ভিজিট দিলেই চলবে।"

"অর্ধেক কেন? মেডিকেল কলেজ তো দাতব্য চিকিৎসালয়, ভিজিট লাগবে কেন?"

"তাঁর চেম্বারে গিয়েই দেখানো ভাল। যত কমে হয়, ব্যবস্থা করে দেবো।"

কিরীটবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "একদম ফ্রী হয় না বুঝি আজকাল?

অফিসের বড়সাহেবদের হাতেই তো সব ক্ষমতা। ওপরের তলায় মন্ত্রীরা সব আছেন বটে, কিন্তু—"

বড়সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, "যাঁরা নিজেদের প্রতিভার জোরে বড় হয়েছেন তাঁদের খানিকটা খাতির করতেই হয়। আপনাদের আমলে, ভয় দেখাবার অস্ত্র ছিল ইংরেজদের হাতে। বাপকে শায়েস্তা করতে হলে, তাঁর সবচেয়ে জোয়ান ছেলেটার নামে একটা গ্রেফতারী পরোয়ানা পাঠিয়ে দিলেই চলত। কিন্তু আজকাল আর তা হয় না।"

"কেন হয় না?"

"বিচারের ধরন বদলেছে। ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া খুবই কঠিন কাজ।" কথাটা বলে ফেলেই বড়সাহেব একটু ঘাবড়ে গেলেন। কিরীট নাগের ফাঁসির বিচারের কাহিনী মনে পড়ল তাঁর। তিনি ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে পুনরায় বললেন, "হোয়াট আই মীন—গান্ধী টুপীর প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের দেখাতেই হয়।"

"গান্ধী টুপী? উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের পনরোই আগস্টের রাত বারোটার পর থেকে আমিও তো মাথা আর খালি রাখিনে! গান্ধী টুপী পরি। ভোর রাতের হিম আমার মাথায় লাগে না। লেকের দিকে বেড়াতে যাই—ও, ভাল কথা। আজ সকালেই তো লেকের দিকে প্রফুল্লর সঙ্গে দেখা হল। এলগিন রোডের কাছাকাছি কোথায় যেন থাকে সে। প্রফুল্লর কাছেই শুনলুম, স্বর্গীয় দত্ত সাহেবের ছেলেটার সঙ্গে - কি যেন নামটা? শ্রবণশক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্মরণশক্তিও কমে আসছে। হ্যাঁ পল্টু। পল্টুর একটা গাড়ি আছে নাকি? বিজয়ের বৌ, মানে লুকু বৌমা খুবই নাকি হাওয়া খাচ্ছে গাড়িতে বসে?"

বড়সাহেব কোন কিছু বলার আগেই মিনতি এসে দাঁড়াল কিরীটবাবুর পাশে। ফলের রস নিয়ে এসেছে মিনতি। ফলের রসের হলদে রঙটা ফুটে বেরুচ্ছে কাচের গেলাস ভেদ করে। বড়সাহেব দেখলেন, মিনতির আঙুলের রঙটা মিশে গেছে গেলাসের গায়ে। কব্জির ওপরে দু-গাছা প্ল্যাস্টিকের

লাল চুড়ি হাতটাকে আরও বেশি সুন্দর করে তুলেছে। এ-হাত যে-কোন শিল্প প্রদর্শনীতে সাজিয়ে রাখা চলে। সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীরও বোধ হয় সাধ্য নেই তাঁর রঙ আর তুলি দিয়ে এমন হাত আঁকার। বড়সাহেব বললেন, "মেয়েটি তো ভারী সুন্দর!"

"হ্যাঁ। অজয় তার ফাইল হাতড়ে বার করেছে মেয়েটিকে। রিফিউজী। বাপ-মা নেই। ছোট একটা ভাই আছে। অজয় তাকেও ঢুকিয়েছে হাওড়ার কোন্ এক লোহার কারখানায়। বাঙালীরা তো শ্রমের কাজ নিতেই চায় না, বাবু হয়ে বসে থাকতে চায় অফিসের চেয়ারে। বিশু মিস্ত্রি হোক, টেক্‌নিক্যাল কাজ এসব। একবার শিখলে ভবিষ্যতে কেউ তার ভাত মারতে পারবে না। বাবু হওয়ার চেয়ে শ্রমিক হওয়া ভাল। মধ্যবিত্তের অহঙ্কার নিয়ে বসে থাকলে বিশু জীবনে কখনও উন্নতি করতে পারত না। এই যে মিনতির কাছে সেদিন সেই ছেলেটি এসেছিল, সে কি? মধ্যবিত্ত। কিন্তু কাজ করে কুলীর।" মিনতির হাত থেকে গেলাসটা নিলেন কিরীট নাগ। ব্লটিং কাগজের মত চোপসানো ঠোঁট নয় কিরীট নাগের। বুড়ো কালেও ঠোঁট দুটা তাঁর কমলালেবুর কোয়ার মত রসে ভরপুর রয়েছে। গেলাসের অর্ধেকটা রস তিনি এক নিশ্বাসেই টেনে নিতে পারলেন। কেন পারবেন না? কলমের এক খোঁচায় তিনি কত লোকের ফাঁসি আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিতে পেরেছেন, আর এই টুকু রস কেন তিনি এক টানে খেতে পারবেন না? অজয়ের কথা শুনতে গেলে তাঁর চলবে কেন? শ্রবণশক্তির অপব্যবহার করে তাঁর লাভ কি? বাংলার মরুভূমিতে অসংখ্য মা আর বৌ-রা যদি এখনো কেঁদে মরে, তাতে কিরীট নাগের কি এসে যায়? কিছুই না। তাঁর পেন্সন আছে, আছে গান্ধী টুপী।

বড়সাহেব বললেন, "ছেলেটিকে দেখে কিন্তু মনে হয় না কুলীগিরি করে।"

"বলেন কি, এক-মন মাছ তার মাথায় দিয়েই তো পাঠালেন?" কিরীট নাগ বাকী রসটুকু খেয়ে গেলাসটা মিনতির হাতে ফিরিয়ে দিতে গিয়েই চাইলেন মিনতির চোখের দিকে। সুখে থাকতে মেয়েটাকে ভূতে কিলয় কেন? থাকা-খাওয়া ফ্রী, তার ওপরে মাসিক পাঁচ টাকা মাইনে। অথচ মেয়েটার

চোখে যেন শ্রাবণের মেঘ জমেই আছে। ব্যাপার কি ? ঐ কুলী ছোঁড়াটাকে ভালবাসে না কি মেয়েটা ? মিনতি গেলাস নিয়ে চলে যাওয়ার পর কিরীট নাগ বললেন, "কলকাতায় বোধ হয় প্রেম-প্রণয়ের সিজিন সুরু হয়েছে। বেঁচে থাকা একটা দায় হয়ে উঠেছে মশাই।—ঐ অজয় এল বুঝি।"

বড়সাহেব এবার সত্যিসত্যি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বেঁচে থাকা যে একটা মস্তবড় দায়, সে-সম্বন্ধে তাঁর আর কোন সন্দেহ রইল না। অজয়কুমার বসু এসে বসলেন খালি চেয়ারটায়। হাত তুলে নমস্কার করলেন বড়সাহেবকে। বড়সাহেবও প্রতিনমস্কার করলেন। লুকুব ভাসুব ইনি। উনবিংশ শতাব্দীর একান্নবর্তি পরিবার সব ভেঙ্গে গেছে বটে, তবুও বড় ভাইকে ছোট ভাই-রা আজো খানিকটা সম্মান করে। অতএব বড়সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অজয়-বাবুর কুশল-সংবাদ জানবার জন্যে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাব শরীর বোধ হয় ভাল যাচ্ছে না ?"

"কেন বলুন তো ?" প্রশ্নের মধ্যে ভেসে উঠল হেঁচ্‌কা টান। চমকে ওঠার স্বর শোনা গেল অজয়বাবুর গলায়। শুনলেন কিরীটকুমার নাগও।

"ব্যাপার কি অজয়, হোটেলের খাওয়া হজম হচ্ছে না বুঝি ? বাড়ি ঘর একটা করো এখানে, বৌমাকে পাটনা থেকে নিয়ে এস।" বললেন নাগ মশাই।

"কিন্তু এখানে যে কতদিন থাকতে পারব, কিছুই জানি নে। পুনর্বাসনের কাজ ফুরলেই তো দিল্লীতে ফিরে যেতে হবে।"

"পুনর্বাসনের কাজ কবে পর্যন্ত ফুরবে বলে তোমার মনে হয় ?"

"তা ধরো, দু-বছর।"

"তুই কি অন্ধ না কি অজয় ?"

"কেন মামা ?"

"পুনর্বাসনের কাজ ফুরতে একটা শতাব্দী লাগবে। ফাইলগুলো সব ডাস্টবিনে ফেলে দিলে তো চলবে না, ক্লিয়ার করতে হবে।"

ফাইলের আলোচনা শুনে বড়সাহেবের জড়তা অনেকটা কাটল! তিনি

নিজেও তো ফাইলের রহস্য নিয়ে জীবন কাটালেন। জীবন কাটাল মাধব পিওন। বড়সাহেব সহসা যেন অজয় বসুর সঙ্গে একটা নতুন রকমের সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললেন। সম্পর্ক গড়ে উঠল স্বাভাবিক ভাবেই। এঁরা সব অফিসের বড় বড় কর্মচারি। এঁরা ফাইল ক্লিয়ার করেন। মন্ত্রীরা সব হুকুম দিলে কি হবে, হুকুম তামিল করবার কলকাঠি সব এঁদেরই হাতে। এঁদের হাতেই আসল ক্ষমতা। এক মাস আগের হুকুম, ওঁরা ইচ্ছে করলে এক বছর পরেও তামিল করতে পারেন। মন্ত্রীর কানে অভিযোগ আসতে আসতে পার হয়ে যেতে পারে বারোটা মাস! অতএব এঁরাই হচ্ছেন এ-কালের সবচেয়ে ক্ষমতা-শালী শ্রেণী।

বড়সাহেব বললেন, "মানুষ ভাবে, আমরা ইচ্ছে করলেই মিনিটে মিনিটে ফাইল ক্লিয়ার করতে পারি, কিন্তু কাজটা অত সহজ নয়। কি বলেন অজয়বাবু?"

"অজয় কি বলবে বেয়াইমশাই, আমি নিজে জানি না? প্রতি মাসে পাঁচ-শ পাতা 'রায়' লিখেছি, ফাইলের রহস্য কি আমি জানি না? আজ কত দিন হল যে, মিনতি সামান্য কটা টাকার জন্যে গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করেছে? প্রায় ছ-সাত মাস হয়ে গেল। মেয়েটার জামাকাপড় নেই, দুটো শাড়ী পরেই প্রায় এক বছর কাটিয়ে দিলে। তা ছাড়া অজয় যদি এক কলম লিখে দেয়, তবে টাকা পেতে আর ক-দিন লাগে? প্রফুল্লর মত লোক, কলকাতায় বেনামীতে বাড়ি করেছে, অথচ সরকারি-ঋণ পেতে তার তিন মাসও লাগে নি!"

প্রফুল্লর নাম শুনে বড়সাহেব আবার একটু নড়েচড়ে বসলেন। জড়তা আসছিল। অজয়কুমার বসু সহসা পকেট থেকে গোটা-দশ পাঁচ টাকার নোট বার করে বললেন, "ভুলেই গিয়েছিলাম মামা! টেমপোরারি সাহায্য হিসেবে কাল অফিস থেকে পঞ্চাশ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। এই নাও টাকা। মিনতির জন্যে যা যা দরকার সব কিনে দিও। রসিদটা আমি সই করিয়ে নেব পরে।" অজয়-বাবু উঠলেন। টাকাগুলো ছাইদানির তলায় চাপা দিয়ে রাখলেন তিনি। কিরীট নাগ বললেন, "আজ তো রবিবার, তুই বিকেলের দিকে মিনতিকে নিয়ে একবারটি গান্ধী-কাটরায় যা, সেখানে সস্তায় ভাল কাপড় পাওয়া যায়।"

"না মামা, আমার অনেক কাজ আছে। তুমি নিজেই যা হয় করো।" এই বলে অজয়বাবু সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ আবার ফিরে এসে বললেন, "তোমার অসুবিধে থাকলে, এক কাজ করতে পারো।"

"কি কাজ অজয় ?" জিজ্ঞাসা করলেন নাগ মশাই।

"মিনতিদের সেই প্রতিবেশী ছেলেটি তো দেখলুম তোমার ফটকের সামনে বসে আছে। তার সঙ্গে মিনতিকে পাঠিয়ে দিতে পারো। ওরা দুজনে পছন্দ করে কাপড় কিনতে পারবে।" অজয়কুমার বসু সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন নিচে। জুতোর শব্দ পেলেন কিরীট নাগ। শব্দ পেলেন বড়সাহেবও। এবার চটপট উঠে পড়লেন বড়সাহেব। যা জানতে এসেছিলেন তা তিনি জেনেছেন। এখন কেবল লুকু আর পণ্টুদার খবরটা বিজয়ের কাছে লিখে জানাতে কিরীট-বাবুর যা সময় লাগে। সাংসারিক শান্তি যদি মেয়ের কপালে লেখা না থাকে, তা হলে তিনিই বা আর কি করতে পারেন ? ফাইল থেকে এক বিন্দু শান্তি তিনি কুড়িয়ে আনতে পারবেন না। মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে পনরো হাজার টাকাও তাঁর জলে গেল। বেগুসরাই আর দিল্লীর মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি দেখতে পেলেন না। নমস্কার জানিয়ে বডসাহেব নেমে এলেন এক-তলায়। সিঁড়িটার শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে ডান দিকে কলতলাটা দেখা যায়। খোলা কল থেকে জল পড়ছে। জলের শব্দ শুনে বড়সাহেব ডান দিকে চোখ ঘোরালেন। তিনি দেখলেন, মিনতি এক গাদা এঁটো বাসন নিয়ে কলতলায় বসে নিবিষ্ট মনে বাসন মাজছে। ওর হাতের সেই প্ল্যাস্টিকের লাল চুড়ি গাছাও তিনি দেখতে পেলেন। এঁটো বাসনের নোংরা লাগে নি লাল চুড়িতে। শিল্প প্রদর্শনীতে সাজিয়ে রাখবার মত সেই হাতটা থেকে কেবল রঙ-এর শিল্প মুছে গেছে কিরীটি নাগের কলতলায়।

বাইরের রোয়াকের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছিল ভজহরি। তারও সময় নষ্ট হচ্ছে। জয়গোবিন্দর রোগটা মিনিটে মিনিটে বেড়ে যাচ্ছে। ডাক্তার কুণ্ডুর কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌছন দরকার। কিন্তু বাড়ির ভেতর ঢুকতে সে সাহস পাচ্ছিল না। চাকরটা গেছে বাজার করতে। ঝি-টা নেই।

মিনতি আসবার পরে, নাগবাবু ঝি-টাকে তুলে দিয়েছেন। ঝি-টাকে বারো টাকা করে মাইনে দিতে হত। বুড়োকালে বাজেট না কাটলে কেমন করে বাকী জীবনটা কাটাবেন তিনি?

ফটকের কাছে বসেছিল ভজহরি। অজয়বাবু বাড়িতে ঢোকবার সময় ওকে রোয়াকের ওপরে উঠে বসতে বলে গেলেন। বেরুবার সময় তিনি জানিয়ে গেলেন, হাতের কাজ শেষ হলেই মিনতি ওকে ডেকে পাঠাবে। প্রায় আধ ঘণ্টা হয়ে গেল, মিনতিব ডাকেব অপেক্ষায় বসে আছে ভজহরি।

বড়সাহেব বাইরে আসতেই ভজহরি উঠে পড়ল। বড়সাহেবকে ভজহরি চেনে। লুকু দিদিমণির বাবা। মাধবদা এঁরই কাছে পিওনেব কাজ করে। ফাইল টানে, আর এ-অফিস সে-অফিসে জরুরী চিঠি বিলি করে মাধবদা।

বড়সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন "মিনতিকে খবব পাঠিয়েছ?"

"পাঠিয়েছি।" সবিনয়ে স্বীকৃতি জানাল ভজহরি।

"হাতে ওর খানিকটা কাজ আছে, শেষ করেই আসবে।" বড়সাহেব রোয়াক থেকে নিচে নামলেন। ভজহরিকে ভাল করে দেখলেন তিনি। একটা গেঞ্জি পরে এলে কি হবে ছেলেটা ভদ্রলোক। এক-মন মোট বইবার সামর্থ্য তার অস্বীকার করবার নয়, কিন্তু তাতেও সে কুলী হতে পারে নি ববং কুলীর মান বাড়িয়েছে ভজহরি। বড়সাহেব যেন তাঁব সারাজীবনের সাংসারিক বিশ্বাস হারাতে লাগলেন ক্রমে ক্রমে। কুলীব কাজেব মধ্যে মর্যাদা দেখতে পাচ্ছেন তিনি!

"মিনতির সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?" জিজ্ঞাসা করলেন বড়সাহেব।

"সম্পর্ক কিছু নেই—"

"প্রতিবেশী বুঝি?"

"হ্যাঁ, ওদের পাশের ঘরে ছিলুম না বটে, তবে এক শহরেরই লোক।"

"কোন্ শহর?"

"ঢাকা।"

"ঢাকা তো আমারও দেশ। কোন্ পাড়ায় ছিলে?"

'প্রথমে ফরাসগঞ্জ পাড়ায়, তারপরে ! তারপরে জমিদার জগদীশ নাগের বাড়িতে।"

"তাই নাকি? এ বাড়ির মালিক তো জগদীশবাবুর খুড়তুতো ভাই।"

"কি নাম বাবুর?"

'কিরীটকুমার নাগ।"

নামটা শুনে ভজহরি একেবারে চুপ করে গেল। কোন কথাই আর মনে এল না ওর—সমস্তটা মন জুড়ে রইল বৌরানী আর দেবেশ দত্ত। বৌরানী কোনদিনও জানতে পারবে না যে, কিরীট নাগের বাড়িতেই মিনতি বলে একটা মেয়ে বাসন মাজার কাজ পেয়েছে, আর ভজহরি এসেছে তারই কাছে কটা টাকা চেয়ে নেবার জন্যে! পাপ করল না কি সে? বড়সাহেব বললেন, "একদিন এস না আমার ওখানে? দেশের খবর সব শুনব? মাধবের কাছা-কাছি কোথাও থাকো বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার পাঁচ নম্বর, আর মাধবদার হচ্ছে চোদ্দ নম্বর।"

"মাধব আমার অনেক পুরনো লোক। ওর মেয়েটার নাম যেন কি?"

"সরোজিনী।"

"ও, হ্যাঁ, সরোজিনী।"

জীবনে এই প্রথম বড়সাহেব রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর পঞ্চাশ বছরের পুঁজি থেকে দশটা মিনিট খরচ করে গেলেন! কিন্তু দশটা মিনিট নষ্ট হল বলে আজ আর তিনি ভাবলেন না। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর কেবলই মনে পড়তে লাগল মিনতির মুখখানা। মিনতির মুখের পাশে লুকুর মুখটা কী কুৎসিতই না মনে হচ্ছে তাঁর! রাসবিহারী এ্যভিনু পার হয়ে এসে বড়সাহেব ভাবলেন, মিনতির সঙ্গে তিনি ভজহরির বিয়ে দেবেন। টাকা-পয়সা যা লাগে সবই দেবেন তিনি। যাদবপুরের দিকে তিনকাঠা জমি কিনে একটা ছোট্ট বাড়িও তৈরি করে দেবেন ওদের জন্যে। কত টাকা লাগবে? পাঁচ হাজার? পাঁচ হাজারই তিনি খরচ করবেন। পাঁচ হাজারের বাড়িটা হবে ওদের সুখের আশ্রয়। দুটো জীবনের আনন্দ-নিকেতনের কাছে পাটনা-দিল্লী কিছু না।

কিছু না গোটা পৃথিবীটাই। পঁচিশো হাজার জলে গেল বলেই, তিনি মিনতি আর ভজহরিকে দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করবেন। ক্ষতিপূরণ করবার উত্তেজনায় বড়সাহেব ঢুকে পড়লেন কোণার ঐ কাপড়ের দোকানটায়। কোন কিছু বিচার না করেই তিনি কিনে ফেললেন দুটো শাড়ী আর দুটো ব্লাউজ। সন্ধ্যের সময় তিনি নিজে গিয়ে শাড়ী আর ব্লাউজগুলো পৌঁছে দিয়ে আসবেন মিনতির কাছে। মিনতিকে তিনি আর বাসন মাজতে দেবেন না কিরীট নাগের বাড়িতে। ফাঁসির জজকে বড়সাহেব আর কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে বড়সাহেব ভাবলেন, সন্তানের চেয়ে মিনতি তাঁর কম নয়। কাপড়ের বাণ্ডিলটা তিনি বুকে চেপে ধরলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন দু-মিনিট। সদ্য কেনা কাপড় থেকে আনন্দের উত্তাপ অনুভব করতে লাগলেন মাধব পিওনের বড়সাহেব।

সতীশবাবুর সঙ্গে গণ্ডগোল সব মিটে যাবার পরে, মাধব সরোজিনীকে নিয়ে চলে এল তার ঘরের দিকে। উনোনটা দূর থেকে দেখতে পেয়েই সরোজিনী দৌড়ে এসে তাড়াতাড়ি করে ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে ফেলল। ভাত বোধ হয় সব গলেই গেছে! দু-সংসারের হিসেব এক হাঁড়িতে ফুটছে, দু-বার করে ভাত রাঁধতে গেলে সনাতনদার ক্ষতি হয়ে যাবে। হাতায় করে ভাত তুলে সরোজিনী আঙুল দিয়ে ভাতগুলো টিপতে টিপতে বলল, "না বাবা, ভাত নষ্ট হয় নি। কী ভয়ই না পেয়েছিলুম!"

বেলা প্রায় বারোটা অবধি সরোজিনী নিঃশব্দে রান্নাবাড়া সব শেষ করল। মাধব ঘরে থেকে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে মেয়েকে দেখছে। দেখে, বুঝবার চেষ্টা করছে সরোজিনীর মনটা। কি চায় সরোজিনী?

মাধব এল বাইরে। চিংড়িমাছের রান্নাটা শেষ করে সরোজিনী কড়াইটা নামিয়ে রাখল। মাছের দিকে ও আর দৃষ্টি দিচ্ছে না। সরোজিনী চেয়েছিল দুধ-ভর্তি গেলাসটার দিকে। রাত জাগছে হরিদা। কোথায় এবং কি যে

সে খাচ্ছে সরোজিনী তার খবর রাখে না। জয়গোবিন্দর জন্যে ভাবনার তার শেষ নেই। জয়গোবিন্দর সঙ্গে হরিদার তেমন ভাব ছিল না। অথচ বিপদের সময় হরিদাই কেবল তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বস্তিতে এতগুলো লোক থাকা সত্ত্বেও, কেউ একবার চার নম্বরে ঢুকে জয়গোবিন্দকে দেখে আসে নি। সরোজিনী ভাবলে, হরিদা ভদ্রলোক বলেই যক্ষ্মা-বোগীর বিছানার পাশে গিয়ে বসতে পেরেছে। কাজ কামাই দিতে সে একটুও ভাবে নি। টাকা সনাতনদার কাছে যত বড় ভগবানই হোক, হরিদার কাছে তা চিবদিনই হাতের ময়লার মত তুচ্ছ হয়েই রইল। এমন মানুষটাকে মিটিং করে বস্তি থেকে তাড়িয়ে দিলে ডব্‌সন বোডেব লাভ হবে কি?

"বসে বসে কি ভাবছিস্ সবোজিনী? সতীশবাবুদের কথা বুঝি?" জিজ্ঞাসা করল মাধব।

"না বাবা, ভাবছিলুম হরিদার কথা। আমাদের বস্তিতে এমন মানুষ আর একটিও নেই।"

"নেই?"

মাধবের প্রশ্ন শুনে সরোজিনী সতর্ক হল। তাড়াতাড়ি করে সে বলে ফেলল "সনাতনদার কথা অবশ্যি আলাদা।—আচ্ছা বাবা, বড়সাহেবকে বলে কয়ে হরিদার জন্যে তোমাদেব অফিসে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারো না?"

"ভাল কবে ধরলে হয়তো পারা যায়। কিন্তু তাতে হয়তো বস্তিটারই ক্ষতি হবে।"

"হরিদা চাকরি পেলে বস্তির ক্ষতি হবে কেন বাবা?"

"সে এখানে আর তবে থাকবে না, ও পাড়ায় উঠে যাবে।"

"না, তা হলে বড়সাহেবকে বলতে যেও না।" আলোচনার ওপর উপসংহার টানল সরোজিনী। মাধব কিন্তু ব্যাপারটা আরও একটু বেশি করে বুঝবার জন্যে মন্তব্য করল, "ভজহরিকে ধরে রেখে লাভই বা কি? আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু সে এখান থেকে চলেই যাবে। দুঃখের দিনে ভদ্রলোকেরা এখানে

আসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। তারপর, সুযোগ পেলে, ওরা চলে যায়। এখানকার কোন কথাই আর মনে রাখে না।"

"হরিদা কিন্তু আমাদের ভুলতে পারবে না বাবা।"

"কেন? আমরা তার জন্যে কিছুই তো করতে পারি নি।—ভজহরি আমাদের মনে রাখবে যতদিন না আমি ওর টাকাগুলো শোধ দিতে পারি।"

"টাকার কথা হরিদার মনেই থাকে না। আমার চেয়ে তাকে তুমি বেশি করে চিনতে পারো নি বাবা। আমি বলছি, সে আমাদের কোনদিনও ভুলতে পারবে না।"

"তা হলে মিটিং করে ভজহরিকে এখান থেকে তাড়াবার আর দরকার নেই। দু-একজন ভদ্রলোক এখানে থাক। কি বলিস্?"

"হ্যাঁ, সেই ভাল। সনাতনদাকে বলে আজ না হয় একটা উল্টো মিটিং ডাকা হোক।"

সনাতন এসে দাঁড়াল দাওয়ার সামনে। সরোজিনী তাকে দেখতে পেয়েই বলল, "বাবা, তোমরা দু-জন এক সঙ্গেই বসে পড়ো। চান করো নি?"

"আজ একেবারে বিকেলবেলায়ই চান করব। ছুটির দিনটায় নিয়মকানুন আর মানতে ইচ্ছে করে না। দে, ভাত দে।"

মাধব ও সনাতন দু-জনে পাশাপাশি বসল। সরোজিনী খাবারের যোগাড় দেখতে লাগল।

খেতে বসবার আগেই মাধব ঠিক করে রেখেছিল যে, সে দুটো চিংড়ি মাছ খাবে না। সরোজিনী কেন যে দুটো মাছ বাজার থেকে বেশি আনিয়েছে মাধব তা জানে না। হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে সে ভজহরিকে খাওয়াতে চায়। মাছ খেতে খেতে সনাতন বলল, "এরকমের রান্না আজ প্রথম খেলুম। চমৎকার হয়েছে!"

"আর একটা মাছ দেব সনাতনদা?" জিজ্ঞাসা করল সরোজিনী।

"হ্যাঁ, সনাতনকে আর একটা দে।" বলল মাধব।

"তুমি তো বাবা মাত্র একটা খেলে ? মাথা পিছু দুটো করে তো হিসেব করা ছিলই। তার উপরে দুটো মাছ তুমি বেশি এনেছ। তোমায় আর একটা দিই বাবা ?"

"না, সনাতনের থালায় দে।"

সরোজিনী সনাতনের থালায় আরও একটা মাছ দিয়ে বলল, "ছুটির দিন, তুমি ভাল করে খাও সনাতনদা।"

"রান্না যা হয়েছে, আমায় লোভ দেখিও না!"

"কেন, আরও তো চারটে মাছ আছে, কে খাবে ?"

আর কেউ নেই শুনে সনাতন খুশী হল। সনাতন অনেকক্ষণ আগেই দেখতে পেয়েছিল যে, কড়াইতে অনেকগুলো মাছ রয়েছে। অথচ মাথা পিছু দুটো করে মাছের হিসেব করেছে সরোজিনী। বাকী মাছ সে কাকে খাওয়াবে ? একটু পরীক্ষা করে দেখবে নাকি ? তাই তিনটে মাছ খাওয়ার পরে, সনাতন মাধবের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি মাত্র একটা মাছ নিলেন কেন ? মাছ তো রয়েছে ?"

"বুড়ো মানুষের পক্ষে চিংড়ি মাছটা ভাল নয়। মাছ যদি বেশি থাকে, তবে সনাতনকে আরও দে না সরোজিনী।" মাধবও পরীক্ষা করে দেখছে যে, তিনটে মাথার পরে চতুর্থ মাথার হিসেব কিছু আছে কি না। কড়াইটা সামনের দিকে টেনে নিয়ে এল সরোজিনী। আগ্রহ করে টানল, না রাগের মাথায় কড়াইটাকে কানে ধরে সামনের দিকে সে টেনে নিয়ে এল, মাধব কিংবা সনাতন পরিষ্কারভাবে তা বুঝতে পারল না।

মাধব বলল, "সরোজিনী আজ খুবই মনোযোগ দিয়ে রান্না করেছে।"

"ছুটির দিন তো।" বললে সনাতন, "ছুটির দিনটা কি করে কাটানো যায় তাই ভাবছি। ডব্‌সন রোডের অনেক জায়গায় দেখলুম বড় বড় বিজ্ঞাপন পড়েছে, বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপন। 'পল্লীসমাজ' আরম্ভ হয়েছে শুক্রবার থেকে। খুব ভিড়। আপনার কোন কাজ আছে না কি সন্ধ্যের দিকে ?" মাধব কোন জবাব দেওয়ার আগেই সরোজিনী ঘোষণা করল "পড়েছি

ব...খানা। ও সব বামুনদের ঠাট্টা ইয়ার্কী দেখতে আমার ভাল লাগে না। এসব বায়স্কোপ দেখে তুমি কি করবে বাবা? বুড়োকালে তুমি কাঁদতে বসবে না কি?”

“না, আমায় তো একবার বিপিন পাল রোডে যেতে হবে। তুই যা না সনাতনের সঙ্গে—বায়স্কোপ তো ভাল জিনিস।”

সনাতন বললে, “ছুটির দিনটার পক্ষে বায়স্কোপ দেখাটা মন্দ নয়। খুব ভিড়! সন্ধ্যের শো-তে যেতে হলে এক্ষুনি গিয়ে টিকিট কাটতে হবে।”

“আর একটা মাছ খেয়ে যাও সনাতনদা, আরও তো চারটে আছে।”

“চারটে? তুমি খাবে না?

“তিনটে রইল।” এই বলে সরোজিনী হাতায় করে দুটো মাছই তুলে দিয়ে দিল সনাতনের থালায়। সনাতনের মনে হল, সরোজিনী ইচ্ছে করেই আজ হিসেবের মধ্যে ভুলের সৃষ্টি করছে। পাঁচটা মাছ সে একাই খেল, খাওয়ালো সরোজিনীই।

“রান্না যে এত ভাল হতে পারে, আজ আমি প্রথম বুঝলুম।”

সনাতন ইচ্ছে করেই বায়স্কোপের আলোচনাটা বন্ধ করল, যেন টিকিট কাটার সিদ্ধান্ত পাকা হয়েই গেছে। সরোজিনীকে নিয়ে ‘পল্লীসমাজ’ দেখতে যাওয়া সম্বন্ধে যেন কারু কোন আপত্তি নেই। সনাতন দুটো চিংড়ি মাছই পুরে দিল মুখের মধ্যে। তাড়াতাড়ি করে সেখানে পৌছুতে না পারলে টিকিট পাওয়া যাবে না।

সরোজিনী সনাতনের দিকে চেয়ে বলল, “ভাল জিনিস আস্তে আস্তে খেতে হয়।—রেণু বৌদি বলেছেন, আরও অনেক রকমের ভাল ভাল রান্না তিনি আমায় শিখিয়ে দেবেন। বাবা, আসছে রবিবারে তুমি মাংস নিয়ে আসবে। দোপেঁয়াজী রাঁধব। রেণু বৌদির রান্না সনাতনদার ভালই লাগবে।” সরোজিনীর খোঁচাগুলো মাধবের পছন্দ হচ্ছিল না। যার সঙ্গে বিয়ে হবে আজ বাদে কাল, তাকে খোঁচা দিয়ে লাভ কি? সতীশবাবুদের মত লোকেদের জন্যে সনাতন কেন যাবে দরদ দেখাতে? অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বলে সতীশবাবু

অমন ভালমানুষটি সেজে বসে আছে। আবার যখন অবস্থা ভাল হবে, তখন ওরাই তো আর মাধবদের মানুষ বলে গণ্য করবে না!

সনাতনকে সাহায্য করবার জন্যেই যেন মাধব বলল, "দোপেঁয়াজী খেয়ে আমাদের কাজ নেই সরোজিনী। ওসব বড় মানুষদের রান্না আমরা হজম করতে পারব না। হাজার হলেও সতীশবাবুরা আমাদের শত্রু, আমাদের যম হচ্ছে ওরাই। ওকি সনাতন, তুমি যাচ্ছ না কি?"

"হ্যাঁ। বড্ড বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, একটু ঘুমুতে হবে না?"

"বেশ তো, টিকিট দুটো আগে কেটে নিয়ে এস—"

"টিকিট?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বায়স্কোপের টিকিট।" মাধবের স্বরে উষ্মা।

"বাবা, আজ কি করে বায়স্কোপ যাই?"

"আলবৎ যেতে হবে। রবিবার ছাড়া সনাতনের ছুটিছাটা থাকে না ছুটির দিনটা কেন সে নষ্ট করবে? সনাতন, চলেই গেলে যে?"

"টিকিট কাটতে যাচ্ছি।" দূর থেকেই বলল সনাতন। মাধব আর কোন কথা না বলে হাতমুখ ধুয়ে চলে গেল ঘরের মধ্যে। শুয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। দরজার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে সে চেয়ে দেখতে লাগল, সরোজিনী ভাত খেতে বসল কি না।

বসল। ডাল দিয়ে সবটা ভাতই সে মেখে অন্যমনস্ক ভাবে খেতে লাগল। খাওয়ার প্রতি ওর একটুও মনোযোগ নেই। কেন নেই? বাপ হয়ে সে কেমন করে মেয়ের এই অন্যমনস্কতা সহ্য করবে? বড়লোকদের মেয়ের মত সরোজিনী কেন অন্যমনস্ক হতে যাবে? বিয়ে করবে একজনকে আর মনে মনে চিংড়ি মাছ খাওয়াবে অন্য একজনকে? এ অন্যায়। ভীষণ অন্যায়। বিপিন পাল রোডে যা হয়, এখানে তা হবে কেন? দিল্লীতে বসে বিজয়বাবু ঠকছে বলে সনাতন কেন ঠকবে? সনাতনের লাইফ-হিস্‌টিরি সরোজিনী জানে না। যতটুকু খবর সে সনাতনের মুখ থেকে শুনেছে তাতেই মাধব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে, এক সময়ে সনাতনও ভদ্রলোক ছিল। বড়লোকদের অত্যাচারের

জন্যে সে ছেলেবেলায় খেতে পায় নি, লেখাপড়া শিখতে পারে নি। বাপ মা সব হঠাৎ মরে গেলেন। আত্মীয়স্বজনরা কেউ তাকে জায়গা দেয় নি। বড় ভাই না কি স্বদেশী করত। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। সেই জন্যে সনাতন কোথাও জায়গা পায় নি। ভেসে গেছে কলকাতার নর্দমা দিয়ে। বড় বোন একজন ছিল বলে সনাতন মার কাছে শুনেছিল। বিয়ে হয়েছিল একজন দেশপ্রেমিকের সঙ্গে। বড়দার দলের লোকই ছিল সে। কিন্তু দুটো বাচ্চা নিয়ে বড়দি বিধবা হয়। চলে যায় কলকাতা ছেড়ে। কোথায় গিয়ে বড়দি শেষ পর্যন্ত ঠেকল, সনাতন তা জানে না। জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পরে সে খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু খোঁজ সে পায় নি। আরও একজন বোন ওর ছিল। তারই কোলে সে মানুষ হয়েছিল। সুকুমারীদি। মার কাছে শুনেছে, মোটরগাড়ির তলায় চাপা পড়ে সে মারা গেছে। সনাতনেরও চাপা পড়বার কথা ছিল। বস্তি থেকে বেরিয়ে সনাতনকে কোলে নিয়ে সুকুমারীদি পার্কে যাচ্ছিল বেড়াতে। কিন্তু অতদূর পর্যন্ত সে আর যেতে পারে নি। মোটরগাড়িটা সংসারের বোঝা দিল কমিয়ে। বাবুদের বাড়িতে বাসন মেজে মা সনাতনকে মানুষ করে তুলবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু তাও হল না। দুঃখ, লজ্জা এবং অপমান সহ্য করে মাও তার বেশি দিন বাঁচেন নি। বিক্রম-পুরের রঘু দত্তের বংশটা যে শেষ পর্যন্ত কাপড়ের কলে আশী নম্বর সুতোর মতো সরু হয়ে পড়বে, সনাতন তা ভাবতে পারে নি। শহর কলকাতায় বসে সে-সব কথা ভাবতে গেলে, সুতোর মত সরু হয়েও সনাতন বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারত না। সুতোর কারিগর সনাতন। বিশ থেকে একশ বিশ নম্বর পর্যন্ত সুতো সে তৈরি করে। মধ্যবিত্তের বাবু-রক্ত সে ধুয়ে ফেলতে চায়। ধুয়ে ফেলবার প্রয়াস তার প্রতি পলের সাধনা। সাধনা তার সার্থক হচ্ছে নিশ্চয়ই। নইলে সে পচে মরত মোটা মোটা ফাইলের মধ্যে। সনাতন আজ জানে, সুতো তার যতো সরুই হোক, সুতোর মধ্যে শক্তির তুফান রয়েছে বাঁধা। ছেঁড়া নেকড়ার মত বাবু সেজে সনাতন কাপড়ে তালি লাগাচ্ছে না। কোটি কোটি গজ সুতোর মত কোটি কোটি শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির অংশ সে।

রঘু দত্তের চতুর্থ পুরুষ আজ উন্নতির রাস্তা, ধরেছে। প্রতিশোধের অস্ত্র তৈরি করছে তাঁরই প্রপৌত্র শ্রীসনাতন দত্ত।

মাধব বিছানায় শুয়েই দেখতে পেল, সরোজিনী একটা মাছও খেল না। হাত মুখ ধুয়ে এসে মাছ দুটো নামিয়ে রাখল বাটিতে। কড়াই থেকে সবটুকু ঝোলই ঢেলে দিল ওতে। মাধবের পক্ষে চুপ করে শুয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। বড়সাহেব যা পারেন, মাধব তা পারে না। সনাতনকে ঠকতে দিতে পারে না মাধব পিওন। সরোজিনী অন্যায় করছে, ঘোরতর অন্যায়! চিংড়ি মাছের মধ্যে সনাতনের অংশ রয়েছে। রয়েছে হিসেব। এ-মাছ ভজহরিকে খাওয়ালে পাপ হবে নিশ্চয়ই।

সরোজিনী বাটি-টা হাতে নিয়ে দাওয়া থেকে রাস্তায় নামল। মাধব আর থাকতে না পেরে বেরিয়ে এল বাইরে। ডাকল, "সরোজিনী।"

সরোজিনী তখনও পা বাড়ায় নি যাবার জন্যে। ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েই সে জিজ্ঞাসা করল, "কি বাবা? ঘুমোও নি এখনও?"

"কি করে ঘুমব? তুই পাপ করছিস। নিশ্চয়ই পাপ করছিস। সনাতনের লাইফ-হিস্টিরি তুই জানিস না। সনাতন ভজহরির চেয়ে অনেক বড় বংশের ছেলে।"

হতভম্বের মত অবাক-দৃষ্টি ফেলে সরোজিনী চেয়েছিল মাধবের দিকে। সে জিজ্ঞাসা করল, "পাপ করছি আমি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই। চিংড়ি মাছ নিয়ে চললি তুই, আর পাপ করলুম আমি না কি?"

"এটাতো আমার ভাগের চিংড়ি বাবা।"

"ভাগ? তোর ভাগ এল কোত্থেকে? আমার আর সনাতনের ভাগ ছাড়া এতে আর কারু ভাগ নেই।"

"একটা মাছের মধ্যেও আমার ভাগ নেই বাবা?"

"না, নেই।"

"আধখানা মাছে?"

"কি করে থাকবে? তুই কি রোজগার করিস্ নাকি?"

"আমি যে বিনে মাইনেতে রান্না করি বাবা? মেহনত যখন করছি, তাব কি এক পয়সাও দাম থাকবে না?"

"কি বললি? বাপ স্বামীকে খাওয়াচ্ছিস্, তার জন্যে মাইনে দিতে হবে? বাখারিটা গেল কোথায়—" মাধব রাগেব মাথায় বাখারি খুঁজতে খুঁজতে পুনরায় বললে, "ভজহরিকে আজ আমি দেখে নেব। মেহনত করলেই যে তার মজুরি একটা থাকতেই হবে, সেটা সে বুঝতে পারবে পিঠের চামড়ায় হাত দিলেই। কই, বাখারিটা কই?" মাধব চেঁচিয়ে মেচিয়ে রবিবারের বস্তিটাকে সজাগ কবে তুলল। সরোজিনী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। একটা কথারও সে জবাব দিতে পারল না। বাখাবি কোথায়, সে কি করে জানবে? বাড়ি-ওয়ালা তো বাখারি দিয়ে বেড়া তৈবি কবেছে, ফালতো কোন বাখারি সে ফেলে যায় নি। সরোজিনী কথার কোন জবাব দিচ্ছে না বলে মাধব উন্মাদেব মত গেল বেড়া থেকে বাখাবি ভাঙতে। এমন সময় সনাতন এসে উপস্থিত হল। এসে সে বললে, "পেয়েছি।"

"এঁ্যা, কি পেয়েছ?" ঘুরে দাঁড়াল মাধব।

"টিকিট। অতি কষ্টে দুটো টিকিট পাওয়া গেল। কী ভিড আজ!"

টিকিট দুটো দেখতে গিয়ে মাধব দেখল যে, সতীশবাবুর পাঁচ বছরের ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে সরোজিনীর সামনে। সরোজিনীর হাতে ধরা বাটিটার দিকে চেয়ে ছেলেটা বলল, "দিদি, আমি আর ভুতো বসে আছি, মাছ দেবে বলেছিলে যে?"

সরোজিনী চুপ করে তবু দাঁড়িয়ে রইল। মাধব হাত দিয়ে তার নিজেব মাথার চুলগুলো সব ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। এতগুলো পাকা চুল মাথায় জমিয়ে রেখে লাভ কি? কেউ কোন কথা বলছে না দেখে সতীশ-বাবুর ছেলেটা চলে যাচ্ছিল। সনাতন ফস্ করে মাছের ঝোলের বাটি-টা সরোজিনীর হাত থেকে নিয়ে বললে, "চলো, আমি গিয়ে দিয়ে আসছি। এ-মাছের মধ্যে আমারও অংশ আছে খোকা।"

মিনতির কাছ থেকে ভজহরি মাত্র দশটা টাকা পেল। ওর কাছে দশটা টাকাই লুকনো ছিল। গেল মাসে বিশু ওকে লুকিয়ে দশটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল ওর মাইনে থেকে। সামান্য টাকাই সে পায়। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বারো বছর বয়সের ছেলেটাকে কাজ শিখতে হচ্ছে। আর বারো বছর বয়সে ভজহরি তো এক রকম বৌরানীর কোলে বসে সময় কাটিয়েছে পরমানন্দে !

মিনতি জানে, সে মাসিক পাঁচ টাকা করে মাইনে পাচ্ছে জজ সাহেবের বাড়িতে। কিন্তু টাকা সে হাতে পায় না। ওর নামে না কি জজসাহেব সব টাকাই জমিয়ে রাখছেন ব্যাঙ্কে। তা ছাড়া অজয়দা যে আজ পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে গেলেন, তাও সে নিজের হাতে পায় নি। জজসাহেবের কাছে মিনতি টাকা চাইতে গিয়েছিল। তাঁকে সে বুঝিয়ে বলেছিল যে, খুবই বিপদের সময় হরিদা একশটা টাকা ওদের ধার দিয়েছিল। এ-টাকা তার শোধ দেওয়া উচিত। কিরীট নাগ বিচার করে বললেন যে, পাওয়া উচিত নয়। মিনতির যতদিন না সুখের দিন আসছে, ততদিন পর্যন্ত কুলীটাকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। দুঃখের দিনে যারা টাকা ধার দেওয়ার বাহাদুরী দেখায়, তারা আবার দুঃখ শেষ না হতে টাকা ফিরিয়ে চায় কি করে ? তা ছাড়া, মিনতির জন্যে কাপড়চোপড় কিনতে হবে। ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজ করতে হলে পরিষ্কার কাপড় পরতে হয়। স্ত্রীর হাত-পা টিপে দেবার জন্যে ওকে বসতে হয় বিছানার পাশে। এর ওপর আবার নীতি দুর্নীতির ব্যাপার আছে। গভর্ণমেণ্ট টাকা দিয়েছে ধার শোধ দেবার জন্যে নয়, রিফিউজীদের নিজের সুখ সুবিধার জন্যে। এক-তলার রোয়াকে বসে লোকটা ঠকাবার মতলব করছে।

দশটা টাকায় কোন কাজ হবে না বলে ভজহরি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "এ টাকা ক-টা তোমার কাছেই থাক। আমি দেখছি, অন্য কোথাও পাই কি না।—এ বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে নতুন ঠিকানায় যাচ্ছ না কি ?"

"বোধ হয় আর যাওয়ার দরকার নেই। অজয়দা বলে গেলেন যে, জজ-

সাহেবের বাড়ির চেয়ে বেশি নিরাপদের জায়গা আর কোথাও নেই। হঠাৎ তিনি মত বদলে ফেলেছেন। তুমি চলে যাচ্ছ না কি হরিদা?"

"হ্যাঁ।"

"আবার কবে আসবে?"

"আসব—দেখি আবার কবে পর্যন্ত আসতে পারি। তুমি তো ভালই আছ।"

"ভালো? না, ভালো নেই হরিদা।"

"কেন? বাসনটাসন মাজতে হয় বলে বুঝি?"

"না। তুমি যদি কুলীর কাজ করতে পারো, আমার তবে বাসন মাজতে লজ্জা হবে কেন?"

"তবে?"

দো-তলার বারান্দা থেকে কিরীট নাগ ডাকতে লাগলেন, "মিনতি, মা মিনতি কোথায় গেলে?"

"জজসাহেবের এবার ওভালটিন খাওয়ার সময় হয়েছে। আবার এস হরিদা।"

"আসব।" ভজহরি রোয়াক থেকে নেমে এল। বেরিয়ে এল সরু রাস্তা দিয়ে।

প্রায় সারা দিনটাই ভজহরি নষ্ট করল হাঁটতে হাঁটতে। যতীন দাস রোড থেকে পায়ে হেঁটে সে এল হাওড়া পর্যন্ত। ময়দানের মধ্যে দিয়ে আসবার সময় ওর নজরে পড়ল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা। চূড়োটা খুবই উঁচু বলে মনে হল ওর। ঢাকেশ্বরী দেবীর মন্দিরটার চেয়েও উঁচু এর মাথাটা। সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে বসে থাকলে কেমন হয়? সেই বড় লোক মারওয়াড়ীকে খুঁজে বার করতে পারলে, জয়গোবিন্দর একটা সুরাহা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাঁকে তো সে চেনে না? তা ছাড়া বড়লোকেরা হাওয়া খেতে আসেন বলে প্রত্যেকদিনই যে হাওয়া খাবেন তেমন নিয়ম কিছু নেই। বড়লোক তো ভজহরির কাছে নতুন বিস্ময় নয়। সত্যিকারের বড়লোক সে দেখেছে।

কর্তাবাবুর মত বড়লোক কলকাতায় নেই নিশ্চয়ই। নেই বাংলাদেশেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনেই বা থাকবে কি করে? লাখ লাখ টাকা থাকলেই মানুষ বড়লোক হয় না। কর্তাবাবু তো এখন ভাড়াটে বাড়িতে দু-খানা ঘর নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন, তাই বলে তিনি গরীব নন। তিনি আজও বড় হয়ে আছেন।

ডব্‌সন রোডে ফিরে আসতে ভজহরির প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। দুপুর বেলা দু-আনার ভাজা ছোলা খেয়েছে। এখন বোধ হয় তাও আর পেটে নেই, হজম হয়ে গেছে। তা হোক। জয়গোবিন্দকে এবার কোন রকমে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারলেই, ডিউটি ওর ফুরবে। তারপরে, রাত্রিতে হোটেলে গিয়ে পেটভরে রুটি-তরকারি খেলেই চলবে। এখন সে যাবে সরোজিনীর কাছে। সকাল বেলাকার দুধটা নিশ্চয়ই সে ফেলে দেয় নি। যক্ষ্মাকে ওরা ভয় পায়। সনাতনদার জন্যে ওদের খুবই ভাবনা। ভাবনা হওয়াই তো স্বাভাবিক। নতুন ঘর সংসার করতে যাচ্ছে, স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখাই উচিত। সনাতনদার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ভজহরি আর কথা কইবে না। কে জানে, ওর গেঞ্জির মধ্যে হয়তো জয়গোবিন্দর যক্ষ্মারোগের বীজাণুগুলো এসে বাসা বেঁধেছে। অতএব সনাতনদা আর সরোজিনীর সুখের বাসা থেকে ওর উচিত দূরে সরে থাকা।

"জয়গোবিন্দ --" ভজহরি চার নম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে একেবারে অবাক্ হয়ে গেছে! ব্যাপার কি? ঘরের দরজায় নতুন একটা তালা লাগানো রয়েছে। বেড়ার গায়ে লাগানো রয়েছে একটা নোটিশ। নোটিশটা পড়ল ভজহরি। লেখা রয়েছে, 'ঘর ভাড়া দেওয়া যাইবে। ইতি ম্যানেজার।' কি হল?

ভুজঙ্গের বৌ দাওয়ায় বসে চুল বাঁধছিল। বারো নম্বরের ঘরের কোণায় একটা বারোয়ারি তুলসীগাছ ছিল। চার ইঞ্চি জায়গা নষ্ট হচ্ছে বলে সনাতনদা কতদিন আক্ষেপ করেছে। আজ ভজহরি দেখল, বস্তির মেয়েরা তুলসী তলায় দাঁড়িয়ে কেউ প্রদীপ দিচ্ছে কেউ শাঁখ বাজাচ্ছে। · জয়গোবিন্দর খবর যেন

এরা কেউ রাখে না বলেই মন হল ভজহরির। প্রতিদিনকার মত আজকের আবহাওয়াও স্বাভাবিক।

হাঁটতে হাঁটতে ভজহরি এল চোদ্দ নম্বরের দিকে। মাধবদার ঘরেও তালা লাগানো। রান্নার কোন জিনিসপত্র দাওয়ার ওপরে একটাও নেই। এমন কি উনোনটা পর্যন্ত উধাও হয়েছে ওখান থেকে! অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সব জিনিসই সরোজিনী ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে গেছে। একটা কুটো পর্যন্ত যেন ভজহরি ছুঁতে না পারে, তার সব রকম ব্যবস্থার প্রতি নজর পড়ল ওর। এ ভালই হল। সনাতনদার মত সরোজিনীও দরজা বন্ধ করেছে। ভিখারির দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রেখেছে ওদের যাবতীয় গোপন ঐশ্বর্য। ভজহরি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল একটা। ফেলল এই ভেবে যে, ওর নিজের ঐশ্বর্যটুকু সে কারু কাছ থেকেই গোপন করে রাখে নি। বড়লোকদের টাকার পুঁজি যেমন সাধারণের কাজে লাগে না, তেমনি সরোজিনী কিংবা সনাতনদার মনের পুঁজিও কাজে লাগবে না কারুর, নষ্ট হয়ে যাবে তালা-বন্ধ ঘরে।

হঠাৎ ওর নজর পড়ল দাওয়ার বাঁ দিকের কোণায়। গেলাসটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে। দুধটা সব গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে গেছে মাটিতে। আশপাশের কুকুরগুলো খবর পেলে এখানে এসে ভিড় জমাত। ভজহরির মনে হল, সরোজিনীরা দরজা বন্ধ করে চলে গেছে একটুখানি আগেই।

খালি গেলাসটা হাতে নিয়ে ভজহরি ফিরে এল নিজের ঘরে। কারু কাছেই সে কোন কিছু জানতে চাইল না। কি করবে জেনে? জয়গোবিন্দকে এরা এতগুলো লোক যখন ধরে রাখতে পারে নি, তখন সে একলা কি করে ধরে রাখত? এখানকার সবাই সনাতনদার কথায় ওঠে বসে। তাকে ভয় করে এবং শ্রদ্ধাও করে। চার নম্বরে যক্ষ্মা হয়েছে বলে ছ-নম্বরের ভয় সবচেয়ে বেশি। এতবড় বস্তিটার মধ্যে সবাই কেবল ছ-নম্বরটাকে দেখতে পায়। বড্ড অসহায় বোধ করতে লাগল ভজহরি। পালিয়ে যাবে নাকি?

টিনের স্যুটকেসটার সামনে নতজানু হয়ে বসল ভজহরি। নাগ-বাড়ির

বিগ্রহের কাছে সে প্রার্থনা করল, জয়গোবিন্দর অসুখটা যেন ভাল হয়ে যায়। ভাল হয় যেন সরোজিনী আর সনাতনের অসুখও।

কি মনে করে ভজহরি সুটকেস থেকে বৌরানীর ডায়ারী বইখানা বার করে নিল। সরোজিনী জানে না, দু-দিন বাদ যাকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার জন্যে গড়পারের রাস্তায় একদিন এক ফোঁটাও দুধ পাওয়া যায় নি। সেই জন্যে বৌরানী, কেবল বৌরানীই সারাটা জীবন ধরে সুকুমারীর হাতে খালি গেলাসটা দেখে গেল! আর আজ যদি সে এখানে উপস্থিত থাকত?

ডায়ারী বইটার মাঝখান থেকে একটা পাতা ওলটাতে গিয়েই ভজহরি পুনবায় চলে এল ঢাকায়—খণ্ডিত বাংলার পুবনো শহরে।

ষষ্ঠ খণ্ড

কোথা থেকে কে যে কখন্ এবং কেন নাগ বাড়ির পুরনো ব্যবস্থা সব ওলোটপালোট করে দিচ্ছে বৌরানী তার খবর রাখল না। ফজ্‌লুকে জবাব দেওয়া হয়েছে অনেকদিন আগেই। বড়কর্তার আমলে সে এসেছিল নাগ-বাড়িতে কাজ করতে, যাওয়ার সময় সে সম্মান নিয়ে যেতে পারে নি। ভজহরির কাছে বৌরানী শুনল যে, ফজ্‌লুর অপরাধ কর্তাবাবু ক্ষমা করেন নি। কি অপরাধ ছিল ফজ্‌লুর? ভজহরি রমাকান্তের কাছে শুনেছে যে, ফজ্‌লু না কি রাত করে যখন তখন বৌরানীকে নিয়ে ওস্তাদজীর বাড়ি যেত। সারা শহরে না কি বৌরানী আর ওস্তাদজীকে নিয়ে অনেক রকমের গল্প চালু হয়েছে।

মধ্যবিত্ত সমাজের বৌ-ঝিরা দুপুরবেলায় বৌরানী আর ওস্তাদজীর গল্প নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে। দু-একজন ভদ্রলোকস্বামীকে এই নিয়ে কথা শুনতে হয়েছে।

"কলকাতা থেকে হাজার হাজার খবরের কাগজ আসে, কিন্তু তাতে খবর থাকে কই?"

অফিসে যাওয়ার মুখে স্বামী আশ্চর্য হয়ে বলেন, "ইংরেজরা হেরে যাচ্ছে, খবরের আর অভাব কি? গান্ধীজী জেলে বসে থাকলে হবে কি, ওদিকে যে সুভাষ বসুর অনেক খবর বেরুচ্ছে। আর কি খবর চাও তোমরা?"

"ওগুলো আবার খবর না কি? ওস্তাদজীকে জগদীশবাবু পাড়াগাঁ-এ পাঠিয়ে দিলেন কেন্? বৌরানীর সময় কাটছে কি করে? বৌরানী কতদূর

এগিয়েছিল তার কোন খবরই তো থাকে না। পয়সা নষ্ট করে খবরের কাগজ কিনে তবে লাভ হল কি ?"

"ইংরেজরা এদেশ থেকে চলে না গেলে, ওসব খবর ছাপবার জায়গা হবে না কাগজে।" জবাব দিলেন স্বামী।

"কেন হবে না শুনি ? ইংরেজরা তো কেবল দেশটা দখল করেছে, খবরের কাগজ তো দখল করে নি ? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চেয়ে বৌরানীর যুদ্ধটা কম কিসে ? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থামবে কবে গো ?"

"থেমে যাবে—এই যাঃ, দশটা যে বেজে গেল ! হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম ? যুদ্ধ ? থেমে যাবে, শীগগিরই থেমে যাবে। এদেশ থেকে ইংরেজদের পালাতেও হবে। তখন কাগজে অনেক খালি জায়গা থাকবে। আমি চলি—" "একটু দাঁড়াও। ইংরেজরা চলে গেলে, স্বদেশী নেতারা তো সবাই আবার আসবেন। তখন যদি আবার জায়গা না হয় ?"

"হবে, আমি বলছি হবে। তাছাড়া নাগ বাড়িতে যা ঘটছে, সে তো নতুন ব্যাপার নয়। জগদীশবাবুর ঠাকুরমা বিয়ের পরে পালিয়ে গিয়েছিল ডাকাত রঘু দত্তের সঙ্গে। ধনপতি নাগ যুদ্ধ করে বৌ-কে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু বুড়ী গঙ্গার জলে বৌটাকে তিনি গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন।"

"ওমা ! বলো কি ? সেই জন্যেই বুঝি গঙ্গাটা বুড়ী হয়ে গেছে ? অফিস তোমার ক-টায় ছুটি হবে গো ? পাঁচটার একটু আগে আসতে পারবে না ? গল্পটা সব শুনব। অফিসের কাউকে জিজ্ঞাসা করো না, বৌরানী কতটা এগিয়েছিল ? জানো, বড়কর্তার আমলের কোচোয়ান ফজ্‌লু শেখ—তাকে জগদীশবাবু বরখাস্ত করেছেন ?"

"কেন ?"

মুচকি হেসে গলার স্বর একটু নিচু করে বৌ বলল, "ফজ্‌লুই তো বৌরানীকে নিয়ে যেত ওস্তাদজীর বাড়িতে।···জগদীশবাবু টেরই পান নি যে বৌরানী রাত্তিরে বাড়ি থাকে না।"

"তোমরা টের পেলে কি করে?"

"ওমা, ফরাসগঞ্জের সবাই যে দেখেছে—সেই জন্যেই তো ফজ্‌লুর চাকরি গেল। সেই জন্যেই যে জগদীশবাবু ঘোড়াগুলোকে বেচে দিয়েছেন, গাড়িটা বেচে দিয়েছেন নিমাই সাহার বড় ছেলের কাছে।"

"বোধ হয় জগদীশবাবুর টাকার দরকার ছিল। জমিদারি তো লাটে উঠতে বসেছে।"

"কক্ষনো না, বৌরানীর পাপের জন্যেই তিনি গাড়িঘোড়া সব বেচে দিয়েছেন। তাঁর পয়সার অভাব নেই।"

"খুবই অভাব।"

"তুমি জানো না।"

স্বামী এবার তেড়ে উঠলেন, "আমি রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি, আমি জানি না মানে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশবাবুও শেষ হবেন।"

আলোচনা শেষ করে দিয়ে স্বামী গেলেন অফিস করতে।

ভজহরি বৌরানীর বিছানায় বসে একটা ছবির বই থেকে ছবি দেখছিল। রং-বেরঙের ছবি। বৌরানী বসেছিল মেঝেতে। ভজহরির জন্যে সে একটা উলের জামা বুনছে ক-দিন আগে থেকে। একটা লম্বা হাতার পুলওভার আগেই বোনা হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে নতুন ডিজাইনের, হাতকাটা এবং খুব মিহি উল দিয়ে বোনা।

বৌরানী বলল, "তোর ঘাড়ের দিকটায় বড্ড বেশি উল লাগে হরি। বড্ড বেশি চওড়া।"

"শুধু চওড়া হবে কেন, শক্তও খুব।" গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল ভজহরি।

"মোট বইতে তোর বোধ হয় কষ্ট হবে না।"

"না, আমার কষ্ট হবে না।"

"কিন্তু তোকে যদি কোনদিন মোট বইতে হয় আমার খুব কষ্ট হবে।"

"তবে আমায় মোট বইতে তুমি দেবে কেন বৌরানী?"

"কেন—?" বৌরানী জামাটা কোলের ওপর ফেলে রাখল, "দিতে আমি চাইনে। কিন্তু……আমি নিজেই যদি একদিন মোটের মত তোর ঘাড়ে চেপে বসে থাকি ? তখন আমায় ফেলে দিবি কি করে ?"

"তোমার আবার কোন ওজন আছে না কি ?" এই বলে ভজহরি বিছানা থেকে নেমে বসল এসে বৌরানীর সামনে। লম্বা লম্বা হাত দুটো দু দিকে ছড়িয়ে দিয়ে পুনরায় সে বলল, "এসো, এক্ষুনি একবার পরীক্ষা করে দেখি। বৌরানী, তুমি তো আয়নায় মুখ দেখো না, দেখলে বুঝতে পারবে কি রকম তুমি শুকিয়ে গেছ !"

কি মনে করে বৌরানী সহসা উলের জামাটা চেপে ধরতে গিয়ে বুকের ওপর আঁচলটাকে ভাল করে জড়াতে গেল। ভজহরি মাথা নিচু করে বসে আছে দেখে সে আর উৎসাহ পেল না ভাল করে ঢেকেঢুকে বসবার। সময় মত বৌরানীর ছেলে হলে তার বয়স বোধ হয় ভজহরির চেয়ে কম হতো না।

ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, "আমার ঘাড়ে চাপবার কথা কেন বললে বৌরানী ?"

"ভয় পাচ্ছিস্ বুঝি ?"

"না। কোন কিছুতেই আমার ভয় আসে না। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনি কেবল আমায় বলতেন, খোকা, পালিয়ে আয়, বাইরে রোদ্দুর। পালিয়ে আয়, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঝড় উঠল খোকা, পালিয়ে আয়। কিন্তু এখন আমি আর ভয় পেয়ে পালিয়ে আসি নে। তোমাকে ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারি। তোমায় পিঠের ওপর চাপিয়ে পার হয়ে যেতে পারি বুড়ী গঙ্গা।"

"বুড়ী গঙ্গা ? ও তো আগে থেকেই বুড়ী হয়ে বসে আছে ! চওড়া নদী পার হতে পারিস্ ? পারিস্ পার হতে সাত সমুদ্র তেরো নদী ? খোকা, এখান থেকে আন্দামান কতদূর জানিস্ ?"

"না বৌরানী। তবে এবার থেকে বুড়ী গঙ্গার জলে দিনরাত ভেসে

থাকবার অভ্যাস করব। কিন্তু তুমি আমার ঘাড়ে উঠে
তোমরা তো বড়লোক, মোটরগাড়ি চেপে ছোটাছুটি করতে পারো, হবে।"

"আমি বড়লোক নই খোকা। আমি দুঃখী। একদিন হয়তো কল
চলে যাব তোর সঙ্গে। গড়পারের রাস্তার পেছন দিকে অনেকগুলো বস্তি আছে।. তুই আমায় সেখানে নিয়ে রাখবি। মুটেগিরি করে নিয়ে আসবি এক টাকা দু টাকা। তাই দিয়ে আমাদের সংসার চলে যাবে। পারবি নে আমায় খাওয়াতে?"

"তা আর পারব না? খুব পারব। কিন্তু ঢাকা থেকে কলকাতা যাব কেন? এখানে কি আমরা থাকতে পারব না? এখানে মুটেগিরি করলে কি হয়?"

"কর্তাবাবুর তাতে অপমান হয়। ওঁরা তো বড়লোক, আমাদের চেয়ে আলাদা। আমার কিংবা ফজ্‌লুর দুঃখ ওঁরা বুঝতে পারেন না।"

"সে তো তোমারই দোষ হয়েছে বৌরানী। তুমি কেন গেলে ফরাসগঞ্জে? বাবার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করবার দরকার ছিল কি?"

"লুকিয়ে আমি দেখা করি নি খোকা।"

"তবে কেন ফজ্‌লুর চাকরি গেল? রমাকান্ত কেন তোমার নামে সব যাবাপ কথা বলে?"

"কর্তাবাবুকে কোলেপিঠে করে রমাকান্তই মানুষ করেছে। পুরনো লোক বলে রমাকান্ত আমায় সহ্য করে না। ও মনে করে, ওর বাবুর ওপর আমার কোন অধিকার নেই। খোকা, কারু ওপরই যদি আমার কোন অধিকার না থাকে, তবে এখানে আমি থাকব কেন?"

বৌরানীর ডান হাতটা ভজহরি তুলে নিয়ে নিজের কাঁধের ওপর রেখে সহানুভূতির সুরে বললে, "দরকার নেই তোমার রমাকান্তের কথা শুনে। তোমার সব কাজ আমি করে দেব বৌরানী। না হয় এক্ষুনি চলো কলকাতায় যাই, তোমায় আমি রোজগার করে খাওয়াবো। হাতের মাংস কি রকম শক্ত হয়েছে, দেখেছো?" ভজহরি তার ডানহাতটা দু-ভাঁজ করে তুলে ধরল

"কেন—?" বৌ
গাইনে। কিন্ত ...। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হাতের মাংস শক্ত করল খোকা। বৌবানী
চেপে বুকে ...। ভজহরির ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে দিল হাত ঢুকিয়ে।
...লাকে মুঠো করে ধরে বেশ জোরেই একটা টান মারল বৌরানী। ভজহরিব
মাথাটা এসে পৌছল বৌরানীর বুক পর্যন্ত। দু-হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল
ভজহরিকে।

"খোকা, আমাকে তুই বেলাদি বলে ডাকবি।"

"কেন?"

"আমার নাম তো আসলে বেলা।"

"তুমি রানী। তুমি কেন শুধুশুধু বেলা হতে যাবে? তোমায় আমি রানী-মা বলে ডাকব। ফজ্‌লু কি বলে জানো?"

উলের জামাটা এবার হাতে তুলে নিয়ে বৌবানী জিজ্ঞাসা কবল, "কি-বলে?" "বলে যে, তোমার মত এতবড রানী নাকি নাগ-বাডিতে কোনদিনই আসে নি। ফজ্‌লু আর কোচোযানের কাজ নেয় নি কোথাও। নেবেও না কোনদিন।"

"কি করে ফজ্‌লু?"

"বায়স্কোপের বিজ্ঞাপন লাগায় পাঁচিলের গায়ে। আমিও দু-দিন ওব সঙ্গে গিয়ে বিজ্ঞাপন লাগিয়ে এসেছি বৌরানী।"

"সে কি রে?"

"হ্যা, বৌরানী। ফজ্‌লু মইটাকে ধরে রাখল। আমি মই বেয়ে উঠে গেলাম ওপরে। তারপরে ইয়া বড় একটা বিজ্ঞাপন লাগিয়ে দিলাম নিমাই সাহার বাড়ির দেওয়ালে। জানো বৌরানী, নিমাই সাহার বড় ছেলে যতীন সাহার কাছ থেকে কর্তাবাবু অনেক টাকা ধাব নিয়েছেন?"

"তুই কি করে জানলি?"

"ফজ্‌লু বলেছে। কর্তাবাবু ওকে কাজ থেকে বরখাস্ত করলে কি হবে, ফজ্‌লু সব সময়েই তোমাদের কথাই ভাবে। ফজ্‌লু বলেছে, আমায় একটা কাজ দেবে।"

"কি কাজ ?"

"সাইকেলে চেপে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবরের কাগজ বিলি করতে হবে।"

"ফজ্‌লু নিজে কেন সে কাজটা করে না খোকা ?"

"সারা জীবন গাড়ি চালিয়েছে. এখন আর সাইকেল চালাতে পারবে না, তাই। ফজ্‌লু আমায় পার্কে নিয়ে সাইকেল চালানো শিখিয়ে দিয়েছে। বৌরানী—" ভজহরি চুপ করে গেল।

"কি রে, চুপ করে রইলি যে ?"

"আমায় একটা সাইকেল কিনে দেবে ? একটা পুরনো সাইকেল ? তোমাকে পেছনে বসিয়ে সারা শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। বৌরানী—"

ঘরের বাইরে থেকে ডাকল লক্ষ্মীর মা, "বৌরানী।" লক্ষ্মীর মা জেনানা-মহলের হেড-চাকরানি। তবে রমাকান্তের মত মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে ওর স্থান তত উঁচুতে নয়।

"কি রে লক্ষ্মীর মা ? ভেতরে আয়।—কি খবর ?"

"দেওয়ানজী একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।" বললে লক্ষ্মীর মা।

"আমার সঙ্গে ? আমি তো জমিদার কিংবা জমিদারি সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

"খুবই জরুরী কাজ, তোমায় একবারটি বাইরে আসতে হবে।"

"চল্।" বৌরানী উলের জামাটা ফেলে রাখল বিছানার ওপর। ভজহরিও উঠল। "আমি থাকব তোমার সঙ্গে বৌরানী ?" জিজ্ঞাসা করল ভজহরি। "আয়।"

জেনানামহলের সীমানা যেখান থেকে শেষ হয়ে গেল, সেখানে একটা খিড়কির মত ছোট্ট দরজা আছে। অনেক দিনের পুরনো দরজা। ব্যবস্থাটা পুরনো আমল থেকেই চলে আসছে বলে, দরজার বিস্তৃতি আর বাড়ে নি। না বাড়লে কি হবে, এই ছোট্ট দরজা দিয়েই ধনপতি নাগের বৌ পালিয়ে গিয়েছিল রঘু দত্তের সঙ্গে। রঘু দত্ত নৌকোয় বসে অপেক্ষা করছিলেন

পেছন দিকের উঁচু প্রাচীরটার ওপাশে। প্রাচীরের গায়ে তখন দরজা তৈরি হয় নি। বৌ-ঝিদের বসবাস জন্যে তৈরি হয় নি সিঁড়ি। ধনপতি নাগের বৌ প্রাচীরের কাছে এসে বাধা পেল প্রথম। কিন্তু ব্যবস্থা সব আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। ধনপতি নাগের বৌ প্রাচীরের ওপর দিয়ে একটা ইঁট ছুঁড়ে ফেলে দিল ওপাশের জলে। একটা ছোট্ট ইঁট খুঁজে বার করবার জন্যে তাকে নাগ-বাড়িটা এক রকম চষে ফেলতে হয়েছিল! ধনপতি নাগের সিন্দুকে টাকা-পয়সা এবং চৌকো মতন পাকা সোনার ইঁট সে দেখতে পেল অনেক-গুলো। লুকিয়ে সে সিন্দুক থেকে একখানা সোনার ইঁট বার করে নিল। পোড়া মাটির ইঁট সেদিন নাগ-বাড়িতে পাওয়া যায় নি।

জলের ওপরে ইঁট পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাত রঘু দত্ত উঠে এলেন প্রাচীরের ওপর। একটা মই ফেলে দিলেন এপাশে। ধনপতি নাগের বৌ কোমরে কাপড় জড়িয়ে উঠে পড়ল মই বেয়ে। ছিপের মত সরু সরু গোটা দশ নৌকো নদীর জল কেটে বেরিয়ে গেল বুড়ী গঙ্গার সীমা পেরিয়ে ভোর হওয়ার আগেই। ঘুম থেকে উঠে ধনপতি নাগ খবর পেলেন, বৌকে পাওয়া যাচ্ছে না। সদরের কালেক্টার সাহেবের কানে খবরটা পৌঁছল, পৌঁছল ঢাকার নবাব বাহাদুরের কানেও। কিন্তু ধনপতি নাগ কারু কাছ থেকেই কোন সাহায্য চাইলেন না। কালেক্টর সাহেব ফৌজ পাঠাবেন বলে খবর পাঠালেন। নবাব সাহেব নিজেই এলেন নাগ-বাড়িতে। বললেন তিনি, "আমি তোমার সঙ্গে যাব ধনপতি। রঘুর সঙ্গে তুমি একলা পেরে উঠবে না।" "পারব নবাব বাহাদুর। না পারি গঙ্গায় ডুবে মরব। আপনি কেবল একটা বন্দুক পাঠিয়ে দেবেন।"

"পাঠাব। তোমার লাঠিয়ালেরা গুলি ছুঁড়তে জানে তো?"

"আপনি বন্দুক দিয়ে দবীরখাঁকে পাঠিয়ে দেবেন। সে সঙ্গে থাকলেই হবে।"

"ধনপতি, বিক্রমপুরের ম্যাপ তোমার ভাল করে জানা আছে তো? রঘুর সব রাস্তাঘাট লুকনো থাকে চারদিকে। তুমি এগুবে অন্য রাস্তা দিয়ে, যেদিক দিয়ে তোমার আক্রমণ ও একেবারে কল্পনাও করতে পারবে না। কখন যাচ্ছ?"

"আজ রাত্রিতেই।"

"এক্ষুনি নয় কেন? তাড়া করতে পারলে, পদ্মার মধ্যেই রঘুকে ধরে ফেলতে পারবে।"

"নবাব বাহাদুর, আপনি আশীর্বাদ করুন, রঘুকে যেন এবার আমি ধরে নিয়ে আসতে পারি আপনার কাছে।—এখন আমি মন্দিরে ঢুকব। নাগ-বাড়ির বিগ্রহের কাছ থেকে শক্তি নেব চেয়ে। আপনি ভাববেন না, ইজ্জৎ ফিরিয়ে আমি নিয়ে আসবই।"

"বহুৎ আচ্ছা।" নবাব বাহাদুরকে এগিয়ে দেবার জন্যে ধনপতি নাগ এসে নামলেন বাগানের মধ্যে। ফটকের ডান দিকে নাগকেশরের অনেকগুলো গাছ। একটা নাগকেশর পড়ে রয়েছে রাস্তার ওপর। ধনপতি নাগ দেখলেন, নবাব বাহাদুর সহসা পা-টা তাঁর সরিয়ে নিলেন ফুলটার কাছ থেকে। ফিরবার মুখে ধনপতি নাগ প্রতিশোধ নিলেন। নিজের পা দিয়ে নাগকেশরকে মাড়িয়ে দিলেন, জুতোর গোড়ালি দিয়ে থেৎলে দিলেন নাগকেশরের সবটুকু রস। বাঁ দিকে চেয়ে দেখলেন, সপ্তমুখী জবাগুলো বড্ড বেশি লাল দেখাচ্ছে আজ।

বৌরানী এসে দাঁড়াল জেনানামহলের শেষ সীমায়। দাঁড়াল ভজহরিকে পাশে নিয়েই। ওপাশ থেকে দেওয়ানজী বললেন, "আপনাকে হয়তো বিব্রত করলাম। কিন্তু না এসেও পারলুম না।"

বৌরানীর কাছ থেকে কোন সাড়া এল না।

"নাগপরিবারের অন্যান্য শরিকদের কথা জানি নে, কিন্তু আমাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে।"

"আমাকে এসব কথা জানিয়ে লাভ কি?" জানতে চাইল বৌরানী।

"লাভ না থাকলে আমি আসতুম না। বোধ হয় কোন দেওয়ানই আসে নি।····· কর্তাবাবুকে আমরা তো বোঝাতে পারি নে, হয়তো আপনি পারবেন।"

"উনি তো অবুঝ কোনদিনই ছিলেন না দেওয়ানজী? এতকাল আপনার

এবং রমাকান্তের সব কথাই তো তিনি শুনে এসেছেন, আজ কেন তার ব্যতিক্রম? তা ছাড়া রমাকান্তের কথা উনি কাল পর্যন্তও শুনে এসেছেন।"

"রমাকান্ত কর্তাবাবুকে যা বলতে পারে আমি তা পারি নে বৌরানী।"

"কেন পারেন না? রমাকান্ত যা তা বলে যাবে আর আপনারা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবেন বুঝি?"

"আমায় দোষ দেবেন না বৌরানী, আমার ক্ষমতা অতি-কম। আমি বাইরে বাইরে ঘুরি, কর্তাবাবুর জমিদারি দেখে বেড়াই। রমাকান্ত থাকে বাবুর শোবার ঘরে, সে দৃষ্টি রাখে বাবুর শরীরের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা। তা ছাড়া রমাকান্ত তাঁকে জন্মের পর থেকেই মানুষ করছে, অতএব তার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না।"

"আমায় ক্ষমা করবেন দেওযানজী, আমি তুলনা করি নি। ছি ছি, আপনি বোধ হয়—"

বাধা দিয়ে দেওয়ানজী বললেন, "না, আমি অপরাধ নিই নি বৌরানী। এবার কাজের কথাটাই বলি। কর্তাবাবুর ঋণ এত বেশি হয়ে উঠেছে যে, দু-একটা ভাল সম্পত্তি মোটা দামে বেচা দরকার। সেই টাকা দিয়ে মোট ঋণের খানিকটা টাকা আগি শোধ করে দিতে চাই। নইলে শেষ পর্যন্ত সুদের অঙ্ক আসলের চেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়াবে।"

বৌরানী ও-পাশ থেকেই বলল, "শুনলুম যতীন সাহার কাছ থেকেও উনি অনেক টাকা ধার করেছেন।"

"হ্যাঁ, বৌরানী। নাগ-বাড়িটা বাঁধা দিয়েছেন কর্তাবাবু। যতীন সাহার গ্রাস থেকে একে আমি বাঁচাতে চাই। ইচ্ছে করলে আপনিই পারেন একে রক্ষা করতে।"

"উপায়টা বলে দিন দেওয়ানজী।"

"কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটা আপনার নামে আছে। আপনি যদি রাজী থাকেন সেটা আমি বেচে দিতে চাই।"

প্রায় দু-তিন মিনিটের নৈঃশব্দ স্থির হয়ে পড়ে রইল দরজাটার দুপাশে।

তারপরে বৌরানী ভজহরির ঘাড়ে হাত রেখে বলল, "আমি রাজী আছি দেওয়ানজী।"

"কর্তাবাবু শুনলে হয়তো আপত্তি করবেন।"

"তাঁর শোনবার কোন সুযোগ নেই।"

"তা হলে আমি কলকাতা যাচ্ছি এক সপ্তাহের মধ্যেই। ভাল দর পেলে আমি সব ঠিক করে ফিরে আসব আপনার সই নেবার জন্যে। দলিলটা কাছারী বাড়ির সিন্দুকেই আছে। নমস্কার।"

"একটু দাঁড়ান দেওয়ানজী।" বৌরানী চৌকাঠের ওপর পা রেখে জিজ্ঞাসা করল, "এত টাকা দিয়ে উনি কি করেন?"

"দেশ এবং দশের উপকার।"

"কোন্ দেশ দেওয়ানজী?

"ভারতবর্ষ। এক সময়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বহু টাকা তিনি দিয়েছেন অনুশীলন সমিতি ও অন্যান্য দলগুলোকে। সেসব দলগুলো কোথায় কবে মিলিয়ে গেল তিনি তার খোঁজ রাখেন না। কিন্তু আজও তাঁর গুপ্তদানের লম্বা ফিরিস্তি শেষ হয় নি। অন্তরীনাবদ্ধ বহু সন্ত্রাসবাদীদের সংসার চলছে কর্তাবাবুর টাকায়। তা ছাড়া নতুন নতুন ইস্কুলের জন্যে আজও তিনি টাকা দেন মুক্ত হাতে। নিজের বাড়িতে যে-মানুষ বাগানটি তিনি তৈরি করেছেন বলে আনন্দ পান, তাতে প্রতি বছরই জনসংখ্যা বাড়ছে। এর ওপরে—"

"এর ওপরে আরো কিছু আছে না কি?"

"বলতে গেলে অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু শুনেই বা আপনি কি করবেন?"

"বলুন, শুনতে আমার ভালই লাগছে দেওয়ানজী। তার কথা শুনবার জন্যে সংসারে আর কেউ তো বসে নেই। আমি তাঁর স্ত্রী। অথচ তাঁর সম্বন্ধে কোন কথাই আমি জানতে পারলুম না।"

"কর্তাবাবুর ব্যক্তিগত কথা কোনদিনও তাঁর ঘরখানার সীমা অতিক্রম করে নি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর কাটল আমার এখানে, কিন্তু তাঁর মনের নাগাল

আমিও পেলুম না বৌরানী। মাঝে মাঝে মনে হয়, কর্তাবাবু যেন এবাড়ির মানুষই নন। ধনপতি নাগের পরিচয় খুঁজে পাই নে তাঁর একটা আঙুলেও।"

"কেন দেওয়ানজী? কর্তাবাবুর আঙুলগুলো কি কোনদিনও শক্ত ছিল না?"

"ধনপতি নাগের মত শক্ত ছিল না নিশ্চয়ই।" এই বলে দেওয়ানজী ঘুরে দাঁড়ালেন বুড়ী গঙ্গার দিকে মুখ করে।

তারপর তিনিই আবার বলতে লাগলেন, "রঘু দত্তের সব সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিলেন ধনপতি নাগ। বিক্রমপুরের সবচেয়ে বড় তালুকটা ছিল রঘু দত্তেরই। আপনি কি ধনপতি নাগের কোন খবরই শোনেন নি?"

"কিছু কিছু শুনেছি। বড্ড ভয় করে দেওয়ানজী।"

"কোন্ অংশটা খুব ভয়ের বলে মনে হয় আপনার?" দেওয়ানজীর প্রশ্নের মধ্যে কোন কুৎসিত ইঙ্গিত আছে কি না বৌরানী তা স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে না। হাজার হলেও দেওয়ানজী তো রমাকান্তের মত নিচুস্তরে নেমে আসতে পারেন না?

"ধনপতি নাগ তাঁর পালিয়ে-যাওয়া বৌকে বুড়ী গঙ্গার জলে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন, একথা শুনলে কার না ভয় হয় দেওয়ানজী?"

"ভয়ের শেষ তো ওখানেই সীমাবদ্ধ নয় বৌরানী। বুড়ী গঙ্গার নরম মাটিতে তিনি বৌকে পুঁতে রেখেছিলেন! ঐ যে দূরে নদীর বুকে চর উঠেছে, লোকে বলে, ওটা উঠেছে সেই দম-আটকানো বৌ-এর দেহ থেকে। সত্যিমিথ্যে জানি নে, চরটা যখন প্রথম জলের ওপর ভেসে ওঠে, কেউ যায় নি ওটার দখল নিতে। জগদীশবাবুর পিতা কালিদাসবাবু বলতেন যে, তিনি নাকি রাত্রিবেলা চাপা-গোঙানির আওয়াজ পে ন। তাঁর মনে হতো, নাগ-বাড়িটা কাঁপছে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে চরটা ওখানে পড়ে আছে, চেয়ে আছে নাগ-বাড়িটার দিকে। ভয় পেয়ে তিনি দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের মাথাটা বাড়িয়ে ফেললেন আরও পাঁচ ফুট। কর্তাবাবুকে ওসব কাহিনী শোনানো হয় নি। তিনি ঐ প্রাচীরের মধ্যে একটা দরজা খুললেন। তৈরি করলেন সিঁড়ি। মাত্র গোটা

পাঁচ সিঁড়ি, বুড়ী গঙ্গার নরম মাটি পর্যন্ত গিয়ে পৌছুতে পারল না।" এই বলে থামলেন দেওয়ানজী।

বৌরানী জিজ্ঞাসা করল, "রঘু দত্তের কি হল ?" প্রশ্নটা খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে করলেন দেওয়ানজী। ধনপতি নাগের তৃতীয় পুরুষের বৌরানী কেন জানতে চায় রঘু দত্তের কথা ?

তিনি বললেন, "রঘু দত্ত মারা যায় ধনপতি নাগের হাতেই। পদ্মার মোহনা থেকে রঘু দত্তকে তাড়া করে তিনি নিয়ে এলেন ধলেশ্বরীর মুখ পর্যন্ত। ক্রমাগত সাতদিন আর নৌকো থামে নি! ধলেশ্বরীর বোবা ঢেউ দেখে রঘু দত্ত ভয় পেয়ে গেল। সে ঢুকে পড়ল বিক্রমপুরের মধ্যে। ধানক্ষেত আর পাটক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ওরা পথ ধরল। মাথার ওপরে কালো আকাশ, কালবৈশাখীর মাতন উঠেছে সারা পূর্ব বঙ্গের ওপর। ধনপতি নাগ বিষমাখা বল্লম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রথম নৌকাটার পাটাতনের ওপর। সাতদিন থেকে তাঁর ভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয় নি, শিথিল হয় নি হাতের মাংস। শক্তিশালী আঙুলগুলো লেপ্টে রয়েছে বল্লমের গায়ে। সাতদিন থেকে মাথার বাবরি চুলগুলো লুটোপুটি খাচ্ছে—ধনপতি নাগের চোখের পাতাও যেন পড়ছে না ঘুমের আক্রমণে। ক্ষুৎপিপাসার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাকেও তিনি জয় করলেন। এবার কেবল বাকী রইল রঘু দত্ত। বৌকে যে পোয মানাতে পারে না, তাঁর খাওয়াই বা কেন, আর ঘুমনোই বা কেন! ধনপতি নাগের পেছনে রয়েছে গোটা তিরিশ নৌকো। নৌকো-ভর্তি লাঠিয়াল। ধনপতি নাগের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিল দবীর খাঁ। হাতে তার বন্দুক। নবাব বাহাদুর তাঁর দেহ-রক্ষী দবীর খাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ধনপতি নাগের সঙ্গে। দবীর খাঁর সঙ্গে নাগবাবু বাজি রেখেছেন যে, তাঁর বল্লমের গতির সঙ্গে গুলির গতি পারবে না। রঘু দত্তের বুকে বল্লম লাগবার আগে গুলি লাগতে পারবে না। দবীর খাঁ বলেছে যে, তা যদি হয়, তবে সে নবাব বাহাদুরে নকরি ছেড়ে দেবে। বন্দুকের গায়ে সারা জীবনে আর হাত দেবে না। অতএব—"দেওয়ানজী কথাটা শেষ না করে জিজ্ঞাসা করলেন, "বৌরানী কি চলে গেলেন নাকি ?"

"না দেওয়ানজী, আমিও ওদের সঙ্গে আছি !"

"কাদের সঙ্গে ? যারা আক্রমণ করছে, না যারা পালাচ্ছে ?"

"বোধ হয় মাঝামাঝি জায়গাতেই আমি আছি।"

ফস্ করে ভজহরি বলে ফেলল, "ওখান থেকে তুমি সরে এসো বৌরানী, নইলে দবীর খাঁর গুলি তোমার বুকেই লাগবে যে? তারপরে কি হল দেওয়ানজী ?"

"তারপরে আড়িয়াল বিলের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল রঘু দত্তের দল। ওটাই ছিল তার বড় ঘাঁটি। রঘু দত্তের ডান হাতে তিনমুখো একটা সড়কি রয়েছে, বাঁ হাতে রয়েছে ঢাল। ধনপতি নাগের নৌকোগুলো ক্রমশই এগিয়ে আসছে কাছে। ছই-এর তলা থেকে ধনপতি নাগের বৌ কমলমণি বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রঘু দত্তের পাশে। সে রঘু ডাকাতের হাত থেকে সড়কিটা নিয়ে ফেলে দিল আড়িয়াল বিলের জলে। ফেলে দিল ঢালটাও। দিযে সে বললে, 'আমি দাঁড়ালুম তোমার বুকের সামনে, এর চেয়ে শক্ত ঢাল তুমি কোথায় পাবে ?......ঐ দেখো, জলের ওপর পদ্ম ফুলগুলোকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে।' রঘু ডাকাত সত্যি সত্যি জলের দিকে চেয়ে পদ্মফুলের বাহার দেখতে গেল। একটা মুহূর্তের মধ্যে তার কাছে পৃথিবীটা গেল বদলে। জীবনেব এত কাছে এত সৌন্দর্য ভেসে রয়েছে দেখে সে কমলমণিকে ধরতে গেল দু-হাত দিয়ে। পারলে না। ধনপতি নাগের বল্লম এসে বিঁধল তার বুকে। দবীর খাঁর গুলিও লাগল। কিন্তু লাগল একটু পরে। দবীর খাঁ এবার বন্দুক ছেড়ে দিয়ে হজ করতে যাবে কি না, তা নিয়ে আর সেখানে কিছু পরামর্শ হল না। বাজিতে সে হেরে গেল। · কমলমণি রঘু দত্তকে রক্ষা করতে পারলে না। রঘু ডাকাত লুটিয়ে পড়ল পাটাতনের ওপর। হাতটা ঝুলে পড়ল শ্বেত পদ্মের গায়ে। মাথাটা বেরিয়ে রইল বাইরের দিকে। দবীর খাঁর গুলিটা লেগেছিল তার কপালের মাঝখানটায়, সেখান থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল শ্বেত পদ্মের পাপড়িগুলোর ওপর। মরবার আগে রঘু ডাকাত বললে, 'ওদের দলে বন্দুক ছিল। বন্দুকের ভয়েই আমি লড়তে পারলুম না কমলমণি।' কোন্ কমলকে যে সে উদ্দেশ করে

কথাগুলো বলল, ধনপতি নাগের বৌ তা বুঝতে পারল না। কারণ, রঘু ডাকাত যখন মারা গেল, তখন ওর হাতের মুঠোয় ধরা ছিল আড়িয়াল বিলের পদ্মফুল। বৌরানী—" বুড়ী গঙ্গার দিক থেকে মুখটা ঘোরাতে গিয়ে দেওয়ানজী দেখলেন, বৌরানী আর ভজহরি তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পার হয়েছে খিড়কির মত ছোট দরজাটা, জেনানামহলের আব্রু আর নেই।

"বৌরানী, এবার আমি চলি। পরশুদিনই আমি কলকাতা রওনা হয়ে যাব।"

"কিন্তু রঘু দত্তের কি সংসার ছিল না?" জিজ্ঞাসা করল বৌরানী।

"ছিল। ছেলেবেলায় সে বিয়ে করেছিল। ছেলে ছিল একটা।—কিন্তু ডাকাতি-ব্যবসা তারা আর কেউ করেনি। করবার সুযোগ দেননি ধনপতি নাগ। সম্পত্তি সব তিনি দখল করে নিলেন। বাড়ি-ঘর দিলেন জ্বালিয়ে। রঘু দত্তের বৌ তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেল রাজবাড়ি গাঁয়ে। তৃতীয় পুরুষের নরহরি দত্ত লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক বনে গেল। পদ্মার জলে ভেসে গেল সমস্ত গ্রামটাই। নরহরি দত্ত কলকাতায় গেল চাকরি করতে। গড়পারে সে থাকত বলেই শুনেছি। রঘু দত্তের হাতে একটা বন্দুক ছিলনা বলে তার খেদ ছিল খুবই। কিন্তু চতুর্থ পুরুষের হাতে গুলি গোলার কোন অভাবই রইল না। তার দলের ভাণ্ডারে জমল এসে অনেক পিস্তল। তারই একটা পিস্তল থেকে দেবেশ দত্ত গুলি ছুঁড়ল ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের বুকে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল তার, কিন্তু নাগ-বাড়ির গায়ে তারা কেউ আর হাত ছোঁয়াতে পারেনি। রঘু দত্তের কেউ পারেনি ধনপতি নাগের অধস্তন কোন পুরুষেরই ক্ষতি করতে। এবাড়ির প্রাচীর আজ খুবই উঁচু বৌরানী!"

"উঁচু, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।" বৌরানী স্বাভাবিক সুরেই কথা কইবার চেষ্টা করতে লাগল, "কিন্তু ধনপতি নাগের নতুন বৌ ঘরে এল কবে?"

"এল সাতদিনের মধ্যেই।"

"কমলমণিকে মেরে ফেলবার জন্যে বিচার হল না ধনপতি নাগের? রঘু দত্ত প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে, কিন্তু কমলমণি তো বন্দী ছিল? বন্দীকে হত্যা

করার আইন কোন দেশেই তো নেই দেওয়ানজী? তবে কেন বিচার হল না? চার পুরুষ আগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের কি ব্যবস্থা ছিল না?"

কথা শুনে দেওয়ানজী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! এতবড় দুর্নীতি যে করতে পারল, তাকে কেবল বৌরানী বন্দী করে রাখতে চায়, শাস্তি দিতে চায় না। পাপ করেছিল কমলমণি, ধনপতি নাগের বিচার হবে কেন? দেওয়ানজীর কাছে আজ যেন জেনানামহলটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, স্পষ্ট হচ্ছে বৌরানীর চরিত্রটা। কর্তাবাবু বোধ হয় সত্যি সত্যি ঠকছেন। শহরের গুজব তা হলে কি গুজব নয়? রমাকান্তকে তবে দোষ দিয়ে লাভ কি? সে তো কর্তাবাবুর কাছে সত্যি কথাই বলেছে। ওস্তাদজীর সঙ্গে বৌরানীর সম্পর্কটা যে কমলমণির মত পঙ্কিল হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা যায় না। কর্তাবাবু ওস্তাদজীকে বারোদি গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষটার নীতিজ্ঞান নষ্ট হয়নি এক বিন্দুও! দেওয়ানজী বললেন, "হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটার পাকা দলিল করেই আমি কলকাতা থেকে ফিরব।"

"কিন্তু গড়পার রোডের বাড়ি তো আর নেই দেওয়ানজী?"

বৌরানীর মন থেকে হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটা উহ্য হয়ে গেছে! বোধ হয় বিক্রি হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। স্তম্ভিত হওয়ার মত মানসিক অবস্থা পার হয়ে গেলেন দেওয়ানজী। বৌরানীর ওপর তাঁর অশ্রদ্ধা এল। তিনি বললেন, "গড়পার রোডের কথা আমি বলিনি, আমি বলছি আপনাদের বাড়িটার কথা। সেটা, বিক্রি করবার ব্যবস্থা করতে কালই আমি কলকাতা যাচ্ছি। পাকা দলিল লিখিয়ে নিয়ে আসব, আপনি কেবল সই করবেন তাতে।"

"সই? অপেক্ষা করে আর লাভ কি দেওয়ানজী, দলিলটা নিয়ে আসুন না, এক্ষুনি আমি সই করে দি?" জবাবের জন্যে বৌরানী আর সেখানে দাঁড়াল না। ভজহরিকে নিয়ে সে চলে এল জেনানামহলের এলাকার মধ্যে। হাঁটতে লাগল নিজের ঘরের দিকেই। কি হবে বুড়ী গঙ্গার দিকে চেয়ে থেকে? জলের সেখানে গভীরতা কই? নদীটার বুকের ওপর চর পড়েছে। ছোট

করে দিয়েছে নদীটাকে। শ্বশুর কালিদাস নাগের বিশ্বাস হয়তো মিছে নয়, কমলমণির গোঙানিটা বোধহয় প্রাচীরের গায়ে আজও প্রতিধ্বনি তোলে। গঙ্গাটা তাই সুরুতেই বুড়ী হয়ে গেছে, বুড়ো হয়ে গেছেন জমিদার জগদীশ নাগ। বিক্রমপুরের সবচেয়ে বড় তালুকটা বিক্রি হয়ে গেল। জগদীশ নাগ সেটা ধরে রাখতে পারেননি। সুকুমারীর খালি গোলাসটার জন্যে বৌরানী একদিন কেবল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়ী করেছিল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে মালবিকাদের দারিদ্র্যের মূলে ছিল ধনপতি নাগের ক্ষমতাশালী আঙুলগুলো। কেবল তাঁর আঙুলগুলোই বা হবে কি করে? দেবশদা যে-আঙুলটা দিয়ে পিস্তলের ঘোড়া টিপেছিল, সেটাওতো অংশত দায়ী?

ভজহরিকে নিয়ে বৌরানী পুনরায় চলে এল ঘরে। জয়পুরের পাথর দিয়ে মেঝেটা তৈরি করিয়ে গেছেন কালিদাস নাগ। এদিককার ঘরগুলো ধনপতি নাগের আমলের নয়।

বিছানার ওপর থেকে উলের বাণ্ডিলটা নিয়ে বৌরানী বসল এসে মেঝের ওপরেই। অত্যন্ত নির্মল আনন্দ পায় সে ভজহরির জন্যে জামা বুনতে। নিঃসন্তান বলে বৌরানী তার অতৃপ্ত পিপাসা ভজহরিকে দিয়ে মেটাচ্ছে না। জগবন্ধুবাবুর রক্তের মহিমা ভজহরি বয়ে বেড়াচ্ছে বলেও যে তার মনের আনন্দ নির্মল হয়ে উঠেছে তাও নয়। তবে কি? ভজহরির ওপর এত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার কারণ কি? বৌরানীর ধারণা, ভজহরি কোন ক্ষমতা-চক্রের অংশ নয়। সে ধরা পড়ে নি সেই বিষ-চক্রটার মধ্যে। ভজহরি যেন নিজেই একটা আলাদা শ্রেণী। কিন্তু শ্রেণীটার নাম কি? মধ্যবিত্ত? জামাটা বুনতে বুনতে বৌরানী ভাবল, হোক না মধ্যবিত্ত, তাতে তার কোন আপত্তি নেই। অতীত কিংবা উপস্থিতকালের মধ্যবিত্ত সে নয়, ভজহরি হচ্ছে আগামী দিনের মধ্যবিত্ত যার মনের সঙ্গে বাঁধা থাকবে না ক্ষমতার শেকল। সামাজিক কিংবা আর্থিক সুবিধার তারতম্যের জন্যে ভজহরি কখনও কাউকে ঘৃণা করতে শেখে নি। নীরবে দুঃখ সহ্য করার তন্ময়তা ভজহরি পেয়েছে বৌরানীর কাছ থেকেই। এই তন্ময়তা যদি জীবন জিজ্ঞাসার সুগভীর তলা পর্যন্ত গিয়ে পৌছুতে

পারে, তবেই ভজহরি পারবে মানুষকে নতুন আলো দেখাতে। ভজহরি মুক্ত, কিন্তু বৌরানী আবদ্ধ। হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ির ফটকে যে-দড়িটা সেদিন সে দেখতে পেয়েছিল, সেটা দেবেশ দত্ত সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে নি। কোমরটা তার খুবই সরু ছিল বটে, বাঁধবার মত দড়িটাও ছিল খুব ছোট। কিন্তু দেবেশ দত্ত দড়ির সবটুকু দেখতে পায় নি, দেখতে পায় নি বৌরানীও। আজ তাই তার বার বার করে মনে হচ্ছে দড়িটার দৈর্ঘ্য খুবই লম্বা, কেবল পাঁচ হাজার বছরকে প্রদক্ষিণই করে নি, সভ্যতার কোমরটাকে কঠিন করে বেঁধেও রেখেছে। বাড়ির ফটকে যে-দড়িটা সে দেখেছিল, সেটা বড় দড়িটার অংশমাত্র। সেটার পশ্চাৎ আছে, আছে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎও নিশ্চয়ই থাকবে। দেবেশ দত্ত আন্দামান বিদায় হয়ে গেল বলে, বৌরানী মুক্ত হতে পারে নি। একটু আগেই সে শুনে এসেছে দেওয়ানজীর কাছে যে, রঘু দত্তের সঙ্গে ধনপতি নাগের সম্বন্ধটা চিরকালের জন্যে চুকে যায় নি, কমলমণির গোঙানিটা আজো নাকি বেঁচে আছে! বর্ষার জল বাড়লেই প্রাচীরের গায়ে গোঙানিটা প্রতিধ্বনি তোলে। অতএব বৌরানী জড়িয়ে গেছে এরই ভবিষ্যৎ-বন্ধনের মধ্যে। কিন্তু ভজহরিকে যেন সেই দড়িটা স্পর্শ করতে না পারে। বাংলার ভবিষ্যৎ মধ্যবিত্তের জন্যে বৌরানী তাই মনোযোগ দিয়ে উলের জামা বুনতে লাগল। মধ্যবিত্ত মরলে, বাংলার আর কিছুই বাঁচবে না বলেই যেন ভজহরি বৌরানীর কাছে জগদীশবাবুর সন্তানের চেয়েও বড় বলে মনে হয়। ভালই হয়েছে, জগদীশবাবুর অক্ষমতা রক্ষা করেছে বৌরানীকে। তাঁর সন্তানকে ইতিহাস আর কিছুতেই গ্রহণ করত না—কতকগুলো জনসংখ্যা বাড়লেই ইতিহাস তা গ্রহণ করেও না।

জগবন্ধুবাবু নাগ-বাড়ির সেরেস্তায় কাজ করছেন। ঢাকা থেকে বারোদি গ্রাম প্রায় বিশ মাইলের রাস্তা। নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ করেও যাওয়া যায়। জগবন্ধুবাবু এসেছিলেন নৌকো করে সোজা ঢাকা থেকেই। তাড়াতাড়ি পৌঁছুবার এমন কিছু তাড়া ছিল না।

বারোদি গ্রামের বেশ একটা বড় অংশ জগদীশবাবুর ভাগে পড়েছে। ভাগ হয়েছে কালিদাসবাবুর আমলেই। ধনপতি নাগের প্রথম পক্ষের কোন সন্তান ছিল না, দ্বিতীয় পক্ষের দুটি ছেলে হয়। বড় ছেলের নাম ছিল নলিনীকিশোর নাগ, ছোট কালিদাসবাবু। নলিনীবাবু সরকারি চাকরি নিয়েছিলেন বলে ক্রমে ক্রমে জমিদারি সব বেচে দেন। তাঁরই ছেলে কিরীট-কুমার নাগ। তিনিও দেশের সঙ্গে বিশেষ কিছু সম্পর্ক রাখেন নি। দু-চার বছর পর পর পূজোর সময় দেশে আসতেন। জজ হওয়ার পরে তিনি আর কখনও বারোদি গ্রামে প্রবেশ করেন নি।

জগদীশবাবুর অংশটা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের অংশ থেকে একেবারে আলাদা। কলিদাসবাবুই প্রাচীর তুলে সীমানা ঠিক করে গেছেন। ও-পাশটায় বহু লোকজনের ভিড়, জগদীশবাবুর অংশে কয়েকজন কর্মচারি ছাড়া আর কেউ নেই।

সেরেস্তার মধ্যে কর্মচারিরা রাত্রিবেলা বিছানা পেতে ঘুময়। অনেকের বাড়ি-ঘর কাছাকাছি বলে টাইম মত কাজ করে দিয়ে চলে যায়। দরওয়ান আছে অনেকগুলো। রান্নার ঠাকুর দু-জন। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখবার জন্যে চাকর আছে গুটি পাঁচ-ছয়। বাগানের জন্যে মালীও আছে। কিন্তু তারা আর ফলের জন্যে খুব বেশি যত্ন নেয় না। ফল-মূল ও শাকসব্জী লাগিয়ে দু-চার পয়সা আয় করে। এই সব ব্যবস্থা সারা বছর ধরেই চালু রাখতে হয়, কারণ পূজোর সময় জগদীশবাবু আসেন বারোদি গ্রামে।

জগবন্ধুবাবুর ভাল লেগেছে বারোদি গ্রামের পরিবেশ। নির্জনতা তিনি চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন পরিচিতদের থেকে আলাদা হয়ে থাকতে। দুটো সবচেয়ে বড় সুরের পরিচয় তিনি রেখে এলেন ঢাকায়। একটা রইল শ্যামপুরের শ্মশানে, আর অন্যটা রইল জগদীশবাবুর বাড়িতে আবদ্ধ হয়ে। সুরমার পরিচয় তিনি একদিন সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন জন্মান্তরের রাস্তা দিয়ে, এক জীবন থেকে অন্য জীবনে, কিন্তু বৌরানীর পরিচয় তাঁকে ফেলে যেতে হবে এইখানেই। সে-সুরটা জগদীশবাবুর অন্তঃপুরে পড়ে রইল তার বিস্তার তিনি

করেন নি, আর কোনদিন করতে পারবেন বলে তাঁর বিশ্বাসও হয় না। বারোদিঘির সুগভীর নির্জনতার মধ্যে তাই তিনি দিনরাত কান পেতে রাখেন, শুনতে চেষ্টা করেন, বৌরানীর পরিচয়-সুর।

সুরমাকে খুঁজতে হয় না। পরিচয় ফেলে এলেও, শ্যামপুরের ব্যবধান ঘুচে যায় যখন তখন। হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় না বটে, চোখ বুজে কাছে যাওয়া যায় সুরমার। কিন্তু বৌরানী?

সেরেস্তা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। হরপ্রসাদ পণ্ডিতের গণনায় ভুল না থাকলেও, সেরেস্তার কাজে তাঁর মন বসে না। কাজ না করলেও কেউ তাঁকে কাজ করতে বলবেও না। সবাই জানে জগদীশবাবুর অবস্থা খারাপ হয়েছে বলেই তিনি এসেছেন এখানে কাজ করতে। ওস্তাদজীকে বেকার করে দিয়ে তাঁর অন্ন-সমস্যা সৃষ্টি করতে চান নি কর্তাবাবু। কিন্তু অন্ন-সমস্যার কথা জগবন্ধুবাবুর মনে হয় নি একদিনও। সুরমা সঙ্গে করে সবটুকু সঙ্গীতই নিয়ে গেছে, অতএব সেরেস্তা আর মুটেগিরির মধ্যে কোন তফাতই তিনি দেখতে পান না। গানের আসর তাঁর ভেঙ্গে গেছে। তামাম দুনিয়া জয় করবার কথা ভাবলে, লজ্জাই পান জগবন্ধুবাবু। এখন কেবল বারোদিঘির এই নির্জনতাটুকুই যদি তিনি জয় করতে পারেন তা হলেই তাঁর জয়ের নেশা কাটবে। নির্জনতার বুকে কান পাতবার জন্যে জগবন্ধুবাবু বেরিয়ে এলেন সেরেস্তা থেকে।

তিনি লাল সুরকির রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন খুবই ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে পা দিয়ে শুকনো পাতাগুলো সরিয়ে দিতে লাগলেন রাস্তার দু-পাশে। যত্নের অভাব ঘটেছে বলেই তাঁর বিশ্বাস। ভাড়াটে মালীরা দু-পাশের গাছ-গুলোর দিকে একটু দৃষ্টিও দেয় না। ছায়া পাবার জন্যে রাস্তার দু-ধারে দামী দামী গাছ লাগানো হয়েছে। মহানিমের পাশেই দেবদারুর ঝালরগুলো ঝুলে পড়েছে। বংশীবটের ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে মেহগনি গাছও তিনি লক্ষ্য করলেন। রাস্তাটার মাঝামাঝি জায়গায় বাঁ পাশে এবং ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক এক জোড়া ইউক্যালিপটাস্ গাছ। গাছের গায়ে আলগাভাবে

হাত রাখলে পিছলে পড়ে যেতো, কিন্তু অযত্নের জন্যেই বোধ হয় আজকাল গাছগুলোর গায়ে শেওলা ধরেছে অনেক।

লাল সুরকির রাস্তাটা জগদীশবাবুর বাড়ির এক তলার গা থেকে সুরু হয়ে চলে গেছে মেঘনা নদীর কিনারা পর্যন্ত। জগবন্ধুবাবু প্রতি দিনই হাঁটতে হাঁটতে চলে আসেন রাস্তাটার শেষ সীমায়। দুটো সেগুন গাছ দাঁড়িয়ে আছে যেন জল আর স্থলের সীমা নির্ধারণের জন্যে। তার তলায় বেঞ্চি পাতা আছে। জগবন্ধুবাবু সন্ধ্যের পরে অনেক রাত পর্যন্ত এখানে বসে থাকেন। স্থল ও জলের নির্জনতা এসে মিশে যায় তাঁর মনেব সঙ্গমে। মাঝে মাঝে মনে হয়, জল তাঁকে টানছে। টানছে বৌরানী। কিন্তু একটু বাদেই যেন স্থলের আকর্ষণ তাঁকে টানতে থাকে উল্টো দিকে। সুষমা জলকে বড্ড ভয় করত।

আজ জগবন্ধুবাবু সেরেস্তা থেকে বেরিয়ে এলেন নির্ধারিত সময়ের আগে। সন্ধ্যে হতে তখনও ঘণ্টা দুই বাকী। লাল সুরকির রাস্তাটার বেশ খানিকটা দূরেই মালীরা কাজ করছিল। তিনি পবিচিত রাস্তায় বাইরে এলেন আজ। বক্তে যাঁর বিস্তারের বৈচিত্র্য রয়েছে তাঁর কাছে কেবল একটা রাস্তাই ভাল লাগতে পারে না। জগবন্ধুবাবু পা ফেললেন ঘাসের ওপর। মালীরা দেখল, জগবন্ধুবাবু নতুন রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন আজ। কাজ ফেলে একটা মালী এসে দাঁড়াল জগবন্ধুবাবুর কাছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ গাছগুলোর নাম কি?"

"কোন্‌গুলো বাবু?"

তিন হাত দূরে খানিকটা জায়গা আলাদা করে ঘেরা রয়েছে। ঘেরা রয়েছে কতকগুলো বুনো গাছ দিয়ে। গাছগুলোর মধ্যে ঘন কাঁটা আছে। কেউ যেন সহজে সেখানে না যেতে পারে সেই জন্যেই এত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে বলে বুঝলেন জগবন্ধুবাবু। কিন্তু কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে কোন্ গাছগুলোকে রক্ষা করছেন জমিদার জগদীশচন্দ্র নাগ?

ঘেরাও করা জায়গাটার মধ্যে মালীটা ঢুকে পড়ল। ওখান থেকেই সে বললে, "এগুলো সব ওষুধের গাছ।"

"কি ওষুধ ? কে খায় এই সব ওষুধ ?" জিজ্ঞাসা করলেন জগবন্ধুবাবু।

"গাঁয়ের গরীব লোকেরা আসে পাতা চাইতে। আসেন কবরেজরাও। বাবুর হুকুম আছে, দাম না নিয়ে গাছ-গাছড়া দিতে হবে।"

"গাছগুলোব নাম কি মালী ? এমন ব্যবস্থা তো আমি আর কোথাও দেখি নি ? ওটা কি, বাচ্চাছেলেদের চোখেব মত পাতাগুলো মিট মিট কবছে যেন ?" ফুর ফুর করে বাতাস বইছিল বাগানে।

"নাগদানা। নাগেশ্বরের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই বাবু। এটা হচ্ছে ওষুধের গাছ। ছেলেপিলে না হলে মেয়েদের কাজে লাগে বলে শুনেছি। ও-পাশের ঐগুলো হচ্ছে আকন্দ, কালমেঘ, গন্ধভাদাল, বিশল্যকবনী, তুলসী—গরীবলোকদের সর্দি কাসি এবং পেটেব ব্যারাম এইতেই সেবে যায় বাবু।"

নাগ-বাড়ির নাগদানা বন্ধ্যামেয়েদের কাজে লাগে শুনে জগবন্ধুবাবু মনে মনে খুশী হলেন। বৌরানী কি তবে আজো নাগদানার সন্ধান পান নি ? বাচ্চাছেলেদের চোখেব মত নাগদানার পাতাগুলো মিটমিট করছিল। কাঁটা গাছের ওপর দিযে তিনি কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিযে এলেন। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে চললেন তিনি পূব দিকে। মালীটা তাঁব পেছনে পেছনে এগুতে লাগল।

নাগদানার পাতাগুলোকে হাতেব তালুতে রেখে জগবন্ধুবাবু যেন আদব করতে করতে রাস্তা পার হতে লাগলেন। ভাডাটে মালীব অযত্ন তিনি আর কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না। দু-চারটে ভুঁই চাপা তাঁর পায়েব তলায় পিষেও গেল। রাধাচূড়ার হলদে ফুলগুলো তাঁব চোখে পড়ল না। তিনি দেখতে পেলেন না শ্বেত চন্দন আর হরিতকী গাছের সারিগুলো। জগবন্ধুবাবু নেমে পড়লেন মাঠের মধ্যে।

সামনে পড়ল কলাগাছের ঝাড়। পেছন ফিরে মালীর দিকে চেযে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন. "এত কলা কি হয় মালী ? কে খায় ? বাবু তো বছরের মধ্যে বার দুই আসেন।"

"ঢাকায় কিছু পাঠিয়ে দিই, সেরেস্তার বাবুরা নেন তাঁদের দরকার মত।

বাকীটা বিক্রি হয়। কর্তাবাবু সব রকমের কলা ভালবাসেন না। রামপালের মোটা খোসার কলা তাঁর পছন্দ হয় না। চিনিচাঁপা আর দুধসাগর তাঁর সব চেয়ে প্রিয়। এ অঞ্চলে কানাইবাঁশী জন্মাতে চায় না, দু-একটা গাছ তবু লাগিয়েছি। কর্তাবাবু কলকাতা গিয়ে কানাইবাঁশী খেয়ে এসেছেন। খুবই সুখ্যাত করেছেন তিনি। দেওয়ানজীকে বলে কলকাতা থেকে কানাইবাঁশীর চারা আনিয়েছি।"

"তোমার নাম কি মালী?" জিজ্ঞাসা করলেন জগবন্ধুবাবু, "কোথায় বাড়ি, কতদিন কাজ করছ এখানে?"

এতগুলো গাছগাছড়া থেকে জগবন্ধুবাবু মালীর পরিচয়টা ধরতে পারেন নি!

"নাম আমার জনার্দন ছইয়াল। জাত ব্যবসা ছিল ঘর তোলার কাজ। কিন্তু কালিদাসবাবুর আমল থেকেই আমি মালীর কাজ করছি। তিনি আমায় নিজে হাতে কাজ শিখিয়েছেন বাবু। এমন মানুষ সারা পরগনাতে কোথায় মিলবে? ঘর তোলার স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে দিতে হল। গোলামির মধ্যে যে এত সুখ আছে তা বুঝতে পারলুম বড় কর্তার হাতের কাছে এসে! ছোট কর্তাও বাপ্‌কা ব্যাটা হয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু—"

"কিন্তু কি জনার্দন?" জগবন্ধুবাবু আগ্রহ দেখালেন জবাব শুনবার জন্যে।

"কিন্তু বংশটা বোধ হয় আর রক্ষে পেল না।"

"কেন? নাগদানার—" কথাটা শেষ করলেন না জগবন্ধুবাবু, সামলে নিয়ে বললেন, "সময় এখনো যায় নি। ঢের সময় আছে।"

"তবে যে শুনছি, ডাক্তার-রা নাকি জবাব দিয়ে দিয়েছে?"

"এসব ব্যাপারে ডাক্তারদের কেরামতি টেকে না জনার্দন।"

"হ্যাঁ, ভগবানের আশীর্বাদ চাই। কর্তাবাবু সারাদেশের এত উপকার করেছেন ভগবানের আশীর্বাদ তিনি পাবেনই।—দোষটা কার বাবু? বৌরানীর নয় তো?"

এবার প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মেঘনা নদী দিয়ে বয়ে চলেছে ভাঁটার জল। শান্ত এবং সুস্থির জল এই নদীটার। আশপাশের হাট থেকে গৃহস্থেরা

সওদা নিয়ে ঘরে ফিরছে। ছোট ছোট নৌকো। এক হাতে হুঁকো নিয়ে মাঝিরা অন্য হাত দিয়ে নৌকো বেয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো নিচু করে মাঝিরা ভাবছে সারাদিনের হিসেব নিকেশ। ছোটখাটো হিসেবের বাইরে ওদের সমস্যা কখনও জটিল হয়ে ওঠে না। জগবন্ধুবাবু এসে বসলেন বেঞ্চিটার ওপরে। নির্জনতা ক্রমে ক্রমে ঘন হয়ে আসছে। স্থলেব সীমানা পার হয়ে নির্জনতা ক্রমে জমাট বাঁধছে নদীর বুকে। একটু পরে নৌকোগুলোও আর থাকবে না। ওপারের বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দু-একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোর টুকরো এসে মাঝে মাঝে জগবন্ধুবাবুর তন্ময়তাকে আঘাত দেয়। না দিলে, জল তাঁকে টেনে নিয়ে যেত। স্থলের সত্য ভুলে যেতেন জগবন্ধুবাবু। সেগুন গাছের তলায় বেঞ্চিটা শুধুশুধু পাতা হয় নি। বেঞ্চিটার পশ্চাৎ আছে, আছে বর্তমানও। অতএব ভবিষ্যৎও নিশ্চয়ই থাকবে। জল ও স্থলের মাঝখানে বেঞ্চিটাই কেবলমাত্র ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ঠেকিয়ে রেখেছে সুরমা ও বৌরানীর বিরুদ্ধ আকর্ষণ। জগবন্ধুবাবুর তন্ময়তা দানা বাঁধে এই বেঞ্চিটারই চারপাশ দিয়ে। আজও বাঁধল।

কতক্ষণ যে তিনি তন্ময়ভাবে জলের দিকে চেয়েছিলেন খেয়াল রইল না তাঁর। বৌরানীটি কে? কি চায় তাঁর কাছে সে? ভালবাসা? সুরমা তো কৃপণ ছিল না, তার চেয়ে বেশি ভালবাসা সংসারে কেউ দিতে পারে বলে মনে হল না জগবন্ধুবাবুর। কিন্তু বৌরানীর ভালবাসা যদি সংসারের সীমা অতিক্রম করে থাকে, তা হলে? কেবল সাংসারিক ভালবাসা নিয়ে তো শিল্পী কখনও জীবন কাটাতে পারে না! কাটাতে হয় বলেই বোধ হয় শিল্পীর দুঃখ আজ জল আর স্থলের সীমানায় এসে থমকে দাঁড়াল। ব্যবধানটা খুবই সংকীর্ণ। জল তাঁকে টানছে, টানছে বৌরানী।

জগবন্ধুবাবু উঠে পড়লেন। রাস্তাটা তাঁর চেনা হয়ে গেছে। অন্ধকারে পা ফেলতে ভয় করে না একটুও। সেরেস্তাটা পেছনে রেখে, দু-তিনটে উঠোন পার হয়ে তিনি এসে পৌছলেন বড় বাড়ির দরজায়। জগদীশবাবু চিঠি দিয়েছেন সরকারমশাইকে যে, জগবন্ধুবাবুকে যেন দো-তলার বড় ঘরটা দেওয়া

হয়। সেরেস্তায় বিছানা পেতে শোবার লোক নন তিনি। প্রথম দিন থেকে তাই সবাই জগবন্ধুবাবুকে সম্মান দেখাচ্ছে আশাতিরিক্তভাবে। মাঝে মাঝে জগদীশবাবু আর জগবন্ধুবাবুর মধ্যে ফারাক কিছুই থাকছে না।

অন্দরমহলটা দেখা শোনা করবার ভার আছে যতীনের ওপর। যতীন রমাকান্তেরই বড ছেলে। এরও বিশ্বাস, জগদীশবাবুর কাছে গোলামি করবার মত সুখের কাজ দুনিয়াতে আর কিছু নেই। সরকারমশাই এসে বলে গেছেন যে, যতীন যেন জগবন্ধুবাবুর সুখসুবিধার দিকে সতর্ক নজর রাখে। পান থেকে চূন খসলে কর্তাবাবু যতীনকে ক্ষমা করবেন না।

দো-তলার সবচেয়ে বড় ঘরটা আজ যতীন নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছিল। সাত দিন পর পর জানালা দরজার পর্দা সব বদলাতে হয়। মেঝের কার্পেটের ওপর চালাতে হয় শক্ত তারের বুরুশ। জগবন্ধুবাবুর পায়ে ধূলো কিছু থাকে না, তবু পরিষ্কার করতে হয়, এটা নিয়ম। কর্তাবাবুর শোবার ঘর এটা, তাঁর পায়েও ধুলো কিছু থাকত না। তবুও সাত দিন পর পর যতীনকে পরিষ্কার করতে হতো। কার্পেটের ওপর বুরুশ চালাতে চালাতে যতীন খুবই অবাক্ বোধ করছিল। জগবন্ধুবাবু যতবড় ওস্তাদ-ই হোন না কেন, তিনি তো কর্মচারি, সেরেস্তায় তাঁকে কাজ করতে হয়। মাইনে তাঁর সরকার-মশাএর চেয়েও কম। অথচ কর্তাবাবুর শোবার ঘরখানা তাঁকে খুলে দিতে হলো! খাবারদাবারের ব্যবস্থা সবই হলো জগদীশবাবুর মত! জগদীশবাবুর সামনে খাবার সাজিয়ে দেওয়া হতো বটে, কিন্তু তিনি খেতে পারতেন না—আর জগবন্ধুবাবু সবই খেয়ে ফেলেন। এইটুকু তফাত ছাড়া যতীন দু-জনের মধ্যে আর কোন তফাতই দেখতে পায় না।

কার্পেট এবং অন্যান্য যাবতীয় আসবাবগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে যতীনের হঠাৎ মনে পড়ল, আজ সকালে কর্তাবাবুর কাছ থেকে আবার একটা নতুন চিঠি এসেছে। চিঠি পেয়ে সরকারমশাই নিজেই এসেছিলেন ছুটে অন্দরমহলে। সিঁড়ি থেকেই তিনি চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, "যতীন, যতীন কই রে? জরুরি চিঠি, শিগগীর আয়।"

"এই যে এসেছি সরকারমশাই, বলুন।"

"কর্তাবাবুর চিঠি, নিজে হাতে লিখেছেন!" চশমার তলা দিয়ে সরকার-মশাই চট্ করে আর একবার চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। কর্তাবাবুর হাতের লেখা গত ত্রিশ বছরের মধ্যে তিনি মাত্র তিনবার দেখেছেন। তাও পাঁচ-ছ লাইনের বেশি নয়। দেশে এলে তাঁর হয়ে সরকারমশাই নিজেই লেখেন চিঠিপত্র। ঢাকায় দেওয়ানজী আছেন। কর্তাবাবু সারাজীবন কেবল সই আর স্বাক্ষর দিয়ে লেখাপডার কাজ চুকিয়েছেন। কিন্তু আজ? ওরে বাবা, এ যে তাঁর নিজের হাতে লেখা পুরো এক পাতা! সেরেস্তায় বসে চিঠি পড়ে তিনি অবাক্ হয়ে গেছেন। এমন যত্ন নিয়ে তিনি কখনও তো কিছু লেখেন নি? বছর পাঁচ আগে কর্তাবাবু একদিন তাঁকে ডেকে পাঠালেন দো-তলার ঐ বড় ঘরটায়। বৌবানী তখন কলকাতায় ছিলেন। কর্তাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কাগজ কলম এনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"লিখুন। লিখুন, কল্যাণীয়াসু—"

"হ্যাঁ? মানে মেয়েদের কাছে লিখতে হবে বুঝি?"

"বৌরানীকে লিখতে হবে। তাঁকে এখানে আসবার জন্যে চিঠি দিচ্ছি। শীতকালে বারোদিয়ার দৃশ্য তিনি দেখেন নি। যে ক-বার তিনি এলেন বর্ষা আর পুজোর সময়। শীতকালটা তিনি দেখেন নি। জনার্দন কি কাণ্ডই না করেছে! বারান্দায় দাঁড়িয়ে—লিখুন আমি যা বলছি।"

"আজ্ঞে বৌরানীকে চিঠি লেখা, মানে—"

"লিখুন, আমি সই করে দেব।......কোন্ পর্যন্ত লেখা হলো?"

"আজ্ঞে, 'বারান্দায় দাঁড়িয়ে জনার্দনের শিল্পসম্ভার দেখতে দেখতে চোখ আমার রসসিক্ত হয়ে ওঠে। একদিকে সারি সারি বাঁধাকপির সবুজ ঢেউ, অন্যদিকে বিলেতী বেগুনের লাল সাম্রাজ্য! চীনে লালের উল্টো দিকে আমেরিকান হোয়াইট আর গোল্ডেন কুইনের হলুদ রং-এর ছড়াছড়ি! বৌরানী, এ দৃশ্য তোমার এসে দেখা উচিত। কাশী আর কিশোরগঞ্জের বেগুন তুমি

নিশ্চয়ই দেখেছ। জনাদন দু-জাতীয় বেগুনের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে। কাশীর ওজন খানিকটা কমিয়ে দিয়ে কিশোরগঞ্জের দৈর্ঘ্য দিয়েছে বাড়িয়ে। কাশীর সাদার ওপর কিশোরগঞ্জের রং উঠেছে ভেসে। অপূর্ব ওর সমন্বয়ের শিল্প। চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি চলে এস বৌরানী।' শেষ লাইনটা কি লিখব কর্তাবাবু?"

"এর পরে আবার শেষ লাইনের দরকার কি সরকারমশাই? শিল্পের শেষ দেখতে চাইছেন কেন?"

'আজ্ঞে তা নয়। মানে, শেষ লাইনটায় থাকে স্বামী-স্ত্রী—"

"ওঃ।" জগদীশবাবুর আশ্চর্যসূচক আওয়াজের মধ্যে সরকারমশাই আর্তনাদের সুর শুনতে পেলেন। কলম হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। শেষ লাইনটার অর্থ কর্তাবাবুর মনে বোধ হয় ঝড় তুলেছে। কথাটা উল্লেখ না করলেই বোধ হয় ভাল হতো। জনার্দনের শিল্প-রাজ্যে শেষ লাইনটার অর্থ কিছুই নেই।

একটু পরে জগদীশবাবু বললেন, "লিখুন, আমার আশীর্বাদ রইল। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—দিন সই করে দিচ্ছি। আজকের ডাকেই চিঠিখানা যেন যায় সরকারমশাই।"

আজকে সকালের ডাকে কর্তাবাবুর চিঠিখানা আসবার পরে, সরকারমশাই বার বার করে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। নিজের চোখের প্রতি অবিশ্বাস আসছিল পুনঃ পুনঃ। এক পাতা চিঠির প্রতিটি কথা তাঁর নিজের হাতে লেখা। এতটা যত্ন নিয়ে তিনি যদি পাঁচ বছর আগে বৌরানীকে চিঠি লিখতেন? যাক, সেসব পুরনো ইতিবৃত্তের আজ আর কোন মূল্য নেই। কাশী আর কিশোরগঞ্জের সমন্বয় নাগ-বাড়ির মাটিতে মাথা ঠুকে মরছে।

যতীন জিজ্ঞাসা করল, "কর্তাবাবু কি লিখেছেন সরকারমশাই?"

"লিখেছেন: বড়ঘরের দেরাজে আমার সব নতুন নতুন কাপড় আছে। শার্ট, পাঞ্জাবি, ধুতি, পা-জামা এবং রাত্রের পোশাক। ওগুলো আমি কোনদিনও ব্যবহার করি নি। করবার সুযোগ পাই নি। যতীনকে বলবেন সে যেন

কাপড়গুলো ওস্তাদজীকে বার করে দেয়। এখান থেকে হঠাৎ তাঁকে চলে যেতে হলো বলে, তিনি কাপড়চোপড় বেশি কিছু সঙ্গে নিতে পারেন নি। দেরাজের মধ্যে কাপড়গুলো পড়ে থাকলে লাভ হবে কি? নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া, ওগুলোর মধ্যে একটাও আর আমার গায়ে লাগবে না। গত এক বছরের মধ্যে আমি যে কতটা ফেঁপে উঠেছি, আমায় না দেখলে তা বুঝতে পারবেন না। আপনি তো ঢাকায় অনেকদিন হল আসেন নি। একবার আসুন, এসে আমায় দেখে যান সরকারমশাই। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। ইতি—"

"যতীন, তুই তা হলে সব ব্যবস্থা করিস। দেরাজের খবব তো আমি কিছুই জানি না। সেরেস্তাব খাতায় কাপড় জামাব কোন হিসেবও নেই। চিঠিখানা তোর কাছেই থাক, দরকার হলে ওস্তাদজীকে দেখাতে পারবি।"

রাত্রিতে বিছানা পাতবার সময় যতীন বার বাব করে ভুলে যাচ্ছিল যে, জগবন্ধুবাবু জমিদার নন। ওর চোখ থেকে ক্রমশই দু-জনেব তফাৎটা মুছে যাচ্ছিল। বড় বড় আলমারী খুলে যতীন কর্তাবাবুর বালিশগুলো বার করে নিয়ে এল। নিয়ে এল লাল, নীল ডায়মণ্ড-কাটা ডিজাইনেব বালিশের ওয়াড়। এক দিন পরে পবে, ডিজাইনগুলো বদলে দেবে যতীন। ওয়াড়ের ওপবে অনেক রকমের ডিজাইন তোলা আছে। একটা ডিজাইন যতীনের খুব ভাল লাগে। কর্তাবাবু এলে সেই ওয়াড়টা সে বালিশে লাগিয়ে দেয়। ছবিটা কর্তাবাবুর খুবই পছন্দ হয। সাদা কাপড়ের ওপর লাল সুতোর একটা কদম গাছ। ফুলগুলো সব হলদে সুতো দিয়ে তোলা। পাতাগুলো অবশ্যি সবুজ। কেষ্ট ঠাকুর বসে আছেন কদম গাছেব ডালে। পাশেই একটা নদী। নদীতে মেয়েবা সব নেমেছেন। রাধিকা? তিনি কোথায়? তাঁকে খুঁজে বাব কবতে যতীনের এক মিনিটও সময লাগে না।

ডায়মণ্ড-কাটা বালিশের ওয়াড় লাগাতে গিয়ে যতীনের চোখের সামনে ভেসে উঠল মেঘনা নদীটা। লাল সুরকির রাস্তাটা সোজা গিয়ে পৌচেছে নদীর কিনারা পর্যন্ত। কদম গাছ অবশ্যি নেই, সেগুন গাছ আছে। খুবই শক্ত গাছ। তার তলায বেঞ্চি পাতা আছে। কিন্তু কর্তাবাবু কিংবা বৌরানী

কখনও সেদিকটায় যান না। গাছে ওঠা তো দূরের কথা, কর্তাবাবু বেঞ্চিটায় পর্যন্ত বসতে কখনও চেষ্টা করেন নি!

জগবন্ধুবাবু ঘরে এলেন। বিছানা পাতা শেষ হয়ে গেছে। বিলেতী সেণ্টের শিশি নিয়ে যতীন বিছানায় ঢালতে যাচ্ছিল। ঢাললও একটু, জগবন্ধুবাবু দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কি যতীন?"

"সেণ্ট।"

"ওটা কেন?"

"পাডাগাঁ-এর ধোপা ভাতেব মাড় দেয়। চাদর আর ওয়াড় থেকে তাই বিচ্ছিবি গন্ধ বেরয়।"

"পাডাগাঁ-এর গন্ধ আমার ভাল লাগে যতীন। ওটা থাক।"

"কর্তাবাবুর একটা চিঠি এসেছে। তিনি নিজে হাতে চিঠি লিখেছেন বাবু।"

"কি চিঠি?"

জগবন্ধুবাবুর হাতে চিঠিখানা দিয়ে যতীন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চিঠিখানা পড়া শেষ করে জগবন্ধুবাবু বাতিটা নিবিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ পক্ষের রাত। ভেতব আর বাইরের মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না। বিছানায় এসে শুয়ে পডলেন তিনি। পাড়া গাঁ-এর গন্ধ কিছু নেই। এক ফোঁটা বিলেতী সেণ্টের কাছে গোটা বারোদি গ্রামের গন্ধটা টিকতে পারল না। সারা ঘরময় আবিরের মত গন্ধটা যেন উডে বেড়াতে লাগল। একটু পরেই তাঁর স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে উত্তেজনা এল। বিস্মিত বোধ করলেন জগবন্ধুবাবু। নাসারন্ধ্রটা যেন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সক্রিয় হয়ে উঠল, ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগলেন তিনি। ঘুম আসছে না। ঘুমতে দিচ্ছে না বিলেতী সেণ্টের গন্ধ।

মস্তবড় বিছানা। পুব থেকে পশ্চিম দিকের দেওয়াল পর্যন্ত বিস্তৃতি এর বিরাট্। জগবন্ধুবাবু হাত ছড়িয়ে দিয়ে কোন দিকের দেওয়ালই ধরতে পারলেন না। ঘরের দক্ষিণ দিকে একটা দরজা রয়েছে। এই দরজা দিয়ে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছন যায় তার মানচিত্র জগবন্ধুবাবুর জানা নেই। জানবার চেষ্টা করলেন তিনি।

দরজাটা খুলে ফেললেন। সামনেই একটা ছোট বারান্দা। তিন দিকেই বন্ধ। একদিকের খোলা রাস্তাটাই ধবলেন তিনি। এগুতে লাগলেন। বাধা কোথাও পেলেন না। বিস্তৃতি কেবল বিছানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিস্তৃতি এর সর্বত্র। দু-চারটে অলিগলি পাব হয়ে গেলেন জগবন্ধুবাবু। কোথায চলেছেন তিনি? খিড়কির দরজার মত একটা ছোট দরজাব সামনে এসে থামলেন তিনি। ওপাশ থেকে দরজাটা বন্ধ আছে।

নাগ-বাড়িব জেনানামহল এইখান থেকেই সুরু হযেছে।

উলের জামা বুনছিল বৌরানী। ভজহবি বৌবানীব গাযে হেলান দিযে বসে ছবির বই দেখছিল। লক্ষ্মীর মা এল সেই সময।

"কি রে লক্ষ্মীব মা, কিছু বলবি?"

"কর্তাবাবু খবর পাঠিয়েছেন, তিনি আপনাব সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।"

"বেশ তো—"

"ভজহরি তবে এখানে কি করবে, ইস্কুলঘরে চলে যাক না ও।"

ভজহরি উঠতে যাচ্ছিল। বৌরানী ওকে টেনে বসিয়ে দিযে বলল, "ভজহবি এখানেই থাক। রমাকান্তের ঘাড়ে ভর দিয়ে কর্তাবাবুর এতটা পথ আসতে কষ্ট হবে খুব। লক্ষ্মীর মা, তুই গিয়ে খবব দিযে আয়, আমি নিজেই যাচ্ছি ওঁর কাছে।"

"আচ্ছা বৌরানী।" লক্ষ্মীর মা বেরিয়ে যাবার সময় ভজহবির দিকে কটমট কবে চাইল একবার। বৌরানী বুঝল ওব রাগের কারণ। কিন্তু লক্ষ্মীর মা বুঝতে পাবলে না যে, এব মধ্যে রাগ কববাব সত্যিই কোন কাবণ নেই। ভজহরির উপস্থিতি আজ আর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না।

"খোকা তুই বস্, আমি একবার কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"আমার জন্যে কিন্তু তাডাতাডি ফিরে এসো না বৌরানী।"

"না খোকা। আমি তাড়াতাড়ি করে ফিরতে না চাইলে কি হবে,

কর্তাবাবু আমায় তাড়াতাড়ি করে বিদায় দিয়ে দেবেন। থাকতে চাইলে কি থাকা যায়?"

শেষের কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না বলে ভজহরি ছবির বইটা মেঝেতে ফেলে রেখে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে বসল। বৌরানী জেনানা-মহলের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। দু-বছর আগে কর্তাবাবু একবার এসেছিলেন তার ঘরে। সেই দিনটার কথা মনে পড়ল বৌরানীর।

ওস্তাদজী চলে যাচ্ছিলেন ঢাকা শহর ছেড়ে। বৌরানী খবরটা পেয়েছিল ভজহরির কাছে। সমস্তটা দিন বৌরানী ভেবেছে, কেমন করে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারে। কাউকে না জানিয়ে সে যেতে চেয়েছিল। ফজ্‌লুর সাহায্য আর পাওয়া যাবে না। প্রকাশ্যভাবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াও বিপজ্জনক ছিল। রমাকান্তের চোখে পড়লে দুর্নামের আর অন্ত থাকত না। এমনিতেই তো শহরে তাকে নিয়ে ওস্তাদজীর সম্বন্ধে কত গল্প রটে গেছে। শেষ পর্যন্ত বৌরানী ঠিক করল যে, সাধারণভাবেই সে লুকিয়ে সন্ধ্যের একটু পরেই নাগ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। রাস্তা থেকে যে-কোন একটা ভাড়াটে গাড়ি ধরে নেবে। কাউকেই না জানিয়ে বেরুতে না পারলে, অভিসারের আর অর্থ রইল কি?

সমস্তটা দিন অভিসারের আবহাওয়ায় মশগুল হয়ে বৌরানী সময় কাটাতে লাগল। অন্যদিন সন্ধ্যে আসতে বেশি দেরী হতো না। আজ যেন দিনের আয়ু ফুরতেই চায় না। সে বুঝতে পেরেছে যে, ওস্তাদজী এবার তার দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছেন। চলে যেতে বাধ্য করলেন তার স্বামী। গানের আসরটিকে কর্তাবাবু জোর করে ভেঙ্গে দিলেন। বৌরানী ঠিক করে রেখেছিল যে, এবার থেকে সে চিকের আড়ালে বসে ওস্তাদজীর গান শুনবে। তাঁর গান শুনতে শুনতে জীবন কাটিয়ে দেবে সে অতি অনায়াসে। কিন্তু জগদীশবাবু সেটুকু সুবিধেও তাকে দিলেন না।

নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বৌরানী কোন রকমে দিনটা কাটিয়ে দিল। বুড়ী গঙ্গার জলে রোদের চিহ্ন আর নেই। বৌরানী আরও একটু অন্ধকারের

জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অন্ধকার হলও। গৃহস্থ বাড়ির বৌদের মত সাধারণভাবে শাড়ী পরল সে। হাতের চুড়ি খুলে ফেলল সব। কেবল এক গাছা করে রেখে দিল নিয়ম রক্ষার জন্যে। খোঁপাটাকে ঠেলা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলল অর্ধেকটা। খোঁপার তলা দিয়ে কতকগুলো এলোমেলো চুল লুটিয়ে পড়ল ঘাড়ের দু-দিকে। কপালের ওপরে সে একটা চুলও অনর্থক ফেলে রাখল না। সিঁথির দু-ধারে সামনের চুলগুলোকে সব এনে স্তূপীকৃত করল। সিঁদুরের রেখাটা অস্তগামী সূর্যের শেষ রেখাটির মত ডুবে গেল চুলের অন্ধকারে। বৌরানী অভিসারে যাচ্ছে, দেখা করতে যাচ্ছে ওস্তাদজীর সঙ্গে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো, সে পার হচ্ছে মাণিকতলার রাস্তা। ফরাস-গঞ্জের রাস্তাটা যেন তার চেনাই নেই।

দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন জগদীশবাবু, "বেলারানী—"

"কে?" আয়নার কাছ থেকে সরে এল বেলারানী, বৌরানী নয়।

দরজা খুলে সে দেখল, মালাক্কা বেতের ছড়ির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জমিদার জগদীশচন্দ্র নাগ। কল্পনাটা লুটিয়ে পড়ল বাস্তবের পায়ের কাছে টুকরো টুকরো হয়ে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছ বৌরানী?"

"বাইরে যাওয়ার সাজসজ্জা তো এ নয়।" বৌরানী অবাক্ হল খুব।

"তা নয়, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মনে হল, তুমি বাইরে যাচ্ছিলে।"

"কেমন করে যাব, ফজ্‌লুকে তো ছাড়িয়ে দিয়েছ?"

"দরকার থাকলে, ফজ্‌লুকে ডেকে আনব আবার। কিন্তু জগবন্ধু আজই যে চলল বারোদির সেরেস্তায় কাজ করতে।"

বৌরানী কোন মতামত প্রকাশ করল না। লম্বা আয়নার ওপরে লেসের ঢাকনিটা তোলা ছিল। সে হাত দিয়ে টেনে সেটা দিয়ে আয়নাটাকে কেবল ঢেকে রাখল। চেহারা দেখবার দরকার নেই আর।

"কিছু তো তুমি বলছ না বৌরানী?" জিজ্ঞাসা করলেন জগদীশবাবু। কি বলবে সে? কাউকে জানিয়ে তো অভিসারে যাওয়া যায় না। এরই মধ্যে

ওস্তাদজীর সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ তার আর রইল না। সমস্ত দিনের প্রস্তুতি নষ্ট হয়ে গেল। জগদীশবাবু না এলেই পারতেন। বৌরানী জিজ্ঞাসা করল, "কেবল ছড়ির ওপর নির্ভর করে এতটা পথ এলে কি করে? রমাকান্ত কই?"

"তাকে সরিয়ে দিয়েছি কায়দা করে।" জগদীশবাবু এসে বসলেন বৌরানীর বিছানায়। ছড়িটাকে ঠেকিয়ে রাখলেন খাটের গায়ে। পা-দুটো অতি কষ্টে টেনে তুলে ফেললেন খাটের ওপরে।

বৌরানী জিজ্ঞাসা করল, "কায়দা করে সরিয়ে দিয়েছ তার মানে কি? পুরনো লোক সব ছেড়ে দিলে চলবে কেন?"

"এক ঘণ্টা বাদেই সে ফিরে আসবে। তুমি এবার আমার ঘর থেকে একবার ঘুরে এস।"

বৌরানী কিছুই বুঝতে পারলে না।

"তোমার ঘরে যাব কেন? তুমি নিজে এলে এখানে?"

"ওখানে জগবন্ধু অপেক্ষা করছে, দেখা করে এসো।"

জগদীশবাবুর মুখটা বড্ড কুৎসিত দেখাচ্ছে বলে মনে হল বৌরানীর। ছাতলা পড়ে নি বটে, তবুও সমস্ত মুখটা অত্যন্ত কদর্য হয়ে উঠেছে। হাতের ছাতলার চেয়ে মুখের চামড়া তাঁর অনেক বেশি নোংরা।

দু-চার মিনিটের ক্লান্তিকর নৈঃশব্দ, তারপরেই বৌরানীর সামনে ভেসে উঠল নতুন একটা জগত, যেখানে জগদীশবাবু চলাফেরা করছেন অন্য একটা মুখোস পরে। অক্ষম মানুষের মনস্তত্ব সেখানে বুঝি বংশ রক্ষার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধর্ম অধর্মের সংগঠন সেখানে নেই, নীতি-দুর্নীতির নৈয়মিক-রহস্য হারিয়ে গেছে ব্যর্থ কামনার নৈমিষারণ্যে। কি করবে, বৌরানী ভাবছিল। আঘাত করবে না ক্ষমা করবে জগদীশবাবুকে? বৌরানীর জীবনদর্শনে আঘাত করবার নীতি কোথাও স্বীকৃত হয় নি। তবে? ক্ষমা করাই উচিত। কিন্তু বৌরানী ভাবলে, ইচ্ছে করলেই ক্ষমা করা যায় না। ক্ষমার মুহূর্তটিকে গড়ে তোলবার জন্যে সাধনার প্রয়োজন। তন্ময়তার শেষ সীমায় গিয়ে

পৌঁছতে না পারলে ক্ষমার সিদ্ধি লাভ করা যায় না। ক্ষমার মুহূর্তটি জীবনের কঠিনতম সিদ্ধি।

দরজাটা খুলে দিয়ে বৌরানী বললে, "তোমার ভাঙ্গা আসরের মর্যাদ ফিরিয়ে আনবার সাধ্য আমার নেই। অতএব—"

"অতএব কি বৌরানী ?" জগদীশবাবু ফস করে ছড়িটা টেনে নিলেন হাতে। ছড়িব ওপর দাঁড়ালেন কাত হয়ে। ডান দিকের পা-টায় জোর তাঁর খুবই কম।

"অতএব কি বৌরানী ?" পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন জগদীশবাবু। একটু ভয় পেয়েছেন বলে গলাব স্বরে মৃদু কম্পন উঠল।

"অতএব, তোমাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসছি জেনানামহলেব খিডকি পর্যন্ত।" এই বলে বৌরানী জগদীশবাবুর ছাতলা-পড়া ডান হাতটা টেনে নিয়ে রাখল তার নিজেব ঘাডেব ওপর। বাঁ দিকে মালাক্কা বেতেব ছডি আব ডানদিকে বৌরানীকে রেখে জমিদাব জগদীশচন্দ্র নাগ পৌঁছুলেন এসে দুই মহলের মাঝখানেব খিডকিতে। চৌকাঠের ও-পাশে বাঁ পা-টাই আগে ফেললেন তিনি। তাবপরে ধীবে ধীবে দেহটাকেও টেনে নিয়ে এলেন। এ-পাশ থেকে খিডকির দরজায় খিল্ল লাগিয়ে দিল জগদীশবাবুর স্ত্রী বেলারানী নাগ।

দু-বছর পব আজ আবার জগদীশবাবু বৌরানীব ঘরে আসবার জন্যে খবর পাঠিয়েছেন। সেদিনেব মত কায়দা করে রমাকান্তকে বাইরে পাঠাতে হয নি। আজ তিনি সবাইকে জানিয়ে শুনিয়েই আসতে চাইছেন। কিন্তু জগদীশবাবুকে বৌরানী আর কষ্ট দিতে চায় না। তাই সে নিজেই চলল পুরুষমহলের দিকে।

জগদীশবাবু শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পডছিলেন। রমাকান্ত পায়ে মালিশ লাগাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "ইংরেজ তা হলে এবারও জিতল বাবু ?"

"তাই তো দেখছি। কিন্তু জিতলেও, ইংরেজ এদেশ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, যেতে বাধ্য হবে।"

"তবে এসব জমিদারিগুলোর কি হবে বাবু ?"

"বৌরাণী তো বলেন, কিছুই এব থাকবে না।"

"তিনি তো খববেব কাগজ পড়েন না, কি করে জানলেন তিনি বাবু?"

বাঁ পা-টা পাশবালিশের ওপব লম্বা ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে জগদীশবাবু বললেন, "থেকেই বা কি হবে রমাকান্ত? ভোগ কববে কে?"

বৌবানী এল। রমাকান্ত মালিশেব শিশিটা হাতে নিযে উঠে পড়ল। বেবিযে গেল ঘর থেকে। জগদীশবাবু বললেন, "কববেজ মশাই এলে আমায খবর দিস।"

বিছানাব পাশেই বসল বৌবানী, জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ?"

"ধীবে ধীবে ভাল হয়ে উঠছি। ডান পা এর জোর খানিকটা বেড়েছে। ভেতরের দুবলতাও কমে যাচ্ছে। কববেজ মশাইকে অনেক আগেই ডাকা উচিত ছিল" জগদীশবাবু বৌবানীব হাতের ওপব হাত রাখলেন।

"তোমাব ভেতবেব দুবলতা কমে যাচ্ছে, কই আমি তো জানি না?"

"বাড়িব সবাই জানে। তুমি জানবে সবার পরে।"

"কেন?"

"পুবোপুরি ভাবে ভাল না হলে তোমাকে জানিয়ে কি লাভ হতো?"

"পুরোপুবি ভাবে ভাল হলেও লাভ কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না।"

"কেন, কেন? আমার সঙ্গে সঙ্গে নাগ-বংশটা শেষ হয়ে যাক, এই কি তুমি চাও?"

"বাঁচিয়ে বেখেই বা লাভ কি?"

"লাভ লোকসান জানি নে, বাঁচানো দবকাব বৌরানী।" শেষের কথাগুলোর মধ্যে অনুবোধের স্বরটাই তাঁর স্পষ্ট হযে কানে পৌঁছুল বৌবানীর। তাই সে বললে, "বাচাতে পারলে ভালই। কিন্তু নাগ-বাড়ির আর কোন ভবিষ্যৎ আছে বলে আমার মনে হয় না। কবরেজ মশাই চেষ্টা কবতে থাকুন। ডাক্তাব বদ্যির ওপর বিশ্বাস না থাকলে চিকিৎসার কোন মানে হয় না।"

"মানে হয় না বললে শুনব কেন বৌবানী? আমার বন্ধুবান্ধব এবং বাড়ির সব কর্মচাবিরা কত খুশী হয়েছে আমার ক্রম-আরোগ্যের খবর পেয়ে। ওদের

উত্তেজনাও বড কম নয়, পারলে নাগ-বাড়ির দেয়াল থেকেই ওরা একটা সন্তান সৃষ্টি করত !”

“কিন্তু আরোগ্য লাভ করার আগেই প্রচারটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি ? উত্তেজনাটা ওদের, না তোমার ?” এই বলে বৌরানী উঠে পডল।

“কোথায় চললে ? কি কাজ তোমার ? দিন কাটে কি করে ?” জিজ্ঞাসা করলেন জগদীশবাবু। বৌরানীর কাছে জগদীশবাবুর গলার সুরটা খুবই অদ্ভুত ঠেকল। নতুন সুর। ব্যাঙের সুর নিশ্চয়ই নয়। এমন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটা হঠাৎ কেন হালকা হয়ে উঠবেন ?

বৌরানী বলল, “কাজ তেমন কিছু নেই। কাজ করতে আমি এ-বাড়িতে আসিও নি। তা ছাড়া সবচেয়ে বড কাজটা তো আমায় দিয়ে করিয়ে নিতে পারলেও না তুমি !”

“কোন্ কাজটা যেন ?” সব কিছু জানা সত্ত্বেও জগদীশবাবু বৌরানীর কাছ থেকে নতুন করে জানতে চাইলেন, “কাজটা কি যেন ?”

“বংশরক্ষার কাজ।”

কথাটা শুনে আনন্দ পেলেন জগদীশবাবু। বংশরক্ষা হোক না হোক, কথাটা শুনতে ভাল লাগে তাঁর। কথাটা কেবল কতকগুলো অক্ষর দিয়ে বাধা হয় নি, উচ্চারণের মধ্যে সঙ্গীত আছে। গানের আসর ভেঙ্গে গেল বলে দুঃখ কি তাঁর ? হল্ ঘরের আসর বড সঙ্গীতের স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। তবলা-তানপুরার প্রয়োজন কি ? কেবল উচ্চারণের মধ্যেই ‘আলাপের’ উচ্চতা ধরা পডছে স্নায়ুতন্ত্রের সহজ বন্ধনের মধ্যে। তিনি চুপ করে আছেন দেখে, বৌরানী ভাবল, জগদীশবাবু বোধ হয় আঘাত পেলেন। তাই সে বলল, “বংশরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম বাবার কাছে। কিন্তু—”

“জানি .....জানি, নইলে তুমি এ-বাডিতে আসবেই বা কেন ?” জগদীশবাবু উঠে বসলেন।

“এলেই যদি, প্রথম দিন থেকে নাগ-বাডির একটা গাছের পাতার প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মাল না কেন বৌরানী ?”

"তার মানে?" চমকে গেল বৌরানী।

"মানেটা খুবই সরল।"

"বুঝিয়ে না বললে বুঝব কি করে?" বৌরানী ঢিল ছুঁড়ল অন্ধকারে, "কি বলতে চাইছ, খুলে বলো।"

"জমিদার জগদীশ নাগের বংশরক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই তুমি এ-বাড়িতে ঢুকেছিলে জানি। মানুষের সব আশা তো পূরণ হয় না বৌরানী। আশা পূরণ হল না বলে, তোমার চেয়ে দুঃখ আমার কম নয়। কিন্তু তাই বলে, সংসারের সবটুকু অস্তিত্ব তো আমার মুঠো থেকে আলগা হয়ে বুড়ী গঙ্গার জলে ভেসে গেল না? সন্তান একটা পেলুম না বলে ভাসিয়ে দিতে পারলুম না আমার ঐ মানুষ-বাগানটাকে! তোমার কেন বিন্দুমাত্র অনুরাগ এল না আমার ঐ মানুষ-বাগানটায়? কেন? জবাব দিয়ে যাও—"

ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছিল বৌরানী। জগদীশবাবুর প্রশ্নের টানে সে ঘুরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বললে, "সারা জীবন ধরে তো কেবল ইস্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে গেলে। কিন্তু শিক্ষা কিছু বাড়ল না।"

"বাড়ল না? এতগুলো মুন্সেফ আর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তবে এল কোথা থেকে?"

"ওঁদের সংখ্যা বাড়ল বলে শিক্ষাও বাড়ল, তেমন বিশ্বাস আমার নেই। ওঁদের সংখ্যা যত তাড়াতাড়ি বাড়বে, তোমরা তলিয়ে যাবে তত তাড়াতাড়ি।"

"তুমি ওঁদের অকৃতজ্ঞ বলতে চাও?" তেড়ে উঠলেন জগদীশবাবু।

"কৃতজ্ঞতাবোধ যে শিক্ষারই একটা বড় অংশ তেমন বিবেচনা শিক্ষাপদ্ধতি থেকে উঠে গেছে। কতকগুলো বই মুখস্থ করে লাভ হল কি? চুরি করা মহাপাপ ক-জন লোক মনে রেখেছে? প্রতিবেশীকে ভাল না বাসলে অপরাধ হয়, অফিস দপ্তরের ক-জন সাহেব সে-কথা জানে? অপরের মুখের অন্ন কেড়ে নিলে মহাপাপ হয়, তেমন বিবেচনা কোন্ বিদ্বান মনে রাখল? ক্ষমা এবং ভালবাসার পুণ্যবোধ তোমাদের শিক্ষিতদের মনে থেকে মুছে না গেলে, মন্দির, মসজিদ্ আর গীর্জাগুলোতে আজ এত ভিড় কেন?"

"ওঃ!" জগদীশবাবু ছটফট করতে করতে বললেন, "ওঃ, সেইজন্যেই বুঝি ভজহরিকে আমার মানুষ-বাগান থেকে তুলে নিয়ে এলে? ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দিলে? ব্যাটা এখন সাইকেল চেপে খবরের কাগজ বিক্রি করে বেড়ায়। সেরেস্তার চিঠিপত্র নিয়ে এদিক ওদিক ছুটতে ওর ভাল লাগে কেন? ব্যাটা মুখখু, তাই। বড় হলে আর কি হবে? হকার, নয়তো পিওন। মানুষের লাথি খেয়ে মরবে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। পরের দিন সকালবেলা ব্যাটা আবার যাবে মানুষের জুতো চাটতে।" ভোঁসভোঁস করে জগদীশবাবু নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

"লাথি খাবে, কিন্তু ভজহরি কখনও নিজের পা ছুঁড়বে না। বিদ্বান লোকেদের লাথি খেয়েও যেন ভজহরি তাঁদের ক্ষমা করতে পারে, তেমন শিক্ষা ভগবান ওকে দিন। রাস্তার ঐ সাধারণ মানুষদের মধ্যে ভজহরিও একজন সাধারণ হয়েই থাক। মানুষকে লাথি মারা যে মহাপাপ তা ওরা আজও ভোলে নি। আর যাই হোক, ভজহরিকে অফিস-দপ্তরের চেয়ার চেপে বসতে হবে না।" বৌরানী যাওয়ার জন্যে পুনরায় পা বাড়াল উল্টো দিকে। বাধা দিয়ে জগদীশবাবু বললেন, "দাঁড়াও।··ভজহরিকে মুখখু এবং সাধারণ করে রাখার অর্থ হচ্ছে যে, তুমি জগবন্ধুর ওপর প্রতিশোধ নিলে।"

"প্রতিশোধ? কেন?"

"জগবন্ধুকে তুমি ভালবাসতে চেয়েছিলে। তাই ভজহরির ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছ। মূর্খ ভজহরি চিরদিন কষ্ট পাবে।"

মৃদু হেসে বৌরানী বলল, "বর্ষা পেরলেই শীত আসতে বেশি আর দেরি হবে না। ভজহরি যেন কষ্ট না পায় সেই জন্যে উলের জামা বুনছি। গেল শীতে বেচারী বড্ড কষ্ট পেয়েছে! এবার সে শীতের সঙ্গে লড়াই করবার অস্ত্র একটা পাবে।"

"কিন্তু আমার প্রথম কথাটার তো জবাব্ দিলে না?"

"কি জবাব দেব? প্রশ্নটা তৈরি করেছ তুমি, জবাবটাও তোমার মনের মধ্যে লুকনো থাক।"

"কেন, তোমার নিজের মনে কি কোন কথা লুকনো নেই ?" জগদীশ-বাবুর-কণ্ঠ ক্রমশই কর্কশ হচ্ছে বৌরানী তা বুঝতে পেরেই দরজা থেকে এগিয়ে এল বিছানার কাছে। যা সত্য তা থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। একটা লুকনো কথার ওপরে যদি স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধটা বিষাক্ত হয়ে ওঠে, তবে তা বিষমুক্ত করার দায়িত্ব বৌরানীরই। সে এসে দাঁড়াল জগদীশ-বাবুর সামনে। তাঁর চোখের দিকে সোজাসুজিভাবে চেয়ে বৌরানী জিজ্ঞাসা করল, "যা বলতে চাও, এবার খুলে বলো।"

"তুমি দেবেশ দত্তকে ভালবাসতে।" বললেন জগদীশ বাবু।

বৌরানী বসে পড়ল বিছানার ওপর। উঁচু মাথাটা তার নিচু হয়ে এল খুব ধীরে ধীরে। প্রতিবাদের ভঙ্গি এটা নয়। স্বীকৃতির মধ্যে বৌরানী কোন লজ্জার লক্ষণ প্রকাশ করল না। বুঁজে-আসা চোখের পাতায় দেবেশ দত্তের মর্যাদা সে ভাসিয়ে রাখল। এর মধ্যে কোন কিছুই আর প্রতিপাদন সাপেক্ষ নয়, সবটুকুই সম্পাদন।

জগদীশ নাগের ছাতলা-পড়া হাতের ওপর বৌরানীর চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রমাগত। ছাতলা-শোধনের ওষুধ এতে নেই। হাতের ওপর থেকে জল গড়িয়ে পড়বে মেঝেতে, মেঝে থেকে চলে যাবে বারান্দায়, বারান্দা থেকে প্রাচীর পর্যন্ত—তারপর ? তারপর হয়তো গিয়ে মিশে যাবে বুড়ী গঙ্গার জলের সঙ্গে। আন্দামানের তট থেকে প্রাচীরটার তলা পর্যন্ত কেবল জলের যোগাযোগই সত্য হয়ে থাকবে। জল বৌরানীকে টানে। টানে দেবেশ দত্তের কোমরে-বাঁধা দড়িটাও। জীবনের প্রথম প্রেম বৌরানী ভুলতে পারে নি। যৌবনের আব্রু উন্মোচিত হওয়ার পরে প্রথম যার সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হল, সে দেবেশ দত্ত। সে নায়ক, সে 'হিরো'। দেবেশ দত্ত মরেছে, হিরো তার মরে নি।

জগদীশবাবু তাঁর অক্ষমতাকে জয় করবার জন্যে মনে মনে সংগ্রাম করছিলেন। অক্ষম হলেও, তিনি মানুষ। খুবই দুঃখ পেলেন মনে। আঘাত দিয়ে সন্তান পাওয়া যায় না, গায়ের জোরে ধরে রাখা যায় না একটা মিনিট

সময়কে। ভালবাসা পেতে হলে যোগ্য হতে হয়, শারীরিক অক্ষমতাকেও তুলে আনা যায় জীবন-শিল্পের স্তরে। কিন্তু জগদীশবাবু সে রাস্তা দেখতে পেলেন না। শিল্পের চেয়ে সন্তানের প্রয়োজন তাঁর সবচেয়ে বেশি। জমিদারি তাঁর বাঁধা পড়েছে। ধনপতি নাগের জয়-করা বিখ্যাত তালুকটা গেছে বিক্রি হয়ে। রঘু দত্তের কাছ থেকে যা কিছু আদায় হয়েছিল আজ তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ঢাকার এই বাড়িটাও কাঁপছে। যতীন সাহা'র কাছে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছেন তিনি। তা হোক, জগদীশবাবু সবই আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন বলে মনে মনে বিশ্বাস করেন। একটা সন্তান তাঁর হাতের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে, তিনি উদ্ধার করতে পারবেন সব কিছু। বাড়াতে পারবেন পূর্বপুরুষদের সাবেক সীমানা। সন্তান তাঁর চাই। কেবল সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়াবার জন্যে নয়, সমাজের কাছে তিনি আজও পুরুষ বলে গণ্য হতে পারছেন না। যেমন তেমন একটা কানাখোঁড়া বাচ্চা হলেও চলবে। মনস্তত্ত্বের খোঁচা খেয়ে খেয়ে মন তাঁর বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। নীতি-দুর্নীতির নিয়ম তিনি মানবেন না, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একটা মানুষ যদি না মানলো, তাতে দুনিয়ার ক্ষতি হল কি? মানলেন না বলে লাভ হবে জগদীশবাবুর। পুরুষ মানুষ যদি কেবল পুরুষ বলে গণ্য হয়, সেইটুকুই তাঁর লাভ। বাকী দিন কটা বেঁচে থাকবার পক্ষে এর চেয়ে বড় লাভের কথা তিনি কল্পনাই করতে পারেন না। মানুষ আছে বলেই তার মনস্তত্ত্ব আছে। কিন্তু মনস্তত্ত্বের সীমা উত্তীর্ণ হবার রাস্তাও তো আছে? না, সে রাস্তায় যাওয়ার তাঁর সময় নেই। সময় সংক্ষিপ্ত, রাস্তা দীর্ঘ। অতএব—

বৌরানী উঠল। অনেকক্ষণ পরেই সে উঠল। জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করবে এখন?"

"ভজহরির জন্যে সেই উলের জামাটাই বুনব।"

"সবটুকু যদি ভজহরিকে দিয়ে দিলে, তবে তোমার নিজের ছেলের জন্যে বাকী থাকবে কি?"

"নিজের ছেলে?"

"হ্যাঁ, বৌরানী। কবরেজ মশাই বলেছেন, আমি ক্রমশই ভাল হয়ে যাচ্ছি। বর্ষাটা পেরলেই, ব্যস্—"

"ব্যস্ কি?"

"ভাল হয়ে যাব পুরোপুরি। দুর্বলতা আর একটুও থাকবে না। শক্তি আমার অনেক বেড়েছে।" এই বলে জগদীশবাবু ফস্ করে বৌরানীকে টেনে নিলেন কাছে। বৌরানী এমন কিছু শক্তির প্রমাণ পেল না। ইচ্ছে করলে সে কাছে না গেলেও পারত। সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করলেও তিনি বৌরানীকে কাছে টানতে পারতেন না। স্বামী বলেই বৌরানী কাছে যেতে চাইল। দুর্নীতি এতে নেই। নীতিই বা এতে কি আছে? কাছে গিয়ে বসবার পরেও তো জগদীশবাবু তাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারলেন না। দুটো হাতই তাঁর কাঁপতে লাগল। কাঁপতে লাগল থর থর করে। বাতের আক্রমণ সহসা প্রবল হয়ে উঠল। জগদীশবাবু চেয়ে রইলেন বৌরানীর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে। জীবনের কী সব অসহায় মুহূর্ত! সারা জীবনে অপরাধ তিনি কিছুই করেন নি। প্রজার ঘরে আগুন দেন নি, জমি থেকে উৎখাত করেন নি একটা মানুষকে। সারা জীবন কেবল দিয়েই গেলেন। তবু পাপের বোঝা তাঁকে বহন করতে হচ্ছে। প্রায় একটা শতাব্দীর পাপ! তিনি বৌরানীর মুখ থেকে মাত্র আট ইঞ্চি দূরে বসে রইলেন চুপ করে। এগুতে পারছেন না। পেছন দিকে প্রগতি নেই, প্রগতি সামনের দিকেই। বৌরানী তার নিজের দু-হাত দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল। স্বামী তার স্থবিরের মত বসে রইলেন! কোন লাভ হল না। শতাব্দীটা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নিজের পচাগলা মাংসগুলোকে চাপিয়ে দিয়েছে জগদীশবাবুর গায়ে। বৌরানী যেন স্বামীর বদলে সবটুকু আদর ঢেলে দিয়ে এল সেই বিশ্বাসঘাতক শতাব্দীটার ঠোঁটে।

"বৌরানী, সবটুকু দিয়ে দিও না ভজহরিকে—বর্ষার মুখে আমরা বারোদি যাব। কবরেজ মশাই বলেছেন বারোদির জল-হাওয়া আমার পক্ষে খুব ভাল হবে।...বারোদির সেরেস্তায় অবিশ্যি জগবন্ধু থাকবে।"

বৌরানী জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। দু-চারটে চুমু খেয়ে শতাব্দীর ঠোঁটে সভ্যতা সে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। বাইরে বেরিয়ে এল বৌরানী। দরজার ওপাশ থেকে রমাকান্ত ঘোষণা করল, "কবরেজ মশাই এসেছেন।"

দু-বছরের মধ্যে বারোদির সেরেস্তায় বড় রকমের ওলোটপালট হয়ে গেছে। জমিদারির আয় কমে যাওয়ার জন্যে, কর্মচারিদের মধ্যে অনেকেই কাজ ছেড়ে দিয়েছে। দু-চার জনকে ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। টাকা পয়সার হিসেব রাখবার জন্যে খাজাঞ্চি একজন আছেন। সরকারমশাই আছেন বাকীবকেয়া আদায় করবার কাজ নিয়ে। জগদীশবাবুর আদেশ মতই এ-সব পরিবর্তন হয়েছে। সরকারমশাইকে আজকাল আর তিনি চিঠি লেখেন না। চিঠি আসে জগবন্ধুবাবুর কাছে।

আজ পর্যন্ত জগবন্ধুবাবু একটা চিঠিও খুলে দেখেন নি। সরকারমশাইকে বলে দিয়েছেন যে, অত বড় বড় চিঠি পড়বার অভ্যাস তাঁর কোনদিনই ছিল না। আর জবাব লেখা তো অসম্ভব! সরকারমশাই নিজেই কর্তাবাবুকে চিঠি লিখে দেন। নিজে হাতেই সরকারমশাই জগবন্ধুবাবুর নাম সই করেন। তবুও বারোদি গ্রামের সবাই জানে, জগবন্ধুবাবুই হচ্ছেন এখানকার সবচেয়ে ভারী ওজনের মানুষ।

আজ কতদিন থেকে জগবন্ধুবাবু সরকারমশাই এর মারফৎ খবর পাচ্ছিলেন যে, জমিদার জগদীশ নাগ অনেকদিন পরে দেশে আসছেন। শ্রাবণের শেষের দিকেই তাঁর নাকি আসবার ইচ্ছে। শ্রাবণ ফুরতে বেশি দিন আর বাকী নেই। বৌরানীও আসবেন বলে খবর পেয়েছেন জগবন্ধুবাবু।

প্রকাণ্ড এই জমিদার বাড়িটা আজ আর তাঁর কাছে অচেনা-রাজ্যের মত মনে হয় না। অত্যন্ত বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছে এর দু-বর্গ মাইল আয়তনটা। হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খেতে হয় না। চোখ বুঁজে জগবন্ধুবাবু পারেন গোটা বাড়িটাই ঘুরে আসতে।

পুরুষ আর জেনানামহলের মাঝখানের দরজাটা যতীন খুলে দিয়েছে। সরকারমশাই না কি যতীনকে খুলে দিতে বলে গিয়েছিলেন। খুলে দেওয়ার কারণ অবিশ্যি জগবন্ধুবাবু জানেন না। জানবার চেষ্টাও করেন নি তিনি। চেষ্টা করবেন মনে করেই সেদিন জগবন্ধুবাবু বড় ঘরের পেছনের বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলেন জেনানামহলের দিকে। দরজাটা খোলাই ছিল। তিনি এলেন এ-পাশে। দ্বিতীয় বারান্দা সুরু হয়েছে এখান থেকে। বারান্দার দু-দিকে চিক ফেলা রয়েছে। পূব এবং পশ্চিম দিক থেকে কেউ জানতে পারবে না যে, কে এবং কারা এ বারান্দা দিয়ে যাওয়া আসা করে।

জগবন্ধুবাবুর মনে হলো যে, বড় ঘরটার আর বৌরানীর ঘরখানার মধ্যে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে। এর স্থাপত্যের মসৃণতা এত বেশি যে, চোখ বুঁজে নাক বরাবর চলতে থাকলে কোথাও কারু হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার ভয় থাকবে না। গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া আসা করা যায়। জমিদার বাড়ির গঠন-শিল্প জগবন্ধুবাবুর বিস্ময় উদ্রেক করল। তিনি চোখ খুলেই হাঁটতে লাগলেন।

সুড়ঙ্গের মত রাস্তাটা শেষ হওয়ার পরেই ঠিক সামনেই একটা মস্ত বড় আয়না দেখতে পেলেন তিনি। ও-পাশের ঘরে ঢোকবার দরজা এটা। আয়নার দরজা! নিজের চেহারাটা তাঁর আয়নায় ভেসে উঠল। বুকটা তাঁর আজো বেশ চওড়াই আছে। হাত দুটোর দৈর্ঘ্য একটুও কমে নি, আঙুলগুলো যেমন লম্বা, তেমন শক্ত। মাথার চুল তাঁর একটাও সাদা হয়নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জগবন্ধুবাবুর মনে দ্বিতীয় বিস্ময় উদ্রেক হলো। সুরমা মারা গেছে দু-বছর হলো। অথচ, এ কি চেহারা তাঁর? প্রেমের অভাব অন্নাভাব থেকেও বেশি মারাত্মক। কিন্তু সুরমার অভাব তাঁর শরীরের কোথাও একটু উঁচু-নিচু সৃষ্টি করে নি। সুড়ঙ্গটার মসৃণ স্থাপত্যের মত, তাঁরও সারা দেহটা অত্যন্ত মসৃণ বলে মনে হলো। বুকের দু-দিকটায় মাংসের স্থাপত্য ইস্পাতের মত শক্ত এবং সুগোল। আয়নার বুকে নিজের বুকটা তাঁর ইস্পাতের মতই চকচক করছে। ডাইনে বাঁয়ে বুকটা চওড়া হয়ে নিচের দিকে

ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। জগদীশবাবুর পা-জামা পরেছেন জগবন্ধু রায়। কোমরের চারদিকে কাবুলীদের মত বড্ড বেশি পা-জামার কুচি! জগদীশবাবুর বড় মাপের পা-জামার বাড়তি কাপড় সব টেনে টেনে তিনি তাঁর সরু কোমরের চারিদিকে গুছিয়ে রেখেছিলেন। তলার দিকে গেঞ্জিটা তাই ফুলে রয়েছে। জগবন্ধুবাবু গেঞ্জিটাকে টেনে তাঁর উরঃফলকের সূঁচলো-সীমায় আটকে রাখলেন। আয়নাব দিকে চেয়ে দেখলেন, এক ছটাক বাড়তি মাংস কোমরে তাঁর জমে উঠতে পাবে নি। মনে মনে খুশী হলেন জগবন্ধুবাবু। সুরমা তাঁর স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি শিল্পী, সুরমার অভাব তাই তাঁর শরীরেব ওপর কোন দাগ কাটতে পারে নি। শিল্পীর অভাব সাংসারিক মানুষদের অভাবের সঙ্গে মেলে না মনে করেই জগবন্ধুবাবু আয়নার দরজাটা টান দিয়ে খুলে ফেললেন। কি ব্যাপাব? ঘর কই? শয়ন-কামরা?

এটা চানঘব। ফরাসগঞ্জের পাঁচ নম্বর বাড়ির দু-খানা ঘরেব সমান এই ঘরখানা। একদিকের দেওয়াল জুড়ে আবার আর একটা আয়না! তার উল্টো দিকে একটা চৌবাচ্চা। জগবন্ধুবাবু দাঁড়ালেন এসে এই চৌবাচ্চাটাব কাছে। একটা ছোটখাটো পুকুর বলে মনে হলো তাঁর। এখন জল নেই, বৌরানী এলে চৌবাচ্চাটা নিশ্চয়ই ভরে উঠবে। চৌবাচ্চার গায়ে হাত রাখলেন জগবন্ধুবাবু। শ্বেত পাথরের চৌবাচ্চা! হাত রাখলে পিছলে পড়ে যেতে চায় হাত। বেশিক্ষণ আর তিনি এখানে থাকতে পারলেন না। স্থাপত্যের চমৎকারিত্ব এখানে কম, দেওয়ালের গায়ে ছবির সংখ্যাই বেশি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি প্রাচীর চিত্রগুলো দেখতে চাইলেন না। ভাল লাগল না দেখতে। এসব ছবির মধ্যে শিল্প নেই।

চানঘরের পেছনের দরজা দিয়ে এবার তিনি শয়ন কামরায় প্রবেশ করলেন। এখানেও চারদিকে আয়নার ছড়াছড়ি। জগবন্ধুবাবু সামনের আয়নার দিকে চেয়ে নিজের পিঠও দেখতে পেলেন। মাথার পেছন দিকে যে তাঁর এতো চুল, তা যেন তিনি জানতেন না। মেরুদণ্ড বরাবর ঘাড়টা যে তাঁর পেছন থেকে এত শক্ত ও সুন্দর দেখায় সে খবর তিনি আজ প্রথম জানলেন। সুরমা

ছাড়া অন্য কেউতো তাঁকে জানাতেও পারত না।' সামনের দিকে মুখ করে যে পেছনের সব খুঁটিনাটি ব্যাপার স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তেমন অভিজ্ঞতা এই তাঁর প্রথম।

ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এবার তিনি এটা-ওটা দেখতে লাগলেন। একদিকের দেওয়ালে বৌরানীর মস্তবড় একটা ছবি টাঙানো রয়েছে। সাদা-কালোর ছবি এটা নয়, অনেক রকমের রঙ ফুটে বেরুচ্ছে বৌরানীর চোখ মুখ দিয়ে। এত স্পষ্টভাবে বৌরানীকে তিনি আজ প্রথম দেখলেন। লজ্জা তাঁর কেটে গেছে বলেই মনে হল। জগবন্ধুবাবু এবার ছবি থেকে বৌরানীর চরিত্র বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটু পরে তাঁর মনে হল, শিল্পীর রঙ লাগানোর মধ্যে সমন্বয় আসে নি। সেই জন্য বোধ হয় আসল বৌরানীকে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি শিল্পী। রঙ-এর সমুদ্রে আসল বৌরানী তাই হারিয়ে গেছেন। বৌরানীর চোখে এত অন্ধকার কেন? অন্ধকার অপসারিত করাই তো শিল্পীর সবচেয়ে বড় কাজ? জগবন্ধুবাবুর মনে হল, অন্ধকার অপসারিত করবার শিল্প-নৈপুণ্য বোধ হয় তাঁর ওপরেই নির্ভর করছে। বৌরানীর অন্তরের আলো তিনি দেখতে পেয়েছেন।

মাথা নিচু করে জোড়াখাটের চারিদিকটা তিনি প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। খাটের ওপর বসবার ইচ্ছে করছিল খুবই। তিনি পরিশ্রান্ত। পুরুষমহল থেকে দূরত্বটা তো কম নয়। বৌরানীর খাটের ওপর বসবার জন্যে মনটা তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠল। দ্রুত পায়ে এবার তিনি খাটের চারিদিকে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। চঞ্চলতা বাড়ছে। মনের দ্বন্দ্ব ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। চলার গতি বাড়তে লাগল তাঁর। চওড়া বুকের তলায় হাঁফ উঠেছে। নাকের নিশ্বাস গরম হয়ে উঠল! জগবন্ধুবাবু বসে পড়লেন বৌরানীর খাটের ওপর।

বসবার অধিকার তাঁর আছে। দু-বছর পরে, আজ তাঁর মনে হল, বারোদির জমিদার জগদীশবাবু নন, জগবন্ধু রায়। জগদীশবাবু মৃত, তিনি অক্ষম। নাগদানার অরণ্যে তাঁর যৌবন হারিয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। কথাটা ভাবতে ভাবতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, বৌরানী

বন্দী। জগদীশবাবুর ক্ষমতার কারাগার তিনি ভেঙ্গে দেবেন। তিনি শিল্পী। কারাগার ভাঙ্গাই তাঁর কাজ।

তিনি পা দিয়ে মাড়িয়ে দেবেন নাগদানার গোটা অরণ্যটা। জগবন্ধুবাবু উঠলেন। পা দুটো যেন মেঝের ওপরে তিনি ঘসতে লাগলেন। ধনপতি নাগের মত তাঁরও বুঝি হাত আর পায়ে শক্তির বন্যা এসেছে। দেওয়ালে টাঙ্গানো জগদীশবাবুর ছবির দিকে চেয়ে জগবন্ধুবাবু হাসলেন একটু। করুণার হাসি ভেসে উঠল জগবন্ধুবাবুর ঠোঁটে। হাসতে হাসতে তিনি সুড়ঙ্গের রাস্তা দিয়ে ফিরে এলেন বড় ঘরটায়। রাস্তা তাঁর চেনা রইল।

অপেক্ষা করছিলেন সরকারমশাই।

সরকারমশাই বললেন, "কর্তাবাবুর চিঠি এসেছে আপনার নামে। দেখুন তো, কি লিখেছেন?"

"আপনি পড়ুন সরকারমশাই।" বললেন জগবন্ধুবাবু।

"তাঁর নিজের হাতের লেখা চিঠি খুলবার আদেশ নেই।"

"তা হলে এখানে রেখে যান, পরে আপনি এসে খোঁজ নিয়ে যাবেন। আমি একটু ব্যস্ত আছি।"

"আচ্ছ, আচ্ছা। আমাকে জানাবার মত কোন খবর থাকলেই তো জানাবেন।" এই বলে সরকারমশাই চলে যাচ্ছিলেন। কি মনে করে তিনি আবার বললেন, "আপনি ব্যস্ত আছেন—" খালি বাড়িতে কি এবং কাকে নিয়ে যে ওস্তাদজী ব্যস্ত আছেন ভেবে পেলেন না তিনি।

"দরকারী কথা থাকলে আপনি বলতে পারেন সরকারমশাই।"

"দরকারী···তা, হ্যাঁ দরকারী তো বটেই। ধর্মদাস হাই-ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা এত বেশি বেড়ে গেছে যে. হেড্-মাস্টারমশাই আমাদের সেরেস্তায় ক্লাশ খুলতে চান। কর্তাবাবু বহু টাকা ঢেলেছেন ইস্কুলটাতে—"

জগবন্ধুবাবু বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেরেস্তাটা ছেড়ে দিলে, আমাদের কাজ চলবে কি করে?"

"সেকথা বলেছিলুম হেড্-মাস্টারমশাইকে। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষকরা যেন

খানিকটা বিদ্রূপের সুরেই আমাকে বললেন যে জমিদারি তো লাটে উঠছে …মানে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো তাঁরা আমার অবগতির জন্যে জানালেন যে, কেবল সেরেস্তা নয়, পুরো বাড়িটাই তাঁদের দরকার। জগদীশ-বাবুর ছেলেপুলে নেই, নিজেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ইটগুলোর দিকে চেয়ে বসে থাকলে কি হবে? তা ছাড়া, ইস্কুলের ফাণ্ডে এখন বেশ কিছু টাকা জমেছে। দরকার হলে, তাঁরা কিছু দামও দিতে পারেন।…ভগবানের কি উদ্দেশ্য জানি নে, 'কর্তাবাবুর দয়ায়, স্রেফ দয়ায় ইস্কুলটা তৈরি হয়েছিল। এতগুলো শিক্ষক তাঁরই জন্যে করে খাচ্ছেন। আর আজ?" বুড়ো সরকার মুহূর্তের মধ্যেই ঘরের আবহাওয়া গুরুতরভাবে গম্ভীর করে তুললেন। জগবন্ধুবাবু চুপ করে ছিলেন। জগদীশবাবুর ব্যথা তাঁর নিজের ব্যথা বলেই মনে হল। আজ ছেলেপুলে নেই, কিন্তু পরে যদি হয়? মানে, একটা বাচ্চা ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ালেই তো ইট আর কেবল ইট থাকছে না—সমস্ত বাড়িটার মধ্যে একটা চরিত্র খাড়া হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে সব কিছু। জগবন্ধুবাবু বললেন, "ওঁদের ধারণা ভুল। বৌরানীর সন্তান সম্ভাবনার কথা ওরা জানেন না।" ফস্ করে কথাটা বেরিয়ে গেল জগবন্ধুবাবুর মুখ দিয়ে। সরকারমশাই নিমেষের মধ্যে দাঁড়াবার মত মাটি পেলেন পায়ের তলায়। কই, এত বড একটা খবর তিনি আজও শোনেন নি কেন? ভাঙ্গা-গাল তার হাসির ঢেউ লেগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। শিক্ষকদের গিয়ে তিনি এক্ষুনি যোগ্য জবাব দিয়ে আসবেন। খবরটা পেলে সারা জমিদারিটাই যেন খাড়া হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস জন্মাল সরকারমশায়ের। যাবার জন্যে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। সেরেস্তায় আজ ক-মাস থেকে বড্ড বেশি নোংরা জমেছে। যতীনকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, ঘরটা ভাল করে সাফ করে দিতে হবে আজই। শিক্ষকদের তিনি রাত্রিতে সেখানে ডেকে নিয়ে আসবেন। সেরেস্তায় আজ কীর্তনের ব্যবস্থা করবেন তিনি। হরির লুট হবে। মন প্রাণ দিয়ে সবাই আজ হরিকে ভজনা করবেন। খোল করতালের আওয়াজ ভেদ করে একটা কথা আজ সারা বাড়িটায় প্রতিধ্বনি তুলবে: ভজহরি'। হরিকে

ভজনা না করলে, জগদীশবাবুর সন্তান কেমন করে হামাগুড়ি দেবে? আনন্দের আতিশয্যে সরকারমশায়ের চোখ দুটো ভিজে উঠল।

"ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া সংসারে কোন কিছুই ঘটে না। শত শত ছেলে কর্তাবাবুর পয়সায় মানুষ হয়ে গেল, অথচ তাঁর নিজের ঘরে একটা ছেলেও ছিল না!"

"এবার থাকবে, অভাব আর থাকবে না কিছু।" এই বলে জগবন্ধুবাবু চিঠিখানা হাতে নিয়েই নেমে এলেন একতলায়। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। জগবন্ধুবাবু সুরকির রাস্তায় নেমে পড়লেন দেখে যতীন দৌড়ে একটা ছাতা নিয়ে এল। ছাতাটা খুলে যতীন এগিয়ে ধরল জগবন্ধুবাবুর দিকে। ডান হাতে চিঠি আর বাঁ হাতে ছাতা ধরে জগবন্ধুবাবু এগুতে লাগলেন সুরকির রাস্তা দিয়ে।

শ্রাবণ শেষ হয় নি। গত সাত দিন থেকে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। পূর্ববঙ্গ ও আসামের বহু জায়গা জলে ডুবে গেছে। প্লাবন আর দুর্ভিক্ষ যেন এগিয়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে। গৃহহীন নরনারীর আর্তনাদ তাঁর কান পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না বটে, তবে তিনি সারা দেশের কান্না অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন। শিল্পীর পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু করা আর সম্ভবও ছিল না।

লাল সুরকির রাস্তায় পা ফেলতেই, তলা থেকে লুকনো জল সব উঠে এল জগবন্ধুবাবুর পায়ের ওপরে। যতীন দেরাজ থেকে একজোড়া চটিজুতো বার করে দিয়েছিল। কানপুরের তৈরি শৌখিন চটি। সোনার জরি দিয়ে চটির সামনের দিকে বুটি তোলা আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় নাগরা পরে জগবন্ধু-বাবু পথ হাঁটছেন।

লুকনো জল সব তলা থেকে ঝপ করে জুতোর মধ্যে ঢুকে গেল বলে তিনি বাড়ির সামনেই পা থেকে জুতো খুলে ফেললেন। ফেলে রেখে গেলেন খোলা আকাশের নিচে। বৃষ্টির জল পড়ে পড়ে দামী জুতোটা নষ্ট হয়ে যাবে। তা যাক, যতীন বলেছে, তিনটে দেরাজ-ভর্তি এখনো অনেকগুলো জুতো পড়ে রয়েছে। একদিনের জন্যেও কর্তাবাবু ব্যবহার করেন নি। তা ছাড়া আবহাওয়ার

খবর নিয়ে, রাস্তায় ক-ইঞ্চি জল জমল তার হিসেব করে পথে বেরবার লোক জগবন্ধুবাবু নন। টাকার অঙ্ক কষে দামী জিনিস ব্যবহার করতে হলে তিনি হয় তো যতীনের দেওয়া কোন জিনিসই ব্যবহার করতে পারতেন না।

খানিকটা দূরে এগিয়ে আসবার পর তিনি দৃষ্টি দিলেন দেবদারু আর মহানিম গাছগুলোর দিকে। বর্ষার জলে কিংবা যত্নের অভাবে গাছগুলোকে আর সুন্দর বলে মনে হচ্ছে না। গাছের মোলায়েম গায়ে হাত রাখতে গিয়ে তিনি বুঝলেন, গাছের গায়ে আধ ইঞ্চি পুরু ছাতলা জমেছে। জগবন্ধুবাবু চিঠিখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে একটু দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললেন নদীর কিনারা পর্যন্ত। জলে-ভেজা বেঞ্চিটায় বসে অল্প আলোয় চিঠিখানা পড়বেন তিনি।

২

প্লাবনের জল মেঘনাকেও ফাঁপিয়ে তুলেছে। গাঁয়ের বহু লোকেরই দুর্দশার আর অন্ত নেই। বাড়ি-ঘর ভেসে গেছে অনেকেরই। গরুগুলোকে রক্ষা করবার জন্যে গাঁয়ের চাষীরা জমিদার বাড়ির গোয়ালে তাদের রেখে দিয়ে গেছে। ঘাস এবং বিচালীর অভাবে গরুগুলোর পেট ভরছে না। যতটা সম্ভব সরকার মশাই যোগাড় করে দিচ্ছেন। যোগাড় করবার হুকুম দিয়েছিলেন জগবন্ধুবাবুই।

নদীর পাড়টা আর আগের জায়গায় নেই। লাল সুরকির রাস্তার উপরে উঠে এসেছে। সাবধান হওয়ার জন্যে সরকার মশাই এরই মধ্যে রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে সেগুন গাছ দুটোর পূব দিক ঘেঁষে একটু উঁচু করে বাঁধ বেঁধে দিয়েছেন। বেঞ্চিটাকে সরিয়ে আনতে হয়েছে অনেক পেছনে। সেগুন গাছের গলা পর্যন্ত জল।

ছাতি মাথায় দিয়ে জগবন্ধুবাবু বসলেন এসে বেঞ্চিটায়। সামনের দিকে চেয়ে দেখলেন, ওপারটা আর দেখা যাচ্ছে না। মেঘনার বুকে ধলেশ্বরীর মত বোবা ঢেউ নেই বটে, কিন্তু বিস্তৃতি আছে। মেঘনাকে এমনভাবে ফেঁপে উঠতে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে কেউ দেখে নি। তবুও এ-জল জগবন্ধুবাবুর ভাল লাগে না। ঢেউ নেই। নদীটার শান্ত সমারোহকে তাঁর মুখোস বলেই

মনে হয় জগবন্ধুবাবুর। এ গোপনে হত্যা করে, ধলেশ্বরীর মত সামনে থেকে আক্রমণ করবার সাহস নেই মেঘনার। ঘুমিয়ে-পড়া গৃহস্থের বাড়িতে এর জল ঢোকে রাত্রিবেলা, ভাসিয়ে নিয়ে যায় সুখের সংসার। গুপ্তঘাতকের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ পায় না কেউ। জগবন্ধুবাবুর বিশ্বাস, পূর্ববঙ্গের মেরুদণ্ড তৈরি হয়েছিল যুদ্ধ করবার জন্যেই।

চিঠিখানা খুললেন তিনি। জগদীশবাবুর নিজের হাতে লেখা চিঠি। বৃষ্টির জল লেগে এরই মধ্যে দু-চারটে কথা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কালিটা গেছে গলে। চিঠিখানা লেখবার সময় জগদীশবাবুর চোখ থেকে দু-চার ফোঁটা জল পড়ে নি তো? বোধ হয় না। জগবন্ধুবাবু চিঠি পড়তে লাগলেন:

জগবন্ধু, কলম ধরতে কষ্ট হয়, তবু নিজে হাতেই লিখছি। তুমি চলে যাওয়ার পরে, আমার করবার মত কোন কাজও নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের চেহারাটা দেখি দিনরাত। উল্টো দিকের দেযালে সেই আয়নাটা আজও সত্যি কথা বলে। মুখটা আমার কি কুৎসিত ই না হয়েছে দেখতে। রমাকান্তকে ছাড়া কাউকে আর ঘরে ঢুকতে দিই না। কেউ বড় একটা আসেও না আমার কাছে।

খবরের কাগজ তুমি পড়ো না, আমি পড়ি। সমস্ত পূর্ববঙ্গটা জলে ভাসছে। এত বড় প্লাবন জীবনে আমি এই প্রথম দেখলুম। বুড়ী গঙ্গার মত দুর্বল নদীটার বুকেও গর্জন উঠেছে। ঘাটের সবগুলো সিঁড়ি ডুবে গেছে, কেবল একটা বাদে। আর দু-চার ইঞ্চি জল বাড়লেই প্রাচীরে এসে ধাক্কা খাবে। প্রাচীর ছাপিয়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে কি না, একমাত্র ভগবানই জানেন।

আমি আসছে শনিবার বারোদি গিয়ে পৌছুব। কষ্ট আমার তেমন কিছু হবে না। আমার এঘাট থেকে নৌকো চেপে নামব গিয়ে বারোদির ঘাটে। সেগুন গাছ দুটো আছে তো? সেগুন গাছ দুটোর তলায় দু-দিকে দুটো বেঞ্চি পাতা ছিল। আমার অবিশ্যি ওখানে বসবার সুযোগ কখনও হয় নি, তবু বেঞ্চি দুটো থাকলে, অন্যান্য সবাই বসতে পারে। তুমি কখনও ওখানে এসে বসো কি না আমি জানি না।

তোমার শরীর কেমন আছে? বারোদির হাওয়া তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল হয়েছে বলে সরকারমশাই লিখেছেন। গত দু-বছরের মধ্যে তোমার না কি বয়স কমে গেছে! খুবই সুখের কথা সন্দেহ নেই। শুনে বৌরানীও খুব খুশী হয়েছেন। তিনিও আমার সঙ্গে আসছেন। সত্য কথা বলতে কি, আমি যাচ্ছি তাঁরই সঙ্গে।

আমরা যাচ্ছি বলে, ওখানকার নিয়মকানুন কিছু যেন না বদলায়। বড় ঘরটায় তুমি যেমন আছ, তেমনি থাকবে। আমার জন্যে ঘরের কোন অভাব হবে না। অসংখ্য ঘরের মধ্যে যে-কোন একটা হলেই আমার চলে যাবে। ভজহরিকে অনেক করে বোঝালুম, কিন্তু সে পাড়াগাঁ-এ যেতে চায় না। ছেলেটা মানুষ হল না, শহরের হকার আর গাড়োয়ানদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। উপায় কি, ফেলে দেয়া যায় না—দ্বিতীয় একটি ছেলে থাকলে ভদ্র এবং শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যেত।

সামনের শনিবারে বারোদির ঘাটে আমার নৌকো লাগবে। তুমি কি ধর্মদাসের বৌকে চিনতে? আহা, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে রেখে বৌটি মারা গেছেন। ধর্মদাসের মৃত্যুর পরে, বারোদির ধনপতি হাই ইস্কুলের নাম বদলে আমি-ই নাম দিয়েছিলুম ধর্মদাস হাই ইস্কুল। তোমার অসুবিধে না হলে, প্রত্যেক দিনই ছেলে আর মেয়েটির খোঁজখবর নিও। মৃত্যুর চেয়ে বড় দুঃখ আর কিছু নেই, কিন্তু যারা পৃথিবীতে রইল, তারা যদি মৃতের মতই হাত পা না নাড়তে পারে তা হলে তেমন জীবন মৃত্যুর চেয়েও করুণ।

চিঠিখানা পড়া শেষ করে জগবন্ধুবাবু চুপ করে বসে রইলেন। দু-লাইনের মাঝখানে লুকনো কোন অর্থ আছে কি না তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। ছাতির ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জগবন্ধুবাবুর পায়ের ওপর।

সরকারমশাই ইতিমধ্যে নাগ-বাড়ির চাকর, ঠাকুর এবং দরওয়ানদের কাছে খবর প্রচার করে দিয়ে এসেছেন যে, সেরেস্তার ঘরে আজ হরির লুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রাবণের বৃষ্টির মত হরির লুটের বাতাসাও ঝরে পড়বে সবারই

মাথার ওপর। বৌরানীর সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে। কেবল সম্ভাবনার খবরটা দেবার জন্য সরকারমশাই ছাতা মাথায় দিয়ে চলে এলেন উত্তর দিকের দেয়ালেব কাছে। ওপাশে জগদীশবাবুর জ্ঞাতিরাই থাকেন। উত্তর দিকের দেয়ালটাই জগদীশবাবুর সীমানা নির্ধারণ করছে। ক্রমাগত বৃষ্টির জন্যেই বোধ হয় প্রাচীরেব একদিকে খানিকটা জায়গা ধ্বসে পড়েছে। সরকারমশাই সীমানা লঙ্ঘন করলেন না। এপাশে দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা-প্রাচীরের মাঝখানে মাথাটা তুলে দিয়ে তিনি ডাকলেন, "নটবর, ওহে নটবর—" নটবর নাগ কিরীট নাগের ছোট ভাই। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এঁচড়ে পেকে গিযেছিলেন বলে লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। পাড়াগাঁ-এ পড়ে আছেন। অল্পস্বল্প জমিজমা যা আছে তাই থেকেই সংসার তাঁর চলে যায়। সরকারমশায়ের সঙ্গে খুবই ভাব। নাগপরিবারের সাংসারিক কলহ এঁদেব সম্বন্ধকে নষ্ট করতে পারে নি। ও-পাশ থেকে নটবব নাগ ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িযে বললেন, "কি হে সরকার, এই বৃষ্টিতে মুখেব বাক্য সব গলে যায় নি?"

"আরে না না—গলে যাবে কি, কথা সব গরম হয়ে উঠেছে। এস, এস এদিকে।"

"দাঁড়াও, হুঁকোটা সবেমাত্র ধরিয়েছি!"

"হাতে করে নিয়ে এস।"

ঘর থেকে হুঁকো আর ছাতি নিয়ে এলেন নটবর নাগ। বাঁ হাতে ধরলেন হুঁকো, ডান হাতে রইল তাঁর ছাতা। পুরনো ছাতা বলেই একদিকের কাপড় সব কুঁচকে নেমে পড়েছে নিচের দিকে, ঘুমন্ত বাদুড়ের পাখার মত ঝুলে পডেছে। জল আটকায় না। তবু নিয়ম রাখতে হয়। মাথার ওপরে ছাতা না ধরলে, প্রজাস্বত্ব আইনকে তিনি ঠেকাবেন কি করে?

সরকারমশাএর ছাতার ওপরে ঝুলে-পড়া দিকটা তুলে দিয়ে নটবর নাগ খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। সরকারমশাই তাঁর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "টিকের তলায় গাঁজা-টাজা নেই তো? নটবর, যত ইচ্ছে গাঁজা খেতে পারো, কিন্তু সেরেস্তায় আজ তোমার আসা চাই।"

"ব্যাপার কি সরকার?"

"হরিরলুট।"

"হঠাৎ?"

"বৌরানীর সন্তান সম্ভাবনা—"

"হঠাৎ? মানে এত হঠাৎ কি করে সব হলো হে?"

"আশু কবরেজের চিকিৎসায়।.....নটবর যত ইচ্ছে গাঁজা খাও আজ, পাপ হবে না। হরিরলুটের বাতাসা খেলে সব পাপই ধুয়ে যাবে। এই নাও তোমার হুঁকো, তামাকটা বড্ড কড়া বলে মনে হচ্ছে। গাঁজা কেনবার পয়সা আছে তো, নটবর?" উত্তর শোনবার জন্যে সরকারমশাই অপেক্ষা না করে, ট্যাক থেকে একটা টাকা নিয়ে গুঁজে দিলেন নটবর নাগের হাতে। দিয়ে বললেন, "চললুম, ইস্কুলটা একবার চট করে ঘুরে আসি। লক্ষ্মণ গোয়ালার ঘরে একবার যেতে হবে। বাতাসার অর্ডারটা দিয়ে আসি।"

সরকারমশাই চলে গেলেন। নটবর নাগ টাকাটা হাতে নিয়ে, দাঁড়িয়ে রইলেন ওখানেই। জগদীশ নাগের বাড়ির দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। কি খুঁজছেন নটবর নাগ? জামরুল আর কামরাঙা গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে নাগদানার একটা গাছও তিনি দেখতে পেলেন না। দেখা যায় না লাল স্থরকির রাস্তাটা। সারি সারি আম আর কাঁঠাল গাছ দাঁড়িয়ে আছে রাস্তাটাকে আড়াল করে। ঠাকুরদা ধনপতি-নাগ ঐ আমের কলমগুলো লাগিয়ে গিয়েছিলেন। গোলাপখাস আর নবাবভোগ আম এখন অনেক ফলে। কিন্তু জগদীশের কেউ নেই, আম তার খাবে কে? নটবর নাগের তো অনেকগুলো সন্তান। মণ্টু আর ভুলু আমের দিনে লুকিয়ে লুকিয়ে দু-দশটা আম চুরি করে আনে, কিন্তু তাতে পেট ভরে না। চুরি করবার জন্যেই বোধ হয় মণ্টু আর ভুলু পাঁচিলটা এখানে ভেঙ্গে রেখেছে। দরওয়ানরা তাড়া করলে, দু-ভাই ওরা লাফিয়ে পার হয়ে আসে এ-পাশে। কিন্তু এবার তো আম খাবার লোক আসছে? জগদীশের ভাগ্য ভাল। ভগবান যাকে দেন, সব কিছু উঁজাড় করেই দেন। আশু কবরেজ হঠাৎ কি ওষুধ আবিষ্কার করল? যাবে না কি

একবার খবর নিতে ? ঢাকা তো এখান থেকে বেশি দূর নয়। দু-তিন টাকা খরচ। সরকার তো না চাইতেই এক টাকা গুঁজে দিয়ে গেল হাতে। গিয়ে কোন লাভ হবে কি ? দু-বছর আগের সব খবরই জানা আছে। ওস্তাদ ব্যাটাকে তো সেই জন্যেই জগদীশ সরিয়ে দিয়েছিল ঢাকা থেকে। লুকিয়ে চুকিয়ে ব্যাটা আবার এর মধ্যে ঢাকা থেকে ঘুরে আসে নি তো ? সরকারও কি ওস্তাদের দলে যোগ দিল ? এতবড় অধর্ম তো মা বসুন্ধরা সইতে পারবেন না ! ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে নটবর নাগ চলে এলেন এ-পাশে। পাঁচিলের বরাবর জনার্দন মালী অনেক রকমের শাক লাগিয়েছে। মা বসুন্ধরার চেহারা গেছে বদলে। ঝাড়পালম আর পদ্মনটে টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগলেন নটবর নাগ। ধনপতি নাগের মত হাতে তাঁর শক্তি থাকলে, মা বসুন্ধরার বুক থেকে আরও অনেক ঐশ্বর্য তিনি লুট করে আনতে পারতেন। কিন্তু ক্ষমতার বিষ তৃতীয় পুরুষে এসে এঁদের সবটুকু শক্তি-ই হরণ করে নিয়েছে। তাই কেবল ঝাড়পালম আর পদ্মনটে নিয়ে সরে পড়লেন নটবরবাবু। দরওয়ানরা কেউ তাঁকে দেখতে পেল না।

বাইরে থেকে ঘুরে এসে সরকারমশাই খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, জগবন্ধুবাবু এখনও ফিরে আসেন নি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নদীর ধারে বসে তিনি কি করছেন ? যতীন বললে, "আপনি গিয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে আসুন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অসুখবিসুখ করলে কর্তাবাবু আবার ওদিক থেকে কামান দাগবেন।"

"কি ব্যাপার সরকারমশাই ? হাজার হলেও তিনি কর্মচারি, তাঁর শরীরের জন্যে কর্তাবাবুর এত ভাবনা কেন ?"

"এ্যাঁ ? কি বললি ? হ্যাঁ, সত্যিই তো এত ভাবনা কেন ? যাই, আমি গিয়ে ধরে নিয়ে আসছি। বন্যার জলে লোকটা ভেসে না যায় !"

সরকারমশাই চললেন নদীর দিকে।

জগবন্ধুবাবু চেয়েছিলেন মেঘনার দিকে। নদীটায় লুকনো রূপটা ধরবার জন্যে চেষ্টা করছিলেন তিনি। মানুষ কিংবা প্রকৃতির মধ্যে এযাবৎকাল তিনি

সরলতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি। দৃষ্টির ভঙ্গি তাঁর বদলেছে। একই মানুষের অনেক রকমের চেহারা তিনি দেখতে পেয়েছেন। সামনে যাকে সাদা বলে মনে হয়েছে আড়ালে সে কালো। কিন্তু তিনি নিজে কি? তাঁর মধ্যেও কি দুটো মানুষ বাস করছে না? দুটো বিপরীত ব্যক্তিত্বের সন্ধান কি তিনি পান নি? শিল্পী জগবন্ধু আর মানুষ জগবন্ধু কি এক?

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল গিয়ে সেগুন গাছটার ওপর। কি একটা লম্বা মত জিনিস এসে ঠেকে রয়েছে গাছটার গুঁড়ির সঙ্গে। জলের স্রোত ওখানে ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ তুলছে। জগবন্ধুবাবু উঠলেন। এগিয়ে গেলেন জলের ধার পর্যন্ত। ছাতাটা বন্ধ করে তিনি ছাতার আগা দিয়ে একটা খোঁচা মারতেই লম্বা জিনিসটা স্রোতের টানে ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে এল তাঁরই দিকে। জগবন্ধুবাবু দেখলেন, শবদেহ। রমণী-দেহ সন্দেহ নেই তাতে। সিঁথিতে সিন্দূর পর্যন্ত রয়েছে। ঘুরপাক খেয়ে শবদেহটা বেরিয়ে গেল উত্তর দিকে, বড় স্রোতের মধ্যে।

"জল থেকে উঠে আসুন বাবু। ওখানে কি দেখছেন?" পাড়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সরকারমশাই।

জগদীশবাবুর পা-জামা পরে হাঁটু অবধি জলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জগবন্ধু-বাবু। পা-জামাটা যদিও কর্তাবাবুর, কিন্তু পা-দুটো তো তাঁর নিজের, ভাবলেন সরকারমশাই। ভেবেই বোধ হয় পুনরায় তিনি বললেন, "অন্ধকারের মধ্যে জলে নাবা ঠিক নয়।......কি দেখছেন বাবু?"

একটা নয়, দশ বারোটা ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে পড়তে লাগল জলে। সবুজ রং-এর লাউডোগা সাপগুলো ওদের গন্ধ পেয়েই তাড়া করে ব্যাঙ-গুলোকে।

"বাবু, ডাঙায় উঠে আসুন। কি দেখছেন অমন করে?"

"বৌরানীর নৌকো এসে লাগবে এখানে।" বলতে বলতে তিনি এবার উঠে এলেন পাড়ে। সরকারমশাই তাঁর নিজের খোলা ছাতাটা তুলে ধরলেন জগবন্ধুবাবুর মাথায়।

"এখানে আর বসবেন না, চলুন বাবু বাড়ি ফিরে যাই।" অনুরোধ করলেন সরকারমশাই।

"জগদীশবাবু চিঠিতে লিখেছেন বুড়ী গঙ্গার ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে। শনিবার দিন বৌরানী আসবেন নৌকো চেপে······সরকারমশাই, নৌকোটা বাঁধা হবে কোথায়?"

"কেন, সেগুন গাছ তো শক্ত গাছ বাবু?"

সরকারমশাএর সঙ্গে জগবন্ধুবাবু নিঃশব্দে লাল সুরকির পথ দিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। স্থান এবং কালের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ নেই। কেবল বৌরানীকে পাশে নিয়ে তিনি সাঁতার কেটে বেড়াতে লাগলেন সময়হীন সময়ের স্রোতে। এ-স্রোতের সুরু এবং শেষ তিনি জানেন না।

"কর্তাবাবু আর কি লিখেছেন?" জিজ্ঞাসা করলেন সরকারমশাই।

"ধর্মদাস বাবুর বিধবা স্ত্রী মারা গেছেন—তাঁর ছেলেমেয়েকে দেখবার অনুরোধ জানিয়েছেন জগদীশবাবু।"

"ছেলে আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওদের ঠাকুরমা চলে গেছেন ঢাকায়।"

"কবে গেলেন?"

"আজ সকালে।"

"ধর্মদাসবাবু কে ছিলেন সরকারমশাই?"

সরকারমশাই ডুব দিলেন অতীত ইতিহাসের জলে। ব্যাঙগুলোর মত তিনিও ভয় পেলেন নাকি? শোবার ঘরের মধ্যে কোথাও তো সবুজ রং-এর একটাও লাউডোগা সাপ দেখতে পেলেন না জগবন্ধুবাবু। তবে তাঁকে তাড়া করল কে?

জগবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "চুপ করে রইলেন যে? মস্তবড় ইতিহাস না কি?"

"নাঃ, তেমন কিছু নয়। সাধারণ মানুষ ছিলেন ধর্মদাস ঘোষ।"

"আর তাঁর বিধবা স্ত্রী?"

"নাঃ, নাঃ—সতী সাধ্বীর নামে কোন বাজে কথা বলা উচিত নয়। ধর্মদাস-

বাবু ছিলেন সন্ত্রাসবাদীদের দলের লোক। ইংরেজের অফিস আদালতে কোথাও তাঁর চাকরি জুটল না। কর্তাবাবুকে ধরলেন তিনি। নতুন বিয়ে করেছেন। এক রকম উপোস করে দিন কাটাচ্ছিলেন। কর্তাবাবু প্রচুর টাকা ফেললেন। ধনপতি নাগ হাই ইস্কুলের গোড়া পত্তন হলো। ধর্মদাসবাবুর চেষ্টায় ইস্কুলটা বড় হলো। তারপরে, হঠাৎ কি একটা অসুখ হয়ে, তিনি মারা গেলেন। সংসারটা আবার ভেসে যাচ্ছিল। কর্তাবাবু মাসিক একশ-টা টাকা দিয়ে সংসারটাকে ধরে রাখলেন। তিনি মাঝে মাঝে এখানে এসে এঁদের সঙ্গে দেখা করতেন। গাঁয়ের লোকেরা কর্তাবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে লাগল।"

"কিন্তু জগদীশবাবুর চরিত্র যে নেই, সে কথা কি গাঁয়ের লোকেরা জানত না?"

"এঁ্যা? কি বললেন? চরিত্র নেই মানে কি বাবু? এঁ্যা? ওঃ! থাক, থাক—কতাবাবু নিন্দা সুখ্যাতির ধার ধারেন না। তাঁর কি আছে আর কি নেই, আমাদের মত অল্প-মগজের মানুষরা তার কি জানবে? যাক, যাক, ভালই হয়েছে। মেয়েটাকে আর বাচ্চা ছেলেটাকে নিযে বুড়ীটা চলে গেছে ঢাকায়।"

"ধর্মদাসবাবুর স্ত্রী কবে মারা গেলেন?"

"এই তো পরশু। পরশু দিন ভোর রাত্রে। খুবই সতী-সাধ্বী ছিলেন। পোড়াতে মাত্র দেড ঘণ্টা সময় লেগেছে। টাকা পয়সার ব্যবস্থা সব আমি-ই করে দিয়েছিলাম। চিঠি দিয়েছিলাম কর্তাবাবুকে। তাই তিনি খবরটা জানতে পেরেছেন। উঃ, ধর্মদাসবাবুর জন্যে কর্তাবাবুর কি কম উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে!"

"কি রকম?"

"জেলার ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সুরু করে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পর্যন্ত ধর্মদাসবাবুকে তাড়াবার জন্যে কী খোসামোদই না করেছিলেন বাবুকে। মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নেওয়ার মত পাপ আর নেই। ধর্মদাস ঘোষকে

আশ্রয় দেবার জন্যে কর্তাবাবু রায়বাহাদুর খেতাব পেলেন না। আপনি এবার পা-জামাটা বদলে ফেলুন। ঐ যে' যতীন দাঁড়িয়ে আছে। আপনার অসুখ বিসুখ হলে আমাদের আর রক্ষে থাকবে না।······বৌরানী কি একলাই আসছেন?"

"একলা? না, সঙ্গে কর্তাবাবুও আসছেন।"

নতুন পা-জামা হাতে নিয়ে যতীন এসে দাঁড়াল জগবন্ধুবাবুর সামনে।

বুড়ী গঙ্গা আজ আর বুড়ী নয়। এ-পারে নাগবাবুদের দেওয়াল আর ও-পারে কি যে আছে বোঝা যায় না। মাঝখানের চরটা ডুবে গেছে। তার ওপর দিয়ে বড় বড় নৌকো চলছে। আর একটু জল বাড়লে মানিকগঞ্জের স্টীমারটাও বোধ হয় চরের ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করতে পারবে।

সকালবেলা বৌরানী ভজহরিকে পাঠিয়ে জগদীশবাবুর কাছ থেকে ঘাটের চাবিটা নিয়ে এসে রেখেছে। সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িটা এখনো জলের তলায় ডুবে যায় নি। বৌরানী বসতে চেয়েছিল সেই সিঁড়িটাতে। বুড়ী গঙ্গার এতবড় বিস্তৃতি দেখবার সৌভাগ্য তার এই প্রথম। নদীটার মধ্যে কেবল বিস্তৃতিই ছিল না, এবার যেন জলের মধ্যে যৌবন এসেছে।

শ্রাবণ ফুরতে আরও কটা দিন বাকী আছে। বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয় নি। সকাল থেকে সূর্যের মুখ কেউ দেখতে পায় নি। সারা পূর্ববঙ্গের মাথার ওপর কালো মেঘ। বিকেল শেষ হয়ে সময়ের স্রোত এসে সন্ধ্যের সঙ্গে মিশে যেতে আর বোধ হয় ঘণ্টা খানেক লাগবে। ভজহরির জন্যে বৌরানী বসেছিল নিজের ঘরেই। ওকে নিয়ে বৌরানী ভেবেছিল সিঁড়িতে গিয়ে বসবে। ভজহরিকে বৌরানী বলেও রেখেছিল সেকথা। কিন্তু ওর ফিরে আসবার কোন লক্ষণ সে দেখতে পেল না। বৌরানী পার হয়ে এল জেনানামহলের খিড়কির দরজাটা। পেছন থেকে লক্ষ্মীর মা জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"ঘাটে গিয়ে একটু বসব।"

"বৃষ্টি পড়ছে, ছাতা নিয়ে যান।" লক্ষ্মীর মা ছুটে গিয়ে একটা ছাতা নিয়ে

এল। ছাতাটা খুলে সে এগিয়ে ধরল। বৌরানী ছাতা মাথায় দিয়ে বারান্দা পার হতে লাগল। জগদীশবাবুর ঘরখানা আড়াল করেই সে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

লোহার গেটের তালাটা খুলে ফেলল বৌরানী। সিঁড়িটার মাথাটুকুই কেবল ভেসে আছে জলের ওপরে। ছাতা মাথায় দিয়ে বৌরানী বসল সেখানে। চেয়ে রইল জলের দিকে। বুড়ী গঙ্গার জলে সত্যিই যৌবন এসেছে। জল খুব বেশি বেড়েছে বলেই যে, বুড়ী গঙ্গায় সে যৌবন দেখতে পাচ্ছে তা নয়। হাঁটু অবধি পা দুটো জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বৌরানী বুঝতে পারলে, জলটা বেশ ভারী। জোয়ান মানুষদের হাতের টানের মত জলটাও যেন পা-দুটোকে টানে!

বৌরানী এবার চাইল সামনের দিকে। বেশ অনেকটা দূরে জেলেরা নদীতে জাল ফেলছে। ইলিশ মাছের জাল। টুকরো টুকরো বাঁশগুলো জলের ওপর ভাসছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মানুষের মাথার মত। অনেকগুলো লোক যেন নদীতে সাতার কাটছে বলে ভুল ধারণা জন্মায়।

চমকে উঠল বৌরানী। আর একটু হলে জলেব মধ্যে পড়েই যেত সে! ডান পায়ের আঙুলগুলো ধরে কে যেন তাকে টান মারল! চিৎকার করে উঠল বৌরানী, "কে? কে?" হাতের থেকে ছাতাটা পড়ে গেল জলে। শ্যামপুর শ্মশান থেকে মড়া-টড়া কিছু ভেসে আসে নি তো? কিন্তু মড়া তো টানতে পারে না।

জলের ওপরে মাথা তুলল ভজহরি।

"ও, তুই? তুই কোত্থেকে এলি দুষ্টু ছেলে?" বৌরানী হাত বাড়াল ভজহরিকে ধরবার জন্যে। গলা পর্যন্ত জলের তলে ডুবিয়ে রেখে ভজহরি বললে, "আসছি তো শ্যামপুর শ্মশান থেকে।"

"সেখানে গিয়েছিলি কেন হতভাগা?"

"মার সঙ্গে দেখা করতে।"

"হঠাৎ?"

"আজ আমার জন্মদিন না?"

"ও, তাই তো! আজ শুক্রবার। আমার মনেই ছিল না।"

"আমারও মনে ছিল না বৌরানী, ফজ্‌লুই তো মনে করিয়ে দিলে। বুড়োটার স্মরণশক্তি দেখেছ? আমার চেয়েও ভাল।" এই বলে ভজহরি জল থেকে উঠে বসল এসে বৌরানীর পাশে। তারপর বললে, "বৌরানী, আমি যখন কর্তাবাবুর কাছে চাবি চাইতে গিয়েছিলুম, তিনি আমায় কেবল ধমকাতে লাগলেন।"

"কেন রে?"

"তিনি বললেন যে, আমি কেন তোমার সঙ্গে বারোদিতে যেতে চাইলুম? সেখানে আমার কি কাজ? সেখানে খবরের কাগজ কই? গাড়োয়ান কই? কাল তো আমাদের বারোদিতে যাওয়ার কথা আছে বৌরানী?"

"হ্যাঁ, ভজহরি। কিন্তু আমরা তো বারোদিতে যাচ্ছি নে। আমরা মাঝ রাতে পালিয়ে যাব নারায়ণগঞ্জ। সেখান থেকে ইস্টীমার চেপে গোয়ালন্দ, তারপর কলকাতা। ফজ্‌লু গাড়ি নিয়ে আসবে তো?"

"গাড়ি নিয়ে সে রাত বারোটা থেকে রাস্তার মোড়ে বসে থাকবে বলেছে। কাদির সর্দারের গাড়িটা সে পনরো টাকা দিয়ে একদিনের জন্য ভাড়া করেছে। নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ফজ্‌লু আমাদের পৌঁছে দেবে।"

"পৌঁছে দিলেই হবে। টাকার জন্যে ভাবনা নেই।"

"কিন্তু বৌরানী—"

"কি রে ভয় পাচ্ছিস নাকি?"

"না, না, ভয় পাবো কেন? ভাবছি কোন কারণে যদি না যাওয়া হয়, তবে তুমি তো কাল সকালে রওনা হয়ে যাবে বারোদির দিকে, আমি পড়ে থাকব ঢাকায়। জানো, ভোর রাত্রে দয়াল মাঝি কর্তাবাবুর সেই পানসি নৌকোটা এই ঘাটে এনে বাঁধবে? দয়াল মাঝির সঙ্গে কথা বলে এলুম।"

হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে কি রকম একটা দমকা হাওয়া বইতে লাগল। বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বাতাসের গতিটা যেন ক্রমশই বাড়তে লাগল।

ব্যাপার কি? কমলমণির গোঙানিটা কি বুড়ী গঙ্গার মাটি থেকে মুক্তি পেল না কি? বৌরানী দেখল, জলের লেভেলটাও যেন ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। সিঁড়িটা ডুবে যেতে লাগল। বৌরানী জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি রে?"

"ঝড় উঠল বুঝি? খুব ভাল হল বৌরানী। ঝড়ের মধ্যে দয়াল মাঝি নৌকো এখানে আনতে পারবে না। বৌরানী, সঙ্গে তুমি কি কি নেবে সব ঠিক করে রেখো।"

"কিচ্ছুই নেব না। আমার ডায়ারী বইখানা কেবল তোর কাছে রাখিস। বইটা আমি তোকেই দিলুম ভজহরি। আমি যখন মরে যাব, খুলে বইখানা তখন পড়িস।—ওটা কেরে? দূরে কে যেন সাঁতার কাঁটছে?"

"ওঃ, সেই বুড়োটা। ফজ্‌লু। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। শ্মশান থেকে এক সঙ্গেই তো সাঁতার কেটে এতটা পথ আপের দিকে চলে এলুম আমরা।"

"ডাক না ফজ্‌লুকে।"

"তুমি না ডাকলে সে আসবে না। জানো, দিনের মধ্যে এক বার না এক বার সে নাগ-বাড়িটার সামনে দিয়ে নয়তো পেছন দিয়ে ঘুরে যায়?"

"আমার নাম করে ওকে বলগে আমি ওকে ডাকছি।"

ভজহরি সাঁতার দিল জলে। লম্বা লম্বা হাত দিয়ে জল কেটে এগুতে লাগল ফজ্‌লুর দিকে।

বসে থাকতে বৌরানীর এবার ভয় করতে লাগল। জলটা ফুলে উঠছে মিনিটে মিনিটে। বৌরানীর প্রায় কোমর অবধি জল উঠেছে। ডান আর বাঁ দিকে চেয়ে সে দেখল, বাতাসের ধাক্কায় বুড়ী গঙ্গার জল নাগ-বাড়ির পাঁচিলে ধাক্কা মারছে। খোলা ফটকের মধ্যে দিয়ে জল ঢুকছে নাগ-বাড়ির বাগানে। ভোরবেলা এইখানেই নৌকো লাগবে। এখান থেকেই রওনা হয়ে তাকে যেতে হবে বারোদি গ্রামে। সঙ্গে থাকবে তার স্বামী। কেবল স্বামী। বিয়ের মন্ত্র পড়ে জগদীশবাবু তার স্বামী হতে পেরেছেন, কিন্তু 'হিরো' হতে

পারলেন না! বৌরানী ভেবেছিল, একদিন না একদিন তিনি 'হিরো' হতে পারবেন। সন্তান হওয়া-না-হওয়ার ওপরেই কেবল দাম্পত্য জীবন নির্ভর করে না। সন্তান তো অনেকেরই হয় না, তাই বলে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা বিষাক্ত হয়ে উঠবে কেন? একটা কিছু পাওয়া গেল না বলে জীবনের সবটুকু ছেড়ে দেওয়ার অর্থ কি? তা ছাড়া, বৌরানীর বিশ্বাস, 'হিরো' হওয়ার মত চরিত্রের বলিষ্ঠতা ছিল বারোদির বড় জমিদার জগদীশচন্দ্র নাগের। তবে তিনি আজ এমনভাবে চরিত্রটা তাঁর হারাতে বসেছেন কেন? এই ঘাট থেকে পানসি চেপে তিনি কোন্ বন্দরের দিকে রওনা হবেন কাল? বারোদির ঘাটে তার স্বামীকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্যে কেউ তো বসে নেই। বৌরানী জানে, বারোদির সবটুকু সমারোহ তৈরি হচ্ছে তারই জন্যে। সমারোহ যত বেশিই হোক, জগদীশবাবু আজ সত্যি-সত্যি তাঁর নিজের চরিত্র হারাতে বসেছেন। ইচ্ছে করলে বৌরানী পারে তাঁর বারোদি যাওয়া বন্ধ করতে। পারে তার স্বামীর চরিত্রটাকে ধরে রাখতে। ধরে রাখবার সংকল্প তার ক্রমশই দৃঢ়তর হতে লাগল। মধ্যরাত্রে ফজ্লুর গাড়ি চেপে সে চলে যাবে নাগ-বাড়ির বাইরে। ধনপতি নাগের বড় বৌ কমলমণি পারে নি রঘু দত্তকে ফিরিয়ে দিতে, বৌরানী পারবে বারোদির দুর্নীতিকে দু-হাতে ঠেলে রাখতে। স্বামীর চরিত্রে দাগ লাগতে দেবে না সে। বারোদি যাওয়ার আয়োজনের মধ্যে কেবল তাঁর যাওয়ার তাগিদই ছিল না, চরিত্র খোয়াবার চক্রান্তও ছিল।

"সেলাম হুজুর।" জলের ওপর ভাসতে ভাসতে ফজ্লু ডান হাত তুলে সেলাম করল বৌরানীকে। সাদা চুল আর সাদা দাড়ির পাশে বুড়ী গঙ্গার জলটা খুবই কালো দেখাচ্ছিল। জলের যৌবন নদীটা আর গোপন করে রাখতে পারছিল না।

"ফজ্লু—" ডাকল বৌরানী।

"হুজুর।" কাছে এগিয়ে এল ফজ্লু।

"তোমার বকশিশের জন্যে কি দেব? দেওয়ানজীর কাছে তো টাকা চাইতে পারব না।"

"তোবা! তোবা! সারা জিন্দিগী ধরে বহুৎ তো লিয়েছি—আমার অভাব কি আছে?" এই বলে সে ভাসমান ভজহরির ঘাড়ের ওপর হাত রাখল।

"অভাব নেই জানি, বায়স্কোপের ছবি লাগাচ্ছ পাঁচিলের গায়ে। কিন্তু আমি তো কিছু দিতে চাই।" সহসা বৌরানী হাতের থেকে একগাছা চুড়ি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ফজ্‌লুর দিকে। ফজ্‌লু চকিতের মধ্যে চুড়িটা লুফে নিয়ে পুনরায় ছুঁড়ে মারল ফটকটাকে লক্ষ্য করে। নাগ-বাড়ির বাগানে এসে উড়ে পড়ল সোনার চুড়ি। ধনপতি নাগের সিন্দুকের সোনা বুড়ী গঙ্গার জল থেকে আজো ডাঙায় এসে পৌঁছুতে পারে নি।

বৌরানী ডাকল, "ফজ্‌লু—"

"জী—রাত বারোটার সময় গাড়ি নিয়ে বসে থাকব হুজুর।" এই বলে ফজ্‌লু ডুব-সাঁতার দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

ভজহরিকে সঙ্গে নিয়ে বৌরানী চলে এল ঘরে। ঘাটের দরজাটা বন্ধ করতে সে ভুলে গেল। কাপড় বদলে এসে বৌরানী বললে, "ডায়ারী বইখানা তোর কাছেই থাক। বেরুবার সময় আমি খালি হাতেই বেরিয়ে যাব।"

"সামনের ফটক দিয়ে যাবে কি করে? দরওয়ান থাকবে যে?"

"কেন, বেরুবার ব্যবস্থা কি তুই করতে পারিস নি হরি?"

একটু হেসে ভজহরি বললে, "ফজ্‌লুই ব্যবস্থা করেছে। পেছনের ঘাটে একটা ডিঙি নৌকো থাকবে। পাঁচিলের ও-পাশেই তোমায় নামিয়ে দেবে। সামনের বড় রাস্তায় ফজ্‌লু গাড়ি নিয়ে বসে থাকবে বলেছে। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"বাতাসটা যে বড্ড বেশি জোরে জোরে বইতে লাগল বৌরানী? ডিঙি নৌকো যদি আসতে না পারে?"

দক্ষিণ দিকের জানালাটা খোলা ছিল। বাতাস আসছিল ঘরে। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কি রকম একটা গোঙানির স্থর এসে বৌরানীর মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করল। জানালার গরাদের মধ্যে দিয়ে বৌরানী চাইল নদীটার দিকেই। অন্ধকার বলে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। বারান্দার আলোয় কেবল

পাঁচিলটাকে ছায়ার মত মনে হয়। রঘু দত্তের ছায়ার মত পাঁচিলটাও বুঝি বৌরানীকে ভয় দেখাচ্ছে আজ। সে জানালাটা বন্ধ করে দিল। ভজহরি বলল, "আমার জিনিস দু-একটা গুছিয়ে নিতে হবে বৌরানী, আমি চললুম। তোমার ডায়ারীখানাও নিয়ে যাই। আগেই গিয়ে গাড়িতে সব ফজ্‌লুর জিম্মায় রেখে আসি।"

"তুই কখন্ আসবি ?"

"এক ঘণ্টা বাদেই।" ভজহরি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

রমাকান্ত জগদীশবাবুর পায়ে মালিশ লাগাচ্ছিল। গতকাল থেকে আশু কবরেজ ওষুধটা বদলে দিয়ে গেছে। রমাকান্ত জিজ্ঞাসা করল, "আগের ওষুধটায় কি কাজ হল না বাবু ?"

"খুব ভাল কাজ হয়েছে। আড়ষ্ট রগটা ঢিলে হয়েছে খুব। কিন্তু নতুন ওষুধটা আরও ভাল। রমাকান্ত, আমি ভাবছি বারোদিতে তোর না যাওয়াই ভাল। এখানকার বাড়ি'ঘর সব তোর ভরসাতেই রেখে যাব।"

"ওখানে তোমায় দেখবে কে বাবু ?"

"কেন, যতীন রয়েছে ?"

"চব্বিশ ঘণ্টা তো যতীন তোমার কাছে বসে থাকতে পারবে না, ওস্তাদজীর ওপরেও নজর রাখতে হবে। আমি বলি কি বাবু, বারোদিতে এখন গিয়ে কাজ নেই। চারদিক তো জলে ভাসছে।"

"ভাসছে তো রাস্তাঘাট, ঘরগুলো তো ঠিকই আছে।"

"কি জানি বাবু, আমার কিন্তু যাওয়ার একেবারে ইচ্ছে নেই।"

"কেন ?"

সময়টা ভাল নয়। শ্রাবণ মাসে এমন ঝড় উঠতে আমি কখনও দেখি নি, বুড়ী গঙ্গায় আজ আর গোঙানির আওয়াজ নেই, গর্জন উঠেছে। ব্যাটা রঘু ডাকাতের আক্রোশ যে কখন কাকে টানে ঠিক নেই।"

"তোর এসব গল্প শুনলে তো আমার চলবে না রমাকান্ত। কবরেজ বলেছে, বারোদির হাওয়াবাতাস আমার শরীরের পক্ষে খুবই ভাল।"

"তা হলে বৌরানীকে সঙ্গে নিচ্ছ কেন? বারোদির জোলো বাতাস তার পক্ষে বোধ হয় ভাল হবে না।"

জগদীশবাবু আয়নার দিকে চেয়ে বললেন, "মুখের চেহারা আমার অনেকটা আগের মত হয়ে এসেছে, কি বলিস? আর ভেতরের দুর্বলতাও প্রায় কেটে এসেছে।"

"আমি দেখে তো কিছু বুঝতে পারছি না বাবু। হাতে টিপেও তো দেখছি, হাড় থেকে মাংসগুলো যেন ক্রমশই আলগা হয়ে আসছে। ধনপতি নাগের নাতির এ কি যোগ্য চেহারা?"

জগদীশবাবু সহসা পা-টা টেনে নিলেন। রমাকান্তের কথাগুলো যেন দম দম বুলেটের মত তাঁকে বিঁধতে লাগল। মনে মনে তিনি কেবল বিক্ষত হলেন না। অপমানের গুপ্ত আগুন তাঁকে পুড়িয়ে মারতে লাগল। তিনি বালিশের গায়ে হেলান দিয়ে বসে বললেন, "যোগ্য চেহারা যদি না হবে, তা হলে বৌরানীর সন্তান সম্ভাবনা হল কি করে?"

মালিশের শিশিটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে রমাকান্ত জিজ্ঞাসা করল, "কই, আগে তো কিছু বলো নি? এত বড় পুণ্যের কথা গোপন করে রেখেছ কেন বাবু? আশু কবরেজ তা হলে—"

বাধা দিয়ে জগদীশবাবু বললেন, "কেবল আশু কবরেজের কৃতিত্ব এতে নেই, ভগবানের আশীর্বাদও আছে।"

"অস্বীকার করবার কথা নয়। সারা জীবন যখন নুন খেয়েছি, গুণ তখন আমায় গাইতেই হবে। যাই, সবাইকে খবরটা আমি দিয়ে আসি।"

রমাকান্তের আনন্দের ঢেউ জগদীশবাবুকেও মাতিয়ে তুলল। তাঁর দেহ ও মনে অপূর্ব এক আনন্দের শিহরণ উঠল। তিনি বললেন, "রমাকান্ত যা তো বৌমাকে একবার ডেকে নিয়ে আয়। না, না, থাক, আজ আমি নিজেই যাচ্ছি তার কাছে। ভেতরের দুর্বলতা যখন সেরেই গেছে, তখন আর তাকে ডাকাডাকি কেন।" জগদীশবাবু তড়বড় করে নিজেই গেলেন উঠতে। মেঝেতে পা রাখতে গিয়েই উপুড় হয়ে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন সিমেন্টের ওপর।

মালিশের শিশিটা বিছানার ওপর ফেলে রেখে রমাকান্ত ছুটে এল জগদীশবাবুর কাছে। এসে বললে, "নাও হাতটা আমার ঘাড়ের ওপর রাখো। লাগল নাকি বাবু?"

"না। অত হা হুতাশ করছিস কেন রমাকান্ত? না হয় একটু পড়েই গিয়েছি! জীবনে এই তো আমি প্রথম পড়লুম।......রমাকান্ত, দয়াল মাঝিকে বলে আয়, ঘাটে যেন নৌকো না আনে। বারোদি আমাদের যাওয়া হবে না।"

বিছানার ওপর জগদীশবাবুকে বসিয়ে দিয়ে রমাকান্ত জিজ্ঞাসা করল, "কেন? কেন যাবে না কর্তাবাবু? এই কটা মাস বৌরানীর পক্ষে বারোদি তো ভালই হবে?"

"সারা দেশ জলে ডুবে গেছে, বৌরানীর ভাল লাগবে না। আচ্ছা, তুই একবার বৌরানীকে খবর দে তো।"

রমাকান্ত প্রথমে গেল লক্ষ্মীর মার কাছে। বৌরানীর সন্তান সম্ভাবনার কথাটা প্রচার করতে লাগল সবার কাছে। খবর দিতে গেল দয়াল মাঝিকে। দেওয়ানজী আজই কলকাতা থেকে ফিরেছেন। তাঁর কানেও পৌঁছে দিয়ে এল খবরটা। কিন্তু বৌরানীকে যে খবর দিতে বললেন জগদীশবাবু সে কথাটা ওর আর মনে রইল না।

রাত দশটা বেজে গেছে। বৌরানী কিছুই আজ খাবে না বলে খবর পাঠালো লক্ষ্মীর মাকে। ছুটে এসে লক্ষ্মীর মা বলল, "তা কখনো হয় বৌরানী? এই সময় উপোস করতে নেই, একটু কিছু খেতে হয়।"

"না, আমায় বিরক্ত করিস নি। আমি খাব না।"

"খাওয়া তো কেবল তোমার নিজের জন্যে নয়, এখন থেকে তোমায় সন্তানের কথাও ভাবতে হবে।"

"কি বললি?"

একটু মৃদু হেসে লক্ষ্মীর মা বলল, "কর্তাবাবুর কাছে খবর পেয়ে রমাকান্ত আমাদের সবই বলে গেল যে। এবার বাড়িটা আলো হয়ে উঠবে, হেসে উঠবে

খিল খিল করে। মেয়েদের কোলে বাচ্চা না এলে, শাড়ী গয়নার দাম কিছু থাকে না।"

কথা শুনে বৌরানী অবাক্ হল না একটুও। জগদীশবাবুর ভাঙ্গা-চরিত্রটা আরও বেশি করে ভাঙ্গতে লাগল। টুকরো টুকরো হয়ে পড়তে লাগল বৌরানীরই পায়ের কাছে। নায়ক হওয়ার স্থযোগ জগদীশবাবুর জীবন থেকে লোপ পেতে লাগল প্রতি পলে পলে। ধনপতি নাগের পাঁচিল ছাপিয়ে মাথা তাঁর উঁচু হতে পারল না।

বিছানায় শুয়ে ছিলেন জগদীশবাবু। শুয়ে শুয়ে বাতাসের গর্জন শুনছেন তিনি। রমাকান্ত তাঁর নিত্য সঙ্গী, তবু তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন, বোধ কবলেন সারাটা জীবন। বযস বাড়ছে বলেই ব্যর্থতা তাঁর বাড়ছে, মনের জোর দিয়ে তিনি ব্যর্থতাকে জয় করতে পারলেন না। জয করতে পারলেন না দেবেশ দত্তকে। বৌরানীর জীবনেব প্রথম 'হিরো'র মাথাটাকে নিচু করে দিতে পাবলেন না বারোদির বড় জমিদার জগদীশচন্দ্র নাগ। রঘু দত্তের চতুর্থ পুরুষ আন্দামানের মাটিতে দাঁডিয়ে দু-হাত দিয়ে ছুঁয়ে রইল বাড়িটার দুটো ঘর। এইটেই বোধ হয় সত্যি, হাত দুটোর বাইরে আর কোন সত্য নেই। ওস্তাদজীকে নিয়ে রমাকান্ত মিথ্যে সন্দেহ করছে। মিথ্যে সন্দেহ করেছে সারা শহরটাই। জগদীশবাবুর মনের খবর একটা লোকও জানে না। তিনি জানাতে পারেন না কাউকে। দেবেশ দত্ত আজ নিন্দা সুখ্যাতির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। অগ্নিযুগের অস্ত্রধারী দেবেশ দত্ত আজ সবটুকু আগুনই ফেলে গেছে আন্দামানের হাওয়ায়। ভারতবর্ষের এক ইঞ্চি জমি সে জয় কবতে পারে নি। পনরো বছরের ব্যবধানে এক ইঞ্চি খবরের কাগজের ক্যলম পর্যন্ত তার করায়ত্তে নেই—তবুও রঘু দত্তের চতুর্থ পুরুষ আজ শহীদ হতে পেরেছে। শহীদ হওয়ার স্থযোগ দিয়েছে স্বর্গীয় হরিলাল বসুর মেয়ে বেলারানী বসু। ভারতবর্ষ তার খবর রাখে না, খবর রেখেছে বেলারানী। স্বর্গীয় হরিলাল বসু এত বড় প্রতারণা না করলেও পারতেন। বেলারানীর প্রতারণাই বা কম যায় কিসে? ওস্তাদজীকে যে সে ভালবাসে না সে খবর

তাঁর প্রথম দিন থেকেই জানা আছে। বৌরানীকে তিনি তা বুঝতে দেন নি। নাটকের উত্তেজনা অনুভব করলেন জগদীশবাবু। দ্বিতীয় কোন উত্তেজনা অনুভব করা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। সন্তান সম্ভাবনার রহস্য বোধহয় এরই মধ্যে বুদ্বুদের মত ফেঁসে যেতে চায়! জীবনের পরিণতি যে কি ভীষণ জটিল হয়ে উঠতে পারে, সে কথা ভেবে জগদীশবাবু খুবই বিস্মিত বোধ করলেন। মালবিকার সঙ্গে তাঁর দেখা না হলেই সম্ভবত ভাল হতো। দেবেশ দত্তর কাহিনী তাঁর জানবার সুযোগ আসত না। তিনি শ্রদ্ধা হারাতেন না বৌরানীর ওপর। ক্ষমা যদি তাঁকে করতেই হয় কোনদিন, বৌরানীর উচিত হবে তার নিজের শ্রদ্ধা গড়ে তোলা। যার জীবন থেকে শ্রদ্ধার বিন্দুমাত্র লোপ পেয়ে গেল, তাকে তিনি ক্ষমা করবেন কি করে? ক্ষমার মর্যাদা সে দিতে পারবে না। মালবিকার সঙ্গে পরিচয় তাঁর হওয়া উচিত ছিল না। পরিচয় না হলে, তিনি জানতে পারতেন না যে, দেবেশ দত্তকে নেমন্তন্ন করে বেলারানী তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। শহীদ হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল বেলারানী বসু। জীবনগুলোর নাট্যাংশটুকু কেমন যেন গোঙানির সুর তুলেছে আজ! ধনপতি নাগের প্রাচীরের বাঁধটা ভেঙ্গে না পড়লে যেন গোঙানিটা মুক্তি পাচ্ছে না। চতুর্থ পুরুষের দেবেশ দত্তই বোধ হয় পারে এই প্রাচীরটাকে ভেঙ্গে দিতে। কিন্তু··· জগদীশবাবু বালিশের তলা থেকে একখানা চিঠি বার করে পড়তে লাগলেন।

দেওয়ানজী খিড়কির এ-পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ও-পাশে দাঁড়াল বৌরানী। দেওয়ানজী বললেন, "রাত অনেক হয়েছে, তবু আমায় আসতে হল। ক-দিন থেকে একখানা চিঠি এসে পড়েছিল। আপনার নাম লেখা চিঠি। কেউ আপনাকে চিঠিখানা এসে দিয়ে যায় নি।"

"আমার নামে চিঠি?" আশ্চর্য হল বৌরানী।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কোনদিনও আপনার নামে চিঠি আসে নি ব'লেই আমি নিয়ে এলুম চিঠিখানা।"

"দিন।" হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে নিল বৌরানী, "আর কিছু বলবেন দেওয়ানজী?"

"বলছিলাম কি,......হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে।"

"কর্তাবাবু জানেন কি সে কথা ?"

"জানেন। ষাট হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। কর্তাবাবু তা থেকে বিশ হাজার টাকা দিয়ে ফরাসগঞ্জের পাঁচ নম্বর বাড়িটা কিনতে যাচ্ছেন।"

"ঋণ তাঁর প্রচুর, তবে কেন আবার বাড়ি কিনছেন তিনি ?"

"ধর্মদাসবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন। তাঁর দুটি সন্তানের জন্যে বাড়িখানা কিনে দিচ্ছেন তিনি। সারাটা জীবন কেবল পরের জন্যেই করে গেলেন। নিজের জন্যে কিছুই রাখলেন না।"

কি মন্তব্য করবে বৌরানী ? জগদীশবাবুর মনস্তত্ত্ব তার বোধগম্য হলো না। ফরাসগঞ্জের পাঁচ নম্বর বাড়িটা তাঁর ওস্তাদজীর জন্যেই কেনা উচিত ছিল। ওস্তাদজীর সঙ্গে বৌরানীর একটা গোপন সম্পর্ক তিনি মনে মনে গড়ে তুলেছেন—অতএব মনের ঝাল মেটাবার জন্যে তাঁর কি উচিত ছিল না জগবন্ধুবাবুকে বাড়িখানা কিনে দেয়া ? জগদীশবাবুর মনস্তত্ত্ব আবার ভুল পথ দিয়ে যাচ্ছে বলে বিশ্বাস জন্মাল বৌরানীর। জগদীশবাবুর নতুন কোন গুপ্ত মতলব নেই তো ?

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বৌরানী চলে এল নিজের ঘরে। বৌরানী ভেবেছিল, হরিশ মুখার্জি রোডের ফটকের বাইরে সে সংসারের সবকিছু বন্ধন ফেলে এসেছে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, ফেলে সে কিছুই আসতে পারে নি, সব কিছু বাঁধা রয়েছে দেবেশদার কোমরে বাঁধা দড়িটার সঙ্গে। কেবল পশ্চাৎ আর বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎটাও তার আবদ্ধ।

ঘরে এসে চিঠিখানা খুলল বৌরানী। আজ তার পালিয়ে যাবার রাত। এইমাত্র সে বাইরের অন্ধকার দেখে এসেছে। মা গো, রাতটা কী কুৎসিত বলেই না মনে হয়েছে বৌরানীর! জীবনের দুটো শুক্রবার সত্যিই আর ভোলবার নয়।

চিঠিখানা খুলে প্রথম লাইনটা পড়তে গিয়েই বৌরানী বসে পড়ল মেঝেতে। পা দুটো কেঁপে উঠল একটু। হাতটাও তার কাঁপছে। চিঠি লিখেছে

মালবিকা। মালবিকা ধর্মদাস বাবুর বিধবা স্ত্রী। কোথায় পালাবে বৌরানী ? হিসেব তার চুকল কই ? গড়পারের বন্ধনও তো তার রয়েই গেল। মালবিকার দুটো সন্তান ফরাসগঞ্জের পাঁচ নম্বর বাড়িটায় এসে উঠবে। হয়তো দু-চারদিনের মধ্যে নাগ-বাড়ির হিসেবের খাতায় জমার অংক বলে লেখা হবে। খরচের দিকে থাকবে কেবল হরিলাল বসুর বাড়ি-বিক্রির বিশ হাজার টাকা।

চিঠিখানা হাতে নিয়েই বৌরানী ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে চলল জগদীশ-বাবুর ঘরের দিকে। জেনানামহলের খিড়কির দরজাটা পেছনে পড়ে রইল। পেছনে পড়ে থাকছে সব কিছু। ডিঙি নৌকোর ব্যবস্থা সব পাকাপাকি করে ভজহরি এই মাত্র ফিরে এসেছে। বৌরানীকে বেরিয়ে যেতে দেখে ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, “কোথায় যাচ্ছ বৌরানী ? এখনও তো সময় হয় নি।”

বৌরানী কোন জবাব দিল না। হাতের চিঠিখানা কেবল ফেলে দিল। বুড়ী গঙ্গার জলে আজ গর্জন উঠেছে, উঠেছে ঝড়। বাতাসের ধাক্কা লেগে চিঠিখানা উড়ে গেল অনেকটা দূরে। ভজহরি ছুটল কাগজখানা সংগ্রহ করে আনবার জন্যে। বৌরানীর কোন কিছুই সে নষ্ট হতে দেবে না। হরিশ মুখার্জি রোডের বেলারানী বসুর যোগ্য ওয়ারিস কেবল এই ভজহরি রায়।

জগদীশবাবুর হাতে আর খবরের কাগজটা নেই। পড়ে আছে বিছানার ওপর। কাগজখানার ওপর দিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ-টা ভেসে উঠল নতুন দেহ নিয়ে। বারোদি গ্রামে তাঁর আর যাওয়ার দরকার হবে না। জগবন্ধুকে নিয়ে মিথ্যে গুজব রটবে। তাতে তিনি শাস্তি পাবেন না একটুও। তাঁর শাস্তি আজ খবরের কাগজের সবচেয়ে শেষ ক্যলমের পথ কেটে আসছে। বৌরানীকে এবার তিনি হাতের কাছে পাবেন। বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃতি পেরিয়ে যাবার দরকার হবে না বৌরানীর। বন্যাপ্লাবিত পূর্ববঙ্গের নদীর জল কোথায় গিয়ে যে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিশে গেল, তার স্মরণ-চিহ্নটা এবার আর তাঁদের সংসারিক সম্বন্ধটাকে ভাসিয়ে দিতে পারবে না। স্মরণ-চিহ্নটা কেবল প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়।

খবরের কাগজের ওপর হাত রেখে জগদীশবাবু তাঁর নিজের দেহে উত্তেজনা

সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আশু কবরেজের ওষুধের চেয়েও খবরের কাগজটা আজ তাঁর কাছে অনেক বেশি উত্তেজক দাওয়াই। জীবনের এই উত্তেজিত মুহূর্তে বৌরানীকে তাঁর দরকার। দেহের মধ্যে তাঁর ক্ষমতার বন্যা এসেছে। গ্রন্থিগুলোতে জড়তা একটুও নেই। খবরের কাগজের কথা-গুলো বেল আর রজনীগন্ধার মত গন্ধ বিকিরণ করছে। সারাজীবনের চেষ্টায় রমাকান্ত পারে নি এমন বিছানা তৈরি করতে। এ বিছানা নয়, শয্যা। কেবল শয্যা নয়, ফুলশয্যা। প্লাবন এল বলে ভয় কি? ঝড় উঠল বলে আতঙ্ক কেন? পাশে তাঁর প্রিয়তমা—পরম তপস্যায় তিনি আজ তার নারীদেহ সৃষ্টি করেছেন। আলিঙ্গন করবার জন্যে জগদীশবাবু ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ঝড়ের চেয়ে ব্যাকুলতার বেগ তাঁর বেশি। বেলারানী আজ থেকে সত্যিকারের বৌরানী হবে। দেবেশ দত্ত আর নেই।

বৌরানী এসে দাঁড়াল চৌকাঠের কাছে। আজ আর জগদীশবাবুর ঠোঁট দুটো দূর থেকেই কাঁপতে আরম্ভ করল না। ঠোঁট যখন স্পর্শ-প্রয়াসী, সুতোর ব্যবধানও তখন সাগরের মত সুদূরের ব্যবধান বলে মনে হয়। মনে হল জগদীশবাবুর। তিনি হাত বাড়ালেন বৌরানীর দিকে। বললেন, "আজ আমাদের ফুলশয্যা বৌরানী। দেবেশ মারা গেছে।" এই বলে তিনি কাগজখানা এগিয়ে দিলেন বৌরানীর দিকে। নায়ক হবার যোগ্যতা কার? একের শবদেহের ওপর অপরের ফুলশয্যা রচিত হয়েছে। কেমন করে বৌরানী ফুলশয্যার ফুল লাগাবে গায়ে?

বৌরানী বেরিয়ে এল ওখান থেকে। সহস্র রজনীর একটা রজনী-ই কেবল স্মরণীয় হয়ে থাক। পাপপুণ্যের বিচার আজ আর করবার দরকার নেই। কে বিচার করবেন, তাঁরও ঠিকানা সে জানে না। ভগবান?

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে বৌরানী নিজের মনেই বলল, "আজ রাতের মত আমায় ক্ষমা করো ভগবান। তোমার আদালতে যাওয়ার আজ আমার সময় নেই। একটা রাত, কেবল একটা রাতই আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চেয়ে নিচ্ছি। কিচ্ছু আমি সঙ্গে নেব না। পাপপুণ্যের পানসি কিংবা

ডিঙি তোমার বাঁধা রইল নাগ-বাড়ির ঘাটে।” বৌরানী নেমে পড়ল বাগানে। খোলা ফটক দিয়ে বুড়ী গঙ্গার জল এসে ঢুকে পড়েছে সর্বত্র। জল আর স্থল সব মিশে গেছে একাকার হয়ে। হরিশ মুখার্জি রোডের ফটকে বৌরানী এমন দৃশ্য দেখেনি।

জগদীশবাবু বিছানায় বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় যাচ্ছ বৌরানী?” জবাব পেলেন না বলে, তিনি মালাক্কা বেতের ছড়িটা চেপে ধরলেন হাতে। চৌকাঠের কাছে গড়িয়ে পড়লেন একবার। ঈষৎ-পূর্বের গরম গ্রন্থিগুলো সবই ঢিলে হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে যে-ক্ষমতা তিনি অনুভব করেছিলেন, হাঁটতে গিয়ে বুঝতে পারলেন সবই মিথ্যে—সবই কল্পনা। তবুও তিনি বারান্দায় এলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে। ডাকলেন, “বৌরানী—” সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়েছিল ভজহরি। সে বললে, “এখনও সময় হয় নি, কোথায় যাচ্ছ বৌরানী?”

বারান্দার পশ্চিম কোণা থেকে দেওয়ানজী ডাকলেন, “এ কি? বৌরানী কোথায় চললেন?” গোলমাল শুনে লক্ষ্মীর মাও চিৎকার করে বললে, “ফিরে আসুন বৌরানী।” পাঁচিলের ছায়ার মধ্যে নিজেকে গোপন করে চুপ করে কেবল দাঁড়িয়ে রইল নাগ-বাড়ির পুরনো চাকর রমাকান্ত।

জগদীশবাবু সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি করে নামবার জন্যে হাত থেকে ফেলে দিলেন মালাক্কা বেতের ছড়িটা। কি হল? কর্তাবাবু সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লেন একতলার বারান্দায়। ভজহরি সামনেই দাঁড়ান ছিল। কর্তাবাবুকে তুললো সে। জগদীশবাবু ভজহরিকে পেঁচিয়ে ধরলেন দু-হাত দিয়ে। কপাল ফেটে তাঁর রক্ত পড়ছে। দেহের সমস্তটুকু উত্তেজনা কুড়িয়ে কাঁচিয়ে এনে তিনি জড়ো করলেন দু-পাটি দাঁতের মধ্যে। সামনের দিকে তিনি আর দৃষ্টি দিতে পারলেন না। চোখ বুঁজে জগদীশবাবু দাঁত বসিয়ে দিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ ভজহরির ঘাড়ে! বাংলার ভবিষ্যৎ মধ্যবিত্তের ঘাড়ে দাগ রেখে দিলেন জমিদার জগদীশচন্দ্র নাগ।

ভজহরি তবু কাঁদল না। কর্তাবাবুর মুখটা সে ঠেলা দিয়ে তুলে দিল ওপর দিকে। কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মিলে গিয়ে ভজহরি হয়ে উঠল রক্তাক্ত!

ওরই ঘাড়ে হাত রেখে জগদীশবাবু নামলেন এসে বাগানে। নামবার আর দরকার ছিল না। ও-পাশে গিয়ে বৌরানী ঘাটের দরজাটা টেনে দিল। অবাক হয়ে সবাই দেখল, ধনপতি নাগের নাত-বৌ লোহার দরজার বদলে টেনে দিয়ে গেল পুরনো ইতিহাসের শেষ পাতাটা।

জগদীশবাবু আর কি করবেন? দরজাটা খুলে আর লাভ হবে কি? ভজহরির ঘাড়ে হাত রেখে তিনি কেবল বললেন, "বেলা, তুমি তো সাঁতার জানো না!"

তারপর? তারপরে আর কিছু নেই। কেবল বুড়ী গঙ্গার জল এসে প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা মারতে লাগল। বাতাসের গতি কমে আসতে লাগল ক্রমে ক্রমে। সমস্ত রাত জাল ফেলে খোঁজাখুঁজির আর অন্ত রইল না। জগদীশবাবু ভজহরির ঘাড়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন সারাটা রাত। ধনপতি নাগ পেরেছিলেন কমলমণিকে ফিরিয়ে আনতে। জগদীশবাবু পারলেন না বৌরানীকে ফেরাতে। তবুও তিনি ভোর না হওয়া পর্যন্ত ঘাটের কিনারে দাঁড়িয়ে রইলেন। নায়ক দেবেশ দত্তের কাছে হেরে গেলেন বারোদির বড় জমিদার জগদীশচন্দ্র নাগ।

হার মানলো না ফজ্লু শেখ। সে দাঁড়িয়ে রইল গাড়ির সঙ্গে গা ঠেকিয়ে। পূবের আসমানে আলো দেখবার সঙ্গে সঙ্গে সে বসে পড়ল বড় রাস্তার ওপরে নামাজ পড়বার জন্যে। নামাজ পড়া শেষ হয়ে গেলে ফজ্লু গিয়ে গাড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে আসবে কাদির সর্দারের আস্তাবলে। ট্যাঁক থেকে খুলে দিয়ে আসবে ভাড়ার বাবদ পনরোটা টাকা।

সওয়ারী আসবার সময় নিশ্চয়ই অতিবাহিত হয়ে গেছে। সারা আসমান সাফ হয়ে গেল। খোদা মেহেরবান্! মেহেরবান্ তো বটেই, নইলে আসমানের অন্ধকার কাটল কি করে?

সপ্তম খণ্ড

অফিস থেকে বেরিয়ে মাধব কি করবে তাই ভাবছিল। পাঁচটার পরে বিপিন পাল রোডে যেতে হতো বলে এ-যাবৎকাল ওর বিরক্তির আর সীমা ছিল না। বিনা পয়সায় তিন চার ঘণ্টা বেশি খাটতে হয় বলে মাধব সহকর্মীদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। আজ আবার তার মনের অবস্থা বিপরীত। বিপিন পাল রোডে যাবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তিন চার ঘণ্টা বাড়তি খাটুনির জন্যে পারলে আজ সে গায়ে পড়ে বড়সাহেবকে অনুরোধও করতে পারত। বিশ বছর চাকরি করার পর বড়সাহেবের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। মাধব বুঝতে পেরেছে যে, সেই সম্পর্কটা আজ আর দেনাপাওনার হিসেব দিয়ে বিচার করা চলবে না। বিনা মাইনেতে বাকী জীবনটা বড়-সাহেবের বাড়ির একতলায় পড়ে থাকলেই বা ক্ষতি কি? দো-তলার ঘরে খাট পালঙ্কের ওপর যারা সারা জীবন ধরে শুয়ে রইল তাদের মধ্যে কেউ কি অনিদ্রা রোগে কষ্ট পায় নি? পেয়েছে বলেই তো মাধবের বিশ্বাস। মনের শান্তি না থাকলে ডবসন্ রোড আর বিপিন পাল রোডের মধ্যে কোন তফাৎ-ই থাকে না। আজ ক-দিন থেকে বড় সাহেবের মনের অশান্তি মাধবকে বিচলিত করে তুলেছে। বড়সাহেবের অশান্তির অংশ নিতে চেয়েছে মাধব। মানুষের জন্যে যদি মানুষ এইটুকুও না করে, তা হলে আর লোকা-লয়ে বাস করা কেন? বনজঙ্গলে গিয়ে থাকলেই তো লেঠা সব চুকে যায়।

মস্ত বড় লেঠার মধ্যে আটকে পড়েছে মাধব। সরোজিনী বোধ হয় ভজহরিকে ভালবাসে। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে দেখবার জন্যে সে চলল ময়দানের দিকে। ফাঁকা জায়গায় গিয়ে ঘণ্টাখানেক বসবে সে। গঙ্গার

দিকটায় গেলে কেমন হয়? গঙ্গার হাওয়া লাগলে জামাকাপড় থেকে ফাইলের গন্ধ যাবে উড়ে। সম্পর্ক থাকবে না অফিসের সঙ্গে, মনে থাকবে না সে বড়সাহেবের পিওন। কেবল সরোজিনীর বাপ হয়ে দু-দণ্ড বসতে না পারলে মেয়ের মনের কথাটা সে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। মেয়েকে নির্ভুল ভাবে বোঝাই তো পিতার জীবনে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। একটা ভুলের জন্যে সরোজিনীর সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাধব রাজভবনের উত্তর দিকের রাস্তা দিয়ে চলল হাইকোর্টের দিকে। হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে হল না, তার আগেই বাঁ দিকে ঘুরবার রাস্তাটা সে পেল। নাক বরাবর চলতে লাগল মাধব পিওন। আরও খানিকটা দূরে ওকে যেতে হবে। একেবারে আউটরাম ঘাট পর্যন্ত না গেলে সরকারি বদবু ওর নাকের মধ্যে ঢুকে পড়বে। সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সে তো বড়সাহেবের চিঠিপত্র নিয়ে এ অঞ্চলে ছোটাছুটি করেছে, আর কেন?

মাধব বসল এসে ইডেন গার্ডেনের ঘাসের ওপর। পশ্চিম দিকে মুখ করেই বসল সে। বাতাস আসছিল দক্ষিণ দিক থেকে। সরকারি গন্ধ গা থেকে উড়ে যেতে সময় লাগবে একটু। পিতা হওয়া সোজা কথা নয়। পিতৃত্বের স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে মাধবকে হতে হবে সরোজিনীর বন্ধু। বন্ধু হওয়া মানেই সন্তানের মানসিক যাতনার অংশ নিতে হবে পিতার। সহানুভূতি ও সম্ভ্রম দিয়ে সন্তানের সমস্যাটিকে যদি সে বিচার করে না দেখতে পারল, তবে তার বাপ হওয়ার দরকার ছিল কি? বন্ধু হওয়ার দায়িত্ব বড় কম না! মাধবের অনুশোচনা এল মনে। এ যাবৎকাল সে সরোজিনী বন্ধু হতে পারে নি, কেবল পিতৃত্বের দম্ভ দিয়ে চোদ্দ নম্বরের আয়তনটাকে ভরাট করে রেখেছিল। নিশ্চয়ই রেখেছিল, নইলে সে সে-দিন বাখারি ভেঙ্গে সরোজিনীকে মারতে চেয়েছিল কেন? ছি, ছি! ইডেন উদ্যানের ঘাসের ওপর বসে মাধব তার ডান হাতের আঙুলগুলো মটকাতে লাগল।...ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে একটা আঙুলেরও ইজ্জত সে রক্ষা করতে পারে নি!

সরোজিনীর মনোভাব বুঝতে গিয়ে, মাধব এবার বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে

বসল। ভজহরির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কি করে দেয়? ভজহরির পিতৃপরিচয় ওর কিছু জানা নেই। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার মত ভজহরিও ভেসে বেড়াচ্ছে কলকাতার জনস্রোতের মধ্যে। কোথায় দেশ, কে ওর বাপ মা কিছুই তো মাধব জানে না। তা ছাড়া, কলকাতার মত জায়গায় পারিবারিক পরিচয়ের মূল্যই বা কি? পাত্র নিজেই তার নিজের পরিচয়। স্ত্রী-পুত্র পরিবার তার নিজেরই প্রতিপালন করতে হবে। আগেকার দিনের মত একান্নবর্তী পরিবারের সাহায্য সে পাবে না। বিপদে আপদে সাহায্য সে পাবে না কারু কাছ থেকে। পিতা পিতামহের বাস্তুর মধ্যে মাথা গুঁজে যে বড় হওয়ার জন্যে দু-চার বছর সংগ্রাম করবে, তারও সম্ভাবনা নেই এখানে। গত বিশ বছর ধরে মাধব এ শহরটার কত পরিবর্তনই না দেখলে। এতো কিছু দেখবার পরেও মাধব কি করে তবে ভজহরির হাতে সরোজিনীকে তুলে দেবে?

না দিয়েই বা উপায় কি? বিয়ে যখন সরোজিনীই করছে, স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে হবে ওকে, থাকতে হবে সারাজীবন একই ছাদের তলায়, তখন সরোজিনীর ইচ্ছে মতই পাত্র তার ঠিক করা উচিত। একটা ভুলের জন্যে বড়সাহেব আজ খুবই অশান্তি ভোগ করছেন। অফিসের কাজের প্রতি তাঁর আর তেমন মনোযোগ নেই। টেবিলের ওপরে গাদা গাদা ফাইল জমে উঠেছে। জরুরী ফাইলগুলোতেও তিনি সই করতে ভুলে যাচ্ছেন। কি হল বড়সাহেবের? সবকিছু জেনে শুনেও তিনি কেন গেলেন পাটনা অবধি বর খুঁজতে? কলকাতায় ভাল বর পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁকে বাংলা দেশের বাইরে যেতে হয়েছে, কথাটা কি সত্যি? মাধব ভাবল, সবটুকু এর সত্যি নয়। লুকু দিদিকে কলকাতা থেকে দূরে সরিয়ে দেবার মতলব নিয়েই বড়সাহেব গিয়েছিলেন পাটনায়। কিন্তু লুকু দিদি সরলো কই? বিজয়বাবু ঠকছেন, ঠকছে লুকু দিদি নিজেও। বড়সাহেবের রাত্রে ঘুম আসছে না। লুকু দিদির মায়ের অবস্থাও তাই। মাগুর মাছের শুক্তো পর্যন্ত কারু আর হজম হচ্ছে না! জগুবাবুর বাজারের কাটা-পোনা আর নিউ মার্কেটের পেস্তাবাদামের নাম শুনলেই এখন এঁদের বমি আসে। কেন এমন হল? দত্তসাহেবের ছেলেটা

টাকা ওড়াক বা না-ওড়াক তাতে বড়সাহেবের কি? লুকু দিদিমণি যখন পন্টুদাকে ভালবাসত, তখন তার সঙ্গেই বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। মানুষ চাকরি করে টাকা রোজগার করবার জন্যেই। দত্তসাহেব যখন লক্ষ লক্ষ টাকা রেখে গেছেন, তখন তার চাকরি করবার দরকার কি? কে জানে, লুকু দিদিমণির সঙ্গে বিয়ে হলে পন্টুদা হয়তো বিয়ের রাত থেকেই হিসেবী হয়ে উঠত। কলকাতার সব চেয়ে সেরা কৃপণ হয়ে উঠত দত্তসাহেবের ছেলে পন্টু দত্ত।

মাধব ইডেন উদ্যানে বসে ঠিক করল যে, সরোজিনীর বিয়ে সে ভজহরির সঙ্গেই দেবে। বিয়ে দেবে সে মানুষের সঙ্গে, টাকার সঙ্গে নয়। আগে মানুষ, পরে টাকা। মানুষ হিসেবে ভজহরির জুড়ি নেই সারা কলকাতায়। কুলীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে বলে বস্তি সমাজে সবাই ওকে বোকা বলবে। তা বলুক, মেয়ের সুখের জন্যে মাধব পারে বোকা বনতে। তা ছাড়া, বড়-সাহেবকে ভাল করে ধরতে পারলে, ভজহরির জন্যে একটা ভাল চাকরি সে জোগাড় করতে পারবেই! কি একটা জরুরী মিটিং-এ যোগ দেবার জন্যে বড়সাহেবের দিল্লী যাওয়ার কথা আছে। তিনি ইচ্ছে করলে, দিল্লীতেও একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন। বড় সেক্রেটারিয়েট দিল্লীতেই। বিজয়বাবু তো সেখানেই আছেন। লুকু দিদিমণি যদি এক লাইন লিখে দেন, তবে ভজহরি তো বিজয়বাবুরই চাপরাশির কাজ পেতে পারে। সর্বভারতীয় কাজ। লাল-দিঘীর কাজের চেয়ে ইজ্জৎ অনেক বেশি। মাধব বিপিন পাল রোডে যাবার জন্যে উঠে পড়ল। বড়সাহেবকে আজই গিয়ে অনুরোধ করতে হবে। তিনি যদি কথা দেন তবেই হবে। ভজহরির বিয়ের কথাটা তবে সে আজ রাত্রিতেই সরোজিনীকে বলবে। বেচারী মনে মনে বড্ড কষ্ট পাচ্ছে! সনাতনের বদলে ভজহরির নাম শুনলেই সরোজিনী আজ রাত্রে খুব ভাল করে খাবে। মেয়েটা কদিন থেকে কিছুই খায় না, কারু সঙ্গে কথা কয় না! ঘরের মধ্যে বসে থাকে। সরস্বতীর পূজো করে সারাটা দিন। আজ আবার সে হাওড়া হাট থেকে লক্ষ্মীমূর্তি কিনবার জন্যে সতীশবাবুকে একটা টাকা পাঠিয়ে

দিয়েছে। বাসে করে যাওয়া-আসা করবার টিকিটের দাম দেবে বলে সতীশ বাবুর স্ত্রীর কাছে কথাও দিয়ে এসেছে সরোজিনী।

ইডেন উদ্যান থেকে বেরিয়ে এল মাধব। কেউ কারুর সুখদুঃখের জন্যে দায়ী নয়। কপালে যা আছে তাই হবে। ভগবানের আশীর্বাদ থাকলে, কুলীর ঘরে গিয়েও সরোজিনী সুখে থাকবে। সুখ? আঃ সুখ! আউটরাম ঘাটের দিক থেকে বাতাস আসছিল, মাধব নাক দিয়ে বাতাস টানতে লাগল ঘন ঘন। এদিককার বাতাসে বিনে পয়সার স্বাস্থ্য ভেসে বেড়াচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা, কেবল টেনে নিতে পারলেই হয়। এই ভেবে মাধব এগিয়ে গেল আউটরাম ঘাটের জেটির কাছে।

অনেক দিনের পুরনো একটা স্মৃতি মনে পড়ল মাধবের। জলের দিকে চেয়ে দেখল, সেখানে কোন পরিবর্তন আসে নি। অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে, গঙ্গার জল ঠিক তেমনি আছে। নেই কেবল সেদিনের বিদেশী-শাসন। সোনার টুকরো ছেলেগুলোর কথা মনে পডলে মাধবেব কান্না পায়। কোথায় গেল তারা? নতুন রাষ্ট্রে তাদের কারু সঙ্গেই তো মাধবের দেখা হল না! দেখা হল না তাদের ভাইবোন, মা বাপ কারু সঙ্গেই। কেবল বিনয় মান্না কেমন করে যেন ফিরে এল ডবসন্ রোডের বস্তিতে। বিশ বছর বয়সে বিনয় মান্না ঢুকেছিল ইংরেজের জেলে। জীবনের সবচেয়ে তাজা বছরগুলো সে ফেলে এসেছে সেখানে। একটা দুটো বছর নয়, প্রায় পনরোটা বছর। আজ সে ফেরীওয়ালা! ছিটকাপড় ঘাড়ে নিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। প্রতি সপ্তাহের রেশনের টাকা সে তুলতে পারে না এতবড় একটা শহরের এতগুলো রাস্তা থেকে! কেন এমন হল? কেবল ইংরেজকে দায়ী করলে চলবে কেন? লালদিঘীর ঐ লোকগুলো ইংরেজকে সাহায্য না করলে, হাজার হাজার বিনয় মান্নার এমন দুর্গতি হতো না। কিন্তু লালদিঘীর বাবুরা তো বেশ ভালই আছেন। মাইনে বেড়েছে তাঁদের। পেন্সন নেওয়ার সময় হল। এরই মধ্যে বালিগঞ্জে তাঁদের বাড়িও উঠে গেছে। এক তলাটা মাদ্রাজীর কাছে ভাড়া দিয়ে শ-দুই টাকা আসবে মাসে মাসে। পেন্সনও আসবে

শ-তিন। বাকী জীবনটার ব্যবস্থা সব পাকাপাকি করে নিলেন লালদিঘীর বাবুরা। কিন্তু দেবেশবাবু কোথায় গেলেন? অমন ছেলে বাংলা দেশে প্রত্যেক দিন জন্মায় না। ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন সেই এক ফ্রাঁসির জজ। কি সাংঘাতিক লোক ছিলেন তিনি! ইংরেজ লাটসাহেব না থাকলে, দেবেশ-বাবুর ফাঁসিই হয়ে যেত। আজ তিনি কোথায়? এখনও কি আন্দামানে পড়ে আছেন না কি? কই, কোন খবরের কাগজে তো তাঁর নাম দেখতে পাই না?

এই ঘাট থেকেই জাহাজ ছেড়েছিল। মাধব লুকিয়ে এসেছিল জাহাজটাকে দেখতে। কাছে এগুতে পারে নি, ইডেন উদ্যানের ঐ উঁচু জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে মাধব দেখেছিল দেবেশবাবুকে। একটা কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল এই ফটকটার সামনে। গুর্খা পুলিশরা দাঁড়াল দু-দিকে বন্দুক নিয়ে। গুর্খারা খুব বেঁটে বলে দেবেশবাবুকে দেখতে ওর অসুবিধে হল না। উঁচু মাথা তার আরও বেশি উঁচু বলেই সেদিন মনে হয়েছিল মাধবের। হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে এসেছিল তাঁকে। কোমরে একটা দড়িও বাঁধা ছিল। একটা ইংরেজ পুলিশ-সাহেবের পাশে গোটা পাঁচ বাঙালী পুলিশসাহেবও ছিল। তাদের মধ্যে দু-একজনকে মাধব আজো ভোলে নি। বড়সাহেবের চিঠি নিয়ে এই তো সেদিন তাদের অফিসে সে গিয়েছিল চিঠি বিলি করতে। আগেকার দিনের মত তাদের আর জাঁকজমক নেই বটে, তাদের মাইনে বেড়েছে অনেক, পদোন্নতির বন্যায় ভাসতে ভাসতে তারা এসে ঠেকেছে প্রায় উন্নতির শেষ সীমায়। কিন্তু দেবেশ দত্তর কি হল? সাগর যেখানে শেষ হল, দেবেশবাবু কি আজো সেখানে বসে আছেন?

আউটরাম ঘাটের জেটির ওপর পায়চারি করতে লাগল মাধব। এখানে আজ অনেক বাতাস। গুর্খা পুলিশ নেই, নেই পুলিশসাহেবরাও। প্রাণখুলে হাওয়া খেতে লাগল সে। খেতে পারত আরও অনেকক্ষণ। কিন্তু আউটরাম ঘাটের জল আর হাওয়ার মধ্যে স্মৃতির বীজাণু ভেসে বেড়াচ্ছে। দেবেশবাবুর মা এবং ভাই বোনেরা সব হারিয়ে গেলেন কেন? মাধবের মনে পড়ল

মালবিকা দিদির কথা। তাঁদেরই বাড়ির সিঁড়ির তলায় বৌকে নিয়ে সে এসে উঠেছিল। এক বছর সে ওখানেই ছিল। দো-তলার পরিবারটির দুঃখের দিনে মাধব এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের পাশে। দেবেশবাবুর বাবা মারা যাওয়ার পরে হঠাৎ ওঁরা কোথায় যে চলে গেলেন, মাধব তা আজো জানে না। কিন্তু······

অন্ধকার হয়ে এল। মাধবকে যেতে হবে বিপিন পাল রোডে। ভজহরির সঙ্গে সরোজিনীর বিয়ে সে আজই ঠিক করে ফেলবে। বড়সাহেবের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে আসবে। এখন থেকেই সরোজিনীর জন্যে কাপড়চোপড় কিছু কিছু কেনা দরকার। ছিটকাপড় সব কিনবে বিনয় মান্নার কাছ থেকে। ভজহরির কাছ থেকে মেয়েটা হযতো কিছুই পাবে না। পাঁচ নম্বর ঘরখানাকে সাজিয়ে দেবার জন্যে মাধবকেই কিনে দিতে হবে চৌকি এবং বিছানা ইত্যাদি। গহনার কি হবে? মেয়েটা তো ফেরীওয়ালার কাছ থেকে কাচের চুড়ি কিনে কিনে পরে। বাসন মাজতে গিয়ে প্রায়ই ভেঙ্গে যায়। দু-গাছা সোনার চুড়ি মাধবের বাক্সে পড়ে আছে। সরোজিনীর মায়ের হাতের চুড়ি। আরও কিছু গহনা তার ছিল। বিয়ের সময় সে পেয়েছিল তার বাবার কাছ থেকে। সগুলো সব থাকলে আজ মাধবের কোন আর উদ্বেগ থাকত না। মেয়েটাকে বশ কিছু সম্পত্তি সে সঙ্গে দিয়ে দিতে পারত। বিপদ-আপদের সময় সোনার মলঙ্কারগুলো কাজে লাগত। কিন্তু···

মাধব বাসে চেপে বসল। বড়সাহেবের কাছে সে আজ-রাত্রেই হাত াাতবে। দশ টাকা, বিশ টাকা, একশ টাকা যা তিনি দেবেন তাই সে নিয়ে াাসবে। কাল থেকে কেনাকাটা সুরু করবে মাধব। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক াখে না। নইলে, এই সময়ে জমিদারবাবুর কাছেও কিছু সাহায্য পাওয়া যত। কোন প্রজাই তো জমিদার জগদীশ নাগের কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে আসে না বলে মাধব শুনেছে। মাধব কেবল শোনে নি যে, জমিদার গদীশচন্দ্র নাগের জমিদারি আর নেই। তিনি কলকাতায় ফ্ল্যাট ভাড়া য়ে বাস করছেন দিনগত পাপক্ষয় করবার জন্যে। যাক, সে সব কথা ভেবে

আর লাভ নেই। মালবিকা দিদির খবরটা জানা থাকলেও চলত। কোলের ভাইটা তাঁর এত দিনে নিশ্চয়ই সাবালক হয়েছে। লেখাপড়া শিখে নিশ্চয়ই সে অফিস-আদালতে বড় চাকরি করছে। ঠিকানাটা জানা থাকলে কিছু টাকা সে চেয়ে নিতে পারত তাঁদের কাছে। পাওনা বলে নয়, এমনিতেই সাহায্য চাইত মাধব। তাঁদের বিপদের দিনে মাধব একটুও কৃপণতা দেখায় নি। দেবেশবাবুর মকদ্দমা চালাবার জন্যে সে তার ছেলেমানুষ বৌ-টির কাছ থেকে সব ক-খানা গহনাই দিয়ে দিয়েছিল মালবিকা দিদির হাতে। বাপ-মার কাছ থেকে পাওয়া গহনা ক-খানা ছেড়ে দিতে বৌ তার এক মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধা করে নি। ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা রেখে মাধব অবিশ্যি গহনা ক-খানা দেয় নি। ভারতমাতার পায়ের শেকলটা মাধবকেও ভেতরে ভেতরে ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছিল। সরকারি চাকরি করেও মাধব পেরেছিল বিদেশী সরকারকে আঘাত করতে! কেউ সেদিন ওঁদের সাহায্য করে নি। মালবিকা দিদি কত দুঃখ পেয়েই না সেদিন বলেছিলেন মাধবকে যে, তাঁর সবচেয়ে বড় বন্ধু পর্যন্ত একটা পয়সা সাহায্য করে নি। বন্ধুটির নাম মনে ছিল না মাধবের। খুব বড় উকীলের মেয়ে সে। ভবানীপুরে মস্তবড় বাড়ি ছিল তাঁদের। বাবার নাম ছিল হরিলাল বসু। আজ সবই বদলে গেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে এমনকি মানুষের চেহারাগুলো পর্যন্ত দেখে আর চেনা যায় না। সেদিনের দেবেশ দত্তরা মন্বন্তরের মতই বিস্মৃত প্রায়! কেন এমন হল? পঞ্চাশ লাখ লোকের মৃত্যু কি স্মরণযোগ্য ইতিহাস নয়? হয়তো নয়। গোটা পাঁচ ম্যাজিস্ট্রেটের মৃত্যুর মতই পঞ্চাশ লক্ষের মৃত্যুও নিরর্থক হয়েছে। হয়তো কোন রকম মৃত্যুর মধ্যেই বড় আদর্শের অঙ্কুর উদ্গম হয় না। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম এবং ভালবাসা ইত্যাদির সার না পড়লে আদর্শের অঙ্কুর মাটি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। মানুষ বোধ হয় সেই জন্যেই মন্বন্তরকে মনে রাখে নি। মনে রাখে নি সে যুগের বিপ্লবের ইতিহাসকে। থাক, থাক, সে-সব বিগত দিনের স্মৃতির ছেঁড়া সুতো টেনে আর লাভ নেই। তার নিজের শ্রদ্ধার ফুলটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই কারুর।

সে তার শ্রদ্ধার ফুল দিয়ে একদিন দেবেশ বাবুকে পূজা করেছে, আজো করে এবং ভবিষ্যতেও করবে। ইতিহাসের কোন একটা পাতায় কেউ যদি এইটুকু শ্রদ্ধাই কেবল লিপিবদ্ধ করে যেতে পারে তবেই ইতিহাস লেখা সত্য হবে এবং সার্থকও হবে। থাক, থাক, মালবিকা দিদির ঠিকানা খোঁজবার দরকার নেই। সরোজিনীর আবার নতুন গহনা হবে। পাঁচজনের ভিক্ষে থেকে সরোজিনীর জন্যে দু-চারখানা গহনা গডানো অসম্ভব হবে না। সমুদয় জন্তু রাজ্যের মধ্যে দু-চার জন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার হবেই। এই বিশ্বাস নিয়েই মাধব পিওন চললো তার বড়সাহেবের কাছে। পাঁচটার পরে সময় কাটাবার কাজ পেল মাধব।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বড়সাহেব খুবই অবাক্ হয়ে গেলেন! কেবল অবাক্ হলেন না, ভয়ও পেলেন একটু। লুকুর ভাসুর অজয়বাবু এসে বসে আছেন তাঁরই অপেক্ষায়! কি হল? লুকুব সব খবর পেয়ে বিজয় দিল্লী থেকে চিঠি দিল না কি? স্যাণ্ডেল, ভারতবর্ষের বাতাস সম্ভবত দূষিত হয়ে উঠেছে বলে ভাবলেন বড়সাহেব। একটা মাত্র মেয়ে, আর একটা মাত্র ছেলে তাঁর। ছেলেটা বিলেত গেছে পড়তে। বিলেতী বিষ ভারতবর্ষের বাতাসে না মিশলে এমন কুৎসিত ব্যাপার তাঁর চোখের সামনে ঘটতে পারত না। সারা জীবন তিনি ভুল করেছেন। বিলেতী আবহাওয়ায় মশগুল হয়ে ছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের কোন কিছুই তাঁর চোখে ভাল লাগত না। কেন ভাল লাগত না? ইংরেজী বই পড়ে তিনি ভারতবর্ষের ভাল কিছু দেখতে পান নি। ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থা খারাপ, ছুঁয়ে দিলে জাত যায়! ভাই বোন, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতে গেলে ব্যক্তিত্ব বাঁচে না! অতএব একান্নবর্তী পরিবারে কি করে থাকবেন তিনি? তিনি সভ্য-মানুষ। যৌবনকালটা ফ্ল্যাটে কাটিয়েছেন। বিলেতী কায়দার ফ্ল্যাট। বাবুর্চিখানা থেকে মোরগ-মসাল্লার গন্ধ এসেছে, ধর্মের গন্ধ আসতে পারে নি। ধর্ম? ভারতবর্ষে আবার ধর্ম এল কোত্থেকে? খালিগায়ে, শুধু পায়ে, ছেঁড়া-কাপড় পরা, সরু বুকওয়ালা লক্ষ লক্ষ বাঙালী ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে মন্দিরের দিকে, ওদের

আবার ধর্ম কি? বিদেশী বায়স্কোপের ছবিতে বড়সাহেবরা চৌরঙ্গীপাড়ায় ওরকম ছবি প্রতি সপ্তাহে একটা করে দেখেন। মধ্য আফ্রিকায়, পশ্চিম আফ্রিকায়, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ওসব কালো কালো লোক নিয়ে সাদা রং-এর সাহেব আর মেমসাহেবরা কত মজার অভিনয়ই না করছে ডিয়ার! ফ্ল্যাটের প্রকোষ্ঠে ওসব কিছু নেই। আছে কেবল ওয়াইফ—স্ত্রী। ভাল করে জামা-কাপড় না পরলে ধর্ম কখনও বোঝা যায় না। গত পাঁচ হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের কেউ ধর্ম বুঝতে পারে নি। যা একটু বুঝবার সুযোগ এসেছে, এসেছে তো ইংরেজী বই থেকে! ভারতবর্ষে কোনোদিন কিছু ছিল না, আজো নেই। পাটনার মসুর ডাল আর কলকাতার আশ-পাশের কতকগুলো বীভৎস-বস্তির মধ্যে ধর্ম কখনো থাকতে পারে? না, পারে না, পারে না। ধর্ম সব লণ্ডনের স্ট্রীটগুলোতে, প্যারীসের 'বূলভারে' আর ওয়াশিংটনের সংখ্যাধিক এ্যভিনূতে। ভারতবর্ষের ময়দান একেবারে ফাঁকা। আমরা ফকির, আমরা ফতুর। আমাদের কপাল পোড়া! বিদেশী 'জাঙ্গল্-পিকচারে' আমাদেরই সব দেখানো হয় নামগুলো সব বদলে বদলে। 'ও, ডারলিং মেট্রোতে গিয়ে দেখে এসো হুলাহুলা নাচের সে কি ঢেউ! হাউস ফুল।' ফ্ল্যাটে থাকবার সময় এমন অনেক কথা বড়সাহেব প্রত্যেক সপ্তাহেই একবার করে বলতেন তাঁর ওয়াইফের কাছে। আজ তাঁর মনোভাব বিপরীত। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে বিলেতী পোষাক খুলে ফেলেন। ধুতিখানা পরতে তাঁর ভাল লাগে। এদেশের সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর সন্ধ্যের পর থেকে। এমন কি কিরীটবাবুর সঙ্গে বসে দু-দণ্ড কথা বলতেও ভাল লাগে। কিন্তু লুকু সব আবহাওয়া নষ্ট করে দিয়েছে। এখন কেবল বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনটা পাস হয়ে গেলে আবহাওয়ার সবটুকুই হয়ে উঠতে পারে বদবু। ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে পার্থক্য আর কিছু থাকে না। না থাকুক, তা নিয়ে বড়সাহেব আর মাথা ঘামাতে পারেন না। টেলিগ্রাম করে ছেলেকে ডেকে নিয়ে আসবেন ভারতবর্ষে। লণ্ডনের স্কুলে বসে অর্থ-বিজ্ঞানের মারপ্যাঁচ শিখবার আর দরকার নেই। তিনি নিজে কিছু কম

শেখেন নি। আর কেন সানি, ফিরে এসো। শেষ মুহূর্তে ভারতবর্ষ যদি না বাঁচে তো না বাঁচুক, দেশের টাকা কিছু বাঁচবে।

"নমস্কার অজয়বাবু," ধুতি পরে বড়সাহেব এসে বসলেন অজয় বসুর মুখোমুখি হয়ে, "কি খবর?" সম্মুখ আক্রমণই ভাল। যা শোনবার আগে থেকে শুনে নেওয়াই ভাল। বিজয় যদি সোজাসুজি কিছু জানতে চেয়ে থাকে, তা হলে তিনিও সোজাসুজি সব কথাই জানিয়ে দেবেন। পল্টুদার স্বর্গীয় পিতার নাম পর্যন্ত তিনি গোপন করবেন না। কোন কিছু গোপন করতে গেলে অশান্তি কেবল বাড়ে।

"অফিস থেকে হোটেলে ফিরবাব মুখে আপনাব কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল। মামার কাছে কাল সব শুনলুম। আপনি যা করতে যাচ্ছেন, এত বড একটা হাতীর মত ভারত-রাষ্ট্র তা করতে পারে নি।" বললেন অজয়-বাবু। বড়সাহেব খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। বিজয় তা হলে চিঠি লিখে লুকুর খবর জানতে চায় নি। শিক্ষিত ছেলে, বৌকে সন্দেহ করবার মত মন তার ছোট নয়। বিজয়ের বৌ আসলে তো তাঁরই মেয়ে, অথচ পিতা হয়ে তিনি কি করে মেয়েকে সন্দেহ করতে পারলেন? স্বামীর মন আর পিতার মন এক নয়। মেয়ে যত কেলেঙ্কারীই করে বেড়াক না কেন, তিনি কখনও তা স্বীকার করতে যাবেন না। তা ছাড়া মোটর গাড়িতে একটু ঘুরে বেড়ালেই মহাভারত অশুদ্ধ হতে পারে না।

"শুনলুম, মিনতির বিয়ে আপনি ঠিক করেছেন? যাদবপুরের দিকে কোথায় একটু জমি কিনেছেন? কবে থেকে বাড়ি তৈরি হবে? মামার কাছে সব খবরই পেলুম।"

"হ্যাঁ, ঠিক খবরই শুনেছেন। বাড়িটা আমি ভজহরিকে যৌতুক দেব। মিনতির আপত্তি না থাকলে বিয়ে পাকা।" বললেন বড়সাহেব।

"আপত্তি? কি যে বলেন আপনি! মামার কাছে মাত্র পাঁচ টাকা মাইনে পায় বলে আমি যাদবপুরে অন্য একটা জায়গায় মিনতির কাজের ঠিক করে ফেলেছিলাম। তা যাক এখন তো আর সে সম্বন্ধে কোন কথাই

উঠতে পারে না। বিশেষ করে মিনতি স্বাধীন নয়, ভজহরির কথা ছাড়া কোন পরিবর্তনই সম্ভব নয়।" অজয়বাবু সিগারেট ধরালেন।

"ভাল, খুবই ভাল। স্বামীর কথা ছাড়া স্ত্রীর উচিত নয় স্থান পরিবর্তন করা। মানে ভজহরির সঙ্গে মিনতির বিয়ে যখন আমি পাকা করেই ফেললুম, তখন স্বামী বলতে আর আপত্তি কি ?" বড়সাহেবের মনে লুকু আর পল্টুদার কথাগুলো বড্ড বেশি খোঁচা মারছিল। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে লুকু এখনও কলকাতায় পড়ে রইল। বিজয় ঠকছে। আরও কত দিন যে সে ঠকবে, তা তিনি আন্দাজ করতে পারলেন না।

অজয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বিয়ের তারিখ কিছু ঠিক করেছেন না কি ?"

"যাব, কালীঘাটে গিয়ে একজন পণ্ডিত পাকড়ে দিনটা ঠিক করে আসব। ভাবছি, ভজহরিকে এখন থেকে আমার এখানেই রেখে দেব। বিয়েটা নাগ মশাইর বাড়িতে যদি হয়, তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই তো ?"

"মামীমার শরীর খুবই খারাপ। তা ছাড়া, পাঁচ টাকায় সংসারের সব কাজই করতে হচ্ছিল মিনতিকে··বিয়ে হয়ে গেলে এত সস্তায় মধ্যবিত্ত রিফিউজী তিনি কোথায় পাবেন ? অসুবিধে তাঁর একটু হওয়ার কথা।"

"তা হলে চলুন না, আজই গিয়ে মিনতিকে আমার কাছে নিয়ে আসি ? আমি যদি কন্যাপক্ষ হই, আপনি তবে বরপক্ষ হতে পারেন অনায়াসে। ইন্ ফ্যাক্ট, আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয় সব চেয়ে বেশি। কোথায় ভেসে যেত সে ! আপনি অন্তত তাকে একটা আশ্রয় দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। কিন্তু এখন আর আমার কোন দায়িত্ব নেই। একদিকে আপনারা রয়েছেন, অন্যদিকে রয়েছে ভজহরি। দুটির মধ্যে বহুদিন আগে থেকেই ভালবাসা ছিল—"

"বহুদিন আর কত আগেই বা হবে অজয়বাবু ? ভজহরির বয়স-ই বা কত !" এই বলে বড়সাহেব উঠে গিয়ে পাখাটা একটু জোরে চালিয়ে দিয়ে এলেন। গরম লাগছে। বিপিন পাল রোডে বাতাস আছে বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস নেই। উত্তর-দক্ষিণ দু-দিকই বন্ধ।

"তা হলে কি ঠিক হল ?" অজয়বাবু যাবেন এবার।

"বিয়ে ঠিক হল। দিন দেখা কেবল বাকী রইল। সংসারের সব ময়লা-বাসন মাজা শেষ হয়ে গেলে, মিনতি চলে আসবে আমার এখানে। যদি বলেন, লুকু যাবে ওকে আনতে।"

"বৌমা কোথায় ? দেখলুম না তো ? দিল্লীতে ফিরে যাওয়ার জন্যে বিজয় কি চিঠি দেয় নি ?"

"চিঠি নিশ্চয়ই দিয়েছে। যাওয়ার জন্যে সে বোধ হয় সুটকেশ গুছিয়ে বসেও ছিল। কিন্তু মিনতির বিয়ে না হলে যায় কি করে ? কেনাকাটা সবই তো ওকে করতে হবে। কাল আমি বিজয়কে চিঠি দিয়েছি।"

"আমিও দেব। বিয়ের দিনটা পাকা হয়ে গেলেই বিজয়কে লিখব, বৌমাকে যেন এখুনি ডেকে না পাঠায়। এদিকে মামা আবার এক কাণ্ড করে বসেছেন ! সেকেলে লোকদের গোঁড়ামি বড্ড বেশি। কোথায় কোন্ দত্তসাহেবের এক ছেলের সঙ্গে বৌমা একটু ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে মামা তাঁর চিঠিতে কি একটা ইঙ্গিত করেছেন। বিজয় একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তা আমি আজই না হয় বিজয়কে সব বুঝিয়ে একটা চিঠি লিখব।"

"খুবই ভাল হয় তা হলে অজয়বাবু। লুকু ছাড়া মিনতির বিয়েটা পার করবে কে ? আমার একলার পক্ষে তো সম্ভব নয়। বিয়েতে আমি টাকা-পয়সা খরচ করব। খরচ করবার জন্যেও তো লুকুর দরকার সব চেয়ে বেশি।"

"তা যা বলেছেন। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আমরা নিয়ে আসতে পারি, কিন্তু খরচ করবে তো মেয়েরাই।......দত্তসাহেব বুঝি আপনার বন্ধু ছিলেন ?"

"হ্যাঁ, এক সময়ে বড ব্যবসা করতেন, ওয়র সাপ্লাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনের তাপ ভারতবর্ষের কারুর গায়ে লাগে নি। আমি তখন এসপ্ল্যানেডের বড় অফিসটায় কাজ করি। দত্তসাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। বড় ঠিকেদার ছিলেন। জাপানীরা প্রায় মণিপুরে এসে গিয়েছে। আরাকানের দিকটা এক রকম খোলাই ছিল। মালমসলার জন্যে সামরিক কর্মচারিরা মিনিটে মিনিটে তাগিদ পাঠাচ্ছেন। এত তাড়াতাড়ি মালমসলা সব দেবে কে ? দত্তসাহেবকে

ডেকে পাঠালুম। লক্ষ লক্ষ টাকার মালের অর্ডার পেলেন তিনি। সময় মত সাপ্লাই দিলেন। তাড়াতাড়ি করতে হল বলে, দত্তসাহেব দু-চার লাখ টাকার ছাই পর্যন্ত সাপ্লাই দিয়ে দিলেন। জাপানীরা এগিয়ে আসছে মিনিটে মিনিটে, মালপত্র দেখেশুনে নেবার মত লোক কই সেখানে? বিল পাস হয়ে গেল।"

"বিল পাস হয়ে গেল?" অজয় বসুর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

"পাস না করলে, শেষ দিকের দশ লাখ টাকার মাল তিনি দিতে পারতেন না। ইউরোপের বুকে আগুন, অথচ কোটি কোটি মন ছাই জমেছিল ভারতবর্ষের অলিতে গলিতে। দত্তসাহেব নিজেই গেলেন চাটগাঁ—বাক্স-ভর্তি ছাই সব ফেলে দিয়ে এলেন কর্ণফুলী নদীতে। অত হৈচৈ চলেছে চারদিকে, তিনি ম্যানেজ করে ফেললেন। গেল বছর দত্তসাহেব মারা গেলেন। সংসারে রইল তাঁর বিধবা স্ত্রী, পণ্টু আর একটি মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে।"

"পণ্টু কি করে?"

"দত্তসাহেবের অফিসটা দেখাশোনা করে। না করলেও পারত, প্রচুর টাকা।"

"এত টাকা রাখে কোথায় পণ্টু?" জিজ্ঞাসা করলেন অজয়বাবু।

"তা আমি জানি না।"

"যাক, ওরাই বার করে নেবে।"

"ওরা কারা?"

"ইন্‌কাম ট্যাক্সের লোকেরা। প্রধান মন্ত্রীকে আমরা কি প্রতিশ্রুতি দিই নি যে, লুকনো টাকা সব আমরা ধরে দেব? আমরা মানে, আপনি, আমি এবং যাঁরা সব অফিসের উঁচু উঁচু চেয়ার দখল করে বসে আছেন? প্রধান মন্ত্রীর হাত যদি আমরা দৃঢ়তর করে না তুলতে পারি, তা হলে তিনি রাষ্ট্র চালাবেন কি করে?"

সে ভাবনা বড়সাহেবের ছিল না। রাষ্ট্র যদি না চলে, তিনি তার কি করবেন? পণ্টুদার গাড়ি না চল্লেই তিনি সারা জীবন অজয় বসুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। মোটা মোটা ব্যাঙ্ক একাউণ্টগুলোর জোরেই পণ্টুদার গাড়ি

চলছে পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে। ইন্‌কাম ট্যাক্সের লোকেরা যদি এখন কেবল খাতাপত্র নিয়ে টানাটানি করে তা হলেই লুকু কলকাতায় আর থাকতে চাইবে না। বেগুসরাইএর নাম শুনে অস্থিরও হবে না সে। উপরি পাওনার মত প্রধান মন্ত্রীর হাত যদি দৃঢ়তর হয়, সে হাতও বড়সাহেব চেপে ধরবেন। ধরতেই হবে। সমাজের সব চেয়ে শক্তিশালী শ্রেণী তো এঁরাই। প্রধান মন্ত্রীর হাত দৃঢ়তর হলে এঁদের হাতেও ক্ষমতার পরিমাণ বাড়বে। মানুষকে মানুষ না বলে গণ্য করবার মনোবৃত্তি কঠিনতর হবে। জমিদার-কেন্দ্রীক সমাজতত্ত্ব বদলে গেছে—ক্ষমতার বিষ কেন্দ্রীভূত হবার জন্য নতুন হাতের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এঁরাও কি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবেন? ধরে রাখতে না পারলে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতগুলো তৈরি হচ্ছে ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে, সেখানে গিয়েই শঙ্খবিষের নতুন শাসনের গোড়া পত্তন হবে। হবেই। বায়ুস্তরের মত ক্ষমতার স্তরও ফাঁকা থাকতে পারে না। মধ্যবিত্তের সর্বনাশ মধ্যবিত্তেরাই টেনে আনছে। ক্ষমতার সদ্ব্যবহার এঁরা করতে পারলেন না।

অজয় বসু উঠে পড়লেন। বিজয়কে তিনি চিঠি লিখে জানাবেন যে, লুকু-বৌমা আরও কিছুদিন কলকাতায় থাক। পল্টু দত্তের পরমায়ু ক্ষয়ে যেতে বেশিদিন আর লাগবে না। পরের বৌকে গাড়িতে বসিয়ে হাওয়া খাওয়াবার তেল তার ফুরিয়ে আসবে। বড়সাহেব খুবই খুশী হলেন অজয় বসুর কথা শুনে। তিনি কেবল মিনতির একটা হিল্লে করে দেন নি, পল্টু দত্তের পেছনে ইন্‌কাম ট্যাক্সের লোক লাগিয়েছেন। কলমের একটা খোঁচা দিয়ে পল্টু দত্তকে রাস্তায় দাঁড় করাতে পারেন এঁরাই।

"তা হলে মামাকে এখুনি আমি জানিয়ে যাচ্ছি যে, মিনতির বিয়ে আপনার বাড়িতেই হবে। ভজহরি বিয়ে করতে আসবে ডব্‌সন রোড থেকেই। তাতে ক্ষতি কিছু হবে না। ট্রাম কোম্পানীর প্রথম শ্রেণীতে চেপে এলে বরের কোন অপমান নেই। বরযাত্রীর ঝামেলা নেই। মিনতির কাছে যা শুনলুম তাতে মনে হয়, বরপক্ষের ভিড় কিছু নেই। ভজহরি একা! সে রিফিউজী। সরকারি পয়সায় হাত দেয় নি বলে নাম ওর কোথাও আমি পাই নি। সে যাই হোক,

আমাদের হাতের মুঠো থেকে ভজহরি পালাতে সাহস পাবে না। বিয়ে ওকে করতেই হবে। আপনি দিন ঠিক করুন। নমস্কার।” অজয় বসু চলে গেলেন। বড়সাহেব যেতে পারলেন না। বসে রইলেন ড্রইং-রুমে। অজয়বাবুর কথা-বার্তাগুলো মাঝে মাঝে বড্ড অসংলগ্ন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। কোনো একটি অসহায় মেয়ের বিয়ের জন্যে উদ্বিগ্ন হবার মত ভাবভঙ্গি তিনি দেখতে পেলেন না অজয় বসুর মুখে।

দরজার সামনে দাঁড়াল এসে মাধব। বড়সাহেব তাঁর চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললেন। এই সময় মাধব এসেছে কেন? বিশ বছর কাজ করবার পরে লোকটার কি কাজের প্রতি ঘেন্না জন্মায় নি? মানুষ স্বভাবত কাজ করতে চায় না। ডিউটি দেওয়া মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। আদিম মানুষ থেকে স্বরু করে আধুনিক মানুষ পর্যন্ত সবাই বিশ্রাম করতে চায়। যে-কাজ স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তাতে মানুষের কোন প্রেরণাই থাকতে পারে না। তবে কেন অফিস ছুটির পরে মাধব আবার এতদূর অবধি ছুটে এসেছে?

“কি রে মাধব, কি খবর?”

“ভজহরির জন্যে একটা অনুরোধ করতে এলুম স্যার।”

“অনুরোধের আর দরকার নেই। যাদবপুরে জমি কিনে ফেলেছি। বাড়ি তৈরি করব। ভজহরির বিয়েতে সেটা আমি যৌতুক দেব।”

মাধব একেবারে গলে গেল! বসে পড়ল বড়সাহেবের পায়ের কাছে। মানুষ না বড়সাহেব, দেব্‌তা, দেব্‌তা! সংসার থেকে না কি দয়া মায়া সব উঠে গেছে? ভজহরির বাজে কথা শুনে শুনে বস্তির লোকেদের কান সব ঝালাপালা হয়ে গেছে। ছোঁড়াটা সনাতনের মত বই না পড়েই কি করে যে এ সব বড বড় কথা বলে, আশ্চর্য।

“স্যার—” মাধবের গলা প্রায় ভিজে উঠেছে।

“কিচ্ছু আর বলবার দরকার নেই। মরবার আগে অন্তত একটা সুখের সংসার আমি গড়ে দিয়ে যাব।” বড়সাহেবের সুরে দম্ভের আওয়াজ ক্রমশই স্পষ্টতর হতে লাগল, “ভাবিস্‌ নে মাধব, সব আমি করব। কাউকে খোসামোদ

করতে হবে না, মন্ত্রী-সান্ত্রীদের কাছে খাতির চাইবার প্রয়োজন নেই। ব্যাঙ্কে আমার টাকা আছে, প্রতিটি টাকা আমার নিজের উপার্জন। এই টাকা দিয়ে আমি ওদের জীবন দুটোকে বেঁধে দিয়ে যাব। সারা জীবন তো ফাইল বাঁধলুম। এবার? এবার আমায় রুখবে কে? একটা সৎ ও সত্য কাজ আমায় করতে দে তোরা। ভজহরিকে কাল সকালে তুই সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। অফিস থেকে ওকে নিয়ে বেরুব। জামাকাপড় কিনব। কোন্ বাজারে যাই বল্ তো?"

"চাঁদনী বাজারে স্যার।"

"না, ওসব সস্তার জিনিস আমি কিনতে চাই নে। নিউ মার্কেটেই যাব। দু-পাঁচ টাকা বেশি লাগুক। মাধব, চেক লিখে দিচ্ছি, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তবে তুই অফিসে আসবি কাল। দু-এক ঘণ্টা দেরি হল তো বয়েই গেল। বিশ বছর ন-টার সময় হাজিরা দিয়ে বুকের পাঁজরা শুকনোই রয়ে গেল! আর কেন মাধব? আর কতদিন সিঁড়ি ভাঙ্গবি?"

মাধব পিওনের চোখ ছলছল করতে লাগল। বড়সাহেবের পায়ের কাছে গজিয়ে উঠল গোটা বৈকুণ্ঠ। সত্যিই তো, আর কেন? আর এগিয়ে লাভ কি? লালদিঘীর সিঁড়িতে মাথা কুটে মরলেও বৈকুণ্ঠের বিশ হাজার মাইলের মধ্যেও সে যেতে পারতো না। আজ সে বৈকুণ্ঠের দু-বিঘত ফারাকের মধ্যে বসে সারা জীবনের হাহাকার সব পুষিয়ে নিচ্ছে! বিন্দুমাত্র ক্ষোভ আর ওর রইল না। মানুষের ভুল ত্রুটি সব সে ক্ষমা করল আজ। মানুষ বড় হয় তার নিজের গুণে। বড়মানুষদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই মাধব এযাবৎকাল সনাতনের মধ্যে অস্ত্রের ধার দেখতে পেয়েছে। সনাতন-অস্ত্র দিয়ে একদিন সে বড়মানুষদের গলাগুলো কেটে ফেলতে পারবে বলেই মাধব মনে মনে সনাতনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। হেড-কারিগর হবার জন্যে সনাতনের প্রতি ওর শ্রদ্ধা বাড়ে নি এক বিন্দুও। বড়সাহেবের পায়ের কাছে বসে মাধব আজ তার গোপন-হিংস্রতার জন্যে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে উঠল।

বড়সাহেব বললেন, "আজ বড্ড আমি পরিশ্রান্ত মাধব। ভজহরিকে কাল

একবার অফিসে আসতে বলিস।” ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি পুনরায় বলিলেন, “থাক, অফিসে গিয়ে কাজ নেই। সন্ধ্যের সময় এখানেই আসতে বলিস। ছেলেটি বড় ভালো।”

বড়সাহেব চলে যাওয়ার পরে মাধবের চঞ্চলতা বাড়ল খুব। ডব্‌সন রোডের বস্তিতে ফিরে যাওয়ার জন্যে ছটফট করতে লাগল। বাসে চেপে সেখানে পৌঁছুতে অনেক সময় লাগবে। ট্যাক্সি করে গেলে কেমন হয়? আনন্দের ফানুসটা যেন একটু বেশিভাবে ফুলে উঠেছে ভেবে মাধব মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল। পাঁচ-এর এ বাসটায় এখন উঠে বসতে পারলেই হয়।

একতলার সিঁড়ির মুখে দেখা হল লুকু দিদির সঙ্গে। হাসিখুশী মুখ আর তার নেই। মাধব যেন হঠাৎ একটু ধাক্কা খেল। লুকু দিদির জন্যে বড়সাহেবের মনটা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে ছিল খুব। তাই বোধ হয় তিনি ভজহরিকে এক নিশ্বাসে সৌভাগ্যের গাছের ডগায় বসিয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। কাল সকালে হয়তো তাঁর একটা কথাও মনে থাকবে না। লুকু দিদি কাল রাত্তিরে যদি দিল্লী চলে যায়, তা হলে বড়সাহেব বোধ হয় কোন প্রতিশ্রুতিই তাঁর রাখবেন না। যাদবপুরের কেনা-জমি চড়া দামে বেচে দিয়ে দু-পয়সা লাভই করবেন তিনি।

মাধব জিজ্ঞাসা করল, “তুমি আজো দিল্লী যাও নি দিদি?”

“না।”

“আর কতদিন থাকবে?”

“অনেক দিন। তারিখ জানতে চাও না কি মাধবদা?—বলব না। তুমি তো বাবার স্পাই।”

“স্পাই?” মাধব আকাশ থেকে পড়ল।

“তাজ্জব বনে গেলে যে মাধবদা? পল্টুদাকে ফতুর করল কারা?”

“এত টাকা! হঠাৎ তোমার পল্টুদা ফতুর হয়ে গেলেন কি করে?”

“ফতুর এখনও হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? ইন্‌কাম ট্যাক্সের লোকেরা

তার হিসেবের খাতা চায় কেন? পন্টুদা কখনও হিসেব রাখে নি। মাথা মোটা আহাম্মকেরা কি জানে না যে, পন্টুদা শিল্পী? রং আর তুলি ছাড়া কোন কিছুরই তো খবর রাখে না পন্টুদা। বড়বাজারের গদি আর গুদাম নিয়ে তো পন্টুদা মাথা ঘামায় না। সে শিল্পী। বাংলাদেশের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কে? ওকি, হাঁ করে তাকিয়ে রইলে কেন মাধবদা? ওঃ, আমি বোধ হয় একটু এ্যাকাডেমিক হয়ে উঠছি।—কিন্তু আমিও তোমাদের সরকারি অফিসগুলোকে দেখে নেব। মুক্তি ফৌজ নিয়ে আমিও পারি পার্কে পার্কে মিটিঙ করতে। বড়সাহেবেদের সব সাবধান করে দিও।"

"আমাকে এসব কথা বলে কোন কাজ হবে না দিদি। আমি তো সামান্য একজন পিওন। তা বাপু, ট্যাক্স সব না দিলে সরকারি কাজই বা চলে কি করে?" মাধব চাইল লুকু দিদিমণির মাথায় খানিকটা বুদ্ধি ঢোকাতে।

"তোমাদের সরকারি কাজই বা কতদিন আর চলবে মাধবদা? একজন বাঙালী শিল্পীর খাতা ধরে টান মারতে পারো, পারো না কেবল বড়বাজারের গদিতে গিয়ে দাঁত বসাতে।"

"সেখানেও আমরা যাই দিদি।"

"কি পাও সেখানে।"

"হিসেব।"

"হাঃ! হিসেব ওরা গদিতে রাখে বুঝি? হ্যারিসন রোড হয়ে হাওড়া পোলের তলা দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ এসে পৌঁচেছে ভারতবর্ষের বর্ডার পেরিয়ে হিমালয়ের কৈলাস অবধি। খবর রাখো তোমরা? পন্টুদা রাখে। আমি চলি মাধবদা। বাবাকে গিয়ে ভাল করে খোসামোদ না করতে পারলে খাতার বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না।"

মাধব বেরিয়ে এল বড়সাহেবের বাড়ি থেকে। পাঁচ-এর এ বাসটা থেমে থেমে চলল হাওড়া স্টেশনের দিকে। না থামলেই ভাল হতো। আজ সরোজিনীকে গিয়ে খবরটা তাড়াতাড়ি দেয়া দরকার। মেয়েটা অনেকদিন থেকে কষ্ট পাচ্ছে। লুকু দিদি যাকে ভালবাসত তাকে সে বিয়ে করতে পারে

নি, সরোজিনী পারবে। বড়সাহেব বিয়েতে যদি যাদবপুরের বাড়িখানা উপহার নাও দেন, তবুও মাধব মেয়েকে তার ভজহরির সঙ্গেই বিয়ে দেবে।

অনেকদিন পরে আজ ভজহরি গান গাইতে বসেছে। মনের অবস্থা তেমন খারাপ ছিল না। জয়গোবিন্দ হাসপাতালে গিয়ে একটু একটু করে ভাল হচ্ছে। জয়গোবিন্দর সঙ্গে দেখা করে ভজহরি সন্ধ্যের পরেই ফিরে এসেছে বস্তিতে। সরোজিনীর সঙ্গে ওর আর দেখা হয় না। দেখা করবার চেষ্টাও করে না ভজহরি। সনাতনের সঙ্গে মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তার কাছেই সে শুনেছে যে, বিয়ের তারিখ ঠিক করবার জন্যে মাধবদা শিগগীরই জ্যোতিষীর কাছে যাবেন। সনাতন সুতো-বিভাগের হেড-কারিগর হয়েছে। পয়সার সঙ্গে সঙ্গে মান সম্মানও বেড়েছে তার অনেক।

মনের অবস্থা ওর তেমন খারাপ ছিল না বটে, কিন্তু ভাল ছিল, তাই বা কেমন করে বলা যায়? হঠাৎ সে গান করতে বসেছে আজ। বহুদিনের পুরনো সুরটাই গলায় তুলেছে। এই গানটা সরোজিনী এক সময়ে খুবই ভালবাসত। জলে ভিজে ভিজে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সে এই গানটাই শুনতে আসত। কি মনে করে ভজহরি সেই গানটাই গাইতে আরম্ভ করল। ঘরের দরজাটা খোলা রয়েছে। ইচ্ছে করে খোলা রেখেছে ভজহরি। পাঁচ নম্বর থেকে চোদ্দ নম্বরের দূরত্ব খুব কম নয়।

তানপুরাটা কোলের ওপর রেখে রাস্তার দিকে মুখ করে বসেছে ভজহরি। তন্ময়তা তার গভীর হতে পারছে না। পায়ের শব্দ শুনে মাঝে মাঝেই সে জিজ্ঞাসা করছে, "কে?"

জবাব আসে, "আমি গো আমি, একুশ নম্বর।" আধঘণ্টার মধ্যে অনেক-গুলো নম্বরই চলে গেল সামনে দিয়ে, কিন্তু চোদ্দ নম্বরের সাড়া সে পেল না। সরোজিনী নিশ্চয়ই রান্না নিয়ে ব্যস্ত আছে। সনাতনদার কারখানা থেকে ফিরবার সময় হয়েছে। লোকটা আট ঘণ্টার ওপরে ওভারটাইম খাটছে। বিয়েতে খরচপত্র অনেক। তা হলেও, সরোজিনীর উচিত নয় সনাতনদাকে এত বেশি পরিশ্রম করতে দেওয়া। স্বাস্থ্য আগে, টাকা পরে। এইসব কথা

ভাবতে ভাবতে ভজহরি কখন যে গান থামিয়ে দিয়েছে, তা সে লক্ষ্য করে নি।

মাধব বিপিন পাল রোড থেকে এই মাত্র ফিরল। পাঁচ নম্বরের সামনে পায়ের শব্দ পেয়েই ভজহরি তানপুরার তারে আঙুল দিয়ে আওয়াজ তুলল। সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করল, "কে? কে যায়?"

"আমি। মাধবচন্দ্র দাস।"

"বড্ড বেশি রাত করে ফিরলেন যে মাধবদা?"

"না, বেশি রাত হয় নি তো।"

"তা হলেও, সরোজিনী একলা একলা থাকে—"

"তোমরা তো সবাই এখানে আছ, সরোজিনীর আর ভয় কি?"

"সনাতনদার ফিরতে অনেক রাত হয়, ওভারটাইম খাটছে। আর আমি তো আজকাল এক রকম সময়ই পাই নে। কবে যে আপনাদের চোদ্দ নম্বরের দিকে একবার একটু উঁকি দিয়ে আসব, তা বোধ হয় ভগবানই জানেন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না? গান শুনবেন?"

"গান? মানে, বুড়ো মানুষের আবার গান শোনা কেন। সরোজিনীই তো গান শুনতে ভালবাসে।" খুবই বিব্রত বোধ করল মাধব, "হ্যাঁ, ভাল কথা। আমি এইমাত্র বড়সাহেবের কাছ থেকে আসছি। তোমায় যে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। কাল সন্ধ্যের সময় তিনি তোমায় যেতে বলেছেন বিপিন পাল রোডে। ভজহরি, আমাদের সবারই বোধ হয় বরাত ফিরল। যাদবপুরে বাড়ি, সরকারি অফিসে চাকরি সরোজিনীর আর দুঃখ করবার রইল কি? মেয়ে যাকে ভালবাসে তাকেই সে বিয়ে করুক।" মাধবের কথা শুনে ভজহরি তানপুরাটা ঠেকিয়ে রাখল বেড়ার গায়ে। শ্রাবণের রাত ছাড়া গান ওর জমবে না। শ্রাবণ আসতে এখনও তিন চারমাস বাকী। এখন সবে বসন্ত পার হচ্ছে।

মাধব জিজ্ঞাসা করল, "কাল তা হলে যাচ্ছ তো? তুমি না হয় পাঁচটার আগে লালদীঘির অফিসে চলে এসো, সেখান থেকে আমরা দু-জনেই চলে যাব বিপিন পাল রোডে।"

"কিন্তু—" ভজহরি বার তিন কিন্তু কিন্তু বলে শেষ পর্যন্ত বললে, "কাল বিকেলে আমায় একবার যতীন দাস রোডে যেতে হবে। সেখান থেকে যাব বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। রাস্তাঘাট আমার সব চেনা হয়ে গেছে।"

"ওদিককার রাস্তাঘাট আমার তো বিশ বছরের মধ্যেও সব চেনা হল না—কিন্তু তোমার কথা আলাদা ভজহরি।"

"কেন মাধবদা?"

"তুমি হচ্ছ গিয়ে ভদ্দরলোক। একবার দেখলেই ওপাড়ার রাস্তাঘাট সব তোমার চেনা হয়ে যায়। তা হোক, আমি ভদ্দরলোকই পছন্দ করি। তক্কের খাতিরে ভদ্দরলোকদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলতে হয়, কিন্তু মেয়ের বিয়ে তো আর তক্কের জোরে হয় না—টাকাপয়সা দেখতে হয়, ঘর দেখতে হয়, পাত্রের যোগ্যতা দেখতে হয়, একেই তো বলে সমাজ। তা ছাড়া, মেয়ে কাকে ভালবাসে তাও দেখা দরকার। কিন্তু তুমি যতীন দাস রোডে যাবে কেন ভজহরি?"

"মিনতির সঙ্গে দেখা করতে।"

"তা বেশ। ভদ্দরলোকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না করলেই বা ভদ্রতা বাঁচে কি করে? সরোজিনীর মতামত যাই হোক না কেন, মেয়ের বিয়ে আমি ভদ্দরলোকের সঙ্গেই দেব।" মাধব চেয়ে রইল ভজহরির দিকে। চার পয়সার মোমবাতি এরই মধ্যে অর্ধেকটা গলে গেছে। বসন্তের হাওয়া ছেড়েছে বাইরে। এঘর, ওঘরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বসন্তের হাওয়া ভজহরির ঘরেও ঢুকছিল। মোমবাতি নিবে গেছে বার দুই। মাধবের কথা শেষ হতে না হতে আর একবার নিবল। ভজহরি মোমবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, "আমার তো মনে হয়, আপনার কথাই ঠিক। কেবল ভালোবাসার জোরেই মেয়ের বিয়ে হয় না। পাত্রের যোগ্যতা দেখা প্রথম প্রয়োজন। পরিবারের পরিচয়ও হেলা করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গায়ের জোরে অনেক কিছুই করা যায়, কিন্তু সমাজকে উড়িয়ে দেওয়া অন্যায়। দিতে গেলে, অনেক রকমের অশান্তি আসে। যে-পাত্র তার পিতৃ-পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে, সে যদি কলকাতার লাট সাহেবও হয়,

তার সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতুম না মাধবদা। আমার মনে হয়, সব দিক বিবেচনা করলে, সনাতনদার মত পাত্র ডব্‌সন রোডে আর একটিও নেই।"

"সনাতন আবার এল কোত্থেকে ?" মাধবের প্রশ্নে হঠাৎ বজ্র-পাতের গর্জন শোনা গেল। ভজহরির কানে গর্জনটা খুবই অস্বাভাবিকই ঠেকল। সনাতনেব সঙ্গে সরোজিনীর বিয়েটা তো সর্বান্তকরণে অনুমোদন করেই ভজহরি তার মতামত প্রকাশ করেছে। তবে কেন মাধবদার প্রশ্নে এত বড় গর্জন উঠল ?

"না, না ভজহরি, সনাতন যতবড কারিগরই হোক না কেন, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে আমি দেব না।"

"কেন মাধবদা ?"

"তার কোন পিতৃ-পরিচয় নেই।"

ভজহরির কানের পর্দায় কোন কথাই স্পষ্ট হল না, কেবল একটা গুলির আওয়াজ এসে হাহাকার তুলল। দেবেশ দত্তের পরিচয় যদি আজ সামাজিক স্তরে কোন রকম একটু সম্ভ্রমের স্থানও না পায়, তা হলে এ-লজ্জা সমাজেরই, দেবেশ দত্তর নয়। সনাতনের ওপর অবিচার কবেছে সমাজ ও রাষ্ট্র। কিন্তু তাব চাইতেও বড় অবিচার করছেন মাধবদা। সনাতনের চেয়ে বড় ভদ্রলোক এ পাড়ায় আর কে আছে ? সনাতনদা শ্রমিক হবার জন্যে যত চেষ্টাই করুক না কেন, মধ্যবিত্তের রক্ত সে কোনদিনও ধুয়ে ফেলতে পারবে না। ধুয়ে ফেলে লাভই বা কি ? এতবড় মর্যাদার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সনাতনদা কেবল নিজেকেই নষ্ট করবে না, সে চেষ্টা করবে মধ্যবিত্তের এতবড় ইতিহাসটাকে নষ্ট করে ফেলবার জন্যে। ভজহরি কলকাতায় এসে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে যে, মধ্যবিত্তের গৌরবকে হেয় করবার জন্যে মধ্যবিত্তেরাই চেষ্টা করছে দিনরাত। এতবড় একটা ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়ে ভজহরি মর্মাহত হয়েছে। অন্তত সনাতনদাকে রক্ষা করবার জন্যে মাধবদার উচিত, সরোজিনীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া। ভজহরির বিশ্বাস, মাধবদার পিতৃ-পরিচয় নিয়ে টান মারলেই, তারও একটা ইতিহাস পাওয়া যাবে। মধ্যবিত্তের ইতিহাসের সঙ্গে তারও ইতিহাস

বাঁধা আছে। কেবল ময়লা কাপড় পরলে আর দাড়ি না কামালেই মাধবদা তার পরিচয় গোপন করে রাখতে পারবে না। তোশকের তলায় লুকনো পাঞ্জাবিটা মাধবদার গায়ে পরিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখবে না কি? তেমন চেষ্টা করে এখন আর লাভ হবে না ভেবে ভজহরি বললে, "আপনি ভুল করছেন মাধবদা। সনাতন দত্ত দেবেশ দত্তরই ছোট ভাই।"

হুম্ করে আকাশটা বুঝি ভেঙ্গে পড়ল ডব্‌সন রোডের বস্তির ওপর! সরোজিনী তার মায়ের গহনাগুলো পায় নি বলে দুঃখ কি? কাচের চুড়ির গৌরব ওর অক্ষয় হোক। কেবল সিঁথির সিঁদুর সম্বল করে ওর মা তো পেরেছে মাধবের সঙ্গে ঘর করতে! গাড়ি বাড়ি পায় নি বলে সে তো বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি নিয়ে কোনদিনও পারে নি এসে আদালতে দাঁড়াতে? অশিক্ষিত বৌ বলে ভারতবর্ষের সমাজটাকে উড়িয়ে দিলে চলবে না। সহজ লভ্যের মধ্যে সরল জীবন অতিবাহিত করাই হচ্ছে শিক্ষার মূল কথা। সরোজিনীর মা সারাটা জীবন আমোদ আহ্লাদ করেই কাটিয়ে গেছে। সরোজিনী কেন পারবে না? যাদবপুরের যৌতুক যেন নিমেষের মধ্যে মাধবের কাছে খুবই ক্ষুদ্র বলে মনে হল। সনাতন কেবল ওস্তাদ কারিগরই নয়, সে যে পুরনো ইতিহাসের মস্তবড় একটা অংশও। একথা ভুললে তো চলবে না! ভজহরি মানুষ নয়, দেব্‌তা। বিয়েটা ভেঙ্গে দেবার আগেই সে সনাতনকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। ভজহরির মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আজই সে আউটরাম ঘাটে দাঁড়িয়ে কয়েক ভরি সোনার কথা ভেবে আক্ষেপ করছিল। ঋণ করে কেউ বোধ হয় সংসার থেকে সরে যেতে পারে না। গেলেও, তার হয়ে অন্য কাউকে সে-ঋণ শোধ দিতে হয়। সনাতন সম্ভবত ঋণ শোধ দেবার জন্যেই সরোজিনীকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। ভগবানের কী চুলচেরা বিচার!

আবেগের ঢেউ এসে মাধবকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। অনেক কথাই তার বলবার ছিল। জানবারও ছিল অনেক। কিন্তু কোন কথাই সে গুছিয়ে বলতে পারছিল না। ভজহরি কি করে সনাতনের পূর্ব ইতিহাস জানলো,

দেবেশ দত্তের কাহিনী বোধ হয় ভজহরির জন্মের আগেই ঘটেছিল ইত্যাদি অনেক রকমের কথা তার মনে পড়তে লাগল। আর একটু অপেক্ষা করলে, সব খবরই সে জানতে পারত। কিন্তু রাস্তা থেকে ডাকল সরোজিনী, "বাবা, চলে এস। ওখানে কি করছ?"

সরোজিনীর গলা শুনে ভজহরি তাড়াতাড়ি করে তানপুরাটা টেনে নিল হাতে। সরোজিনীর গলাকে ডুবিয়ে দিয়ে সে গান ধরল, "ঘুর্ আয়ি মাহিনবা শাঁওনকি—"

বাইরে বেরিয়ে আসতেই মাধব দেখল, সনাতন ডাউনের রাস্তা দিয়ে এদিকপানে এগিয়ে আসছে। সরোজিনী নিশ্চয় আগেই তাকে দেখতে পেয়েছিল। দেখতে না পেলে সরোজিনী কেন অমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে যাবে, "ওখানে কি করছ? চলে এস বাবা।" প্রথম বারের ধমকানি যদি সনাতন শুনতে না পায়, সেই জন্যে সে দ্বিতীয় বারেরটা বেশ জোরে জোরেই বলল।

সরোজিনীর হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে সনাতন বলল, "ছুটির পরে দু-চারটে দোকান ঘুরে এলুম। দুখানা শাড়ী কিনলুম। এখন আপনাদের পছন্দ হলেই হয়।"

সরোজিনী কিছু বলবার আগে মাধব বলল, "পছন্দ হবেই। চলো, আমাদের ওখানে।"

ওরা তিনজনেই চলে এল চোদ্দ নম্বরের দিকে। সরোজিনীর কানে তখনও ভজহরির গানের সুর আসছিল ভেসে। শাড়ীর আকর্ষণ গানের চেয়ে বেশি নয় ওর কাছে। গান সরোজিনীকে টানে।

দাওয়ার ওপর মাধব আর সনাতন বসল। শাড়ীর প্যাকেট-টা সরোজিনী ওদের সামনেই রাখল। হারিকেন লণ্ঠনটা সরোজিনী দিল এগিয়ে। মাধব প্যাকেট-টা খুলে শাড়ী দুটোকে ওপরের দিকে তুলে অত্যন্ত গদগদ স্বরে বলল, "বাঃ, অতি সুন্দর! সরোজিনীকে মানাবে ভাল। কত টাকা খরচ করলে সনাতন?"

"বেশি নয়।...সোনার দাম খুব চড়া। গলার একটা হার আগে থেকেই

তৈরি করে রাখলুম।" এই বলে সনাতন পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা ধরনের কাগজের বাক্স বার করে তুলে ধরল মাধবের দিকে। বাক্সটা খুলে ফেলল মাধব। বাঁ হাত দিয়ে লণ্ঠনের পলতেটাকে দিল উঁচু করে তুলে।

"একেই বলে খাঁটি সোনা! সনাতনের পছন্দকে তারিফ করতে হয়। সরোজিনীর নিজের পছন্দ এত ভাল নয়। ক-ভরি আছে এতে?"

"সওয়া দু-ভরি।"

"এক দিনেই অনেক খরচ করে ফেললে সনাতন। সবে তো এক মাস হল তোমার মাইনে বেড়েছে।"

"সোনায় তেমন লোকসান নেই। গৃহস্থের ঘরে পাঁচ-দশ ভরি সোনা মজুত থাকা ভাল। কোম্পানী থেকে বিয়ের সময় কিছু টাকা ধার পাওয়া যাবে।"

"ধার পাওয়া যাবে, কিন্তু শোধ দিতে হবে তো।"

"মাইনে থেকে প্রতি মাসে কিছু কিছু করে কেটে নেবে, গায়ে লাগবে না।"

সরোজিনী বাধা না দিলে, সোনা এবং ধারের গল্প আরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলত। তাই সরোজিনী বলল, "তোমরা এবার জামা কাপড় ছেড়ে এস, খেতে বসবে। খিদে লাগে নি?"

"খিদে আবার লাগে নি! এক্ষুনি আসছি।" সনাতন শাড়ী আর সোনার হারগাছা ওখানে রেখে চলে গেল ডাউনের রাস্তায়।

সরোজিনী বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে চেয়েছিল শাড়ীর দিকেই। মাঝে মাঝে কাগজের বাক্সটার ওপরেও দৃষ্টি ফেলছিল। কিন্তু কানদুটোর আকর্ষণ ছিল পাঁচ নম্বরের দিকে। ভজহরি তখনও প্রাণ খুলে গান করছিল। তন্ময়তা এবার ওর সুসম্পূর্ণ হয়েছে। মাধব কি মনে করে জিজ্ঞাসা করল, "ভজহরি বুঝি আজ সন্ধ্যেবেলা থেকেই গান গাইতে বসেছে?"

"জানি না তো।" জবাব দিল সরোজিনী।

"কি খায় ও, আর কখনই বা খায়, কিছু খবর রাখিস্?" মাধবের কৃতজ্ঞতা-বোধ ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। সেই সঙ্গে যাদবপুরের যৌতুকটাও আবার স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে মাধবের। দু-খানা ঘর নিশ্চয়ই থাকবে। পেছন

দিকে একখানা রান্না ঘর। উঠোনের এক কোণায় থাকবে একটা তুলসীগাছ। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে একটা মাচা তৈরি করলে কেমন হয়? কুমড়ো গাছ লাগানো চলে। লাউ গাছও ভাল হবে। আল্তাপাটি শিম যাদবপুরের মাটিতে ভাল ফলবে। সবুজ শিমই বা মন্দ কি?

"আমার তো মনে হয়, ছেলেটা রাত্তিরে বোধ হয় উপোস করে। বরাত খারাপ, নইলে এত বড় বস্তিটায় কেউ না কেউ ওর দিকে দৃষ্টি দিত।" মাধব দ্বিতীয় বার চেষ্টা করল সরোজিনীর মুখ থেকে কথা বার করবার। সরোজিনী তবু কোন কথাই বললে না।

"কি রে চুপ করে রইলি যে? সারা দিন করিস কি? নভেল পড়ে সময় নষ্ট করলে সংসারটা যে ভেসে যাবে! ভজহরির দিকে একটু নজর রাখতে পারিস্ না?"

মাধবের নজর রয়েছে যাদবপুরের বাড়িটার ওপর। নিজে গিয়ে সেখানে সে থাকবে না, জানে। ভজহরির বাড়িতে সে থাকতে যাবে কেন? শ্বশুরের সম্মান আলাদা। মেয়ে যদি সুখে থাকতে পারে, তাতেই তো বাপের সুখের আর অন্ত থাকবে না। বড়সাহেব যখন পেছনে দাঁড়িয়েছেন, তখন সুরুতেই ভজহরির মাইনে হবে কমের পক্ষে একশ।

সনাতনকে আসতে দেখেই মাধব আবার ফিরে এল যাদবপুর থেকে। সনাতন ওকে টেনে নিয়ে গেল গড়পারের রাস্তায়। দেবেশবাবুর ছোট ভাই এই সনাতন দত্ত! কত বড় কাহিনী আর কত বড় ইতিহাসই না সেদিন বাংলা দেশটাকে তছনছ করে তুলেছিল! সরকারি চাকরি করেও, কত লোকই না গোপনে গোপনে দেবেশবাবুকে পূজো করত। সনাতন সেই বংশেরই ছেলে। সনাতনকে দেখতে পেয়ে, মাধবের গায়ে ইতিহাসের হাওয়া লাগল। সে উঠে পড়ল দাওয়া থেকে। একটু বিরক্তির সুরেই যেন মাধব বলল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনলে তো সনাতনের পেট ভরবে না। খাবার যোগাড় দেখ্।"

"তুমিও এস কাপড় চোপড় বদলে। এক সঙ্গেই বসে পড়ো বাবা।"

সরোজিনী আসন পাতল দু-খানা। সনাতন এসে বসে পড়ল একটার ওপরে। মাধব ঘরে গেল অফিসের পোশাক পরিবর্তন করবার জন্যে। শাড়ী আর কাগজের বাক্সটা সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। আঁচল থেকে সরোজিনী চাবি নিয়ে বলল, "তোমার বাক্সের চাবিটা নিয়ে যাও বাবা।"

"আমার বাক্স? সারা জন্মে আমার তো কোন বাক্স ছিল না সরোজিনী?" অকারণে মাধব তার মনের উষ্মা প্রকাশ করতে লাগল।

"মায়ের বাক্সটাই তোমার ছিল বাবা।"

"ও, হ্যাঁ। দে, চাবি দে।"

সরোজিনী যে শাড়ী আর সোনার জন্যে এতটা সতর্কতা অবলম্বন করছে, তাতে সনাতন খুশী হল খুবই। টাকা ওর কাছে ভগবান। অতএব সোনা হচ্ছে ভগবান শ্রেষ্ঠ। সরোজিনী যে সনাতনের ধর্ম তার ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করছে, তার দৃষ্টান্ত দেখে দাসনগরের হেড-কারিগর খুশী মনে ভাত খেতে বসল।

"পছন্দ তোমার হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।" বলল সনাতন।

"হ্যাঁ, ষোল আনা পছন্দ হয়েছে। বাবার পছন্দ সতরো আনা।" ভাতের থালা সাজিয়ে দিয়ে সরোজিনী তার অনুমোদন জানালো।

"তোমার বাবা একটু হুজুগে লোক। কিন্তু লোক খুব ভাল। কি বলো?"

"আমি আর কি বলব? মেয়ের মুখে বাপের নিন্দে শোনা পাপ।"

"তা ঠিক, তা ঠিক। আমার আবার বাপ-মার কথা একদম মনেই নেই। কিন্তু তা হলেও সত্যের খাতিরে খারাপকে সব সময়ই খারাপ বলতেই হবে। আজকের পৃথিবীতে সত্য বলার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।"

"কোন্ বইতে পড়লে?—আর একটু ডাল দেব না কি?"

"না। সত্য বলার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কারণ প্রচার ও প্রতিপত্তির জোরে মিথ্যের কালি আজ সবারই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েছে। মানুষ হয়ে উঠেছে শয়তান। অতএব, বাপ যদি খারাপ হয়, তাকে খারাপই বলতে হবে। বাপের চেয়ে সন্তান তার বড় হতে পারে না, সেই বা কেমন যুক্তি?"

"যুক্তি খেয়ে পেট ভরবে না, তুমি ভাল করে ভাত খাও। খেম্নয় হয়ে কথা না বলাই ভাল।—তরকারিটুকু সরিয়ে রাখলে কেন?" ক্ষাৎ

একটু হেসে সনাতন বললে, "উঃ, কত আর খাবো বলো তো? সুতো-বিভাগের সবাই বলছে যে, হেড-কারিগর হবার আগেই আমার না কি ভুঁড়ি গজিয়েছে। না সরোজিনী, এত বেশি করে আমায় খেতে দিও না।"

"তোমার হিসেবের অংশটা তো তোমাকেই খেতে হবে।"

"না, পারব না। হিসেব তা হলে ছোট করে ফেলো।" সনাতন ঢেঁকুর তুলল। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের বাতাসটা যেন বইতে লাগল জোরে জোরে। ডাউনের দিক থেকে ভজহরির কণ্ঠস্বর উড়ে এসে চোদ্দ নম্বর পেরিয়ে চলে যাচ্ছে আরও আপের দিকে। সনাতন সম্ভবত ভজহরির সুরটাকে সরিয়ে দেবার জন্যেই নিজের কণ্ঠকে চড়িয়ে দিয়ে সরোজিনীর সঙ্গে বড় বড় কথা বলবার চেষ্টা করছিল। সরোজিনী জানে, সনাতনের কণ্ঠে কথা আছে, সুর নেই। কথার আঘাতে সুরকে সরিয়ে দেওয়া যায় না।

সনাতন তরকারিটুকু খেয়ে ফেলে বলল, "হরিভাই দেখছি আজ কাউকে ঘুমুতে দেবে না।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। বস্তির হাওয়ায় তো রোজই নর্দমার গন্ধ ভাসে। হরিদা আজ সবাইকে জাগিয়ে রাখবে। সুগন্ধের স্পর্শ পাবে সবাই। জানো, এত বড় বস্তিটায় তুমি ছাড়া হরিদার প্রশংসা আর কেউ করে না?"

"হরিভাই আমার প্রতিবেশী। পাঁচ-নম্বর আর ছ-নম্বর হচ্ছে পাশাপাশি ঘর। ওভারটাইম খেটে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লে, নর্দমার গন্ধ দরজার ও-পাশ থেকেই ধাক্কা খেয়ে অন্য রাস্তা ধরে। মনেই থাকে না যে, আমারই ঘরের সামনে একটা নর্দমা আছে।"

"পাশাপাশি ঘর বলেই, এ-সুবিধাটা তুমি একলাই ভোগ করো। হরিদার গান তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ওভারটাইমের বাড়তি পরিশ্রম তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারে না।"

সরোজিনীর বাবার দিকে সনাতনের আর মনোযোগ ছিল না। সবটুকু মনোযোগ প্রয়োগ করেছে সরোজিনীর কথার মধ্যে। দু-বার চেষ্টা করেও সে পারলে না সরোজিনীকে ধরে ফেলতে। বার বার করে সে পিছলে যাচ্ছে। অথচ বিয়ের আগে সরোজিনীর মনটাকে ওর বোঝা দরকার। কোন রকম হেঁয়ালীর ওপর নির্ভর করে বিয়ে করা উচিত হবে না। সনাতনের মনের দ্বিধা বড় কম নয়, দ্বন্দ্ব রয়েছে মনের চাতাল জুড়ে। সরোজিনীকে নিয়ে সেখানে সংসারের তাঁবু খাটাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁবু তার উড়ে না যায়। চারদিক বন্ধ করে বাস করা সম্ভব হবে না। বাতাস আসবেই। আর বাতাস এলেই যদি সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের সুগন্ধও ভেসে আসতে থাকে, তা হলে ওভারটাইমের মেহ্‌নত সব পণ্ড হয়ে যাবে অনিবার্যভাবে। সনাতনের মনের দ্বন্দ্ব গভীরতর হল।

"হরিভাইকে শাড়ী আর গহনাটা দেখিয়ে এসো না? ওর পছন্দটা কি রকম, দেখা যাক।"

"ভালই তো হয়। বিয়ের জিনিস পাঁচ জনকে দেখিয়ে তবে পছন্দ করা ভাল। তা ছাড়া, আমার নিজের কোন পছন্দের বালাই নেই। হরিদাকে তুমিই একবার দেখিয়ে নিও।"

মাধব এসে বসল সনাতনের পাশে। সরোজিনী নিঃশব্দে ভাত বাড়তে লাগল মাধবের জন্যে।

বিশু এসেছে তার দিদির সঙ্গে দেখা করতে। কাল মাইনে পেয়েছে সে। আজ রবিবার বলে দুপুর বেলার খাওয়া শেষ করেই বিশু এসেছে। নাগবাবুদের বাড়িতে হিসেব করে রান্না হয় সে-খবর ও আগেই পেয়েছিল। অজয়দার কাছে আরও যেসব টুকরোটাকরা খবর বিশু সংগ্রহ করেছে, তাতে নাগবাবুদের ওপর এই বয়সেই ওর ঘেন্না জমেছে প্রচুর। দিদি যে তার এখানে সুখে নেই, তা সে মিনতির মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারে। কিন্তু কি করবে উপায় কিছু নেই। বাড়ি-ঘর ফেলে চলে আসতে হয়েছে হঠাৎ। ইস্কুলের পড়াও বন্ধ হয়ে গেল। ভূগোল পড়তে ভাল লাগত বিশুর। মানচিত্র নিয়ে বসলে, ওর

খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকত না। বাংলা দেশের মানচিত্র সে তন্ময় হয়ে দেখত। সোনার বাংলা! মাস্টারের ছেলে বলে সোনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ তার কোনদিনই হয় নি। তবুও বিশু স্বপ্ন দেখত, বাংলা মায়ের সিন্দুকে সে তাল তাল সোনা রোজগার করে এনে জমিয়ে রাখবে। নিজের মা তো মরেই গেল! অতএব, বাংলা মায়ের সিন্দুকে ছাড়া সে এত সোনা রাখবে কোথায়?

কলকাতার রাস্তায় পা দেবার পরে বিশু আর সিন্দুকের কথা ভাবে নি। ভাবতে গেলে, গাড়ি চাপা পড়ে মরে যেত বিশু। এরই মধ্যে লজ্জায় সে বার কয়েক মরে যেতে চেয়েছিল। কেবল দিদির জন্যে মরতে পারে নি। মানচিত্রটা ভাগ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু পশ্চিম অংশটাকে বাংলা দেশ বলে চিনতে পারে নি সে! হরিদাকে দেখলে বরং চেনবার স্থবিধে হতো। এমন একটা অচেনা দেশে আর কতদিন সে ঘুরে বেড়াবে? ঘুরে বেড়াতেই বা পারল কই? কলকাতার রাস্তায় পা দিতে না দিতেই অজয়দার সঙ্গে চেনা হয়ে গেল। তিনি ওকে ঢুকিয়ে দিলেন লোহার কারখানায়। হাতুড়ি পিটে পিটে হাতের মাংস সব এক বছরের মধ্যেই গোল পাকিয়ে গেছে। দিদি যদি এখন চিমটি কাটতে আসে, তা হলে সে নিজের আঙুলেই ব্যথা পাবে। শরীরে কোথাও আর নরম মাংস নেই। ঢাকায় থাকতে দিদি ঝগড়া করত মাঝে মাঝে, চিমটি কাটত প্রায়ই। এখন ব্যথা পাবে বলেই বুঝি দিদি মাসের মধ্যে একবারও বিশুর সঙ্গে ঝগড়া করে না।

কিন্তু ঝগড়া করবার জন্যে বিশুই তৈরি হচ্ছে। দিদির সঙ্গে নয়, মানুষের সঙ্গে। সাধারণ ঝগড়ার প্রতি ওর আর তেমন উৎসাহ নেই। বিশু লড়াই করবে। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আট ঘণ্টা করে কাজ করছে কেন? আগুনকে জয় করবার জন্যে। সঙ্ঘবদ্ধ হতে না পারলে, বড় আগুনকে সে পোষ মানাতে পারবে না, বাবা মার মত শ্মশানের আগুনে সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অতএব, বিশু এখন ইউনিয়নের সবচেয়ে উৎসাহী কর্মী। যে-সব শ্রমিকদের গায়ের চামড়া আধ-পোড়া হয়ে গেছে তাদের সে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

অপরের বন্ধুত্ব সে আর কামনা করে না, নিজের বন্ধুত্বের প্রলেপ সে লাগায় অপরের আধ-পোড়া চামড়ার দগদগে ঘাগুলোর ওপরে। বিশু নতুন ওষুধের সন্ধান পেয়েছে।

দিদির সঙ্গে বিশু সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলে যায়। দো-তলায় ওর উঠতে ইচ্ছে করে না। নাগবাবু ভয় পান। যাওয়ার সময় বিশু যদি এটা ওটা পকেট ভরে নিয়ে যায় তা হলে নাগবাবু চোখে দেখতে পাবেন না বলে দিদিকে তিনি আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। কথাটা শুনে বিশু খুবই দুঃখ পেয়েছে। কাউকে সে মনের দুঃখ খুলে বলতে পারে নি। কার কাছে বলবে? লোক কই? হরিদা কাছে থাকলে তাকেই বলা যেত। কিন্তু হরিদা কোথায় যে ডুব মেরেছে বিশু তার খবর রাখে না।

আজ এসেছে বিশু দিদির সঙ্গে দেখা করতে। ওপরের বারান্দায় গিয়ে বসবার জন্যে মিনতি বিশুকে অনুরোধ করল, "দো-তলার বারান্দায় চুরি করবার মত কিছুই তো নেই। ক-খানা চেয়ার পড়ে আছে। পকেটে ভরে তুই কি চেয়ার-টেবিল নিয়ে যেতে পারবি?"

"না, ওপরে আমি যাব না। টাকা কটা তুমি রেখে দাও। দু-খানা শাড়ী কিনে নিও দিদি।"

"শাড়ী আমি পেয়েছি। ভাল শাড়ী। বিজয়বাবুর শ্বশুর আমায় দু-খানা শাড়ী উপহার দিয়েছেন।"

"তা হলে পরো নি কেন?—অজয়দার সঙ্গে আজকাল বেড়াতে যাও না?"

মিনতি চুপ করে রইল। বিশুও কি যেন ভাবছিল। বিশুকে ভাবতে দেওয়া ঠিক নয় ভেবে মিনতি জিজ্ঞাসা করল, "তোর কি ভাল একটাও প্যাণ্ট নেই বিশু? আমি টাকা দিয়ে কি করব, তুই বরং প্যাণ্ট আর একটা শার্ট কিনে নিস্।"

"টাকা জমিয়ে রাখো দিদি। আমার মাইনে বাড়লেই আলাদা বাড়ি ভাড়া করব।"

"সেই জন্যেই আমি দিনরাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আর বলি,

ঠাকুর, বিশুকে তুমি মানুষ করে তোলো। ভাই, মাইনে বাড়তে আর কতদিন লাগবে?"

"বেশি দিন নয়। মালিক বলেছেন, ত্রিশ টাকা থেকে ষাট টাকা করে দেবেন। ষাট টাকায় সংসার চালাতে পারবে তো দিদি?"

"খুব পারব বিশু। শুধু ডাল ভাত খেয়ে আমরা সুখে থাকব। পরের বাড়িতে মাছ মাংস খেয়ে লাভ কি?"

দিদির চোখের পাতা ভিজে উঠেছে বলে বিশুর মনে হলো। নাগবাবুর বাড়িতে মানুষ কখনো সুখে থাকতে পারে না। কুকুর বেড়াল থাকলেও তাদের কষ্ট হতো। কিন্তু নাগবাবু খুব হিসেবী লোক বলে, পাশের বাড়ির বেড়ালটা পর্যন্ত এখানে মাথা গলাতে পারে না। বেড়ালের পায়ের শব্দ তিনি দূর থেকেই শুনতে পান। অথচ শ্রবণশক্তি তাঁর প্রতিদিন কমে আসছে বলে তিনি মিনতির কাছে দুঃখ করেন! বিশু সে কথা বিশ্বাস করে না। ওর ধারণা, নাগবাবু দো-তলায় দাঁড়িয়ে ভাইবোনের গোপন-কথা শোনবার চেষ্টা করেন। সেই কারণে বিশু সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কয়। মিনতি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিশু জিজ্ঞাসা করল, "অজয়দা কি আজকাল আসেন না?"

"আসেন, রোজ নয়।"

"অজয়দা ভালমানুষ নন।" বলে ফেলল বিশু।

"কেন রে? এমন কথা কেন বললি? তিনি সাহায্য না করলে আমরা যে কোথায় ভেসে যেতুম, কেউ তার খবর রাখত না। তাঁর দয়ায় আমরা আশ্রয় পেয়েছি।"

"কার দয়ায় কে কোথায় আশ্রয় পাচ্ছে, আমি তা জানি নে। মোটের উপর অজয়দা মানুষ ভাল নন। তাঁর চেয়ে হরিদা অনেক বেশি খাঁটি। হরিদার মত মানুষ এপর্যন্ত একজনও আমি দেখি নি দিদি।"

"হরিদা আসবার পরে, অজয়বাবু এ-বাড়িতে খুবই কম আসেন।"

"হরিদা? কোথায় হরিদা?" বিশু আনন্দে লাফিয়ে উঠল

সিঁড়ির ওপর থেকে নাগবাবু বললেন, "কুলী ব্যাটার সঙ্গে সমস্তটা দুপুর কি যে ফিসির ফিসির করছ, বুঝতে পারি না। কে ওখানে? ভজহরি না কি?"

"না, বিশু।" জবাব দিল মিনতি।

"উনি আর দশ মিনিট পরে ঘুম থেকে উঠবেন। ফলের রসটা যেন তৈরি থাকে মিনতি।"

"আচ্ছা।"

বিশু জিজ্ঞাসা করল, "হরিদার ঠিকানাটা কি?"

"ঠিকানা তো রাখি নি। অন্যদিন এলে আমি রেখে দেব। বিশু, কারু ওপরেই আর আমাদের নির্ভর করা চলবে না। তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস্, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাস্। আবার কবে আসবি বিশু?"

"রবিবার ছাড়া আমি যে ছুটি পাই না দিদি? তাছাড়া, এখন আমার কাজ শেখবার সময়, ছুটি নিলে লোকসান আমারই হবে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে দুজন পাঞ্জাবী ছেলে কাজ শিখছে, তারা আট ঘণ্টার ওপরে ন-ঘণ্টা কাজ করে। কারখানার মধ্যে কি রকম গরম জানো? কিন্তু তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন দিদি?"

বিশুকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে মিনতি বলল, "ভয় পাই তোর জন্যে বিশু। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে তোকে আট ঘণ্টা কাজ করতে হয়!"

"আমরা রিফিউজী, কাজ না করলে বাঁচব কি করে? হরিদা বলত, মেহ্‌নত হচ্ছে ভগবান। ও কি তুমি কাঁদছ কেন?"

"কেন কাঁদব না বল্? মাথার চুলগুলো তোর নারকোলের ছোবড়ার মত খসখসে হয়ে উঠেছে!"

"তা উঠুক। আজকাল আর আগুনের তাপে গা আমার জ্বালা করে না। কচিখোকা হয়ে ঘরে বসে থাকলে ষাট টাকা মাইনে হবে কি করে?—ছাড়ো, তুমি যদি কাঁদো, তা হলে আমি আর কখনও আসব না দিদি।"

বিশুকে ছেড়ে দিল মিনতি। দিয়ে বলল, "জানিস বিশু, বড়সাহেব হরিদার

সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান? যাদবপুরে জমি কিনেছেন হরিদার নামে। বাড়িও করে দেবেন বড়সাহেব।"

"তা হলে তুমি কাঁদছিলে কেন? সুখের দিন তো আসছে তোমার? হরিদার সঙ্গে বিয়ে হলে খুব ভাল হয়। হরিদার ঠিকানাটা এবার রেখে দিও।"

"রাখব। কিন্তু হরিদার সঙ্গে বিয়ে আমার না হওয়াই ভাল।"

"কেন? কেন?"

নাগবাবুর গলা শোনা গেল, "মিনতি, মিনতি—"

"আমি এবার যাই বিশু।"

"যাও···কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, অজয়দা লোক ভাল নন।" এই বলে বিশু বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভজহরি কাজে বেরুচ্ছিল। গত একটা মাস নিয়মিত সে কাজে যোগ দিতে পারে নি। জয়গোবিন্দকে নিয়ে খানিকটা ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত করে তুলেছে সরোজিনী। পাঁচ-নম্বরটা সে যেন একেবারে ভুলেই গেছে। ডাউনের দিকে পা ফেলে না একেবারেই। মাঝে মাঝে ভুজঙ্গর বৌর সঙ্গে বসে গল্প করে যায় সরোজিনী বেশ জোরে জোরেই কথা কয় সে। পাঁচ-নম্বরে বসে ভজহরি ওর প্রত্যেকটা কথা শোনে আর ভাবে, এবার বোধ হয় সরোজিনী আসবে। ক-কদম রাস্তা হাঁটতে সরোজিনীর এমন কি কষ্ট! আট-নম্বর থেকে পাঁচ-নম্বর পর্যন্ত একটা বাচ্চা ছেলেও হামাগুড়ি দিয়ে আসতে পারে, কিন্তু সরোজিনী তবু আসে না। কতকগুলো দিন সে অনর্থক নষ্ট করল ঘরে বসে!

রাস্তায় নেমে ভজহরি আপের দিকে দৃষ্টি ফেলল একবার। স্পষ্ট কিছু দেখতে পেল না সে। উনোনের ধোঁয়ায় আপের রাস্তাটা একেবারে ভরপুর হয়ে আছে। কেবল সরোজিনীর উনোন নয়, আরও পাঁচ দশটা উনোনে আগুন দেওয়া হয়েছে। সবগুলো উনোনের ধোঁয়া একসঙ্গে মিশে গেছে বলে সরোজিনীর উনোনটা সে দেখতে পেল না। দেখবার জন্যেই বোধ হয়

ভজহরি দু-কদম হেঁটে এল আগের দিকে। বাঁ পাশে ছ-নম্বরের দরজাটা বন্ধ রয়েছে। দরজার দিকে চাইতে গিয়েই ভজহরি খুবই অবাক হয়ে গেল। দরজার ওপরে একটুকরো কাগজ লাগানো রয়েছে। কাগজের ওপরে সনাতন নিজের হাতে বড় বড় করে লিখে রেখেছে : সনাতন দত্ত, হেড-কারিগর।

ভজহরি ভাবল, সনাতনদা হেড-কারিগর হয়েছে বলে বস্তি সমাজ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে চাইছে। শ্রেণীবিভাগ সে তুলে দিতে গিয়ে, সনাতনদা তার নিজের শ্রেণীকে ধরে রাখছে। ময়দার আঠা দিয়ে কাগজটাকে সেঁটে দিয়েছে দরজার ওপরে। হাজার হলেও, সনাতনদা তো মধ্যবিত্ত সমাজেরই লোক! রঘু দত্তের ঊর্ধ্বতন আরও দশপুরুষের রক্ত রয়েছে সনাতনদার শিরায় শিরায়। কালিমাখা শ্রমিকের পোষাক পরলে কি হবে, দত্ত বংশের পরিচয়-চিহ্ন সে তার উঁচু বুক থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। দরজার বুকে-আঁটা কাগজটা তো সেই পুরনো দলিলের নতুন পরমায়ু! আর খানিকটা মাইনে ও পদমর্যাদা বাড়লে, সনাতনদা বস্তি থেকে উঠে যাবে। ভদ্রপাড়ায় গিয়ে পুরনো দলিলটাকে লিখে রাখবে পেতলের নামফলকের চকচকে বুকের ওপর। ভালই হবে। মধ্যবিত্তের ইতিহাসটা সর্বপ্রকার লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচবে। গৌরবের ইতিহাসের পাতাগুলোকে কেটে ফেলবার জন্যে যারা অস্ত্রের মুখে আজ ধার তুলছে তারা সনাতনদাকে দেখলে বোধ হয় লজ্জাই পাবে। দেবেশ দত্তকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে, সনাতনদাকে দাঁড়াতে হবে মেরুদণ্ড খাড়া করে। চরিত্রের জোর থেকে মেরুদণ্ডের জোর বাড়বে। মধ্যবিত্তের সমুদয় শক্তি দিয়ে দেবেশ দত্তকে বসিয়ে দিতে হবে শহীদের সিংহাসনে। ক্ষমতার জোরে আজ যারা মিথ্যে ইতিহাস লিখছে, সনাতনদা যেন তাদের একদিন ক্ষমা করতে পারে, এই ভেবে ভজহরি পা বাড়াল আগের দিকে।

সনাতন দরজা খুলে বাইরে বেরুতেই, ভজহরিকে দেখতে পেল তার ঘরের সামনে।

"হরিভাই, খবর কি? কোথায় যাচ্ছ?"

"কলতলায়। চোখেমুখে একটু জল দেব।"

"যত জলই দাও, চোখের কালি তোমার উঠবে না। ব্যাপার কি, রাত্রে কি ঘুম আসে না?" দরজায় তালা লাগিয়ে সনাতন নেমে এল রাস্তায়।

"ঘুমের একটু ব্যাঘাত হচ্ছে সনাতনদা।"

"হবেই। সারারাত ধরে গান করলে অন্য পাঁচজনেরও ঘুমের ব্যাঘাত হয়। এখানে যারা আসে, তারা ঘুমতে আসে, গান করতে আসে না হরিভাই। শুনলুম, কাজকর্ম একরকম ছেড়েই দিয়েছ?"

"চাহিদা আমার কম তাই—"

"দুপুরবেলা কি ঘরেই থাকো না কি?" সনাতনের স্বরে সন্দেহের ঝড় উঠল।

"রোজ থাকি না, মাঝে মাঝে থাকি বৈ কি।"

কারখানার টাইম হয়ে গেছে বলে সনাতন আর পাঁচ রাস্তা ঘুরে মনস্তত্ত্বের গন্তব্যে পৌছবার চেষ্টা করল না। সোজাসুজি বলল, "কলতলায় যখন যাচ্ছ সরোজিনীর সঙ্গে দেখা হবে। কাল ওর জন্যে দু-খানা শাড়ী আর একটা সোনার হার কিনে এনেছি। দেখো তো, কেমন হয়েছে। তোমার পছন্দটাও আমি জানতে চাই।—বিয়েটা তো খুব শীগগিবই হবে।"

"খুব ভাল। অপেক্ষা করে লাভ নেই সনাতনদা। এখন হেড-কারিগর, পরে হয় তো আরও বড় চাকরি হবে। তখন কাজের ব্যস্ততায় বিয়ে যাবে পিছিয়ে।"

সনাতন খুশী হল খুব। ভজহরির ঘাড়ে হাত রেখে সে বলল, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক হরিভাই। কাল আমায় মালিক ডেকে নিয়ে গিয়ে কি বলেছেন, জানো?"

"না।" জবাব দিল ভজহরি।

"বললেন যে, মিল থেকে দু-জন ওস্তাদ কারিগর তিনি জাপানে পাঠাবেন। একজন তাঁত-বিভাগ থেকে, অন্যজন সুতো বিভাগ থেকে। মালিকের ইচ্ছে, রেশমের সঙ্গে সুতো মিশিয়ে নতুন ধরনের কাপড় তৈরি করা। খরচ দেবেন মালিক। ইচ্ছে করলে, আমি যেতে পারি।"

"এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের কথা আমি তো কিছু ভাবতেই পারি না সনাতনদা। বিয়েটা তুমি তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলো।"

আশপাশের কারখানাগুলোতে হুইসেল্ বাজতে লাগল। সনাতন ব্যস্ত হয়ে বলল, "এই রে দেরি হয়ে গেল! ওবেলায় কথা হবে হরিভাই। জাপান যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু এখনো গোপন আছে। মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই, কে কখন সব পেছু থেকে ভেস্তে দেয় তার ঠিক নেই।"

"তবুও মানুষকে বিশ্বাস করতেই হয় সনাতনদা। তোমার মালিকের মত মানুষকে বিশ্বাস না করলে তুমি কোনদিনও উন্নতি করতে পারতে না।"

"তা ঠিক, তা ঠিক।—ও কে? সরোজিনী না? ওকে কিছু এখনো বলা হয় নি। এবার আমি চললুম।" সনাতন ডাউনের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল। সরোজিনীর চেয়ে মিল-মালিকের টান আজ অনেক বেশি।

কলতলায় যাওয়ার আর ইচ্ছে ছিল না ভজহরির। আর বেশি দেরি করলে ডাউন মেল ট্রেনগুলো ধরতে পারবে না সে। এই ভেবে ভজহরিও ঘুরে দাঁড়াল ডাউনের দিকে। পেছন থেকে ডাকল সরোজিনী, "হরিদা।"

"কে? ও, সরোজিনী।" ভজহরি যেন সরোজিনীকে এই মাত্র দেখল! এগিয়ে গেল সরোজিনীর কাছে। সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "কাজে যাও নি হরিদা?"

"এই তো যাচ্ছিলুম।" বলে ভজহরি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এতদিন দেখা হয় নি, তবু যেন কারো কোন বলবার মত কথা ছিল না। কিংবা এত বেশি কথা ছিল যে, কেউ কোন কথা বলতে সাহস করছে না। মুখের ওপর থেকে কথা সব ওদের তলিয়ে গেছে মনের তলায়। এত তলায় যে, দুটি নিঃসঙ্গ আত্মা মিলনের পথ খুঁজে মরছে বস্তির সরু রাস্তায়।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "কাল রাতে তোমার কিছুই খাওয়া হয় নি, না?"

"গান করতে বসেছিলাম, রাত হয়ে গেল। অত রাত্রে হোটেলে কিছু ভাল জিনিস পাওয়া যায় না।"

"উনোন আমার ধরে উঠেছে, একটু চা খেয়ে যাও হরিদা। আটা মেখে রেখেছি। দু-খানা রুটি সেঁকতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগবে না। ও কি, চলে যাচ্ছ হরিদা?"

"রোজগার করতে হবে তো। মেল ট্রেনগুলো চলে গেলে, সন্ধ্যে পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকতে হবে। রাত্রিতে আমার মোট বইতে ভাল লাগে না।"

"আজ রাত্রে তুমি বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবে না?"

আলোচনাটা বদলে ফেলল সরোজিনী। হয়তো এই আলোচনাটাই করবার জন্যে সরোজিনী ভজহরির সঙ্গে কথা কইতে এসেছে। বিছানায় শুয়ে মাধব কাল রাত্রিতে বড়সাহেবের মনের কথা সব সরোজিনীকে খুলে বলেছে। ভজহরির সঙ্গে সরোজিনীর বিয়ে দেবার জন্যে বড়সাহেব না কি বহু টাকা খরচ করবেন। যাদবপুরে জমি কেনা হয়ে গেছে ইত্যাদি অনেক কথাই মাধব সরোজিনীকে বলেছে। সরোজিনী কোন কথারই জবাব দেয় নি। মতামত প্রকাশ করে নি কিছুই। মাধব এমনও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, ভালবাসার মত পবিত্র জিনিস সংসারে আর কিছুই নেই। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ইত্যাদি না পেলেও চলে। কিন্তু ভালবাসা না পেলে চলা অসম্ভব। রাস্তার ভিখারীকেও ভালবাসলে, তাকেই বিয়ে করা উচিত। সরোজিনী তবু মাধবের আলোচনায় যোগ দেয় নি। কি হবে যোগ দিয়ে? সনাতনদার কোন অপরাধ নেই। তাকে বাবাই তো বিয়ের জন্যে খোসামোদ করেছে গত দু-বছর থেকে। বিয়ে করবার জন্যে সনাতনদা ওভারটাইম খাটছে। আট ঘণ্টার ওপরে যে-মানুষটা ওভারটাইম খাটতে পারে তার জন্যে বাবার আজ বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। অতবড় অবিচার সরোজিনী কি করে ঘটতে দেবে? এর চেয়ে বড় পাপ বড়লোকরাও করতে পারত না। ধর্ম তো আকাশ থেকে আসে না, আসে জীবন থেকে। ওভারটাইম-খাটা মানুষটাকে ভেঙ্গে দিলে ভগবান কখনো ক্ষমা করবেন না।

ভজহরি বলল, "সন্ধ্যের সময় যাবো বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে—আচ্ছা, এবার আমি চলি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।" ভজহরি সত্যি সত্যি এবার চলতে

লাগল। সরোজিনী একটু ইতস্তত করে এগিয়ে এল ভজহরির পেছু পেছু। এসে বলল, "বড়সাহেবের কথায় তুমি কিছুতেই রাজী হয়ে এসো না।" মুখ না ঘুরিয়েই কথাটা শুনলো ভজহরি। কান দিয়ে সে শুনলো, সরোজিনী দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল চোদ্দ নম্বরের দিকে।

আক্ষেপ করবার কিছুই নেই। যা স্বাভাবিক তাই ঘটে। ঘটা উচিত. ভাবল ভজহরি। সরোজিনীকে বিয়ে করবার জন্যে সনাতনদা তপস্যা করছে। বড় হবার চেষ্টা করছে দিনরাত। টাকা খরচ করে শাড়ী কিনেছে, গহনা কিনেছে সনাতনদা। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি তার। আবদ্ধ ঘরে তাকে আট ঘণ্টা কাজ করতে হয়। তার ওপরে আবার ওভারটাইমের ধাক্কা! সরোজিনীর জন্যেই তো তার এত কষ্ট। ঘর-সংসারে এসে সরোজিনী যেন অভাবের তাড়নায় কষ্ট না পায়, সেই জন্যে সনাতনদা বিশ্রামের আরামটুকুও পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে সনাতনদার, ভজহরির নয়। দেবেশ দত্তর চোখের নিচে যদি এর শতাংশের এক অংশ কালিও পড়ত, তা হলে বৌরানীর জীবনটা এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যেত না। দেবেশ দত্তর অভাবটা যেন সনাতনদা আজ ঘুচিয়ে দিতে চাইছে ওভারটাইমের তপস্যা দিয়ে।

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই ভজহরির হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। কথাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। সনাতনদার ওভারটাইমের তপস্যার মধ্যে খানিকটা রহস্য আছে বলে মনে হল ভজহরির। সবটুকু এর সত্য নয়। সনাতনদা ওভারটাইম খাটছে তার নিজের উন্নতির জন্যে। বড় হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার খুবই প্রবল। বড়লোকদের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে নিজেই বড়লোক হতে চায়। মিল-মালিককে খুশী করবার জন্যে সে ওভারটাইম খাটে। হাতের কৃতিত্ব তার দিন দিনই বাড়ছে। না বাড়লে, মিল-মালিক তাকে জাপানে পাঠাতে চাইতেন না। আজ তার চোখেমুখে যে-অজানা জগৎটা ভেসে উঠতে ভজহরি দেখেছে, তাতে সরোজিনীকে সে দেখতে পায় নি।

"ভজুয়া! মেরে ভজুয়া!!" সর্দার চন্দ্রনাথ দুবে জড়িয়ে ধরল ভজহরিকে।

"তুমি দেশে যাও নি সর্দার?" সর্দারের বুকের ওপর মুখ রেখে ভজহরি প্রশ্ন করল। বুকের তলায় ধুক ধুক শব্দ হচ্ছে সর্দারের, শুনতে পেল ভজহরি। শুনতে পেল সর্দারের হাতে-বাঁধা ঘড়িটায় টিক টিক আওয়াজও। এই ঘড়িটাই সর্দারকে দিয়ে একদিন সে কুলীর কাজে ভর্তি হতে পেরেছিল। কর্তা-বাবুর ঘড়ি এটা। ভজহরিকে তিনি দিয়েছিলেন অনেক বছর আগে। দামী ঘড়ি। কিন্তু ভজহরি ধরে রাখতে পারে নি কর্তাবাবুর ঘড়ি।

"সর্দার, দেশ থেকে তুমি কবে ফিরলে?" দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল ভজহরি।

"হাম মোগলসরাই স্টীশন সে লোট্‌কে চলা আয়া। ভজুয়া, হাওড়া স্টীশন মে মেরা দিল, মেরা জান্ সব কুছ লাগা হুযা হ্যায়, হাম কেইসে ঘর জাযেগা?"

সব কটা মেল ট্রেনই এসে পৌঁছে গেছে। ব্যাণ্ডেল প্যাসেঞ্জার আসবার সময় হয়েছে। অফিসের বাবু ছাড়াও, দু-চারজন প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায় এই ট্রেনখানাতে। ভজহরি মাথায় গামছা বাঁধতে লাগল। হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে সর্দার বলল, "ব্যাণ্ডেলকা ফালতো গাড়ি যানে দে ভজুয়া। রাত মে বহুৎ প্যাসেঞ্জার মিলে গা।"

"রাত্রে আমার কাজ আছে সর্দার। একবার বালিগঞ্জে যেতে হবে।"

"বালিগঞ্জ?" চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সর্দার। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, "উধারমে তোমারা কেয়া কাম হ্যায়? বাতাও।"

ভজহরি জবাব দিচ্ছে না দেখে সর্দার ওকে এক রকম টানতে টানতেই নিয়ে চলল প্ল্যাটফর্মের বাইরে। গয়া জেলার খোদা বক্স এবং বিহারের অন্যান্য জেলার কুলীরা দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

সর্দার চন্দ্রনাথ দুবে ভজহরিকে নিয়ে চলে এল স্টেশনের বাইরে, চা-এর দোকানে। কাল রাত্রে ভজহরির খাওয়া হয় নি। রুটি আর তরকারির অর্ডার দিয়ে সর্দার খৈনী টিপতে টিপতে বলল, "তুম্‌কো হাম ইধারসে নেহি যানে দেগা ভজুয়া।"

"কেন? আমার কসুর হয়েছে নাকি?" জিজ্ঞাসা করল ভজহরি।

"জরুর হুয়া। সরজিনী রোতি কেঁও? তুম বালিগঞ্জ যানে সে, সরজিনী রোতি হ্যায়। ভজুয়া, হাম তুঁমকো শাদি দেগা। সরজিনী কো বাপ্ সে ভেট করনে কো লিয়ে হাম যায়েগা কাল সুবামে।"

ভজহরি নিঃশব্দে রুটি চিবতে লাগল। সর্দারের কথার কোন জবাব দিল না।

মিনতির সঙ্গে দেখা করে ভজহরি যখন বিপিন পাল রোডে গিয়ে পৌছল, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাড়িটা খুঁজে বার করতে কষ্ট হয় নি ওর। বড়সাহেব ফটকের সামনেই পায়চারি করছিলেন। মনে হলো, তিনি যেন ভজহরির জন্যে অপেক্ষা করছেন। গায়ে পড়ে বড়সাহেব কেন যে ওর উপকার করবার জন্যে ছটফট করছেন, ভজহরি তার অর্থ বুঝতে পারল না। তাঁর উচিত ছিল মিনতি এবং বিশুকে বাসনমাজার এবং আগুনের কষ্ট থেকে উদ্ধার করা। ঢাকায় ওরা লেখাপড়া শিখছিল, বড়সাহেব পারতেন ওদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে। ওরা খুবই সম্মানীলোকের সন্তান, ভদ্রলোক। অজয়বাবুই বা কেমন মানুষ? তিনি যখন ওদের উপকার করছেন বলে সারা কলকাতায় ঢাকঢোল পিটিয়েছেন তখন তাঁর কি উচিত ছিল না বিশুকে অন্তত ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া? অল্পশিক্ষার চেয়ে একেবারে কিছু না শেখাই ভাল। সমাজের বেশি সংখ্যক মানুষই যদি অল্পশিক্ষিত হয়, তা হলে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় পাবার কারণ আছে। বিশুরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। এইমাত্র সে মিনতির কাছে শুনে এসেছে, বিশুর গায়ের চামড়া এরই মধ্যে গণ্ডারের মত খসখসে হয়ে উঠেছে। চিমটি কাটলে বিশু আর ব্যথা পায় না। আর ক-বছর পরে, বন্দুকের গুলিও হয়তো বিশুর চামড়ায় কোন দাগ কাটতে পারবে না।

ফটকের কাছে এসে দাঁড়াতেই বড়সাহেব ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে? কে?"

"আমি। আমি ভজহরি।"

"ও, তুমি!" বড়সাহেব বোধ হয় আর কাউকে দেখবেন বলে আশা করেছিলেন। "চলো ওপরে গিয়ে বসি। পন্টুর সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না।—আরে, মাধব যে। অফিস ছুটি হয়েছে পাঁচটায়, বাড়ি যাস নি? মেয়েটাকে একা ফেলে এ-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছিস কেন? চল্, ওপরে গিয়ে বসি।"

বড়সাহেবের কথাগুলো মাধবের কানে খুবই অদ্ভুত ঠেকল। তাকে বাদ দিয়ে বড়সাহেব ভজহরির সঙ্গে সরোজিনীর বিয়ে ঠিক করবেন কি করে? মাধবের অনুমতি না পেলে তো কোন কথাই তিনি পাকা করতে পারবেন না। অফিসের কাজে মাধবের অনুমতি লাগে না। কিন্তু মেয়ের বিয়েতে তার অনুমোদন চাই সবাগ্রে।

দো-তলার বারান্দায় বসে বড়সাহেব চোখ রাখলেন রাস্তার দিকে। পন্টু দত্তর সঙ্গে আজ তিনি একটা বোঝাপড়া করবেন বলে সকাল থেকেই মনস্থির করে রেখেছিলেন। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন—মেয়ের কপাল যদি ভেঙ্গে বাহান্ন টুকরো হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তিপ্পান্ন টুকরোটায় এমন আর কি ক্ষতি হবে?

"মাধব—" ডাকলেন বড়সাহেব।

"স্যার—" অফিসিয়াল সুর তুলল মাধব পিওন।

"ভজহরির জন্যে একটা ভাল চাকরি আমি ঠিক করেছি। মাস খানেক অপেক্ষা করতে হবে।"

"তা হোক স্যার। ভাল চাকরির জন্যে মানুষ তো সারা জীবন ধরেও অপেক্ষা করে থাকে।"

ভজহরি মুখ ঘুরিয়ে মাধবকে একবার দেখে নিল। কিন্তু একটা কথাও সে বলল না।

চাকরির জন্যে ভজহরিকে অপেক্ষা করিয়ে রেখে বড়সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "রাস্তায় ওটা কার গাড়ি? ও, না—এটা নয়। এটাতো অস্টিন টেন! মাধব—"

"স্যার—"

"ভজহরির বিয়ে আমি দেবই'। কিন্তু দু-জনের মত না পেলে বিয়ে আমি পাকা করব না।···খুব ঠকেছি।"

"সেই ভাল স্যার।"

"এঁ্যা? কি বললি?"

"দু-জনের মত না পেলে বিয়ে পাকা করা উচিত হবে না।"

"হঁ্যা। ভজহরির কি মত নেই?"

ভজহরি জবাব দিল না। সরোজিনী ওকে সাবধান করে দিয়েছে যে, বড সাহেবের কথা যেন সে স্বীকার না করে। এখন ভজহরি বুঝতে পারছে যে, সরোজিনী সত্যি সত্যিই সনাতনকে বিয়ে করতে চায়। নইলে বড়সাহেবের প্রস্তাব সে স্বীকার করেই ফেলতো। লোভ হতে লাগল ভজহরির। এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব জীবনে সে আর কোনদিনও শোনে নি!

মাধব ভজহরির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সরোজিনীকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি নেই তো?"

বড়সাহেব সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বলে কি লোকটা? ভজহরি ভালবাসে মিনতিকে। আবার একটা গোলমালের স্থষ্টি করছে না কি মাধব? বড়সাহেব বললেন, "না, না—এর মধ্যে তুই সরোজিনীকে টানিস না মাধব। সরোজিনীর বিয়ে তুই অন্য কারুর সঙ্গে ঠিক কর। আমি তো তোকে তিন-শ টাকা দেব বলে আগেই কথা দিয়েছি।"

"মনে আছে স্যার মনে আছে।" মাধবের পায়ের তলায় ভূমিকম্প হচ্ছে!

"ভজহরি ভালবাসে মিনতিকে। এক দেশের লোক ওরা। ভারি স্থন্দর মেয়েটি। তুই তাকে দেখিস নি মাধব······এমন মেয়েকে দিয়ে ঐ নাগবাবু বাসন মাজায়! মিনতিকে আমি দু-তিন দিনের মধ্যে এখানে নিয়ে আসব। বিয়ে এখানেই হবে। নাগবাবুর হাত থেকে মিনতিকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম নেই।—ঐ, দেখ্‌তো ওটা কার গাড়ি? না, পণ্টুর গাড়িটাতো প্যাকার্ড!" বড়সাহেব পুনরায় আরাম-কেদারায় এলিয়ে পড়লেন।

মাধব তাঁর সামনে বসে আর এলিয়ে পড়তে চাইছে না, এখন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। বাঁচে ভজহরিও। সরোজিনীর মনটাকে সে এবার ভাল করে বুঝতে পেরেছে। রাজকুমারী এবং তার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব যৌতুক পেলেও, সরোজিনীর কাছে তার কোন দাম নেই। যাদবপুরের সম্পত্তি সে মাধবদাকে দান করে দিতে পারে অনায়াসে। কিন্তু মিনতির কি উপায় হবে? সব কিছু ঠিক করার পর, ভজহরি কি করেই বা তাব অসম্মতি জানাবে? এত দুঃখ পাওয়ার পরে, মিনতিকে আঘাত দেওয়া উচিত হবে কি? যে-শহরটায় সে একজন আত্মীয়ের সন্ধান করে উঠতে পারে নি, সেখানে মিনতির ভবিষ্যৎ বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠতে ক-দিন সময় লাগবে? সবোজিনীর মাথার ওপরে মাধবদা আছেন। আছে সনাতনও। ডব সন রোডের গোটা সমাজটাই আছে সরোজিনীকে রক্ষা করবার জন্যে। ঠেলাওয়ালা চটু পযন্ত পারে সরোজিনীর জন্যে জীবন দিতে। কিন্তু মিনতির মাথার ওপবে কি আছে? কিছু না। সাদা আকাশটাও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে মিনতির সঙ্গে। তবে? তবে কেন সে বড়সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করবে না?

একটু আগেই বড়সাহেব অবিশ্যি বললেন যে, নাগবাবুর কাছ থেকে মিনতিকে তিনি উদ্ধার কবে নিযে আসবেন। কিন্তু বড়সাহেব কি কথাটা ভুল বললেন না? নাগবাবুদের হাতে আজ আর বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। 'রায়' দেবার ক্ষমতা তাঁদের হাত থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই। এখন ক্ষমতা নিয়ে খেলা করছেন তো বড়সাহেবরা। অজয়বাবু কি? এঁরাই তো সব ক্ষমতাশালী লোক। নাগবাবু মিনতির কতটুকু ক্ষতি করতে পারবেন? বাসনমাজার কাজে সত্যিকারের ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। হাতে ময়লা লাগে বটে, কিন্তু জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে তা উঠে যায় অতি সহজেই। গোটা বড়বাজার, ক্লাইভ স্ট্রীট আর লালদিঘীর অফিসগুলোতে নতুন করে জমে উঠছে ক্ষমতার শঙ্খবিষ। মিনতির ভয় তো সেখানেই। কেবল মিনতির নয়, দেশের ভবিষ্যৎটাই আজ যেন বাত্যা-বিক্ষুব্ধ ধলেশ্বরী নদীতে পাড়ি জমিয়েছে। কোটি কোটি বিশু সমুদ্রের মোহনা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে ছুটে

আসছে ঘূর্ণি-হাওয়ার টানে। ধলেশ্বরীর বোবা ঢেউ-এর মত ওরা সব ভেসে বেড়াচ্ছে সারা দেশের বুকে। সাবধান হওয়ার দরকার আছে বড়সাহেবদের। নাগবাবুদের কলতলায় মিনতির কোন ভয় নেই।

মাধব উঠল। হঠাৎ যেন বড়সাহেব ফিরে এলেন তাঁরই ফটকের সামনে থেকে। পল্টুদার গাড়িটা যেন সরে পড়তে না পারে, সেইজন্যে তিনি মনে মনে পাহারা দিচ্ছেন বিপিন পাল রোডে!

"আচ্ছা···হ্যাঁ, আজকেই আমি তোমাকে কথা দিয়ে যেতে বলছি না ভজহরি। একটা দিন ভেবে দেখো। তোমাদের কাউকে আমি ভুল করতে দেব না। মিনতিও ভাবছে। বিয়েতে যেন ওর খুব একটা উৎসাহ নেই? যাদবপুরের বাড়িটার প্রতি বিশেষ একটা লোভ আছে বলেও মনে হল না।"

"ফরাসগঞ্জে মস্তবড় বাড়ি ছিল ওদের।" বলল ভজহরি।

"আর কি ছিল?" জিজ্ঞাসা করলেন বড়সাহেব।

"একটা ইতিহাস।" জবাব দিল ভজহরি।

"ইতিহাস?" উঠে বসলেন বড়সাহেব।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় ইতিহাস।"

"কি রকম?"

"মিনতির বড় মামা দেবেশ দত্ত ছিলেন অগ্নিযুগের শহীদ।"

"বলো কি? ঐ কিরীট নাগই তো তার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিরীটবাবুর ঠাকুরদাদা ধনপতি নাগ বল্লম ছুঁড়ে ছিলেন রঘু দত্তের বুকে।"

"জানি, জানি—বিক্রমপুরের বড় ডাকাত ছিল রঘু দত্ত।"

"নাগবাবুরা তাঁকে ডাকাত বলতেন বটে, আসলে তিনি ছিলেন ধনপতি নাগের চেয়েও বড় জমিদার। ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার সংঘর্ষ না হলে কে বড় আর কে ছোট তা প্রমাণিত হয় না। দুটো পরিবারের সংঘর্ষ আজো যেন শেষ হয় নি। কে জানে, বিশুর হাতেই হয়তো শেষ প্রতিশোধের অস্ত্র আজ তৈরি হচ্ছে। মাধবদা চলে যাচ্ছেন না কি?"

ঘাড় ফিরিয়ে বড়সাহেব ডাকলেন, "মাধব, তোর কি হল ? ভজহরির কাছ থেকে দেশের খবর শুনছি। প্রায় ত্রিশ বছর হল দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।"

বড়সাহেবের ডাক শুনে মাধব দাঁড়িয়ে পড়ল। আলোচনা সব শেষ করবার জন্যেই ভজহরি বলল, "আমার বিয়েতে মিনতির উৎসাহ না থাকাই উচিত। ফরাসগঞ্জের বাড়িটার জন্যে নয়, বংশমর্যাদার জন্যেও মিনতির পক্ষে হাওড়া স্টেশনের একজন কুলীকে বিয়ে করা খুবই মন্দ ভাগ্যের কথা।"

"ঠিক, ঠিক, আমি ভাবছি, পন্টুর সঙ্গে বিয়ে দিলে কেমন হয় ?" জিজ্ঞাসা করলেন বড়সাহেব।

ভজহরির হয়ে মাধব এবার জবাব দিল, "খুবই ভাল হয় স্যার। রাত হয়ে যাচ্ছে, আমরা এবার যাই।"

"কাল একবার আসিস্ মাধব, অনেক কথা আছে।"

"আচ্ছা স্যার।"

ভজহরি বড়সাহেবের পায়ের ধুলো নিয়ে মাধবের সঙ্গে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। একই বাসে উঠল ওরা। বসল পাশাপাশি। কেউ কোন কথা বলল না। বলবার হয়তো অনেক কথাই ছিল মাধবের। ভজহরির চরিত্র ওকে একরকম অভিভূত করে ফেলেছে। রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব সে হেলা করে ফেলে দিতে পেরেছে বলে মাধবের বিশ্বাস জন্মালো। ভজহরি ভাবছিল, সরোজিনীর অনুরোধ সে রাখতে পেরেছে। অন্তত আজকের মত সে রাখতে পেরেছে। কাল কি হবে ভজহরি তা জানে না।

বাস থেকে নেমে ওরা হাঁটতে হাঁটতে বস্তির দিকে এগোতে লাগল। চলে এল পাঁচ-নম্বরের সামনে। মাধব দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। জিজ্ঞাসা করল, "এত বড় বংশের ছেলে সনাতন, সে কেন মাধব পিওনের মেয়েকে বিয়ে করবে ?"

জবাব দেবার সময় পেল না ভজহরি। ছ-নম্বর থেকে সনাতন বেশ জোরে জোরেই বলল, "হরিভাই, এদিকে একবার এসো। লেখাপড়া আমার বৃথা হয়

নি। মিল-মালিকের ওপরেও একজন বড় মালিক আছেন। নইলে, জাহাজে চাপিয়ে কেউ আমায় নিয়ে যেতে পারত না জাপানের বন্দরে।”

মাধব চলে গেল চোদ্দ নম্বরের দিকে। গেল খুব দ্রুত পায়ে হেঁটে। মেয়েটা ভাত নিয়ে বসে আছে। মস্তবড় অশান্তি বুকে চেপে মেয়েটা সংসারের সব কাজই করে যাচ্ছে। এতবড় অশান্তি নিয়ে সে নিজে পারত না লাল-দিঘীতে ডিউটি দিতে।

দাওয়ার ওপর বসে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিল সরোজিনী। হারিকেন লণ্ঠনটা নিবু নিবু করছে। তেল বেশি পুড়বে বলেই সরোজিনী আলোটা কমিয়ে রেখেছিল। তা ছাড়া, অন্ধকার হলে, ভাবতে ভাল লাগে সরোজিনীর। হরিদা যদি সত্যি সত্যি বড়সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ না করে তা হলে সনাতনের সঙ্গে বিয়ে ওব একরকম পাকাই হয়ে যাবে। বিয়েটা ভেঙ্গে দেবার আর কোন পথই থাকবে না। কি দরকার ছিল ওর গায়ে পড়ে হরিদাকে অনুরোধ করবার? হরিদা যা ভাল বুঝত, তাই সে করত। সনাতনদারও অনুযোগ করবার কথা থাকত না। বাবা বড়সাহেবের কাছে চাকরি করেন। অতএব, বড়সাহেবের হুকুম মতই তিনি ভজহরির সঙ্গে সরোজিনীর বিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। বড়সাহেব যেন সত্যি সত্যি হুকুম দেন, তেমন একটা নীরব-প্রার্থনা সরোজিনী জানিয়েছে মা সরস্বতীর কাছে। জানাচ্ছে প্রতি পলে পলে।

বিপরীত মনের অবস্থা নিয়ে মাধব এসে দাঁড়াল চোদ্দ নম্বরের সামনে। বাপ হওয়ার ঝকমারি বড় কম নয়! মেয়ের মন বুঝে বিয়ে দিতে গেলে, সংসারে বোধ হয় কারুর আর বিয়ে দেওয়া যেত না।

“বাবা!” মাধবের মুখ দেখবার জন্যেই সম্ভবত সরোজিনী লণ্ঠনের পলতেটা দিল বাড়িয়ে, “বাবা, কখন এলে?”

“এক্ষুনি।···তোকে সব ভুল খবর দিয়েছিলুম রে। বড়সাহেব ভজহরির বিয়ে দিচ্ছেন সেই যতীন দাস রোডের মেয়েটির সঙ্গে।···হাজার হলেও ভজহরি ভদ্রলোক।”

"কবে বিয়ে হচ্ছে বাবা? পাঁচ-নম্বরে তবে থাকবে কে? ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে বলে এসো ওখানে আমরা কোন ভদ্রলোককে থাকতে দেব না। মিটিং করব।"

"কাকে নিয়ে মিটিং করবি?"

"সনাতনদাকে বল্লেই হবে বাবা।"

"সেও তো জাপান না কোথায় যেন যাচ্ছে। সরোজিনী, ডবসন্ রোডের বস্তিতে ভদ্রলোকরা আসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। সুযোগ এলে, নিজেরাই সরে যায়। মিটিং করে কোন লাভ হয় না মা। মিটিং করে আমরা কি ভজহরির মত বদলাতে পারি?"

"হরিদা বুঝি মত দিয়ে এসেছে?"

"আজ দেয় নি……কাল দেবে।"

নিঃশব্দে সরোজিনী এবার ঠাণ্ডা ভাত গরম করবার জন্যে হাঁড়িটা চাপিয়ে দিল উনোনের ওপর। গুঁড়ো কয়লা দিয়ে উনোনটাকে সে জ্বালিয়ে রেখেছিল। আগুনটাকে নিবতে দেয় নি। সনাতন ওভারটাইম করে এলেও, সরোজিনী তাকে কোন দিনও ঠাণ্ডা ভাত খাওয়ায় নি। সরোজিনীর মনের উত্তাপ গুঁড়ো কয়লার আগুনের চেয়ে বড় কম নয়!

ভজহরি সনাতনের দ্বিতীয় আহ্বান শুনলো। গলার সুরে তার আজ এতটুকু কর্কশতা নেই। মিল-মালিকের ওপরে অন্য একজন মালিকেরও সন্ধান সে পেয়েছে। কিন্তু বিশু কিংবা মিনতির সন্ধান সে আজো পায় নি। পাওয়ার চেষ্টাও করেনি তেমন। সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সনাতনদা জীবনের অনেকগুলো বছরই নষ্ট করেছে। তার চেয়ে ভাঙ্গা-সংসারটাকে জোড়া দিয়ে খাড়া করে তুলতে পারলে, সত্যিকারের কাজ হতো। এখনও সময় আছে। ইচ্ছে করলে সে বিশুকে রক্ষা করতে পারে, পারে মিনতিকেও। সবাই মিলে সংসারটাকে গড়ে তুলতে পারলেই তো সমাজ ও রাষ্ট্রের বিগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। নিজের পুণ্য দিয়ে অপরের পাপ ক্ষালনের মহত্ব যদি এযুগের মানুষরা অর্জন করতে পারে, তবেই সম্ভবত বৌরানীর তপস্যা সার্থক হবে।

"হরিভাই শীগগির এসো।" সনাতনের কণ্ঠ থেকে তৃতীয় আহ্বান এল। সনাতনের তৃতীয় আহ্বান উপেক্ষা করে ভজহরি শোনবার চেষ্টা করতে লাগল বিশুর সেই চিৎকারটা, "হরিদা, দিদি নেই!"

"নেই? চলো, আমি যাচ্ছি তাকে খুঁজে আনবার জন্যে।"

"একলা যাবে হরিদা?"

"একলাই।"

সনাতনের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ভজহরি একলাই চলে এল ঢাকায়, রাজনীতির বিষাক্ত তরোয়ালগুলোকে উপেক্ষা করে। বাংলায় নতুন ইতিহাসের নির্ভীক নায়ক সত্যপথ ছাড়া অন্য কোন পথই চেনে না।

অষ্টম খণ্ড

বৌরানী চলে যাওয়ার পরে পৃথিবীতে অনেকগুলো বড় বড় পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে পূর্ববঙ্গেও। ভজহরির চোখের সামনে সব কিছু বদলে গেল। ইংরেজ বিদায় নিয়ে চলে গেল। বিদায়ের দৃশ্যটা দেবেশ দত্ত দেখতে পেল না!

উনিশ-শ পঞ্চাশ সালের গোড়ার দিকে নাগবাবুদের বাড়িটা দখল নেওয়ার জন্যে যতীন সাহা নিজেই এসেছিল। দখল নেওয়ার পরে অবিশ্যি বাড়িটায় সে নিজে এসে বসবাস করতে পারে নি, সরকারি অফিস হবে বলে গভর্ণমেণ্টের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছে। সরকারি অফিস বসবার কয়েকটা দিন আগে কর্তাবাবু চলে গেলেন ঢাকা থেকে। সেদিনের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি ঘটনা ভজহরির পরিষ্কার মনে আছে। ভোলবার মত ঘটনা এগুলো নয়।

সকালবেলা মন্দিরের পুজো শেষ হয়ে গেল। বৃদ্ধ পুরোহিত মন্দির ত্যাগ করে গেছেন ঘণ্টা খানেক আগে। চার চাকার গাড়িতে বসিয়ে রমাকান্ত কর্তাবাবুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল মন্দিরের সামনে। ভজহরি তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

"হরি—" ডাকলেন জগদীশ নাগ।

"কর্তাবাবু।"

"কাছে আয় হরি।···আজ আমি চললুম। কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। যদি কখনো ওদিকে আসতে ইচ্ছে করে, চলে আসিস্ আমার কাছে।" প্রায় পাঁচ মিনিট পর্যন্ত কেউ কোন কথা কইল না। রমাকান্ত কেবল মন্দিরের দরজাটা খুলে দিয়ে এল। জগদীশবাবু চোখ বুঁজে নাগ-বাড়ির

বিগ্রহের সঙ্গে হয়তো কথা কইতে লাগলেন। ধনপতি নাগ বিগ্রহের কাছে সারাটা জীবন কেবল শক্তি চেয়েছিলেন। পেয়েছিলেনও প্রচুর। সাংসারিক ক্ষমতা তিনি এত বেশি পেয়েছিলেন যে, ধনপতি নাগ মাঝে মাঝে ভাবতেন, বিগ্রহের মধ্যে সম্ভবত পাথর ছাড়া আর কিছু রইল না। বিগ্রহের সবটুকু শক্তি তাঁর করায়ত্ত হয়েছে।

ধনপতি নাগের কাছ থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরুষ যা পেয়েছিলেন, তার ওপরে এঁরা আর বিগ্রহের কাছ থেকে কোন কিছুই চান নি। তা ছাড়া, জগদীশবাবু জন্মেছিলেন চাইবার জন্যে নয়, দেওয়ার জন্যে। সমস্তটা জীবনে তিনি কেবল দিলেন, পেলেন না কিছুই। ভজহরি পাশে দাঁড়িয়ে চেয়েছিল মন্দিরের দিকে। কর্তাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন ধ্যান করছিল!

ধ্যান ভাঙ্গবার পরে জগদীশবাবু বললেন, "এখানকার কিছুই আমি সঙ্গে নিলুম না। সব রইল। দুপুরবেলার পরেই এসে যতীন সাহা দখল নেবে। কিন্তু তার আগেই আমি নাগ-বাড়ির সীমানার বাইরে চলে যাব। ভজহরি—"

"কর্তবাবু।"

"কাছে.আয়।"

ভজহরি জগদীশবাবুর পাশে এসে বসে পড়ল। চার চাকার গাড়িতে বসে জগদীশবাবু একটু হেলে অতি কষ্টে ভজহরির ঘাড়ে হাত রাখলেন। তারপর ওর মাথাটা টেনে নিয়ে এলেন নিজের বুক অবধি। বুকের ওপরে টানতে গিয়ে, ভজহরির ঘাড়ের ডান দিকে মস্তবড় একটা ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলেন তিনি। এ চিহ্নটা জগদীশবাবুর নিজেরই কীর্তি।

"হরি, ঠাকুর তো সবাইকে সব কিছু দিলেন। কিন্তু তুই? তুই কি তাঁর কাছে কিছুই চাস্ নি?"

"চাইব কেন কর্তাবাবু? না চাইতেই তো কত পেয়েছি! তোমার মত মানুষের স্পর্শ পেয়েছি, আর কিছু আমি চাইনে।"

"তবু তোকে আমি একটা কিছু দিয়ে যেতে চাই। পাওয়ার গর্ব হয়তো এতে কিছু থাকবে না, কিন্তু রাখবার দায়িত্ব এতে থাকবে।"

"আমায় তুমি সবচেয়ে বড় দায়িত্বটাই দিয়ে যাও কর্তাবাবু।"

জগদীশবাবু চুপ করে রইলেন। জীবন ও জগতের সবচেয়ে বড় দায়িত্বটাকে বোধ হয় তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তির গভীরতম স্তর থেকে তুলে নিয়ে আসছেন। কি পেয়েছেন সেইটেই বড় কথা, কি পান নি তাই নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ কি? বারোটার পরেই যতীন সাহা দখল নিতে আসবে। তার আগেই তিনি সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে এখান থেকে সবে পড়তে চান। সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁকে যখন সরিয়ে দিয়েছে, তখন আর পশ্চাৎ-বন্ধনের মধ্যে পড়ে থাকা কেন? একটা মুহূর্ত বেশি পড়ে থাকলেই, একটা মুহূর্ত বেশি নষ্ট হবে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলে তাঁর মুহূর্তটার কি দাম নেই?

"হরি, নাগ-বাড়ির বিগ্রহ রাখবার দায়িত্ব তোর ওপরেই আমি চাপিয়ে দিয়ে গেলাম।"

"কর্তাবাবু!" জগদীশবাবুর আলিঙ্গন থেকে ভজহরি মুক্ত হতে চাইল না। মাথা নিচু করে ভজহরি তার চোখ দুটো চেপে রাখল জগদীশবাবুর বুকের ওপর।

"ভজহরি, আমি শুনতে পেয়েছি যে, পৃথিবীটা না কি অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। আমি বেশি লেখাপড়া শিখি নি বলে কতদূর এগিয়েছে তা আমি দেখতে পাই নি। কিন্তু এইমাত্র আমি বিগ্রহের সামনে চোখ বুঁজে দেখলুম যে, পৃথিবীটা সত্য থেকে সরে গেছে অনেক দূরে। বৌরানী তোর কানে কি মন্ত্র দিয়ে গেছেন, আমি তা জানি না। মন্ত্র দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। তোকে কেবল অনুরোধ করে যাচ্ছি, সত্যকে ধরে রাখবার জন্যে। সত্যকে লাথি মেরে সভ্যতা এক পাও এগুতে পারে নি। কই রে রমাকান্ত, চল্—ছেলেগুলোকে একবার দেখে আসি।"

বুড়ী গঙ্গার দিকে মুখ করে বুড়ো রমাকান্ত চোখের জল গোপন করবার চেষ্টা করছিল। চেষ্টা করছিলেন জগদীশবাবু নিজেও। চোখের জল ফেলবার এই তো সময়! ভেতরের ময়লা চোখের জল দিয়ে সাফ করে ফেলতে না পারলে, কলকাতার গঙ্গায় চান করলে পুণ্য আসবে কেন? শতাব্দীর

সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস বুকের তলায় চেপে রাখলে নাগ-বাড়ির একখানা ইটও তিনি ধরে রাখতে পারবেন না ; চার চাকার গাড়িতে বসে মানুষ ইটের ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারেও না—ইটের বদলে ভজহরির মাথাটা আজ তাই জগদীশবাবুর কাছে এক নতুন ঐশ্বর্যের সন্ধান এনেছে। মস্তবড় দায়িত্ব তিনি ওর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। পশ্চাৎকে নতুন করে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে, বাংলার ভবিষ্যৎ 'হিরো' নিজেকেও বাঁচাতে পারবে না। জগদীশবাবুর চোখ থেকে টস টস করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগল ভজহরির মাথায়। প্রাচীন সভ্যতার সর্বশেষ চিহ্নটুকু ভজহরি বাঁচিয়ে রাখুক তার বিনয়াবনত শিরে। বিগ্রহের সত্য থেকে ভজহরি যেন কোনদিনও স্খলিত হয়ে না পড়ে, মন্দিরের সামনে এইটেই তাঁর শেষ প্রার্থনা রইল।

"কই রে রমাকান্ত—"

রমাকান্ত চার চাকার গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল কর্তাবাবুর মানুষ-বাগানের দিকে। ফুলের বাগান পদদলিত। মালীরা কেউ নেই।

মানুষ-বাগানের সবচেয়ে ছোট ফুল নিতাই আর সবচেয়ে ছোট নয়। লেখাপড়া সে শেষ করতে পারল না। এবার সে রিফিউজী হবার জন্যে বিছানাপত্র বেঁধে তৈরি হয়ে আছে। নাগ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে বেলা বারোটার আগে। আরও তিন চারটি ছেলে এখানে ছিল। তারাও তাদের বিছানাপত্র বেঁধে ফেলেছে। কর্তাবাবুকে দেখে ওরা সবাই এগিয়ে এল। এক এক করে প্রত্যেকেই পায়ের ধুলো নিল কর্তাবাবুর।

"কোথায় সব তোমরা যাবে ঠিক করেছ?" জিজ্ঞাসা করলেন কর্তাবাবু। নিতাই বলল, "কলকাতায়।"

"কলকাতায় কেন রে নিতাই?"

"রিফিউজী হতে।"

"রিফিউজী হওয়া তো সুখের জীবন নয় নিতাই?"

"সুখ কে চায় কর্তাবাবু?"

"তবে? সুখের জন্যেই তো বাঁচা?"

"বাঁচাব জন্যেই সুখ কর্তাবাবু। আগে বাঁচি, তারপরে সুখের কথা ভাবব।" নিতাই আলোচনার ওপর উপসংহার টানল। ভজহরির মনে হল, নিতাই যেন পুরনো রঙ্গমঞ্চের ওপর সহসা ড্রপ-সিনটা ফেলে দিল কেবল কলকাতায় গিয়ে নতুন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবার জন্যে। সমাজ ও রাষ্ট্রের রঙ্গমঞ্চে নিতাইরা যে কি অভিনয় দেখাবে তার একটা ছায়াছবিও যেন ভেসে উঠল ভজহরির চোখের সামনে।

অন্যান্য ছেলেদের দিকে চেয়ে জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "নিতাই তো রিফিউজী হবার জন্যে বিছানা বেঁধেছে। তোমরা? তোমরা কি করবে?"

"আমরা এক্ষুনি কিছু করতে পারছি না। আমাদের মা বোনেরা রয়েছেন পাড়াগাঁয়ে। তাদের ব্যবস্থা না করে আমরা হঠাৎ কি করে কলকাতায় যাই?"

"না, হঠাৎ কি করে যাবে। মধ্যবিত্ত সমাজের ছিটেফোঁটা তবু মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল এখানে। রমাকান্ত—"

"কর্তাবাবু।" রমাকান্ত গাড়িটাকে উল্টো দিকে ঘোরাতে গেল।

"একটু দাঁড়া রমাকান্ত।" জগদীশবাবু ফতুয়ার পকেট হাতড়ে গোটা কয়েক নোট বার করে বললেন, "নিতাই, তোরা কিছু টাকা নিয়ে যা।"

"ও টাকা তোমার কাছে রেখে দাও কর্তাবাবু। তুমি তো আমাদের আগেই রিফিউজী হতে চলেছ কলকাতায়। আমরা কষ্ট সহ্য করতে পারব, তুমি পারবে না কর্তাবাবু।"

জগদীশবাবুর কষ্টের তল এ-যুগের নিতাইরা আর কোনদিনও দেখতে পাবে না!

চার চাকার গাড়িটাকে রমাকান্ত এবার নিয়ে চলল পশ্চিম দিকে। এখান থেকে রাস্তার বড় ফটকটা দেখা যায়। যতীন সাহার লোকেরা ঐ ফটক দিয়েই নাগ-বাড়িতে ঢুকবে বেলা বারোটার পরে। বাধা তারা পাবে না। ফটকে আজ আর একজন দরওয়ানও নেই। কাজ থেকে তাদের তুলে দিতে হয়েছে অনেক দিন আগেই। তাছাড়া, পাহারা দিয়ে ধরে রাখবার মত আর কোন গোপন ঐশ্বর্য এখানে ছিল না। পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে যে-ঐশ্বর্য ভোগ

করা যায় না, তাকে বেশি দিন ধরে রাখা যায়ও না। শতাব্দীর ভুল জগদীশবাবু ধরে ফেলেছেন বৌরানী পালিয়ে যাবার পরে।

"সেলাম হুজুর—" ফজ্‌লুর গলা শুনতে পেলেন জগদীশবাবু!

খালি আস্তাবলে বসে ফজ্‌লু বিড়ি টানছিল।

ফজ্‌লুর গলা শুনেই রমাকান্ত গাড়িটাকে ঘুরিয়ে ফেলল পূবদিকে।

বিড়িটা ফেলে দিয়ে ফজ্‌লু এগিয়ে এল জগদীশবাবুর সামনে।

"সেলাম হুজুর।"

"ফজ্‌লু!"

"জী।"

আলাপ আলোচনার দরকার হল না আর। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ফজ্‌লু। রমাকান্ত গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে। জগদীশবাবু গাড়িতে বসে ফজ্‌লুর সেলামটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে নিজের কপালে কেবল হাত ঠেকিয়ে রাখলেন। দুটো মনের নিভৃত মিলন অক্ষয় হয়ে থাক আদান প্রদানের ছায়াপথ ধরে। যুগের ক্ষয় আছে, ক্ষয় আছে মানুষের। কিন্তু আদানপ্রদানের ছায়াপথ মিলনের রহস্য দিয়ে চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বেলা বারোটার আগেই দয়াল নৌকো নিয়ে এল পেছন দিকের ঘাটে। বৌরানী চলে যাবার পরে, ঘাটের দরজায় আর কোনদিনও তালা লাগানো হয় নি। রমাকান্ত টুকিটাকি কটা জিনিস চটপট তুলে ফেলল নৌকোতে। দিন সাত থাকতে হবে এরই মধ্যে। ভজহরি এবার জগদীশবাবুকে নিজেই নিয়ে এল ঘাটের কিনারা পর্যন্ত। রমাকান্ত আর ভজহরি দু-জনে তাঁকে আলগা করে তুলে দিল নৌকোয়।

"আমি ট্রেনে চেপেও যেতে পারতুম হরি। কিন্তু নৌকো করে যাচ্ছি পূর্ববঙ্গের নদীগুলো দেখবার জন্যে। বুড়ী গঙ্গা আমার প্রতিদিনকার সাথী ছিল। ধলেশ্বরী দেখব, দেখব মেঘনা। পার হয়ে যাব পদ্মা। তারপর গোয়ালন্দ থেকে ট্রেন ধরব কলকাতার। ভজহরি, বিক্রমপুরের জমিদারি আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে অনেক দিন হল। তবু, বিক্রমপুরের কিনারা

ঘেঁষেই দয়াল তার নৌকো বেয়ে চলবে। বিক্রমপুরের দৃশ্য দেখতে আমার ভালই লাগবে।"

বিছানার চাদরটাকে ভজহরি হাত দিয়ে টেনে টেনে সমান করে দিতে লাগল। কাণ দুটো খাড়া করে রাখল কর্তাবাবুর দিকে। সে জানে, জগদীশবাবুর বুকে আজ অনেক কথা জমে উঠেছে। প্রতিটি কথা তাঁর মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। অতীতকে যে মর্যাদা দিতে শিখল না, ভবিষ্যৎ গড়বার শিক্ষা তার মিথ্যে বলে প্রমাণিত হবে।

"ভজহরি—" ডাকলেন জগদীশবাবু।

"কর্তাবাবু।" জবাব দিল ভজহরি।

"তোর বাবার কথা মনে পড়ে না?"

"পড়ে কর্তাবাবু।"

"আশ্চর্য! কেন যে সে কাউকে না জানিয়ে বারোদি গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেল, বুঝতে পারলুম না। কোনদিন যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, তাকে বলিস্, জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতি, ধর্ম-অধর্ম সবকিছু এই ঘাটের সিঁড়িতে ফেলে রেখে আমি আজ বিদায় নিয়ে যাচ্ছি।"

"বলব কর্তাবাবু, যদি দেখা হয়।"

"হ্যাঁ, বলিস্। দয়াল, বারোটা প্রায় বাজে—"

"পাল তুলছি কর্তাবাবু।" পেছনের গলুই থেকে জবাব দিল দয়াল মাঝি।

"পূর্ববঙ্গ জলের দেশ।" মন্তব্য করলেন জগদীশবাবু।

ভজহরি চুপ করে রইল।

"ভজহরি—"

"আজ্ঞে—"

"বিশু আর মিনুমাকে চিনিস?"

"বিশুকে চিনি, অন্য কাউকে চিনি না।"

"পাঁচ নম্বর ফরাসগঞ্জে ওরা থাকে। যাবার আগে ওদের সঙ্গে দেখা হল না। যাক, যাক! ধর্মদাসের ছেলে আর মেয়েটা হয়তো ভেসে যাবে।

পূর্ববঙ্গ জলের দেশ।…রাজবাড়ী গ্রামে রঘু দত্তের বংশটা ছিল। পদ্মার জলে রাজবাড়ীটাও তলিয়ে গেছে। দয়াল? ওরে, নৌকো ছাড়্।…রাজবাড়ীর ওপর দিয়েই দয়ালকে নৌকো চালিয়ে যেতে বলেছি। ব্ঝলি হরি?"

"বুঝেছি কর্তাবাবু।"

"আচ্ছা এবার তুই নেমে যা। রমাকান্ত উঠেছে তো?"

"উঠেছে।" ভজহরি নেমে আসছিল নৌকো থেকে। জগদীশবাবু ভজহরির হাতটা টেনে ওর মুখটাকে নামিয়ে নিয়ে এলেন নিজের মুখের কাছে। তারপরে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ঘাট থেকেই বৌরানী পালিয়ে গিয়েছিল, না রে হরি?"

জবাব দেবার সময় পেল না ভজহরি। দয়াল পালের দড়ি ধরে মারল এক টান। ভজহরি লাফিয়ে নেমে পড়ল ঘাটের সিঁড়িতে। নৌকোর মুখ গেল ঘুরে। কর্তাবাবুকে ভজহরি আর দেখতে পেল না। পেছন ফিরে সে দেখল, ফজ্লু শেখ কপালে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে, "সেলাম হুজুর, সেলাম।"

ভজহরি ফজ্লুর পাশে এসে দাঁড়াল। দু-জনে চেয়ে রইল বুড়ী গঙ্গার দিকে। খানিকক্ষণ পরে, দয়ালের নৌকো আর দেখা গেল না। শ্যামপুর শ্মশানের বাঁকে নৌকোটা ঢাকা পড়ে গেল। কপাল থেকে হাত নামিয়ে ফজ্লু তার হাতটা রাখল ভজহরির ঘাড়ের ওপর। রেখে বললে, "বাড়ি থেকে বাইরে যেও না। শহরের অবস্থা বহুত খারাপ। বড়লোকদের খেল্ এখনও শেষ হয় নি। ভজুয়া, আমি কাছাকাছি কোথাও থাকব।"

বেলা বারোটার পরে যতীন সাহার বদলে এল সরকারি লোক। শহরে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না বলে বাড়িটায় অনেকগুলো অফিস বসবে। যতীন সাহার পরিবারের পক্ষে এবাড়িটা সত্যিই খুব বড়। এমন টানাটানির যুগে খালি ঘরে পায়রা পুষে অপরের অসুবিধা সৃষ্টি করার কোন অর্থ হয় না।

একটি অল্প বয়সের সরকারী কর্মচারি ফাইল হাতে নিয়ে বাড়ির মধ্যে

ঢুকলেন প্রথম। ঢুকে তিনি পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সদর থেকে অন্দরে যাবার রাস্তাটা তো সরল নয়! ভজহরিকে দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি-ই কি বাড়িটা দেখাশোনা করেন?"

"উপস্থিত আমি একলাই আছি। কি দরকার আমায় বলতে পারেন।"

"বাড়িটা সরকার থেকে রিকুইজিশন করা হল। নোটিশ—"

"নোটিশ নিয়ে আমি কি করব? নতুন মালিকের আসবার কথা আছে এক্ষুনি।" বললে ভজহরি।

"কে নতুন মালিক? নাম জানেন?"

"যতীন সাহা।"

"আপনি এখানে কি করেন?"

"পুরনো মালিকের লোক আমি। আমারও থাকবার মেয়াদ ফুরিয়েছে। কেবল মন্দিরটার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলেই আমি চলে যাব।"

"ও, এখানে একটা মন্দির আছে বুঝি? বেশ, তা থাক। আপনি থাকুন ঐ মন্দিরটায় যতদিন না নতুন ব্যবস্থা করতে পারেন। বাড়ির মধ্যে যা জায়গা আছে, তাতেই আমাদের অফিসের কাজ চলে যাবে। মন্দিরের জন্যে আমাদের কোন ব্যাঘাত হবে না।"

"কবে আসবেন আপনারা?"

"ধরুন, পনরো দিনের মধ্যেই।"

মোটর গাড়ি থেকে যতীন সাহা নামল তার একটি কর্মচারী সঙ্গে নিয়ে। ভজহরি দেখল, কর্মচারীটির হাতে অনেকগুলো নতুন নতুন তালা। খোলা ফটকের মধ্যে দিয়ে ওরা ভেতরে চলে এল। বাধা পেল না।

সরকারি কর্মচারীটি এবার ফাইল নিয়ে এগিয়ে গেলেন যতীন সাহার দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "আপনিই বুঝি এই বাড়িটার নতুন মালিক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দলিলপত্র সব রেজিস্টারী হয়ে গেছে। সন্ধ্যের সময় আসব বৌকে নিয়ে বাড়িটা দেখাবার জন্যে।"

"দেখাতে পারেন, কিন্তু থাকতে পারবেন না।"

"কেন? রেজেস্টারী—"

"ওসব অফিসের দলিলপত্র আপনার কাছেই থাক। সরকারের তরফ থেকে আমি বাড়িটা রিকুইজিশন করলুম। নোটিশটা—"

"এঁ্যা? নোটিশ—"

যতীন সাহার হাতে নোটিশটা দিয়ে সরকারি কর্মচারীটি বললেন, "আমাদের অফিসে কাল একবার আসবেন, ভাড়া ঠিক করে যাবেন।" এই বলে সরকারি কর্মচারীটি তাঁর লোকজন নিয়ে চলে গেলেন। যতীন সাহা গেল একটু পরে। নতুন নতুন তালাগুলো তার কাজে লাগল না।

পরের দিন সকালবেলা থেকে শহরে নানা রকমের গুজব রটতে লাগল। খবরের কাগজগুলো হাত দিয়ে ধরতে গেলে হাত পুড়ে যাওয়ার উপক্রম! বেলা বারোটা নাগাদ শহরে গণ্ডগোল সুরু হয়ে গেল। ভজহরি নাগ-বাড়িতেই রইল। সকালবেলা পুরোহিত ঠাকুর নিয়মিত পূজা শেষ করে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আর ক দিন আছো ভজহরি?"

"কি করে বলি ঠাকুর মশাই? কোন কিছুই তো আজকাল আর হিসেব করা বলা যায় না।"

"ঠিকই বলেছ। ঠাকুরের ওপর নির্ভর করাই ভাল। কলকাতা থেকে ছেলেরা সব ডাকছে। কিন্তু এই বয়সে ভয় করলে চলবে কেন? মাটি কামড়ে এখানেই পড়ে থাকতে হবে। তা ছাড়া মানুষের তো মাটির সঙ্গেই সম্পর্ক। পূর্বপুরুষদের পায়ের ধুলো সব ঝেড়েঝুড়ে ফেলে দিলে আমরা বাঁচব কি নিয়ে?—যাই বেলা হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ নম্বর ফরাসগঞ্জের পূজো এখনও শেষ হয় নি। পূজো শেষ না হলে ও-বাড়ির কেউ জলস্পর্শ করে না। ভজহরি, শহরের অবস্থা জানো তো? রাজনীতির খেলা কবে যে শেষ হবে ভগবানই জানেন! চলি ভজহরি, বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।"

বেলা তিনটের সময় ভজহরির আর পুরোহিত ঠাকুরের কথা মনে ছিল না।

সমস্ত নাগ-বাড়িটার চেহারা গেল বদলে। কাতারে কাতারে লোক এসে উঠতে লাগল এখানে। ভজহরি এক তলা দো-তলার ঘরগুলো সব খুলে দিয়েছে। ঘর সব ভর্তি হয়ে গেল সন্ধ্যে হওয়ার আগেই। লম্বা লম্বা বারান্দাগুলোতেও আর তিল ধারণের স্থান রইল না। যে যা পেরেছে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সবাই। সন্ধ্যের পরে বাড়িটার সামনে পেছনেও ভিড় জমলো। ব্যাপার দেখে ভজহরি একেবারে তাজ্জব বনে গেছে। সরকারি ডাক্তার এলেন গুটি কয়েক, শহরের ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব এলেন নিজে। মন্ত্রী এলেন দু জন। তারা সব অভয় দিতে লাগলেন রিফিউজীদের। বাড়ির চারদিকে সৈন্য মোতায়েন করা হল। দু তিন ঘণ্টার মধ্যে নাগবাড়িটার মধ্যে সৃষ্টি হল এক বিচিত্র জগৎ—রিফিউজী ক্যাম্প। মধ্যবিত্ত সমাজের ছিটেফোঁটা যা ছিল সব এসে জড়ো হল নাগ-বাড়িটার বাগানে। উঁচু নিচু আর রইল না, ভূমি সমতল হল। মধ্যবিত্তকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র চরমে উঠল।

সন্ধ্যের একটু পরেই বিশু ছুটে এল ভজহরির কাছে। ভজহরি দাঁড়িয়েছিল ঘাটের কিনারে। বিশু এসেই বললে, "হরিদা, দিদি নেই।"

"নেই ?"

"বোধ হয় নেই। অনেকগুলো লোক বাড়ির সামনে এসে হল্লা করছে।"

"চলো আমি যাব।"

"একলা ?"

"হ্যাঁ, একলাই।"

সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া নিরাপদ হবে না মনে করেই, ভজহরি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নিচে, একেবারে শেষ সিঁড়িটায়। বললে, "তুমি বাড়ির বাইরে যেও না বিশু, এখানেই থাকো। আমি সাঁতরে গিয়ে উঠব ফরাসগঞ্জের কাছে। দিদিকে আমি নিয়ে আসব বিশু।"

ভজহরি সাঁতার দিল জলে। মাথার ওপরে কালো আকাশ। কালো আকাশ থেকে বার বার করে বিশুর সেই চিৎকারটা যেন ভেসে আসতে লাগল ভজহরির কানে। ভজহরি সাঁতার কাটতে লাগল প্রাণপণে। শীতের রাত

বলেই হয়তো ভজহরি হাতপাগুলোকে ছুঁড়তে লাগল জোরে জোরে—শরীরটা গরম না হলে সাঁতারের গতি বাড়বে না।

জল থেকে ডাঙায় উঠল ভজহরি। একটা সরু গলি মত রাস্তা দিয়ে সে এল বড়রাস্তার ধারে। এখানকার এক ইঞ্চি রাস্তাও ভজহরির অচেনা নয়। এ-দিকে, ও-দিকে চাইতে চাইতে সে বড় রাস্তাটা পার হয়ে এসে দাঁড়াল পাঁচ-নম্বর বাড়ির সামনের গলিটার মুখে। ওখান থেকেই ভজহরি দেখল, ফজ্‌লু শেখ পাঁচ-নম্বরের দরজায় দাড়িয়ে রয়েছে। বুড়োর বুকের ছাতিটা পাঁচ-নম্বর বাড়িটার দরজার চেয়ে চওড়া কম নয়। রাস্তার ওপরে অনেক লোক। ফজ্‌লু শেখ দরজার ওপরে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে খুন না করে কেউ আর দরজা ভাঙ্গতে সাহস পাচ্ছে না। ভজহরি এগিয়ে এল দ্রুত পায়ে। ওকে দেখতে পেয়েই ফজ্‌লু শেখ চেঁচিয়ে উঠল, "আরেঃ! মেরা বেটা—"

ভজহরি দাঁড়াল ফজ্‌লু শেখের পাশে। জনতা চকিতের মধ্যে সরে যেতে লাগল। পুলিশের গাড়ি ঢুকে পড়েছে গলিটার মধ্যে। গাড়িটাকে দাঁড় করালো ফজ্‌লু শেখ। ভজহরি ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে। বিশুর ঠাকুরমা সামনেই ছিলেন। ভজহরি বলল, "আমার নাম হয়তো শুনে থাকবেন। আমি ভজহরি। চলুন, শীগগির চলে আসুন। নাগবাবুদের বাড়িতে রিফিউজী ক্যাম্প খোলা হয়েছে। বিশু সেখানেই আছে।"

"আমি যাব না বাবা। মিনুকে নিয়ে যাও। আমার আর বাঁচবার সাধ নেই। মিনতি, মিনু—"

মিনতি এসে দাঁড়াল ভজহরির সামনে। এল পেছনের ঘরখানা থেকে। ঐ ঘরখানাতেই সে মা আর বাবার মাঝখানে শুয়ে বড় হয়েছিল। মা মারাও গিয়েছিলেন ঐখানে। নিমেষের মধ্যে ভজহরির অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল। কিন্তু স্মৃতির ঘাস চিবিয়ে রোমন্থন করবার সময় এ নয়। মিনতির মুখে আতঙ্কের রেখাগুলো ভেসে উঠেছে অতি স্পষ্ট ভাবে। ঠাকুরমার পায়ের ধুলো নিয়ে মিনতি ভজহরিকে বলল, "চলুন।" অগ্র পশ্চাৎ দেখবার দরকার

হল না। ভজহরি সত্যিই ভজহরি কিনা, তাও কেউ পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না। মিনতি কেবল ভজহরির কথার ওপর নির্ভর করে বেরিয়ে এল রাস্তায়। পুলিশের গাড়ি চেপে ফজ্‌লু আর ওরা দু-জনে পৌঁছল এসে নাগবাড়ি রিফিউজী ক্যাম্পে। বিশু ফটকের সামনেই দাঁড়ানো ছিল।

বাগানের মধ্যে ঢুকে ভজহরি অবাক হয়ে গেল! সারা বাগান জুড়ে ইট দিয়ে অসংখ্য উনোন তৈরি করেছে রিফিউজীরা। হাঁড়ি আর কড়া চাপিয়ে তাতে রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে। সরকারি লোকেরা এরই মধ্যে কাঠ আর চালের ব্যবস্থা করে গেছে। ঘর-সংসার থেকে উৎপাটিত মানুষ একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে কিছুক্ষণের জন্যে সেখানেই আবার সংসার পেতে বসেছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের জয়পতাকা উড়ছে পাশাপাশি উনোনগুলোর ফাঁকটুকুর মধ্যে। কে কার হাঁড়ি ছুঁয়ে দিয়েছে বলে একটু আগেই দুই পরিবারের মধ্যে খানিকটা ঝগড়াও হয়ে গেল!

ফজ্‌লু শেখ ভজহরিকে বলল, "তোর আর এখানে থাকা হবে না। তুই কলকাতায় চলে যা।"

"কেন? কলকাতা যাব কেন? আমি ভয় পেয়েছি নাকি?"

"না ভজুয়া। এখানে তোর থাকা হবে না। ওস্তাদজী নেই, কর্তাবাবুও চলে গেলেন। তোকে দেখবে কে?" দাড়িতে হাত বুলতে বুলতে সে আবার বলল, "আমি বুড়ো হয়ে গেছি। কবরের মাটি আমায় টানছে। না, তোর আর এখানে থাকা চলবে না। কাল সকালে আমি তোর টিকিট কেটে নিয়ে আসব।" এই বলে ফজ্‌লু শেখ চলে গেল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে।

সমস্তটা রাত ভজহরি এক মিনিটের জন্যেও ঘুমতে পারেনি। নাগবাবুদের ঘর খালি করে সব জিনিস-পত্র এনে সে দিয়েছে রিফিউজীদের ব্যবহারের জন্যে। প্রায় একটা শতাব্দীর জমানো জিনিস মানুষের কাজে লাগল আজ, ভাবল ভজহরি।

ফাল্গুন সুরু হয়েছে বটে, কিন্তু শীত একটুও কমে নি। উপরন্তু সন্ধ্যেবেলা থেকে ঠাণ্ডা আজ ভীষণভাবে বেড়ে গেল। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, মেয়েগুলো

শীতের আঘাতে কান্নাকাটি সুরু করেছে। বিশুকে সঙ্গে নিয়ে ভজহরি বাগানে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে জড়ো করল একজায়গায়। তারপরে তাদের নিয়ে এল দো-তলার ঘরে। বৌরানীর ঘরটা সে খুলে ফেলল তাড়াতাড়ি করে। কেবল বৌরানীর ঘরটাই সে রিফিউজীদের ব্যবহার করতে দেয় নি। ভজহরি ভেবে রেখেছিল, সরকারি লোকেরা অফিস খুলবার আগে কেবল বৌরানীর জিনিসগুলোই সে পাঁচ-নম্বর ফরাসগঞ্জে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বৌরানী নিজেই যখন কোন একটা জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি, তখন ভজহরি বা কি করবে সেসব জিনিস ধরে রেখে। মানুষের ক্ষমতা যে কত সীমাবদ্ধ ভজহরি তা এইটুকু বয়সেই বুঝতে পেরেছে !

বৌরানীর খাটের ওপরে বাচ্চাগুলোকে সে তুলে দিল এক এক করে। বড় আলমারীটার মধ্যে লেপটা তোলা রয়েছে। কাজ ছাড়বার আগে লক্ষ্মীর মা সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল। গত কয়েকটা বছর ধরে তাতে কেউ হাত দেয় নি। আলমারী খুলে ভজহরি কেবল লেপটাই বার করল না, গায়ে দেবার মত চাদর এবং আরও কাপড় চোপড় সে বার করল। ওদের সব শুইয়ে দিয়ে, ভজহরি দক্ষিণ দিকের জানালাটা দিল খুলে। বৌরানী এখানে দাঁড়িয়ে বুড়ী গঙ্গার জল দেখত। শীতকাল বলে জল এখন অনেক নিচে নেমে গেছে। জানালায় দাঁড়িয়ে ভজহরি আজ জল দেখতে পেল না। জল দেখবার জন্যে জানালাটা সে খোলেও নি। ঘরটা অনেকদিন থেকে বন্ধ পড়েছিল বলে হয়তো এখানকার বাতাস সব দূষিত হয়ে উঠেছিল। বাইরের বাতাস এসে এবার ঘরটার নষ্ট-স্বাস্থ্য আরোগ্য করে তুলুক। এতগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে বৌরানীর খাটের ওপর শুয়ে পড়বার পরে, ভজহরির মনে হল, ঘরের স্বাস্থ্য ফিরে আসতে এক মুহূর্তও লাগল না। কেবল একটা ছেলের অভাব হয়েছিল বলে সারা সংসারটা ফাঁকা থাকবে কেন ? আলোটা নিবিয়ে দেবার আগে ভজহরি শেষ বারের মত বৌরানীর খাটের দিকে একবার দৃষ্টি ফেলল। দৃষ্টি ওর অতিক্রম করল খাটের সীমানা। নাগবংশের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা যেন টুকরো টুকরো হয়ে আজ সব শুয়ে রইল বৌরানীর খাটের ওপর।

খাট-টা বাংলা দেশের মতো বড় ! এরা যদি না বাঁচে, তবে বাংলার ভৌগোলিক বাস্তব একদিন নতুন প্লাবনের জলে ভেসে যাবে, এদের কোন আলাদা পরিচয় থাকবে না।

পরের দিন সকালের দিকেই ফজ্‌লু শেখ ঢুকে পড়ল নাগ-বাড়িতে।

"ভজুয়া, চল্‌। হাওয়াই জাহাজের টিকিট মিলেছে। বেলা বারোটায় বিমানঘাঁটি থেকে হাওয়াই জাহাজ ছাড়বে। চল্‌, আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।"

"গাড়ি ? কি গাড়ি ?"

"ঘোড়ার গাড়ি। কাদির সর্দারের গাড়িটা পাওয়া গেল। চল্‌ ভজুয়া।"

ইতিহাসের পাতা ওলটাচ্ছে। ভজহরি তবু পেছন দিকের শেষ পাতাটা ধরে রাখবার চেষ্টা করল, "এতগুলো লোক এখানে পড়ে রইল ফজ্‌লু ?"

"ওদের সঙ্গে তুই কি করবি পড়ে থেকে ? সরকারি লোক আছে, তারা সব বন্দ্‌বস্ত করবে। নে চল্‌—"

পাঁচ-মিনিটের মধ্যে রিফিউজী ক্যাম্পটা সজাগ হয়ে উঠল। ভজহরি চলে যাচ্ছে শুনে বসে-পড়া ভাঙ্গা মানুষগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। ভজহরি চলে গেলে ওরা এখানে থাকবে কি করে ? আশ্চয হল ভজহরি ! ভজহরি ওদের কে ? গত রাত্রিতে সামান্য একটু সাহায্য করেছে বলে গোটা ক্যাম্পটা ভজহরির মধ্যে দেখল কি ? কতটুকু ক্ষমতাই বা আছে তার ? ক্যাম্পের ভেতরে এবং বাইরে কত পুলিশ এবং সৈন্য সামন্ত রয়েছে, তবে কেন ওরা ওকে ছাড়তে চায় না ? তবু ছেড়ে দিতে হল। ফজ্‌লু বুড়ো হয়েছে, ভজহরির দায়িত্ব সে আর এক দণ্ডের জন্যেও নিতে পারবে না। হাওয়া বদলে গেছে, মানুষ বদলে গেছে। কেমন করে সে দায়িত্ব নেয় ? কাল সমস্ত রাত ধরে ফজ্‌লু ভেবেছে যে, ওর আশেপাশে হঠাৎ সব জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। অতএব—

যাওয়ার জন্যে ভজহরি প্রস্তুত হতে লাগল। মন্দির থেকে বিগ্রহটা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখল সে। খবরের কাগজের পাপ সে আজ

হাত দিয়ে ছোঁয় নি। সাদা কাগজ যোগাড় করে নিল কর্তাবাবুর অফিস ঘর থেকে। তারপর বৌরানীর ডায়েরী বইখানা রাখল সে বাঁ দিকের পকেটে। ভজহরি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত, আর কিছু সঙ্গে নেবার নেই।

ক্যাম্পের অনেকেই এসে ভিড় করল ভজহরির সামনে।

"তুমি আমার ছেলে, আমার মেয়েটাকে কলকাতা নিয়ে যাও।"

"আপনি আমার ভাই, আমাকে এখানে ফেলে যাবেন না।"

"আপনাকে আমি বাপ ডাকলুম, একখানা টিকিট কি কোন রকমেই যোগাড় করে দিতে পারেন না?"

কোথা থেকে ভিড় ঠেলে মিনতি এসে দাঁড়াল ভজহরির পাশে। তার চোখের দিকে চেয়ে মিনতি বলল, "আমি আপনার সঙ্গে যাব। পাঁচ-নম্বর থেকে যখন নিয়ে এলেন, তখন আপনি আমার—"

ভজহরি দু-হাত দিয়ে নিজের কান দুটো ঢেকে রাখল। এমন কথা শুনতে নেই! বৌরানীর তন্ময়তা সে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। মালবিকা দত্তর মেয়ে যেন তন্ময়তা তার ভাঙতে না পারে, সেই জন্যে সে ফজ্‌লুকে বলল, "আমার টিকিটখানা ওকে দিয়ে দাও।"

"ওরাও তো তোর সঙ্গে যাচ্ছে।" ঘোষণা করল ফজ্‌লু শেখ। সারা জীবনের জমানো টাকা দিয়ে হয়তো বুড়োটা তিনটে টিকিটই কিনে এনেছে!

ভিড় ঠেলে ফজ্‌লু ওদের নিয়ে গাড়িতে এসে উঠল। মিনতি আর বিশু বসল গাড়ির মধ্যে। দু-দিকের জানালা দরজা সব বন্ধ করে দিল ফজ্‌লু। ভজহরি বসল কোচ-বাক্সে ফজ্‌লু শেখের পাশে। কাদির সর্দারের ভাঙ্গা গাড়িটা পিচের রাস্তায় আওয়াজ তুলতে তুলতে নাগবাবুদের সামনের ফটক থেকে রওনা হয়ে গেল।

রমনার নির্জন রাস্তায় এসে পৌঁছুতে এক ঘণ্টাও লাগল না। গাড়ি চালাচ্ছে ফজ্‌লু। চাবুকটা হাতে ধরে রেখেছে। ঘোড়ার পিঠে একবারও সে চাবুক মারে নি। ওর ধারণা, জঙ্গল দিয়ে সে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। দু-দিকের বড় বড় ইটের বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসছে বাঘ ভাল্লুকের গর্জন। এর

মধ্যে ঘোড়া দুটোই কেবল মানুষের মত মাথা ঠিক রেখে ঘোড়ার কর্তব্য করতে রাস্তায় বেরিয়েছে আজ।

ভজহরির মনের অবস্থা ক্রমে ক্রমে শক্ত হয়ে আসছে। এত তাড়াতাড়ি যে দৃশ্যগুলো বদলে যেতে পারে তেমন কল্পনা ওর কোনদিনই আসে নি। এবেলা-ওবেলা দৃশ্যগুলো বদলাতে আরম্ভ করলে মানুষ কি করে তার সঙ্গে পাল্লা দেবে? কিন্তু পেছন দিকে দৃষ্টি ফেলবার আর ওর সময় নেই। প্রগতি সামনে, পেছনে নয়। অজানা জগতের দিকে সে চলেছে নতুন সংগ্রামের সামর্থ্য নিয়ে। যুদ্ধ করতে ভজহরি কোনদিনও ভয় পায় নি। রাম-রাবণের যুদ্ধের চেয়ে মনের সংগ্রাম ওর ছোট নয়। ওর বিরুদ্ধে কেবল রাবণরাজার সৈন্যবাহিনী পায়তাড়া করছে না, সারা দুনিয়াটা দাঁড়িয়েছে ওকে আঘাত করবার জন্যে। ভয় পেলে চলবে না, অসত্যের সঙ্গে রফা করা অসম্ভব। কেনই বা করবে? ফজ্‌লুর মত বুড়ো সত্য বসেছে ওর ডান দিকে। বাঁ দিকের পকেটে রয়েছে জগতের প্রথম সত্য। আবার কিসের ভয় রইল ওর?

বিমান ঘাঁটিতে ওদের পৌঁছে দিল ফজ্‌লু। সে আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করল না। অপেক্ষা করতে গেলেই সে তার চোখের জল গোপন করতে পারত না। বুড়ো কালে আর কেন চোখের জল ফেলা? ছেলেমানুষদের বিব্রত করে লাভ হবে কি? ওদের এখন শক্ত হওয়ার সময়। ছোট জঙ্গল থেকে আবার হয়তো ওরা চলেছে বড় জঙ্গলে। জঙ্গল কেটে সাফ করবার তাকত যদি ওরা হারিয়ে ফেলে তবে এখান থেকে যাচ্ছেই বা কেন? ফজ্‌লু শেখ চটপট বেরিয়ে এল বিমান ঘাঁটি থেকে। বেরিয়ে এল বড় রাস্তায়। গাড়ি হাঁকিয়ে সে জল্‌দি জল্‌দি ফিরে যাচ্ছে কাদির সর্দারের আস্তাবলে। হঠাৎ সে কি মনে করে ডান দিকে চাইতে গেল। কবরখানাটা চোখে পড়ল ওর। বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠল। কে যেন ডাকছে ওকে। বিবি নয় তো? হাতের চাবুকটা হাঁটুর সঙ্গে ঠেকিয়ে ভেঙ্গে ফেলল দু-টুকরো করে। তারপরে সে টুকরো দুটো উড়িয়ে দিল হাল্কা হাওয়ায়। হাতের ময়লা সাফ হয়ে গেল।

চাবুকের শাসন শেষ করে দিল কবরখানার সামনে নাগবাবুদের বুড়ো কোচোয়ান ফজ্‌লু শেখ।

"বিশু, কলকাতায় গিয়ে উঠবে কোথায়? কে আছে সেখানে?" জিজ্ঞাসা করল ভজহরি। বিশু জবাব দেবার আগে মিনতি বলল, "আমাদের এক মামা থাকেন কলকাতায়।"

"ঠিকানাটা জানা আছে তো?"

"না। খুঁজে নিতে হবে।"

"প্রথমে গিয়ে উঠবেন কোথায়?" জানতে চাইল ভজহরি।

"খুড়তুতো ভাই রাজেনদা সেখানে আছেন, খুব বড় চাকরি করেন। ঠিকানা আমি জানি।" ঠিকানাটা মিনতি বলল।

উড়ো জাহাজে বসে মিনতি কেবল রাজেনদার কথাই মনে করতে লাগল। রাজেনদা বড চাকরি করেন। বৌদি খুব ভাল মানুষ। বড় বংশের মেয়ে। এই তো সেদিন দু-জনে মিলে কোম্পানীর পয়সায় বিলেত ঘুরে এলেন। বৌদির চিঠি পড়ে ঠাকুরমা কত খুশী হয়েছেন। মিনতি যেন চলেছে তার চেনা দেশেই, চেনা লোকের মধ্যে। গত চব্বিশ ঘণ্টার আতঙ্ক ওর মুখ থেকে মুছে গেছে। ভজহরি অবাক হয়ে ম্যাজিক দেখছিল। পাঁচ নম্বর ফরাসগঞ্জ থেকে নিয়ে এসেছিল বলে ভজহরিকে আর সে কোনরকম দায়ী করছিল না। হয়তো কলকাতার ভিড়ের মধ্যে গিয়ে মিনতি ভজহরিকে চিনতেই পারবে না।

দমদম বিমান ঘাঁটিতে হাজার হাজার লোক জমেছে। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের খোঁজ করতে এসেছেন এরা। পুলিশের লোকেরা ভিড় ঠেলে রিফিউজীদের নিয়ে এল বিমান ঘাঁটির অফিসে। সেখান থেকে উড়োজাহাজ কোম্পানীর অফিসে। অফিসভর্তি লোক। ভলান্টিয়াররা এসেছে। রিফিউজীদের সরকারি অফিসে নিয়ে যাবার জন্যে কেউ কেউ মিনতিদের অনুরোধ করছে, কেউ নিয়ে এসেছে গরম চা। ভজহরি বিনে পয়সায় পর পর দু-পেয়ালা গরম চা খেল। শহরটা তা হলে কেবল ইট-সুরকির গর্ব নিয়ে খাড়া হয়ে

নেই! এখানে মানুষ আছে। আছে আত্মীয়তার উত্তাপ, হাত বাড়ালে গরম চাও পাওয়া যায়। চা খাওয়া শেষ করে ভজহরি মিনতিকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার রাজেনদা আসেন নি? সবাই তো চলে যাচ্ছে।"

"কই দেখছি না তো। তিনি তো খবর পান নি, কি করেই বা আসবেন?" বললে মিনতি।

"এখানে বোধ হয় বেশিক্ষণ থাকতে দেবে না। কি করবেন?"

"একজন ভলান্টিয়ার সঙ্গে নিয়ে রাজেনদার বাড়ি চলে গেলে কেমন হয়? যাওয়ার পথে রিফিউজী অফিসে নামটা লিখিয়ে যাব।"

"খুবই ভাল কথা।……সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা এনেছেন কি?"

"না। আনবার সময় পেলুম কোথায়? সাত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে হল।"

এবার বিশু কথা বলল, "আমি গিয়ে খবর দিয়েছিলুম বলেই তো হরিদা নদী সাঁতরে চলে গেলেন ফরাসগঞ্জে। ঠাকুরমার কাছ থেকে টাকা আনো নি কেন দিদি? রাজেনদা যদি আমাদের থাকতে না দেন?"

"দেবেন। বাবাই তো রাজেনদাকে পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।"

ভজহরি বলল, "খুবই ভাল কথা। তবু কিছু টাকা আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। আমার কাছে গোটা পঞ্চাশ টাকা আছে। আপনি চল্লিশ টাকা এথেকে নিন।"

"আপনার কাছে তো অনেক টাকাই ধার হয়ে গেল। শোধ দিতে হবে তো? রাজেনদার ঠিকানাটা আপনি লিখে নিন। সময় পেলে একদিন আসবেন।"

"আসব।"

মিনতি আর বিশু একজন ভলান্টিয়ার সঙ্গে নিয়ে চলে গেল রাজেনদার বাড়ির দিকে। যাওয়ার পথে অবিশ্যি রিফিউজী-অফিসের ফাইলে নামঠিকানা সব ওরা লিখে রেখে যাবে। ম্যাজিকের শেষটুকু ওর ভালই লাগল।

বুক পকেটে টাকা দশটা রেখে ভজহরি তার হাত ঘড়িতে সময় দেখল। বেলা দশটা বেজেছে। অফিস-আদালত বসবার সময় হয়েছে। রাস্তা দিয়ে সবাই খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছে। দাঁড়াবার ফুরসত কারু নেই। কোথায় কি হচ্ছে দেখবার মত বাড়তি সময় নেই কারু ঘড়িতে। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দশটা বেজেছে।

ভজহরি বিমান অফিসের দরজা থেকে ফুটপাতে নামল। অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই ওর। শহুরের বিরাট্-বিস্তৃতিটা ওকে আকর্ষণ করল। বুক ফুলিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল ভজহরি। নিজের বুকের বিরাটতর বিস্তৃতি দিয়ে একদিন সে শহরটাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে, তেমন একটা প্রতিজ্ঞা মনের মধ্যে চেপে রেখে ভজহরি মিশে গেল কলকাতার জনস্রোতে।

মাসখানেক সাঁতার কেটে বেড়াল ভজহরি। স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিল আরও পনেরো দিন। কিন্তু স্রোতের শেষ সে দেখতে পেল না। লোক, লোক আর কেবল লোক। গাদাগাদা লোক শরীরের চামড়া ঘেঁষে চলাফেরা করে। কেউ কারু পরিচয় জানতে চায় না, কুশল সংবাদের ধার ধারে না কেউ। অর্থনৈতিক সংবাদ ছাড়া কারু মুখে সে অন্য কোন কথা শুনতে পায় নি—এবার তার নিজের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠল। অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক ওর ঘুচে গেল, একটা পয়সাও আর নেই। কি করবে ভজহরি? ফুটপাত আর পার্কে ঘুরে বেড়ালে লাভ হবে কি? কোথাও কোন রকম একটা কাজের যোগাড় করে উঠতে পারলে না সে। শহরটার মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না। পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ ছাড়া কলকাতার দ্বিতীয় কোন বিশেষত্ব ওর নজরে পড়ল না। সূর্য ওঠে বলেই পূব-পশ্চিম চেনা যায়। কিন্তু মানুষজন দেখে ক্ষমতার মূল সে কোথাও খুঁজে পায় না। নাগবাবুদের হাত থেকে ক্ষমতা কার হাতে এল? কার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়াবে ভজহরি? নতুন সভ্যতার পদ্মানদীতে পরিবারগুলো সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে তলিয়ে গেছে। কেউ কাউকে আর আশ্রয় দিতে পারে না। বাপ ঠাকুরদাদের চওড়া

বুকগুলোর মত একটা বুকেরও সন্ধান সে করে উঠতে পারল না। বড্ড অসহায় বোধ করতে লাগল ভজহরি। নাগবাবুরা ডুবলেন বলে মধ্যবিত্তরাও সব তলিয়ে গেল না কি? পদ্মার একদিকে ভাঙ্গন, অন্য দিকে গড়ন। কিন্তু চরের মাটি তো ভজহরির চোখে পড়ছে না!

মিনতির কাছে গেলে কেমন হয়? তার রাজেনদা তো মস্ত বড় চাকরি করেন। হাজার হাজার অফিস ঘরের কোন একটা কোণায় কি তিনি ভজহরির জন্যে একটু জায়গা করে দিতে পারবেন না? অন্ধকারে ভজহরি ঢিল ছুঁড়ল। ক্ষমতার শঙ্খবিষ কোন্ দিকে যে পথ কেটে চলেছে সেটা খুঁজে বার করবার জন্যেই বোধ হয় ভজহরি চলল মিনতির কাছে।

বাড়িটা খুঁজে বার করল সে। কিন্তু কেউ বাড়ি ছিলেন না। ধবধবে সাদা পোশাক-পরা একজন চাকরের সঙ্গে দেখা হল ওর।

"কেয়া মাঙ্‌তা?"

রমাকান্তের মত গলার স্বরে এর ভদ্রতা নেই। চাকরের স্বর থেকে রাজেনদার পরিচয় খানিকটা পাওয়া গেল। কোম্পানীর পয়সায় স্বামী-স্ত্রী দু-জন বিলেত ঘুরে এসেছেন বলে হয়তো স্বাধীন ভারতবর্ষের চরিত্রটা আজো ইংরেজী বই-এর সীমা উত্তীর্ণ হতে পারে নি।

"এখানে মাস দেড়েক আগে একটি মেয়ে এসেছিল না? সঙ্গে তার ভাই ছিল।" জিজ্ঞাসা করল ভজহরি।

"হাঁ। দো রোজ বাদ মে চলা গিয়া।" চাকরটার সাদা পোশাকের ওপর ভজহরির কালো কথাগুলো তা হলে দাগ কেটেছে।

"কোথায় গেছে?" জিজ্ঞাসা করল ভজহরি।

"ই হাম বাতানে সাখেগা নেহি। কেয়া মালুম, কোই রিফিউজী ক্যাম্প মে গিয়া হোগা।"

"একটু কাগজ দিতে পারো, আর একটা পেন্সিল?"

"ঠার যাইয়ে।" দরজাটা খোলা রেখে চাকরটা গেল কাগজ আর পেন্সিল আনতে। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে একটা মস্তবড় কুকুর মুখ বার

করল। ভয় পেয়ে একটু পেছন দিকে সরে এল ভজহরি। নিজের নামটা এখন লিখে রেখে দিয়ে বাড়িটা থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচে। মিনতির জানা থাকা ভাল যে, সে ওর কুশল-সংবাদ জানতে এসেছিল।

কাগজের ওপর ভজহরি বাংলায় তার নাম লিখছে দেখে চাকরটা বলল, "ইংলিস মে লিখিয়ে বাবু।"

"কেন ?"

"সাহেব বংলা পড়তা নেহি। বহুৎ গোসা হোতা হ্যায়।" কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ভজহরি দ্রুতপায়ে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

শ্রান্তি আর ক্ষুৎপিপাসায় চোখ যখন ওর প্রায় বুঁজে আসবার উপক্রম, তখন হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে ওর নতুন জীবনের গোড়াপত্তন হল। ভজহরি কাজ পেল। খোসামোদ করতে হল না, ফুটপাতের ওপরেই ওর কাজ জুটে গেল। একজন কে ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মোট বইতে পারবি ?"

"কেন পারব না ? ক-মন ওজন ?"

"ক-মন ? আধ মনের বেশি নয়। ত্রিশ সেরও হতে পারে। হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে।"

"এখান থেকে কতদূর ?"

"দূর ? দূর কই ? ঐ তো পোলের ওপারে।"

"যাব, চলুন। মোট কই ?"

"ঐ দোকানটায় আছে। কত চাস্ ?"

"কত দিতে পারেন ? মানে, কত হওয়া উচিত ?"

মুটেগিরির বিদ্যে ওর ধরা পড়ল।

"বারো আনা পাবি।"

"তাই দেবেন।"

মোট মাথায় নিয়ে ভজহরি ভদ্রলোকের পেছনে পেছনে চলতে লাগল পোলটার ওপারে, হাওড়া স্টেশনের দিকে। বাঙালী কুলীগিরি করে না বলে

গর্ব করবার কি আছে? রুজ রোজগারের জন্যে কোন মেহ্‌নতই উপেক্ষা করবার নয়। মেহ্‌নত হচ্ছে ভগবান। বৌরানী বেঁচে থাকলে, সে অন্তত ভজহরিকে ঘৃণা করত না। বৌরানীর বোঝা বহন করবে বলে ভজহরি কি একদিন তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় নি?

হাওড়া স্টেশনের মেহ্‌নত-মন্দিরে ঢুকে পড়ল ভজহরি। হুইলার কোম্পানীর সামনে মোট নামিয়ে দিয়ে ভজহরি দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। নম্বর' লাগানো কুলীরা সব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল বলে ভদ্রলোকটি পয়সা দিতে বিলম্ব করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভজহরির হাতে একটা আধুলি গুঁজে দিয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, "শীগগির এখান থেকে সরে যা। ওরা দেখতে পেলে আধুলিটাও কেড়ে নেবে।" রোজগার করতে এসে ভজহরি ঠকে গেল প্রথম দিনেই।

ভজহরি সরে যেতে পারল না। সরে গেলেন ভদ্রলোকটি নিজেই। নম্বর লাগানো কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে দিয়ে তিনি গেলেন টিকিট কাটতে। হুইলার কোম্পানীর এপাশ থেকে বেরিয়ে এল সর্দার চন্দ্রনাথ দুবে। ভজহরির হাত চেপে ধরে সে বলল, "পইসা নিকালো। ভাগো হিঁয়াসে। রেলওয়াই কা—" কথাটা আর সর্দার শেষ করতে পারলে না। ভজহরির মুখের দিকে চাইতে গিয়ে তার মনে পড়ল নিজের ছেলের কথা। অনেকটা যেন দেখতে সে ভজহরির মতই ছিল? বেঁচে থাকলে বড়ছেলেটার বয়স বোধহয় ভজহরির মতই হতো।

ইতিমধ্যে ভজহরি পকেট থেকে তার হাত-ঘড়িটা নিয়ে সর্দারের কব্জিতে বেঁধে দিয়ে বলল, "আধুলিটা আমার প্রথম রোজগার, এটা কেড়ে নিও না সর্দার।"

"কেয়া নাম?"

"ভজহরি।"

ঘড়ি-বাঁধা হাতটা এবার সর্দার ভজহরির ঘাড়ের ওপর রেখে জিজ্ঞাসা করল, "কুছ্‌ খাওগে ভজুয়া?"

কুলীর সর্দার চন্দ্রনাথ দুবে জীবনে এই প্রথম টের পেল যে, ক্লাইভ স্ট্রীটের বাবুদের মত ভজহরির ঘাড়ের মাংস নরম নয়। মেহ্‌নতের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে রাখবার মত খাড়া ওর মেরুদণ্ডটা। এর চেয়ে উঁচু মনুমেণ্ট বাংলার কোন্ ময়দানে খাড়া আছে প্রভু?

নবম খণ্ড

সকালবেলার দিকে অজয়বাবু এলেন বিপিন পাল রোডে। অফিস-আদালত সব বন্ধ ছিল। বন্ধ না থাকলেও অজয়বাবু আসতেন। তিনি দিল্লী চলে যাচ্ছেন। বদলির হুকুম এসে গেছে। রওনা হওয়ার দিন এখনো ঠিক হয় নি।

বড়সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "মিনতির বিয়েটা চুকিয়ে গেলে কি ভাল হতো না?"

"যেতে পারলে ভালই হতো। কিন্তু বিয়ের দিন তো আপনি এখনো ঠিক করেন নি।"

"ভজহরির কথা পেলেই দিন ঠিক করব। মিনতির মতামত কি তাও তো আমি জানি না অজয়বাবু।"

"কি যে বলেন! দুটিতে মিলে পার্কে এবং লেকের ধারে বেড়াতে যাচ্ছে, এর পরে মতের আর বাকী রইল কি? আপনি দিন ঠিক করুন। কাল কিংবা পরশু ওদের বিয়ে হয় না? ধরুন, রেজেস্টারী-বিয়েতে তেমন কোন হাঙ্গামা নেই······আই মীন, বিয়েটা তা হলে আমি দেখেই যেতে পারতাম।" অজয় বসু সাহেবী কায়দায় ঘাড়ের মাংস দোলাতে লাগলেন। বড়সাহেবের বয়েস হয়েছে। ঘাড়ের মাংস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে হাড়সুদ্ধ তাঁর নড়ে উঠত। তাই তিনি স্থিরভাবেই বসে বসে ভাবতে লাগলেন। অজয়বাবু দিল্লী বদলি হয়ে গেলেন। অথচ লুকু পড়ে রইল কলকাতায়। তাঁর চারদিকে সবই যেন উলটোপালটা ব্যাপার ঘটছে। দামী এবং পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরে লোকগুলো সব চলাফেরা করছে বটে, কিন্তু কারুরই আসল চেহারাগুলো তিনি ধরতে পারছেন না। অনেকদিনের অভ্যাসের ফলে নকল চেহারা-

গুলোকে নকল বলে ধরা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। দুধে জল মেশায় বলে কেবল গয়লাগুলোকে শাস্তি দিয়ে লাভ কি? আদি ও অকৃত্রিম গব্য ঘৃতের সাইনবোর্ডগুলো পর্যন্ত খাঁটি বলে মনে হয় না বড়সাহেবের। কাঁচা রং দিয়ে লেখা অক্ষরগুলো অল্প জলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে গলে পড়ছে। এই শহরটায় দীর্ঘ দিন বাস করবার পরেও বড়সাহেব যেন শহরটাকে আজ আর চিনতে পারছেন না!

বড়সাহেব তবু অজয়বাবুকে অনুরোধ করলেন, "মেয়েটাকে যখন আপনি রক্ষা করেছেন, তখন বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত আপনি দিল্লী চলে যাবেন না অজয়বাবু।"

"আপনার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।......বৌমা কোথায়? মামার কী যে কাণ্ড! বিজয়কে এরমধ্যে আবার একটা চিঠি লিখেছেন। দিল্লী গিয়ে বিজয়কে আমি সব বুঝিয়ে বলব। মিনতির বিয়েটা শেষ করেই যেন বৌমা ওখানে চলে আসে।"

"তা নিশ্চয়ই যাবে। আমিই হয়তো সঙ্গে করে নিয়ে যাব। দিল্লীতে আমার একটা মিটিং আছে।"

"তা হলে আমি উঠছি। বিয়ের তারিখটা কবে ঠিক করলেন, পরে সুবিধে মত আমায় একটা চিঠি দিয়ে জানাবেন।" অজয় বসু উঠলেন।

"আজ সন্ধ্যের সময় ভজহরি আসবে। ওর মতামত আজকেই জানতে পারব। বিয়ে করতে রাজী হলে, বিয়ের তারিখ ঠিক করতে আর কোন অসুবিধে হবে না।" বললেন বড়সাহেব।

"ভজহরিকে রাজী হতেই হবে। পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়াবার পরে, আর তো ওর রাজী হওয়া ছাড়া উপায় নেই? তা ছাড়া, আমরাই বা ওকে ছেড়ে দেব কেন? কুলী-মজুরদের মতামত কে গ্রাহ্য করে বলুন তো?"

"আজ না করলেও কাল করতে হবে অজয়বাবু। যা দেখছি চারদিকে, মনে হয়, ক্ষমতা আর আমাদের হাতে বেশিদিন থাকবে না।"

"তা হলে কাল সকালেই আমি প্লেন ধরব।......মিনতি কবে আসছে এখানে? বৌমা যেন আজকেই ওকে এখানে নিয়ে আসে। মামীমার বাতের ব্যথা একটু কম আছে বলে মামা বড্ড মুশকিলেই পড়ে গিয়েছেন। বসিয়ে

বসিয়ে মাইনে দিতে হবে ভেবে বাক্স থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি পুরনো বাসন বার করেছেন। মিনতির কাজের অভাব নেই। জুতোর ঘষা লেগে লেগে মামার মোজাগুলোতে ফুটো বেরিয়েছে গুটিপাঁচেক করে। তিনটি গেঞ্জির ওপর নির্ভর করে বছর দেড়েক তিনি কাটিয়ে দিলেন। আরও বছর দেড়েক কাটাবার ইচ্ছে আছে বলে মিনতিকে সমস্ত দুপুরটা বসে বসে ছেঁড়া মোজা আর ছেঁড়া গেঞ্জি সব সেলাই করতে হয়। মামার ধারণা, জুতোটা যদি চকচকে থাকে, তবে মোজার ফুটো কেউ দেখতে পাবে না। গায়ের জামা যদি ইস্ত্রি করা থাকে, তবে সেলাই করা গেঞ্জি কারু চোখে পড়বে না।"

"হ্যাঁ, ভেতরের ফুটোফাটা সব ঢেকেঢুকে চলাটা একটা মস্তবড় আর্ট!" বললেন বড়সাহেব।

"কেবল আর্ট হবে কেন, সায়েন্সও বটে।···আচ্ছা আমি তা হলে চলি। এই শ-টাকার নোটখানা রইল। মিনতির বিয়েতে আপনি খরচ করবেন। মামার কাছ থেকে কোন টাকা আপনি পাবেন বলে মনে হয় না। ব্যাঙ্কে না কোথায় না কি মিনতির টাকাগুলো সব জমছে!"

"এত ঋণ উনি শোধ দেবেন কি করে তাই ভাবছি। মিনতির মামা ছিলেন অগ্নিযুগের শহীদ।"

"শহীদ? শহীদ কি?" অজয় বসু যেন আইসল্যাণ্ডের ইতিহাস থেকে নিষ্কাশিত হয়েছেন এমন ভাব দেখালেন প্রথমে, তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কংগ্রেসের অফিসিয়াল ইতিহাসে তাঁর নাম উঠেছে কি? কি নাম ছিল তাঁর?"

"দেবেশ দত্ত। নাগমশাই তাঁকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণর তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেন।"

"তা হলে কালই আমি প্লেন ধরব। স্ক্যাণ্ডেল·· মানে শহীদের ভাগ্নিকে দিয়ে মামা আজো বাসন মাজাচ্ছেন! এ পাপ, পাপ।"

"পাপ কেবল তাঁর একলার নয়, আমাদের এবং রাষ্ট্রের পাপ তাঁর চেয়েও বেশি।"

"সর্বনাশ। বলছেন কি আপনি? সরকারি কর্মচারীদের, মুখে রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে কোন কথাই তো সাজে না। সভ্যদেশে একেই তো বলে ট্রিজন্, রাষ্ট্রদ্রোহিতা। আচ্ছা আমি তা হলে চললুম। বিয়ে শেষ হয়ে গেলে আমায় খবর দেবেন। মিনতিকে যেন—"

"হ্যাঁ, লুকু গিয়ে আজই সন্ধ্যের পরে নিয়ে আসবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

অজয়বাবু চলে যাওয়ার পরেও বড়সাহেব বসে রইলেন বারান্দায়। ছুটির দিন বলেই হয় তো বসে থাকতে ভাল লাগছে। কি করবেন, হাতে কোন কাজ নেই। কাজ কোনদিন তাঁকে করতে হয়েছে কি না তাও যেন তিনি আজ আর স্মরণ করতে পারছেন না। কর্মব্যস্ত কলকাতায় কেউ যে সত্যি-সত্যি ব্যস্ত তা তিনি আর বিশ্বাস করবেন না। নিজের স্বার্থটুকু কেবল ভাল করে সুরক্ষিত করবার ব্যস্ততা ছাড়া এদের আর সবটুকুই ফাঁকি। বড়-সাহেবের মনে হল, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একমাত্র মিনতিই কেবল কাজ করছে। নাগবাবুর ছেঁড়া মোজা আর ছেঁড়া গেঞ্জি সেলাই করছে মিনতি।

সকালবেলা বাজারে যাওয়ার সময় মাধব জিজ্ঞাসা করল, "সনাতনের কি হল? কাল রাত্রে বাড়ি ফিরল না কেন রে?"

"বোধ হয় ওভারটাইমের ওপরেও ওভারটাইম খাটছে।" জবাব দিল সরোজিনী।

"বিয়ে করবার জন্যে ছেলেটা আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে তুলেছে! এমন ভাল ছেলে জীবনে কখনো দেখি নি।"

"আমিও দেখি নি বাবা। নিজের উন্নতির জন্যে সনাতনদা বিশ ঘণ্টাও কাজ করতে পারে।"

"হ্যাঁ, বংশটা তো দেখতে হবে! যাক। বাজার থেকে কি আনব? ছুটির দিনে সনাতন একটু ভাল করে খাওয়ার ফুরসৎ পায়।"

"তা ঠিক। দেখেশুনে যা হয় তুমিই নিয়ে এসো। রেঁধে দেবার কাজ আমি করে দেব বাবা।"

মাধব চলে যাবে মনে করে আবার একটু দাঁড়াল। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, "ভজহরির সঙ্গে দেখা হয় নি তোর?"

"দেখা করে কি করব বাবা? বড্ড লজ্জা করে।"

"কেন? কেন?" মাধব প্রশ্ন করতে করতে এগিয়ে এল সরোজিনীর কাছে।

"তার ধারের টাকা এখনো তো আমরা শোধ দিতে পারি নি বাবা।"

"টাকা কটা শোধ দিয়ে দিলেই কি ঋণ আমাদের শোধ হবে? ভজহরির ঋণ আমি অন্তত শুধতে পারব না। তোর কথা অবিশ্যি আলাদা।"

"কেন? টাকা ছাড়া তুমি আর কিছু নিয়েছ না কি হরিদার কাছ থেকে? কই, আমায় তো কোনদিন কিছু বলো নি বাবা?"

মাধব সরোজিনীর কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারল না। মনে মনে খানিকটা বিরক্ত বোধ করল। পিতার কর্তব্য সে করতে চাইছে, সরোজিনীর বন্ধু হতে চাইছে মাধব। কিন্তু সরোজিনী তবু ভজহরির দিকে একটু ঘেঁষতে চায় না। আজ ভজহরি যাবে বড়সাহেবকে কথা দিতে। কথা যদি সে একবার দিয়ে আসে, তা হলে সারাজীবন কষ্ট পেলেও ভজহরিকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হবে না। মেয়েটা যেন সারাজীবন কষ্ট না পায়, সেই জন্যে মাধব যাদবপুরের বাড়িটা পর্যন্ত ছেড়ে দিতে রাজী আছে। মনে যদি শান্তি থাকে, তবে ডবসন্ রোডের পাঁচ নম্বরটার চেয়ে বড় বাড়ি সংসারে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু মেয়েটা ইচ্ছে করেই আজ নিজের সর্বনাশ নিজে করতে যাচ্ছে। একটু চেষ্টা করলেই বাপ-মেয়েতে মিলে যে-সুখের সংসারটা আজ গড়ে তুলতে পারে, সরোজিনী তা কেবল তার নিজের ভুলের জন্যেই ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছে। মাধব মনে মনে খুবই অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

"নাঃ, বাজার আজ থাক। সনাতন এবেলায়ও ওভারটাইম খাটছে কি না কে জানে! হয় তো এলই না। কি দরকার পয়সা নষ্ট করবার? আমার তো ডাল ভাত হলেই চলে যাবে।"

"তা হলেও সনাতনদার জন্যে রান্না করতেই হবে। এত খেটেখুটে মানুষটা ঘরে ফিরবে, আর ফিরবে তো আমাদের জন্যেই বাবা—"

মাধব বাধা দিয়ে বলল, "যাক, যাক আমার কি, আমি বাজার করে নিয়ে আসছি। মাংস নিয়ে আসব। একটু বেশি করেই নিয়ে আসব।"

"তা হলে আজ আমি দোপেঁয়াজী রাঁধব। সনাতনদা দোপেঁয়াজী রাঁধবার জন্যে রোজই বলে।"

"সনাতন বললেই রাঁধতে হবে তার মানে কি?" রেগে উঠল মাধব।

"সনাতনদা দোপেঁয়াজী খেতে খুবই ভালবাসে বাবা।"

"আমরা ভালবাসি না? মানে, ভজহরিকে দু-একদিন খাওয়ালে কি হয়? আমি একটু বেশি করেই মাংস আনব।" সরোজিনীকে জবাব দেবার সময় না দিয়ে মাধব চলে এল ডাউনের রাস্তা ধরে। প্রথমে সে দৃষ্টি দিল ছ-নম্বরের দিকে। দরজায় তালা ঝুলছে। পাঁচ-নম্বরের দরজায় ভজহরি দাঁড়িয়েছিল। "এই যে ভজহরি, কাজে যাও নি? আমি বাজারে যাচ্ছি। ছুটির দিন, দেরি হয়ে গেলে ভাল জিনিস সব বিক্রি হয়ে যাবে। আট-টা না বাজতেই ভদ্রলোকেরা সব চিলের মত ছোঁ মেরে সব ভাল জিনিস নিয়ে যায়। আজ আমি চিলগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছি। ভাল জিনিস আমিও কিনব। কেন কিনব জানো? তোমায় আজ সরোজিনী দোপেঁয়াজী খাওয়াবে। তুমি নাকি দোপেঁয়াজী খেতে খুব ভালবাসো?" সরোজিনীকে এদিকপানে আসতে দেখে মাধব তাড়াতাড়ি করে জিজ্ঞাসা করল, "বড়-সাহেবকে আজ কি বলবে?" প্রশ্ন করে মাধব চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের মধ্যে যেন ইঞ্জিনের আওয়াজ হচ্ছে। চোখ দুটো ও তুলে ধরেছে ভজহরির মুখের দিকে। ভজহরি তবু জবাব দিচ্ছে না। জবাবটা না শুনে পালিয়ে যেতে পারলেই যেন মাধব এখন কষ্টের হাত থেকে বেঁচে যায়। কে জানে ভজহরি হয় তো বালিগঞ্জের মেয়েটাকে বিয়ে করবার জন্যে মনস্থির করে ফেলেছে।

"কি জবাব দেব বড়সাহেবকে এখনো ভেবে উঠতে পারি নি। তবে সনাতনদাকে সব কথাই আজ আমি খুলে বলতে চাই। বিশু এবং মিনতিকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আজ সনাতনদার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কালরাত্রি থেকে তো সনাতনদাকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"ওভারটাইম, মানে ওভারটাইম খেটে খেটে ছেলেটা হাড়গিলের মত সরু হয়ে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, নতুন সংসার করতে যাচ্ছে, হাতে কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে নেওয়া ভাল।"

"তা যা বলেছ। কিন্তু সরোজিনী বলে যে, সনাতন নিজে বড় হওয়ার জন্যেই না কি—ঐ সরোজিনী আসছে। দুপুরবেলা দোপেঁয়াজী খাওয়ার নেমন্তন্ন রইল তোমার।" মাধব চলে এল ওখান থেকে। দেরি হলে বাজারে গিয়ে সে ভাল জিনিস কিনতে পারবে না।

সরোজিনী এসে দাঁড়াল ছ আর পাঁচ নম্বরের মাঝামাঝি জায়গায়। ছ-নম্বরের তালাটার দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা তোমায় কি বলছিলেন হরিদা ?"

"দোপেঁয়াজীর কথা, তুমি না কি আমার জন্যে আজ দোপেঁয়াজী রাঁধছ ? কখন যাব খেতে ?"

"সন্ধ্যের আগে যখন তোমার সুবিধে হয়।"

"তা হলে দুপুর বেলায়ই আমার সুবিধে হবে।"

"হ্যাঁ, সেই ভাল। সন্ধ্যের সময় তোমার তো কাজ আছে। কখন যাচ্ছ হরিদা ? ধুতি আর পাঞ্জাবিটা ইস্ত্রি করা আছে তো ?"

"এতো দিন তো ছিল। তুমি নিজেই একদিন আমায় ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে বিপিন পাল রোডে।"

"নিয়ে গিয়েছিলুম বলেই আজ তুমি মেয়েটির খবর পেলে! হরিদা, মেয়েটি আজ কত বিপদেই না পড়েছে, তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোই তোমার সবচেয়ে বড় কাজ।……বড়সাহেবকে কি বলবে ?"

"তোমার তা জেনে লাভ কি সরোজিনী ?"

"লাভ আছে হরিদা। চোদ্দ নম্বরে বসে বসে আমি পাঁচ-নম্বরের সংসারটা দেখতে পাব। দুটো নম্বরের মধ্যে এমন আর দূর কি বলো ? সবাই যাকে ফেলে দিয়েছে তাকে তুমি তুলে নিয়ে এসে বড় করে তুলবে প্রতিদিন ঐ পাঁচ

নম্বরের মধ্যে—” বাধা দিয়ে ভজহরি বলল, “সরোজিনী, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে যদি দেরি হয়, দোপেঁয়াজী তুলে রেখে দিও।” এই বলে ভজহরি নেমে পড়ল রাস্তায়। চলে গেল হন হন করে। ভজহরিকে কেউ কোনদিনও অস্থির কিংবা অসহিষ্ণু হতে দেখে নি। তাই আজ সরোজিনী খুবই অবাক হল ভজহরিকে দেখে।

ভজহরি চলে যাওয়ার পরে, সরোজিনী দরজাটা নারকোলের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে বলে ঢুকে পড়ল ওর ঘরে। দড়িটা গেল কোথায়? দড়ি খুঁজতে গিয়ে সরোজিনীর আবার নতুন করে মনে পড়ল যতীন দাস রোডের কথা। ‘তত্ত্ব’ নিয়ে যাবার কি দরকার ছিল? ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়ে হরিদাকে রাস্তায় বার করার মূলে ছিল সে নিজেই। হরিদার দোষ একটুও নেই। সে নিজে কখনও জামাকাপড়ে ভদ্রলোক হতে চায় নি। হরিদার আসল ভদ্রতা মনে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সরোজিনী বসল এসে ভজহরির খাটিয়ার ওপর। পাঁচ-নম্বরের সংসারটা ওরই গড়ে তোলবার কথা ছিল। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত কিছুই সে চায় নি। হরিদার পাশে বসে সারাটা জীবন সে গান শুনে কাটিয়ে দেবে বলে ভেবেছিল। গান সরোজিনীকে টানে। কবে আবার শ্রাবণ ফিরে আসবে? হরিদার গলায় কবে আবার শোনা যাবেঃ ঘুর্ আয়ি মাহিনবা শাঁওনকি—বর্ষাকালে বস্তির লোকেদের খুবই অসুবিধা হয়, নইলে সরোজিনী সারা বছরই শ্রাবণের জলে বসে থাকতে চাইত। বস্তির সরু রাস্তাটায় জল উঠত বটে, কিন্তু ওর তাতে কোন অসুবিধে হতো না। বাবা ঘুমিয়ে পড়লে, সরোজিনী জল ভেঙ্গে চলে আসত পাঁচ-নম্বরের সামনে। জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হরিদার গান শুনত। শুনেছেও সে অনেক দিন। অনেকদিনের মধ্যে হরিদা কেবল ওকে একদিনই মাত্র দেখতে পেয়েছিল।

কিন্তু সে-দেখাও সরোজিনীর কোন কাজে লাগল না। হরিদাকে আজ কথা দিয়ে আসতে হবে। যেতে হবে বড়সাহেবের কাছে সন্ধ্যের সময়। কী গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যেই না মেয়েটিকে সারাটা দিন আজ কাটাতে হচ্ছে! কিন্তু অনিশ্চয়তাই বা কেন? হরিদা যদি মেয়েটিকে ভালবাসে—তা হলে এর

মধ্যে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে না। সত্যিকারের ভালবাসার মধ্যে সবটুকুই তো সত্যি—অনিশ্চয়তা আসবার রাস্তা কই? কথাটা ভেবে দেখবার মত গভীর কথা বলেই সরোজিনী খাটিয়ার ওপর ভাল করে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। উনোনের কয়লা পুড়ে যাচ্ছে। তা যাক। একদিন না হয় সনাতনদার হিসেবের কয়লা একটু বেশি পুড়ুক। মা গো, লোকটা কি হিসেব-পাগলা! পানের থেকে চুন খসলেই ধর্ম তার নর্দমা দিয়ে ভেসে যায়। এমন ঠুনকো ধর্ম পালন করে সনাতনদা কি যে সুখ পায় সরোজিনী তা ভেবে পেল না! তা হলে যে-লোকটা এমন মিথ্যে ধর্ম নিয়ে মত্ত হয়ে আছে তাকে বিয়ে করে সরোজিনীই বা কোন্ সুখের মুখ দেখতে যাচ্ছে? সনাতনকে সে ভালবাসে না। ভালবাসে ভজহরিকে। তবে কেন সে ভজহরিকে ধরে রাখতে পারছে না? তাই তো, এ-কথাটা তো সরোজিনী ভাল করে ভেবে দেখেনি! মাথার ঘিলু যেন ওর সব নড়েচড়ে উঠল। যাবে না কি একবার রেণু বৌদির কাছে? মা সরস্বতীর সঙ্গে পরামর্শ যা করবার তা তো সে চব্বিশ ঘণ্টা ধরেই করছে, কিন্তু সেদিক থেকে সরোজিনী এখন পর্যন্ত কোন আদেশ পায় নি। অতএব, সন্ধ্যের আগে রেণু বৌদির সঙ্গে এ সম্বন্ধে ভাল করে একবার সে পরামর্শ করে নেবে।

কিন্তু পরামর্শ করেই বা লাভ হবে কি? সনাতনদাকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে প্রায় এক বছর আগে। সামাজিক নিয়ম মত বাবা নিজেই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। সনাতনদা গায়ে পড়ে ওকে বিয়ে করতে আসে নি। কেবল ভালবাসার দিকটা দেখলে চলবে কেন, ওভারটাইমের মানেটাও বুঝতে হবে। বড় হওয়ার জন্যে সনাতনদা সেই ছেলেবেলা থেকে পরিশ্রম করছে। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে। খানিকটা লেখাপড়া সে সরোজিনীকেও শিখিয়েছে। কেন সে এত পরিশ্রম করল? কেবল নিজে বড় হওয়ার জন্যে নয়, সরোজিনীকে সুখী করবার জন্যেও বটে। এখন যদি সে তাকে ফিরিয়ে দেয়, তাহলে সনাতনদা ভেঙ্গে পড়বে। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। না, না, তা হয় না। নিজে সে দুঃখ পাক, সনাতনদাকে দুঃখ দেওয়া চলবে না। নিজের দুঃখ সে মা সরস্বতীর পায়ে নিবেদন করে দিয়ে জীবনটা এক রকম হেসেই

কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু সনাতনদা কি করবে? সে তো ঠাকুরদেবতা মানে না। ভগবান মানে না। নিজের উন্নতি ছাড়া সনাতনদা আর কিছুই মানে না। অতএব, তাকে খাড়া রাখবার জন্যে সরোজিনীকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তার পাশে। সনাতনদার মত অসহায় লোক সারা তুনিয়ায় আর কেউ আছে বলে বিশ্বাস হয় না সরোজিনীর। ঠাকুরদেবতার ওপর বিশ্বাস নেই বলেই সবটুকু বিশ্বাস তার জমে উঠেছে ওর ওপর। এমন মানুষকে অসহায় বলবে না তো কি বলবে? অতএব, সরোজিনীর আর কোন উপায় নেই। তাই সে ভজহরির তোশকের তলা থেকে ধুতি আর পাঞ্জাবিটা টেনে বার করে নিল। বড্ড বেশি কুঁচকে গেছে। ধুতিটাকে ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখল তোশকের তলায়। পাঞ্জাবিটাকেও ভাঁজ করলে সে। বড়সাহেবের সামনে ভাল কাপড়চোপড় পরে না গেলে ওঁরা বোধ হয় মেয়েটির সঙ্গে হবিদার বিয়ে দিতে চাইবেন না। কাপড়চোপড়ের জন্যে যদি বিয়েটা ভেঙ্গে যায় তা হলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। সরোজিনীর মত মেয়ে চোদ্দ নম্বরে রয়েছে, জামা কাপড়টা কি সে একটু ইস্ত্রিও করে দিতে পারে নি? বলবেন ওঁরা। সরোজিনী তাই তোশকের তলায় পাঞ্জাবি আর ধুতিটা রেখে দিয়ে তার ওপরে চেপে বসল। হরিদার জামাকাপড় ইস্ত্রি হচ্ছে

পাঁচ-নম্বরে কেবল জামাকাপড় ইস্ত্রি হচ্ছে না, মেঝেতে টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা জলও পড়ছে। এখনও তো শ্রাবণ আসতে অনেক দেরি!

একটু পরেই সে নারকোলের দড়িটা হাতে নিয়ে বাইরে এল। হিসেবের কয়লা এখন যতটা কাজে লাগানো যায় ততই ভাল। লোকসান কেবল সনাতনের একলার নয়, মাধবেরও। অনেক কষ্টের টাকা, অনর্থক পুড়িয়ে ফেললে লাভ হবে কি?

দড়ি দিয়ে দরজাটাকে বাঁধতে গিয়েই সরোজিনী দেখল সর্দার এসে দাঁড়িয়েছে পাঁচ-নম্বরের সামনে। বার বার করে সরোজিনী কেন সর্দারের কাছে ধরা পড়ে? ওর ভেজা চোখ কেন সে গোপন করতে পারে না সর্দারের কাছ থেকে।

"ভজুয়া কাঁহা হ্যায় রে সরজিনী ?"

"কি করে বলব ? কাজে যায় নি ?"

"নেহি। কভি কভি যাতা হ্যায়।···তুম্‌কো সাদি হোগা কব্ ? ভজুয়া বহুৎ আচ্ছা আদমি হ্যায়।"

"কিন্তু তোমার ভজুয়া তো সাদি করতে যাচ্ছে বালিগঞ্জে।"

"কেয়া ? ঝুট্ বাত মাত বোলো।"

"ঝুট্ নয়, সত্যি সর্দার। ঐ বাবা আসছে !"

মাধব বাজার নিয়ে ফিরে আসছে। সর্দার আর সময় নষ্ট না করে, হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়ে সরোজিনীর হাতে দিয়ে বলল, "ভজুয়াকা সাদি কো লিয়ে ই ঘড়ি হাম রাখাথা। ই ঘড়ি ভি ঝুটা হ্যায়!" যাওয়ার সময় সর্দার তার জুতোর আওয়াজ তুলতে তুলতে চলে গেল। সমস্ত সংসারটার পিঠে যেন জুতোর আওয়াজটা আজ সকরুণ প্রতিধ্বনি তুলেছে !

"এ কে রে সরোজিনী ?" জিজ্ঞাসা করল মাধব।

"কুলীর সর্দার······সর্দার চন্দ্রনাথ দুবে।" জবাব দিল সরোজিনী।

দোপেঁয়াজী রাঁধতে গিয়ে সরোজিনীর আজ সব বিচ্ছিরী রকমের ভুল হতে লাগল। নুনের পরিমাণ ঠিক হল না। মশলা যা দিল তাতে দোপেঁয়াজীর স্বাদ আসবে কি করে ? রেণু বৌদিকে ডেকে আনলেই সম্ভবত ভাল হতো। কিন্তু বত্রিশ নম্বর পর্যন্ত সরোজিনী আজ যাবে কি করে ? পায়ে জোর কই ? মনে উৎসাহ কই ? কোন রকমে রান্নাটা সে শেষ করে ফেলল। শেষ করতে বেলা প্রায় বারোটা বাজল।

মাধব শুয়েছিল। ছুটির দিনটায় শুয়ে থাকতে বেশ ভাল লাগে। কয়েক বছর আগে ছুটির দিনে শুয়ে থাকতে ভাল লাগত না। চলে যেত দক্ষিণেশ্বর কিংবা কালীঘাটে। অনেকদিন হল মাধব আর সে সব দিকে যায় না। যায় না বলেই বোধ হয় চোদ্দ নম্বরে আজ এত অশান্তি এসেছে। ধর্ম পালন না করলে মানুষকে আর মানুষ বলে কেন ? অন্য কিছু বলত। বিছানায় উঠে বসল মাধব।

"রান্না কি তোর হয় নি সরোজিনী?" ঘর থেকেই জিজ্ঞাসা করল মাধব।

"হয়েছে বাবা। চান করে এসো।"

চান করতে যাবে বলে মাধব বেরিয়ে এল দাওয়ায়। গামছা আর কাপড় নিয়ে সে এসে দাঁড়াল রাস্তার ওপরে।

"গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি।"

"অনেক দেরি হয়ে যাবে যে।" বললে সরোজিনী।

"ছুটির দিনেও যদি গঙ্গা-চান না করি, তবে নদীটা যে একদিন শুকিয়ে যাবে মা। তা ছাড়া সনাতন তো এখনো ফিরল না। ছুটির দিনেও কি সে ওভারটাইম খাটছে? ব্যাপার কি রে?"

"তার তো ছুটি নেই বাবা। সরকারি ছুটির সঙ্গে কারখানার ছুটি মিলবে কেন?"

"ও, তাই তো! তা হলে তুই দোপেঁয়াজী রাঁধলি কার জন্যে? কেন এত কষ্ট করলি? কে খাবে তোর কষ্টের রান্না?"

"তুমি খাবে বাবা। সনাতনদা এলে সেও খাবে।" সরোজিনী দুখানা থালা জল দিয়ে ধুতে লাগল।

"না, তোর এত কষ্টের রান্না আমি খেতে চাই নে। কেন খাবো? একটা দিনও ভজহরিকে খাওয়াতে পারলুম না। তোর কষ্ট ভজহরি ছাড়া বুঝবেই বা কে?"

"রাঁধতে আমার আজ কোন কষ্টই হয় নি বাবা। তাই রান্নাটা আজ খুব খারাপ হয়ে গেছে।"

"কি বললি?" মাথার তালুতে তেল ঘসতে ঘসতে মাধব এগিয়ে এসে দ্বিতীয়বার গর্জন করে উঠল, "কি বললি, রান্না খারাপ হয়ে গেছে? কেন খারাপ হল? কিসের চিন্তা তোর? দিনরাত ভাবিস কি? ভজহরিকে আজ আমি দোপেঁয়াজী খাওয়াবো বলে নেমন্তন্ন করে এলুম,......দেখি দেখি তোর দোপেঁয়াজী?" মাধব দাওয়ার ওপর উঠে এল।

"রাগ করছ কেন বাবা? হরিদা আজ এখানে খেতে আসবেই না। বড়সাহেবের বাড়িতে ভাল করে খেয়েদেয়ে সেই রাত্রের দিকে সে ফিরবে।"

"ও, বড়সাহেবের বাড়ির রান্না বুঝি আজ তোর রান্নার চেয়েও ভাল হল? বহুৎ আচ্ছা। আমিও দেখে নেব। ফেলে দে ওসব দোপেঁয়াজী টোপেঁয়াজী, বেশ করেছিস ভাল করে রান্না না করে। শুঁকে ত্থাখ্ তো, মাংস থেকে পোড়া গন্ধ আসছে না কি?"

"তুমি কি করে বুঝলে বাবা? সত্যিই, মাংসটা পোড়া লেগে গিয়েছিল বাবা। এতক্ষণ তাই নিয়ে আমি ভেবে মরছিলাম।"

"না, না, ভাবনার কিছু নেই। কেন ভাববি? কার জন্যে ভাববি? ওসব ভজহরি-টজহরির জন্যে ভেবে কিচ্ছু লাভ হয় না। সারাটা জীবন আমি কারু জন্যেই ভাবি নি। বেশ হয়েছে, আয় আমরা বাপ-বেটিতে মিলে আজ পোড়া-মাংসই খাবো। আমরা বর্বর, আমরা জানোয়ার! সরোজিনী, আমাদের কপাল পোড়া!" গলায় আর্তনাদের সুর তুলতে তুলতে মাধব চলে গেল চান করতে।

ফিরে এল ঘণ্টা দুই পরে। এসেই সে আবার শুয়ে পড়ল। পাঁচ-নম্বরের দরজাটা নারকোলের দড়ি দিয়ে তখনও বাঁধা ছিল। ছ-নম্বরের তালাটা সনাতন এখনও এসে খোলে নি। ওভারটাইমের রহস্য ক্রমশই ঘনতর হতে লাগল। ঘনতম না হওয়া পর্যন্ত কারু আর কিছুই করবার রইল না। অবসন্ন হয়ে মাধব শুয়ে পড়েছে। অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সরোজিনীও জোর পাচ্ছে না ভাত বাড়বার। ভাত মেখে মুখে তুলবার মত যৎকিঞ্চিৎ প্রেরণা পর্যন্ত বাপ-বেটিতে খুঁজে পাচ্ছে না আজ। মাধব চেয়ে আছে মেয়ের দিকে। সরোজিনীও মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে বাবার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে। আদানপ্রদানের নিরুক্ত ভাষা উভয়ের মনের সমুদ্রে এসে মিশে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে একই স্রোতাভি-মুখে। মাধব সরোজিনীর বন্ধু হতে চেয়েছিল। পারল না। হয়তো গলার গর্জনে বন্ধুত্ব জন্মায় না। জীববিদ্যার প্রজন-রহস্যে সত্য আছে, বন্ধুত্ব নেই। জীবতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক অংশটায় পিতৃত্ব পাকা হয় বটে, কিন্তু

বন্ধুত্ব পাকা হয় না। বন্ধুত্ব প্রোটোপ্লাজম্ থেকে আসে না, আসে কৃষ্টি থেকে। শেষ জীবনে মাধব পিওন কৃষ্টির পথ খুঁজে পেয়েছিল। সরোজিনীর বন্ধু হতে চেয়েছিল সে। এখনও সময় আছে। সন্ধ্যে হতে দু-এক ঘণ্টা বাকী। এখনও যদি বিপিন পাল রোডের দিকে রওনা হয়ে যায়, হয়তো বড়সাহেবের বাড়ির দরজায় গিয়ে পারে সে ভজহরির পথ রুখে দাঁড়াতে। মেয়ের সুখের জন্যে যদি সে এইটুকু পথ অতিক্রম করতে না পারে, তা হলে পিতৃত্বের অহংকার নিয়ে এতদিন বেঁচে রইল কেন? বিছানায় শুয়ে রইল মাধব। মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মিনিটের মধ্যে আজকের এই কটা মিনিট সে কিছুতেই আর নষ্ট হতে দেবে না। সরকারি চিঠি বিলি করতে করতে জীবনের বিশটা বছর সে উড়িয়ে দিয়েছে লালদীঘির হালকা হাওয়ায়। ব্যাগ-ভর্তি চিঠি নিয়ে অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াল মাধব। জরুরী চিঠি সে সারা জীবন ধরে বিলি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আজকে তার হাতে কোন চিঠি নেই বটে, কিন্তু সবচেয়ে জরুরী খবর আছে মনের আকাশে। এ আকাশের বিস্তৃতি চোদ্দ নম্বর থেকে সুরু হয়ে শেষ হয়েছে বিপিন পাল রোডের ফটক পর্যন্ত। এমন জরুরী খবর পৌঁছে দেবার সুযোগ প্রতিদিন আসে না। হয়তো সহস্র যুগের মধ্যে একবারই আসে। আষাঢ়ের প্রথম দিবসটা পেরিয়ে গেছে বটে, কিন্তু মেঘের চলাচল বন্ধ হয় নি। প্রিয় ও প্রিয়তমার তপস্যা-লব্ধ নতুন আষাঢ়ের প্রথম দিবস আজ আবার সমাগত! মাধব দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। ভজহরিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে সে। গঙ্গায় চান করা তার সার্থক হয়েছে। সত্যিকারের বন্ধুত্ব-ধর্ম অর্জন করে নিয়ে এসেছে পুণ্য-স্নাত পিতা মাধবচন্দ্র দাস। প্রোটোপ্লাজমে সত্য আছে বটে, কিন্তু সভ্যতা নেই।

মিনতিকে সন্ধ্যের সময় যতীন দাস রোড থেকে নিয়ে আসবার জন্যে লুকু রাজী হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যের একটু আগেই কিরীটবাবু এলেন বিপিন পাল রোডে। খুবই অপ্রত্যাশিত আগমন সন্দেহ নেই। বড়সাহেব বাড়িতেই ছিলেন। বসবার ঘরে নাগমশাইকে নিয়ে এলেন তিনি। মাথা থেকে

গান্ধী টুপীটা খুলে নাগমশাই রাখলেন সেণ্টার টেবিলের ওপর। একটু পরিশ্রান্ত এবং চিন্তিত বলে মনে হল তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে বড়সাহেবও একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এবার নিশ্চয়ই কিরীটবাবু লুকুর খোঁজ করবেন। ভগবানের কৃপায় লুকু আজ বাড়িতেই ছিল। কিরীটবাবু বললেন, "রিক্সা করে এলুম। জীবিকার মান বড্ড বেশি উঁচু হয়েছে আজকাল। রাসবিহারী এ্যভিনু পার হতে আট আনা পয়সা লাগল।" বড়সাহেব বললেন, "রিক্সা-মালিকরাও রেট বাড়িয়েছে। রিক্সওয়ালারা বেশি আয় না করলে মালিকদের সন্তুষ্ট করবে কি করে?"

"তা ঠিক, তা ঠিক। রিক্সায় যে জিনিসগুলো ছিল, সেসব কি কুলীটা নিয়ে পালাল না কি?"

"জিনিস? কি জিনিস বেয়াইমশাই?" জিজ্ঞাসা করলেন বড়সাহেব।

"মিনতির ক-খানা শাড়ী আর যা দু-চারটে ওর জিনিস পত্র ছিল, আমি নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে।"

"আপনি এসব হাঙ্গামা পোয়াতে গেলেন কেন? লুকু তো একটু বাদেই যাবে মিনতিকে আনতে।"

"কুলীটাকে পেয়ে গেলুম একতলার রোয়াকে।"

"কুলী?" এবার বড়সাহেব কুলীটার পরিচয় পেলেন।

"হ্যাঁ, ঐ যে আপনার, কি বলে গিয়ে ভজহরি। স্ত্রী বরই না জুটিয়ে দিলেন বেয়াইমশাই! মেয়েটা বেশ তো ছিল আমার ওখানে। খেয়েদেয়ে পাঁচটা করে টাকা জমছিল ব্যাঙ্কে। যাক, এখন আর এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। কুলীটা দুপুর থেকে এসে রোয়াকের ওপর বসেছিল। সিঁড়ির তলায় না কোথায় মিনতি তার জিনিস পত্র সব রেখেছে খুঁজে পাই না। দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। কিন্তু কুলীটাই সব খুঁজে পেতে বার করলে মশাই। এক বছরের সংসার, এটা-ওটা করে মিনতির অনেক জিনিসই জমে উঠেছিল। আপনার বেয়ান ঠাকরুনের এক জোড়া শান্তিনিকেতন-প্যাটার্ণের জুতো ছিল। তিনি সেটা মিনতিকে দিয়েছিলেন। আমি জানতুমই না।"

"বেয়ান ঠাকৃরুন তো অসুস্থ, জুতো পরবার সময় কই তাঁর? তা ছাড়া, বুড়োবয়সে তাঁর পায়ে শান্তিনিকেতন-প্যাটার্ণ মানাবে কেন?" বললেন বড়সাহেব।

"ঠিক সেই জন্যেই যে দামী জুতোটা মিনতি পেল তা নয়। দু-বছর থেকে খাটের তলায় জুতো জোড়াটা পড়ে ছিল। এক নম্বর রোটাস দিয়ে বাড়ি তৈরি করলুম। কিন্তু কি বলব মশাই, চার্লস ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ যে বালিগঞ্জের আণ্ডারগ্রাউণ্ডে এমন সাংঘাতিকভাবে বড় হয়েছে তা আমি আগে বুঝতে পারি নি! বালিগঞ্জের ইঁদুরগুলো সব এক একটি বাচ্চা বাচ্চা বাঘ! কোথায় লাগে মশাই আপনার কি বলে গিয়ে পরশুরামের পাঁঠা? কেবল বেহালার তার আর নব্বই টাকার নোট সে খেয়েছিল। পরশুরামের মোল্লা মসজিদের সীমা পার হতে পারে নি। আর এ যে মশাই কি বলে গিয়ে বালিগঞ্জের ইঁদুর—শান্তিনিকেতনের ওপরে ওঠে নি, তলা থেকে সব হজম করে ফেলেছে! কি সাংঘাতিক দাঁত! ঐ তো কুলী ব্যাটা সব মাথায় করে নিয়ে আসছে, স্বচক্ষেই দেখবেন। আপনি না কি দু-চারখানা শাড়ী ব্লাউজ দিয়েছিলেন, সেগুলো মিনতি বোধ হয় সিঁড়ির তলায়ই রেখেছিল—" বাধা দিয়ে বড়সাহেব বললেন, "খুবই দামী শাড়ী ছিল দু-খানা। সুরাটের এক নম্বর জরি ছিল পাড়ের বুননিতে।"

"বুঝেছি, তা না হলে কি এমন দলবল নিয়ে ওরা সিঁড়ির তলায় মহোৎসব করেছে? সুরাটের এক নম্বরের লোভ মশাই আমি নিজেও তো সংবরণ করতে পারতুম না। আর এরা তো বালিগঞ্জের আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বসে দাঁতে শান্ দিচ্ছে দিনরাত। একটা শাড়ীও আর আস্ত নেই। রিফিউজীদের বরাতই খারাপ বেয়াই মশাই। অজয় আর কত সাহায্য করতে পারে বলুন? ঐ তো মাথায় করে কুলীটা সব নিয়ে এসেছে। এই, এখানে রাখো।"

ভজহরি হাতে ঝুলিয়ে পুঁটলিটা নিয়ে এসেছে। মিনতির এক বছরের সংসার তুলে নিয়ে আসতে ভজহরির তিনটে আঙুলেরও দরকার হয় নি। কিরীটবাবু বুক্ পকেটে হাত দিয়ে একটা দশ টাকার নোট বার করে বললেন,

"এই রে আট আনা পয়সা তো নেই? এই, কি বলে গিয়ে তোমার নামটা যেন? ও, ভজহরি। রিক্সাওয়ালার কাছ থেকে সাড়ে ন-টাকা নিয়ে এসো।"

বড়সাহেব বললেন, "রিক্সাওয়ালার কাছে সাড়ে ন-টাকা থাকলে, আমাদের প্রধান মন্ত্রী এত নাম করতে পারতেন না বেয়াইমশাই। দরকার হতো না পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার। আপনি ব্যস্ত হবেন না, এক তলায় আমার লোক আছে, তারাই দিয়ে দেবে। তা ছাড়া, মিনতির জিনিস আনবার জন্যে আপনি খরচ করবেন কেন?"

"তা যা বলেছেন। এই যে বৌমা, এসো এসো। কবে যাচ্ছ দিল্লী? বিজয়কে লিখব লিখব করে আজ পর্যন্ত একটা চিঠিও লিখে উঠতে পারি নি। অজয় বোধ হয় আজই দিল্লী চলে গেল।"

লুকু এসে কিরীটবাবুর পায়ের ধুলো নিল। নিয়ে বলল, "আমি যাচ্ছি মিনতিকে নিয়ে আসতে।"

"মিনতি? মিনতি কোথায় বৌমা? কি বলে গিয়ে, ঐ ছোঁড়াটার নাম যেন কি? ও, হ্যাঁ বিশু। আজকাল তো কেউ আর বাবা বিশ্বনাথকে দেখতে পায় না! সর্বত্রই বিশু। রাস্তাঘাটে, মাঠে ময়দানে বিশুরাই কেবল মিটিং করে বেড়াচ্ছে। লজ্জায় এবং দুঃখে বাবা বিশ্বনাথও চোখ বুঁজে আছেন। তিনিও কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। কি করে জীবনের বাকী ক-টা দিন কাটাই বলুন তো? আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বাচ্চা বাচ্চা বাঘ, আর রাস্তায় ঘাটে বাচ্চা বাচ্চা বিশ্বনাথ! বেলা বারোটা একটার সময় বিশু এসে উপস্থিত। মাইনে বেড়েছে তার। এ-যুগের অজয়রা না থাকলে, বিশুরা যে কোথায় ভেসে যেতো কে জানে। ত্রিশ টাকা থেকে এক বছরের মধ্যেই ষাট টাকা! এক তলার রোয়াকে বিশু যেন মিনিট পনরো কেবল মার্চ করল, একমিনিটও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারল না। বাচ্চা বিশুরা বড্ড বেশি অস্থির হয়ে উঠেছে বেয়াই-মশাই। আপনাদের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ওপরটা ভালই দেখতে, কিন্তু তলায় কি হচ্ছে? বাচ্চা বিশুরা দাঁত বসিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভজহরিকেই হয়তো পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পুঁটলিটা মাথায় করে বয়ে বেড়াতে হবে। আপনার

ঘরে রাখবার জায়গা হবে না। একতলা, দো-তলা আর তিন-তলা সব মাদ্রাজী আর পাঞ্জাবীর কাছে ভাড়া দিয়ে হয়তো আপনাদের গিয়ে উঠতে হবে ছাদের ওপর। বড সাংঘাতিক হাওয়া উঠেছে বাংলা দেশে! ওপর দিকে উঠলে হবে কি, পড়ে যেতে কতক্ষণ? ছাদের ওপর কতদিন টিকতে পারবেন?"

"কিন্তু মিনতির কি হল?" জিজ্ঞাসা করলেন বড়সাহেব।

"কি হল আমি কি করে বলব? ভাইবোনে মিলে রাস্তায় বেরুলো বেলা একটার সময়। ওর জমানো টাকা সব আমার কাছেই পড়ে রইল। ওর হাতে থাকলে টাকাগুলো কি বাঁচত? আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যেত। ভাবছি, পরশুরামের কাছে একটা নোট পাঠাব। কেবল পাঁঠার ওপর দোষ চাপালে চলবে কেন? পরের ধন হজম করবার মত লক্ষ লক্ষ রাক্ষসগুলোকে তিনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না কেন? বৌমা, ওখানে কে এল?"

"মাধবদা। বাবার অফিসে কাজ করেন। মিনতি কি এখনো ফিরে আসে নি?"

"ফিরে আসবে?" ফিরে না এলেই যেন ভাল হয়, তেমন একটা আকাঙ্খার ইঙ্গিত ভেসে উঠল কিরীটবাবুর স্বরে। জমানো টাকাগুলো ফিরিযে না দিতে হলেই ভাল। দেবেনই বা কেন? গত এক বছরের মধ্যে মিনতি তিনখানা চিনামাটির পিরিচ ভেঙ্গেছে, দুটো পেয়ালা ভেঙ্গেছে। দু-খানা কাঁসার থালা ছাই দিয়ে মাজবার সময় মিনতি থালা দুটোতে দাগ ফেলে গেছে। বছর পাঁচ আগে থেকেই দাগগুলো ছিল, কিন্তু কিরীটবাবু তা বিশ্বাস করতেন না। মিনতিই বা কি করবে? শুধু ছাই দিয়ে ওকে বাসন মাজতে হয়েছে। একটুকরো লেবু চেয়ে চেয়ে সে হতাশ হয়ে পড়েছিল। ছাই-এর সঙ্গে লেবু মিশিয়ে নিলে কাঁসার গা থেকে হয়তো সে দাগগুলো তুলে দিয়ে যেতে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হল না। দাগগুলো পড়ে রইল। কিরীটবাবুদের দাগ তুলে দেবার দায়িত্ব বোধ হয় মিনতির হাতে আর নেই। আছে বিশুর হাতে। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে হাতের মাংস শক্ত করেছে বিশু।

বড়সাহেবের বাড়ির ফটকের দিক থেকে গাড়ির হর্ন বাজতে লাগল। লুকুর বদলে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কিরীটবাবু। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "গাড়ির হর্ন বাজাচ্ছে কে? হর্নের আওয়াজটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে? শ্রবণশক্তি খুবই কমে গেছে বটে, কিন্তু—"

লুকু বলল, "হ্যাঁ, আমাদের তো খুবই চেনা। দত্তসাহেব এক সময়ে বাবার খুব বড় বন্ধু ছিলেন। দত্তসাহেব নেই, মারা গেছেন। তাঁরই গাড়িটা পল্টুদা আজো ব্যবহার করছেন। তা হলে আমি গিয়ে মিনতিকে নিয়ে আসি?"

"বৌমা, বাড়িতে মিনতি যদি থাকত, তা হলে আমিই তো তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতুম? ষাট টাকা মাইনে হয়েছে বিশুর, আর কেন সে এখানে থাকবে? আমার তাতে কোন ক্ষোভ নেই। অকৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় নয়।"

"কিন্তু, না জানিয়ে হঠাৎ চলে যাবার মত মেয়ে তো নয় মিনতি?" বললেন বড়সাহেব।

"আমিও জানি নয়, তবুও তো গেল বেয়াইমশাই।"

"হয়তো একটু বাদেই সে আবার ফিরে আসবে।"

"ওঃ, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় আমার চিঠির বাক্সে একটা চিঠি পেলুম। দেখুন, মনেই ছিল না চিঠির কথাটা। স্মরণশক্তি কমে যাচ্ছে। চিঠিখানা আপনার নামেই লেখা। লিখেছে বোধহয় মিনতি।"

এই বলে কিরীটবাবু পকেট থেকে খামে-আটকানো চিঠিখানা বার করে বড়সাহেবের হাতে দিলেন। চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলেন তিনি। খুবই ছোট চিঠি। পড়তে সময় লাগল না। জীবনের শেষ বিচারটা অন্তত তাঁর সত্য হয়ে থাক।

ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠল। কেউ কোন কথা কইছে না। সবাই চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল। পড়ল লুকু, পড়ল মাধব এবং ভজহরি। সবার শেষে চিঠিখানা ঘুরে চলে গেল কিরীটবাবুর হাতে। পকেট থেকে চশমা বার করে তিনি চিঠিখানা দু-বার পড়লেন। এককালে বড় বিচারক ছিলেন

তিনি। বাদী এবং বিবাদী পক্ষের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। কোন রকম সন্দেহ থাকলে চলবে না।

চিঠিখানা দ্বিতীয়বার পড়বার পরে কিরীটবাবু উঠলেন। যেতে হবে এবার। ইতিহাস আজ অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। তিনি না উঠলেও পারতেন। তবু তিনি উঠলেন। চৌকাঠের কাছে পা ফেলতেই, দুটো পা-ই তাঁর এক সঙ্গে কেঁপে উঠল। কাঁপল তার অতীত ও বর্তমান। তিনটে পা তাঁর নেই। অতএব ভবিষ্যৎও তাঁব নেই। তিনি হাত রাখলেন ভজহরিব ঘাড়ে।

ঘাডে হাত রেখে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলেন। অস্ফুট স্বরে ভজহরিকে উদ্দেশ করেই বললেন তিনি, "অজয় তোমাকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিল। স্ক্যাণ্ডেল··শেম্, শেম্। এত বড পাপ কি করে সে করলে? আমার বাড়ি ছাড়া এত বড় পাপ সে করতে পারত না। ছি, ছি! এবার আমি গৃহ হারা, ঘর আমার ভাঙ্গলো ভজহরি। ছিঃ!"

ভজহরির ঘাডে হাত রেখে তিনি বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। চলে এলেন রাসবিহারী এ্যভিন্যুর মোড় পর্যন্ত। "আর কতদূর তুমি আমার সঙ্গে যাবে ভজহরি?" জিজ্ঞাসা করলেন কিরীটবাবু।

"যতদূর পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাবার দরকার বোধ করবেন।"

"যতীন দাস রোড থেকে কেওড়াতলাব দূরত্ব খুব বেশি নয়। এইটুকু পথ আমায় একলা যেতে দাও। গুডনাইট ভজহরি!"

রাস্তার ওপার থেকে কিরীটবাবু একলাই হেঁটে চললেন। সামনে তাঁর কেওড়াতলার আগুন জ্বলছে। হাজার হাজার চিতা! গঙ্গার বাতাসে আগুনের মাথাগুলো সব লম্বা হয়ে আকাশ ছোঁযার চেষ্টা করছে। আগুনের তাপ ... লেগে তাঁর বিচারের খাদ সব গলে গেল। কয়েদখানার লম্বা লম্বা লোহার শিকগুলো সব এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি। গঙ্গা আর গঙ্গা নেই। মাঝখানে মস্তবড় সমুদ্র। ওপারের কয়েদখানার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আ... কে? দেবেশ না? হ্যাঁ, দেবেশ দত্তই বটে।

বাংলার সোনা! বিচার তিনি করতে পারেন নি। বিচারের সবটুকুই তাঁর খাদ ছিল। সোনার গর্ব কেবল দেবেশের গায়েই অক্ষয় হয়ে থাক।

দেবেশকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা তাঁর হাতে আর নেই। দেবেশ আবদ্ধ। আবদ্ধ মানবজাতি। আবদ্ধ বাংলার সোনা। কিরীটকুমার নাগ কপালে হাত ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে প্রণাম করলেন। রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে ভজহরি তা দেখল। বাংলার ভবিষ্যৎ-ইতিহাস কিরীট নাগের শেষ প্রণামটি গ্রহণ করবে কি না বলা যায় কি?

কিরীটবাবু বেরিয়ে যাবার পরে, লুকুও বেরিয়ে এল। চলে এল একেবারে ফটকের সামনে। বিজয়বাবুর স্ত্রীর জন্যে পল্টুদা অপেক্ষা করছিল। লুকু বিবাহিতা। লুকুকে দেখতে পেয়ে পল্টুদা তার গাড়ির বাঁ পাশের দরজাটা খুলে দিল। লুকু বলল, "কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছি, এখানে আর নয়।" এই বলে লুকুই পল্টুদার গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পুনরায় বলল, "নমস্কার পল্টুবাব।" বিপিন পাল রোডের ধর্ম ফিরিয়ে নিয়ে এল লুকু। ফিরে গেল পল্টু দত্তের প্যাকার্ড।

বড়সাহেব এখনো তাঁর মন থেকে মিনতির চেহারাটা মুছে ফেলতে পারেন নি। কি করে পারবেন? মিনতি আর মিনতি নেই। বিশ্ব-নারীর নির্যাতন তিনি নিরুপায় হয়ে বসে বসে দেখতে লাগলেন। বিপিন পাল রোড এবং যতীন দাস রোড ছাড়াও পৃথিবীতে আরও অনেক রোড আছে। সবগুলো রোডেই যেন কোটি কোটি মিনতি রিফিউজী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ লক্ষ অজয় বসুর মুখোসগুলো খুলে পড়তে আর বোধ হয় বিলম্ব হবে না।

লুকু এসে দাঁড়াল বড়সাহেবের সামনে। বাবা তাঁর ধ্যানে বসেছেন! কি করবে লুকু? কার সঙ্গে কথা কইবে? মাধবদা কোথায়? সরে পড়েছে মাধবদা।

"বাবা।" ডাকল বড়সাহেবের মেয়ে লুকু।

"কে?" নিজের মেয়েকে চিনতে পারছিলেন না তিনি।

"আমি, আমি লুকু।"

"কি চাই?"

"একখানা টিকিট।"

"টিকিট কেটে কোন্ গ্রহে যাবি মা?"

"গ্রহে নয়, দিল্লী যাব বাবা।"

ডব্‌সন রোডে মাধব ফিরে এসেছে। এসেই সে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। হারিকেন লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিয়ে মাধব পলতেটার দিকে চেয়ে ছিল মুহূর্ত কয়েক।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "অন্ধকারে শুয়ে পড়লে যে বাবা?"

জবাব দিল না মাধব। একটা হারিকেন লণ্ঠনের আলো জ্বালিয়ে রাত দুনিয়ার অন্ধকার দূর হবে কেন? মাধবকে আর বিরক্ত করা উচিত না মনে করে সরোজিনী বস্তিটার সরু রাস্তায় এসে দাঁড়াল। পায়চারি করতে করতে সে এল প্রায় ছ-নম্বর পর্যন্ত। পাশাপাশি ঘর দুটোই বন্ধ পড়ে রয়েছে। সনাতন আজো ফিরল না। ফিরল না বলে সরোজিনীর তেমন দুর্ভাবনা হয় নি। ভাবনা কেবল হরিদাকে নিয়ে। বাবার মন খারাপ কেন? হরিদা বোধ হয় তার কথা দিয়ে দিয়েছে। দোপেঁয়াজী খাওয়ার আর লোক কই? ডব্‌সন রোডের বস্তি একেবারে ফাঁকা! বাবার মনে এত অশান্তি কেন? বিপিন পাল রোডের অশান্তি কি সে সঙ্গে করে নিয়ে এল না কি? দো-তলার মানুষদের মনে অশান্তি এল কি করে? এই সব নানা রকমের প্রশ্ন করতে করতে সরোজিনী আবার চলে এল চোদ্দ নম্বরের সামনে। সরু রাস্তাটার অন্ধকারে গা ভাসিয়ে দিল সরোজিনী।

ভজহরিও ঘরে ফিরে এল। খাটিয়ার তলা থেকে টিনের বাক্সটা টেনে নিয়ে এল সামনের দিকে। ডালাটা খুলে ফেলল টান দিয়ে। হাঁটু ভেঙ্গে বসল সে মেঝের ওপর। কি করছে ভজহরি? নাগ-বাড়ির বিগ্রহ আর বৌরানীর ডায়ারী বইখানা ছাড়া ওতে আর আছে কি? তবুও ভজহরি

চুপ করে বসে রইল তারই সামনে। ইতিহাসের পাতা ওল্টাচ্ছে সে। ওল্টাচ্ছে অতি নিঃশব্দে। সরোজিনী যে ঘরের বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তাও সে টের পায় নি। তন্ময়তা ওর আজ জমাট বেঁধেছে। তন্ময়তার স্পর্শ লেগে ইতিহাসের পাতাগুলো পেছন থেকে উড়ে উড়ে পড়তে লাগল পাঁচ-নম্বরের মেঝের ওপর। কি দেখছে ভজহরি? পাঁচ হাজার বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ক্ষমতার শঙ্খবিষ বার বার করে পাতাগুলোকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কেন দিচ্ছে? ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খবিষ আসে কেন? হঠাৎ যেন ভজহরি প্রশ্নটার জবাব পেয়ে গেল! ধনপতি নাগ্‌রা চিরদিনই ভগবানের কাছ থেকে শক্তি চেয়েছেন। চেয়েছেন ক্ষমতা। ক্ষমতা পেয়ে কি করলেন ধনপতি নাগ্‌রা? সবটুকু ক্ষমতাই কি খরচ হয়ে যায় নি বল্লমের মুখে? শেষ পর্যন্ত সেই বল্লমটাই বিঁধেছে এসে নিজেদের বুকে। বল্লমের মুখে কেবল ধারই ছিল না, ছিল শঙ্খবিষ। ভজহরির মনে হল, পৃথিবীর মেরুদণ্ডটা যেন ধনপতি নাগের বল্লমের মতই শক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই পৃথিবীটার শাক্ত-মেরুদণ্ড এরই মধ্যে নুয়ে পড়েছে জগদীশবাবুর মত। জীবনের মূলাধারপদ্মে ঘর বেঁধেছে ভগবান-বিবর্জিত বোবা তমিস্রা—জমে উঠেছে শঙ্খবিষের ক্রমসঞ্চয়। কি করবে ভজহরি? কি করবে বাংলার মধ্যবিত্ত? বিষাক্ত-বৃত্তের আবদ্ধশক্তি নিয়ে সে কি করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে? অর্থ-লোভী বাড়িওয়ালার ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ বুঝি প্লাবন এল, আলোর প্লাবন! এমন প্লাবন বৌরানীও দেখতে পায় নি। পূর্ববঙ্গ কেবল জলের দেশই ছিল না, আলোর দেশও ছিল।

ইতিহাসের পাতা থেকে ভজহরি এবার সবটুকু ক্ষমতাই তুলে নিয়ে এসে নিবেদন করে দিল ভগবানের পায়ে। ক্ষমতা থেকে শঙ্খবিষের অংশটাকে আলাদা করে বার করে নিয়ে আসবার আর কোন পথই দেখতে পেল না ভজহরি। বৌরানীও যদি এমন করে দেখতে পেত, তা হলে বোধ হয় জীবনটা তার জলের টানে ভেসে যেত না। দেবেশদার কোমরে-বাঁধা দড়িটার সাধ্যই হতো না বৌরানীকে টেনে নিয়ে যাবার। বৌরানীর হয়ে ভজহরিই যেন

আজ ডায়ারী বইখানার সবটুকু ব্যর্থতা সঁপে দিল ভগবানের পায়ে। বৌরানীর ভুল শুধরে দিল ভজহরি।

ঘরের বাইরে থেকে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করল, "হরিদা, ও-পাড়ায় এত অশান্তি কেন বলতে পারো?"

এ-পাড়ায় অশান্তি থাকলে ও-পাড়ায় শান্তি আসবে কি করে?" এই ব ভজহরি টিনের বাক্সটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে রাখল খাটিয়ার তলায়।

পরের দিন ছ-নম্বরের দরজায় নোটিশ পড়ল, 'ঘর ভাড়া দেওয়া যাইবে ইতি, ম্যানেজার।'

ওভারটাইমের রহস্য সরোজিনীর আর না জানাই ভাল।